নজরুল-রচনাবলী



নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী নজরুল ইসলাম



বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাএ ৪৯১৮

প্রথম সংস্করণ : ৯ই ফাল্গুন ১৩৭৬/২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭০। দ্বিতীয় প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮৩/আগস্ট ১৯৭৬। তৃতীয় প্রকাশ : ১লা পৌষ ১৩৯১/১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৪। নতুন সংস্করণ : ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/২৫শে মে ১৯৯৩। প্রথম পুনর্মুদ্রণ (নতুন সংস্করণের) : ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩/২৫শে মে ১৯৯৬। নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ (দ্বিতীয় খণ্ড) : ফাল্গুন ১৪১৩/ফেব্রুয়ারি ২০০৭। প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) : জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮/মে ২০১১। প্রকাশক : শাহিদা খাতুন, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ [পুনর্মুদ্রণ সেল], বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : সমীর কুমার সরকার, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০ কপি। মূল্য : ২০০.০০ টাকা।

Abdul Quadir (ed.), NAZRUL RACHANABALI [*works of Kazi Nazrul Islam*], Vol. II. First edition : February 21, 1970. New edition : May 25, 1993. Nazrul Birth Centenary edition [Vol–II] : February 2007. First Reprint (Birth Centenary edition) : May 2011. Published by Shahida Khatun, Director, Establishment, Planning & Training Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh.. Price : Taka 200.00 only.

ISBN 984-07-4926-9

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা-পরিষদ

রফিকুল ইসলাম
সভাপতি

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

আবুল কাসেম ফজলুল হক
সদস্য

নজরুল-রচনাবলী

প্রথম সংস্করণের সম্পাদক

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ

আনিসুজ্জামান
সভাপতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
সদস্য

রফিকুল ইসলাম
সদস্য

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
সদস্য

মনিরুজ্জামান
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

করুণাময় গোস্বামী
সদস্য

সেলিনা হোসেন
সদস্য-সচিব

প্রসঙ্গ-কথা : নজরুল-রচনাবলীর জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড নজরুল বিশেষজ্ঞ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একীভূত হয় ১৯৭২ সালে। তৎকালীন বাঙলা একাডেমী থেকে অবশিষ্ট চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ এবং পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৪ সালে কবি আবদুল কাদির পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৯৩ সালে নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী' সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ পাঠকসমাজে বিপুলভাবে আদৃত হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সংস্করণের সমুদয় কপি নিঃশেষিত হয়ে যায়। ফলে সংস্করণটি পুনর্মুদ্রণ করা হয়। ব্যাপক চাহিদার কারণে পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। তবে ইতোমধ্যে বিভিন্ন রচনার পাঠ-সমস্যা, প্রুফ-ত্রুটি ইত্যাদি সনাক্ত করা হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে নজরুলের নতুন কিছু রচনারও সন্ধান পাওয়া যায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চার খণ্ডে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলী পুনরায় সম্পাদনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ-সব কারণে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও 'নজরুল-রচনাবলী' পুনর্মুদ্রণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

'নজরুল-রচনাবলী'র বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রস্তুত করা সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালের অক্টোবরে নজরুল-জন্মশতবর্ষে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। নজরুল-বিশেষজ্ঞ ও ভাষাবিদদের সমন্বয়ে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়।

সম্পাদনা পরিষদ নজরুলের অপ্রকাশিত রচনার অন্তর্ভুক্তি, বাদ-পড়া ও আবিষ্কৃত অংশ সংযোজন, তুলনামূলক পর্যালোচনায় পাঠ প্রমিতকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে 'নজরুল-রচনাবলী'র একটি প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন।

কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলী, বাংলা একাডেমী থেকে প্রফেসর আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে গঠিত সম্পাদনা-পরিষদের তত্ত্বাবধানে চার খণ্ডে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র, নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ পর্যালোচনার পরই সম্পাদকমণ্ডলী পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এই সংস্করণে শুদ্ধ পাঠ

নির্ণয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যুগোপযোগী করার প্রয়াস হিসেবে প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

'নজরুল-রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত গীতিসংকলন, কাব্যগ্রন্থ, কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধসমূহের মধ্যে কবির সঙ্গীত-প্রতিভা এবং কবিতা ও গদ্যরচনায় নজরুলের রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যবৃন্দ নজরুল-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, কবি ও প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, ভাষাবিদ প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, প্রাবন্ধিক প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হক, এবং কবি ও প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দ নিষ্ঠা ও ধৈর্যসহকারে যেভাবে 'নজরুল-রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন সে জন্যে তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের কাজে সংকলন উপবিভাগের কর্মকর্তা জনাব ফারহানা খানম সম্পাদনা পরিষদকে সহযোগিতা করেছেন। গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের সাবেক পরিচালক জনাব নূরুল ইসলাম সম্পাদনা পরিষদের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
ফাল্গুন ১৪১৩॥ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

মঈনুল হাসান
ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রসঙ্গে

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয় 'বাংলা একাডেমী'র সঙ্গে। সরকার কর্তৃক এই পরিবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেই বলেছি, চতুর্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড ১৯৮৪ সালে দুই ভাগে। চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কবি আবদুল কাদিরের জীবদ্দশায়, তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সব খণ্ডেরই নতুন সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ হয়েছে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর লেখা 'সম্পাদকের নিবেদন'সহ।

'নজরুল-রচনাবলী'র ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্পকালের মধ্যেই রচনাবলী-র সব খণ্ড বিক্রি ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যে এবং মরহুম কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমী' নয় সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে এবং এই পরিষদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে চার খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার ফলে 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণও যথারীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নতুন সংস্করণের প্রতিটি খণ্ড একাধিক-বার পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র নতুন সংস্করণ (১৯৯৩) একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল-জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র অধিকতর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি

নতুন সম্পাদনা পরিষদের ওপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে। এই নতুন সম্পাদনা পরিষদ অদ্যাবধি ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলী-র বিভিন্ন সংস্করণ এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের আদি বা পরবর্তী সংস্করণসমূহে সন্নিবেশিত প্রতিটি রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলিয়ে বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করেন।

নজরুল-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডে ছায়ানট, চিত্তনামা, সাম্যবাদী, পুবের হাওয়া, সর্বহারা, বুলবুল, চোখের চাতক, রিক্তের বেদন, মৃত্যু-ক্ষুধা, দুর্দিনের যাত্রী ও রুদ্রমঙ্গল গ্রন্থ সংকলিত হলো। নজরুল-রচনাবলী'র এই নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রতিটি খণ্ডের শেষে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি এবং তাঁর গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক সূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট নজরুলের গানের বই এবং আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে বিবৃত গানের বাণীর পাঠান্তর যথাসম্ভব নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'নজরুল-রচনাবলী'র বিভিন্ন সংস্করণে মুদ্রণজনিত ত্রুটির দরুন এবং অন্যান্য কারণে যেসব বিচ্যুতি ঘটেছে, বর্তমান সংস্করণে সেগুলো সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

'নজরুল-রচনাবলী'র এই সংস্করণে নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের কালানুক্রম বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে কবির অসুস্থতার পর সংকলিত এবং প্রকাশিত রচনাবলী তথ্যসূত্রের অভাবে কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। এই বাস্তবতায় 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণকে যথাসম্ভব প্রামাণিক করার চেষ্টা ও শ্রম সম্পাদনা-পরিষদ আন্তরিকভাবেই করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও নজরুলের সমস্ত রচনা এ-সংস্করণে সংকলিত—এমন দাবি করা যাবে না। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, এই রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্গত রচনাসমূহের বাইরেও নজরুলের কিছু রচনা থাকা সম্ভব—যা এখনও জানা বা সংগ্রহ করা যায়নি। বস্তুত, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনা ও প্রকাশ একটি চলমান প্রক্রিয়া ; ভবিষ্যতে নজরুলের দুষ্প্রাপ্য কোনো কোনো রচনা সংগৃহীত হলে সেগুলোকে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। আমরা এ-পর্যন্ত সংগৃহীত নজরুলের রচনাসমূহ সংকলন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তবু হয়তো কিছু রচনা বাদ পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

উল্লেখযোগ্য যে, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির। 'নজরুল-রচনাবলী'র শুধু প্রথম সংস্করণই নয়, পরে প্রকাশিত সব সংস্করণ আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ভিত্তিতেই করা হয়েছে। সব সংস্করণেই সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত রয়েছে তাঁর নাম, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর লেখা প্রতিটি সংস্করণের 'সম্পাদকের নিবেদন'। সুতরাং, কবি আবদুল কাদিরের প্রয়াণের পর প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ নতুন সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করা হলেও 'নজরুল-রচনাবলী'র আদি ও মূল সম্পাদক আবদুল কাদির।

[নয়]

বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি জাতীয় দায়িত্ব সম্পাদন করলেন। এই সংস্করণের 'সম্পাদনা পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলা একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মঈনুল হাসান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
চৈত্র ১৪১৩ ॥ মার্চ ২০০৭

রফিকুল ইসলাম
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের সুনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী নজরুল-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের রচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'সংযোজন'-বিভাগের প্রথম তিনটি কবিতা তার সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে রচিত ; এগুলি রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে সংযোজিত হলেই কালানুক্রম রক্ষিত হতো। প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন'-এ বলা হয়েছিল যে, সে খণ্ডের 'সংযোজন'-বিভাগে যে সকল লেখা সংকলিত হয়েছে তাছাড়াও সে সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলি খুঁজলে কবির আরো কিছু লেখা পাওয়া যাবে—যা গ্রন্থবদ্ধ হয়নি, এবং সেরূপ কোনো লেখা পাওয়া গেলে তা পরবর্তী খণ্ডে পরিবেশন করা হবে। বলাবাহুল্য যে, উক্ত তিনটি কবিতা রচনাবলী প্রথম খণ্ড প্রকাশের অব্যবহিত পরে আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়েছে। 'প্রবন্ধ' বিভাগের শেষ দুটি নিবন্ধ কবির সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ অর্থাৎ শেষ যুগে রচিত। সে যুগে কবির সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ'-পত্রে তাঁর স্বাক্ষরিত এরূপ বহু সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সে-সকল দুর্লভ লেখা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।

নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের সূচনায় যে মতবাদের প্রবক্তা হন, তা প্রত্যক্ষতঃ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজ্‌ম)। তাঁর পরিচালিত 'লাঙলে' হয়েছিল তারই কালোপযোগী কর্ষণা। 'লাঙল' ছিল 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র' ; ১লা পৌষ ১৩৩২ মুতাবিক ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৫২ তারিখে তার প্রথম (বিশেষ) সংখ্যাতেই সে-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য' ও 'চরম দাবি' বিবৃত করে নজরুল এক ইশ্‌তেহারে বলেন :

'নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা-সূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য। * * *

আধুনিক কল-কারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, স্টীমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকরী জিনিস, লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া, দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত কর্মিগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিচালিত হইবে।

ভূমির চরম স্বত্ব আত্ম-অভাব-পূরণ-ক্ষম স্বায়ত্তশাসন-বিশিষ্ট পল্লী-তন্ত্রের উপর বর্তিবে—এই পল্লী-তন্ত্র ভদ্র শূদ্র সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।'

ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজ্‌মের প্রতি নজরুলের মনের প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁর 'সাম্যবাদী' 'সর্বহারা' ও ফণি-মনসা'র বহু কবিতা ও গানে সুপরিস্ফুট। তাঁর 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার'-চরিত্র এই আদর্শবাদের আলোকে বিকশিত।

কিন্তু সেদিন কবি প্রবল আবেগ নিয়ে দেশের গণ-আন্দোলনের পুরোধায়ী চারণ হয়েছিলেন, তাতে ভাটা পড়লো দুটি কারণে। প্রথম কারণ : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা এপ্রিল শুক্রবার থেকে কলকাতায় রাজরাজেশ্বরী মিছিল উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সূত্রপাত। দ্বিতীয় কারণ : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে কংগ্রেস-কর্মী-সংঘের সদস্যদের উদ্যোগে 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' নাকচ করে প্রস্তাব গ্রহণ। নজরুল কৃষ্ণনগর সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' গেয়ে, কিন্তু কাণ্ডারিদের কানে তাঁর আবেদন পৌঁছলো না। অগত্যা নজরুল আত্মরতির সন্ধান করলেন 'মাধবী-প্রলাব' ও 'অনামিকা'র রোমান্টিক রূপ-জালে-ক্রমে আত্মমগ্ন হলেন 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতক'-এর সুর-লোকে। কিন্তু সেই রূপ ও সুরের মোহন মায়াজাল ভেদ করেও বারবার তাঁর কানে বেজেছে নিপীড়িত মানবতার কাতর আর্তনাদ ; তিনি নিরাসক্ত শিল্পীর আনন্দময় আসন ছেড়ে এসে রুদ্র কণ্ঠে গেয়েছেন 'সন্ধ্যা', 'প্রলয়-শিখা', 'চন্দ্রবিন্দু'র বেদনার্ত গাথা-গান।

'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার' একস্থানে বলেছেন, 'নীড়হারাদের সাথী আমি। ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে, পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই। ... আমার রাজনৈতিক মত বদলে গেছে।' এই আনসারের কণ্ঠে সেদিন পরোক্ষ ফুটেছে নজরুলেরই অন্তরের বাণী। বস্তুত তাঁর সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তরে যে তাঁর রাজনৈতিক মতামত পরিবর্তিত হয় এবং তাঁর সাহিত্যধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হয়, তা বর্তমান খণ্ডের লেখাগুলো এক্‌ত্রে পড়ে নিঃসন্দেহে হৃদয়ঙ্গম হবে বলেই আমাদের নিশ্চিত ধারণা।

এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত 'সিন্ধু-হিন্দোল' ও 'জিঞ্জীর' বহুদিন বাজারে নাই। এ দুটি কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণও হয় নাই। ইতিমধ্যেই 'বুল্‌বুল' হয়েছে দুর্লভ। 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা' ও 'চক্রবাক' নূতন সংস্করণে অনেক অদল-বদল হয়েছে। এই খণ্ডের জন্য 'বুল্‌বুল'-এর গানগুলি আমাকে নকল করে পাঠিয়েছেন হুগলি থেকে শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'সিন্ধু-হিন্দোল' দেখতে দিয়েছেন অধ্যাপক আবদুল কাইউম। 'চক্রবাক' প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করেছি 'আল ইসলাহ্‌' সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নূরুল হকের সৌজন্যে সীলহেটে কেন্দ্রীয় সাহিত্য-সংসদের পাঠাগার থেকে। 'গ্রন্থ-পরিচয়' লিখতে কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। এরাও নজরুল-সাহিত্যের প্রচারকামী ; অতএব আমার কাছে কৃতজ্ঞতা দাবি করেন না।

এ-খণ্ডেরও 'গ্রন্থ-পরিচয়' অসম্পূর্ণ ; তারও কারণ আমাদের হাতে মাল মশলার অভাব। তবে নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা ক্রমশ যেরূপ বিস্তারিত হচ্ছে তাতে খুবই আশা করা যায় যে, নবীন গবেষকদের কল্যাণে কবির সকল লেখারই প্রথম প্রকাশকাল ও উপলক্ষ সম্পর্কে আবশ্যক তথ্যাদি পাঠকদের পরিজ্ঞাত হতে বেশি বিলম্ব ঘটবে না।

ঢাকা
২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৯৪তম জন্ম-বার্ষিকীর প্রাক্কালে তাঁর রচনাবলী একসঙ্গে প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ইতঃপূর্বে বাংলা একাডেমী থেকে কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় *নজরুল-রচনাবলী* পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব আবদুল কাদির যখন কবির রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেন তখন নজরুলের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ ও ধারাবাহিকভাবে নজরুলের সমস্ত রচনা পাওয়া ছিল বেশ দুরূহ ব্যাপার। ফলে তাঁর সম্পাদিত রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু *নজরুল-রচনাবলী* সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও অগ্রযাত্রীর ভূমিকা আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

বর্তমান রচনাবলী বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত উক্ত *নজরুল-রচনাবলী*রই আরো সংহত, পূর্ণাঙ্গ, কালানুক্রমিক ও পরিমার্জিত রূপ। এই সংস্করণটির সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদ-মনোনীত দেশের বরেণ্য নজরুল-বিশেষজ্ঞগণ।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য এদেশের মানুষকে তাঁদের আন্দোলনে ও সংগ্রামে, কার্য ও ভাবনায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে আসছে, ভবিষ্যতেও করবে। নজরুল-সাহিত্য সুলভে এদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা আমাদের মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্য ব্যতীত এই প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব ছিল না। এ-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রণালয়ের—বিশেষভাবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং আগ্রহের কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এই রচনাবলীর সংকলন, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমাদের এই প্রয়াস যদি নজরুল-অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং রচনাবলীর এই নতুন সংস্করণ আদৃত হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ ॥ ২৫ মে ১৯৯৩

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নতুন সংস্করণের মুখবন্ধ

বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল–বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় পাঁচ খণ্ডে নজরুল–রচনাবলী প্রকাশিত হয় সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে। কেন্দ্রীয় বাঙলা–উন্নয়ন–বোর্ড থেকে এর প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশ লাভ করে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭০ সালে। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা–উন্নয়ন–বোর্ড একীভূত হয় বাংলা একাডেমীর সঙ্গে। তারপর বাংলা একাডেমী থেকে নজরুল–রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৭৫ সালে, তৃতীয় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৭৬ সালে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়।

নজরুল–রচনাবলী পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তার একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ সরকার এজন্যে বিশেষ অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করেন। অন্যদিকে একথাও উপলব্ধ হয় যে, আবদুল কাদিরের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুল শ্রমের স্বাক্ষরবহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্পাদিত *নজরুল–রচনাবলীর* বিন্যাসে কিছু যৌক্তিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং এর পাঁচ খণ্ডে যেসব রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এখন তার সন্ধান পাওয়া যাওয়ায়, সেসবও এতে সন্নিবেশিত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী নয় সদস্যবিশিষ্ট সম্পাদনা–পরিষদ গঠন করে *নজরুল–রচনাবলীর* সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পণ করেন।

এই নতুন সংস্করণে যেসব পরিবর্তন করা হয়েছে, তা এই :

১. কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলি যথাসম্ভব কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। যেমন আগে *অগ্নি–বীণার* পরে *বিষের বাঁশী* এবং তারপরে *দোলন–চাঁপা* বিন্যস্ত হয়েছিল। নতুন সংস্করণে ক্রম হয়েছে *অগ্নি–বীণা, দোলন–চাঁপা, বিষের বাঁশী*। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণের পাঠ তাঁর অভিপ্রেত পাঠ বলে গণ্য করে তা অনুসরণ করা হয়েছে।

২ কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলিও কালানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণের পাঠ যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

৩. গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা কোনো কোনো খণ্ডে 'সংযোজন' শিরোনামে *রচনাবলী*তে মুদ্রিত হয়। আবার পঞ্চম খণ্ডে এ ধরনের কিছু কিছু রচনা একেক নামের গ্রন্থরূপে সন্নিবেশিত হয়। যেমন, *সঙ্গীতাঞ্জলি, সন্ধ্যামণি, নবরাগমালিকা*। কিন্তু ওসব নামে কোনো গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত না হওয়ায় অনুরূপ বিন্যাস আমরা সংগত বিবেচনা করিনি। ওসব শিরোনামের অন্তর্গত রচনা এবং সংযোজন পর্যায়ের রচনা 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা'র পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. নজরুল ইসলামের বিভিন্ন সংগীতগ্রন্থের গান বর্তমান সংস্করণে গৃহীত হয়েছে, তবে স্বরলিপি মুদ্রিত হয়নি। আমরা মুদ্রিত গানের পাঠ অনুসরণ করেছি, রেকর্ডে ধারণকৃত বা স্বরলিপিতে বিধৃত গানের পাঠে ভেদ থাকলে তা নির্দেশ করা হয়নি।

৫. নজরুল ইসলামের নামে প্রকাশিত যেসব গ্রন্থের সন্ধান আগে পাওয়া যায়নি কিংবা যেসব গ্রন্থ *নজরুল-রচনাবলী* প্রকাশের পর বেরিয়েছে, সেগুলো বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ-ধরনের অনেক গ্রন্থে নজরুলের পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের উপকরণ গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা একই রচনা দুবার মুদ্রণ না করে গ্রন্থপরিচয়ে তার উল্লেখ করেছি।

৬. আবদুল কাদির-প্রদত্ত গ্রন্থপরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে 'পুনশ্চ' শিরোনামে গ্রন্থ-সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

৭. নজরুল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থে বানানের সমতা নেই। সেজন্যে আমরা আধুনিক বানানপদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য বইয়ের নামের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যেমন *বিষের বাঁশী* কিংবা *পূবের হাওয়া*। তবে দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে, যেমন *সর্বহারা*। যেসব ক্ষেত্রে বানানের কোনো বিশেষত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সংগত মনে হয়েছে, সেখানে আমরা কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সংস্করণের বানান বজায় রেখেছি।

৮. পাঁচ খণ্ডের জায়গায় চার খণ্ডে এবারে *নজরুল-রচনাবলী* প্রকাশিত হলো বলে বিভিন্ন খণ্ডের বিন্যাসের বড় রকম পরিবর্তন ঘটেছে। আবদুল কাদির প্রত্যেক খণ্ডের একটা ভাবগত সামঞ্জস্যের কথা ভেবেছিলেন। তা যে সর্বত্র রক্ষা করা যায়নি, সেকথাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। নতুন সংস্করণে প্রথম খণ্ডে ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নজরুল ইসলামের সকল গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বাকি সব বই সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কাব্য ও গীতি-গ্রন্থ এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান। চতুর্থ খণ্ডে আছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গদ্য ও নাট্যগ্রন্থ, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গদ্য ও নাট্যরচনা এবং চিঠিপত্র। এই দুই খণ্ডের রচনাবিন্যাসে কালক্রম রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি।

৯. কবির নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ *সঞ্চিতা* এই রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তবে *সঞ্চিতার* প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য ও সূচি প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দেওয়া হয়েছে।

১০. *মক্তব-সাহিত্য* বইটির একটি কীটদষ্ট কপি নজরুল ইন্সটিটিউটে রক্ষিত আছে। কীটদষ্ট অংশের পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর না হওয়ায় *রচনাবলীর* দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে *মক্তব-সাহিত্যের* উদ্ধারযোগ্য অংশ সন্নিবিষ্ট হলো।

নজরুল-রচনাবলীর সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণের পাঠ-নির্ধারণের বিষয়ে সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যেরা যে শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন, তার জন্যে আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এই কাজে কবির রচনার বিভিন্ন সংস্করণ দিয়ে সাহায্য করেছেন নজরুল ইন্সটিটিউট-কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ দেখার সুযোগ পেয়েছি। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও জনাব মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত সংগ্রহও আমরা ব্যবহার করেছি। সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য-সচিব সেলিনা হোসেনের উদ্যম ও মোবারক হোসেনের পরিশ্রমের কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সকল পর্যায়ে আমাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

নজরুল-রচনাবলীর সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা একটি দুরূহ কর্ম। বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদির এই কাজে অগ্রসর হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নতুন সংস্করণে আমরা কিছু উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেছি। তবে এটিই চূড়ান্ত নয়। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে গবেষকরা *নজরুল-রচনাবলীর* আরো শুদ্ধ ও আরো সম্পূর্ণ সংস্করণ-প্রকাশে উদ্যোগী হবেন।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০০॥ ২৫শে মে ১৯৯৩

আনিসুজ্জামান
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

সূচিপত্র

কবিতা

গান

গল্প

উপন্যাস

চব্বিশ

প্রবন্ধ



কৃষ্ণনগরে নজরুল (১৩৩৪)



নজরুল : তরুণ বয়সে



যৌবনে নজরুল



বংশীবাদক নজরুল



ফেজ টুপি পরিহিত নজরুল



১৯২৮ সালে সিলেটে গুণগ্রাহীদের সঙ্গে নজরুল



পাগড়ি-পরিহিত নজরুল



তিন বন্ধু : অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার, হবীবুল্ল্যাহ্ বাহার ও নজরুল



চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ে নজরুল



চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে সাম্পানে নজরুল



১৯২৯ সালে রাজশাহির মুসলিম ছাত্রাবাসে (চৌধুরীর দালান) নজরুল। বাম থেকে দণ্ডায়মান : মুহম্মদ ইয়াসিন, বিএ ক্লাসের জনৈক ছাত্র, আবদুল কাদের, শামসুদ্দোহা, মুহম্মদ লতিফুর রহমান, অজ্ঞাত, মিজান আলী চৌধুরী, মুঃ মমতাজউদ্দীন, সিরাজুল ইসলাম। উপবিষ্ট : মোহাম্মদ জালালউদ্দীন, মোহাম্মদ আবুল কাসেম, নজরুল, ফজলুল হক (হেড পণ্ডিত, মাদ্রাসা) ও জিয়াদুর রহিম

সর্ব্বহারা



কাজী নজরুল ইসলাম

প্রচ্ছদ : সর্ব্বহারা

ধূমকেতু

সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হইবে ।

[illegible] মূল্য ৫ টাকা] সম্পাদক—কাজী নজরুল ইস্‌লাম [[illegible] মূল্য /০ আনা

১ম বর্ষ } শুক্রবার—২৬শে শ্রাবণ, ১৩২৯ ; ১১ই আগষ্ট, ১৯২২ { ১ম সংখ্যা

সূচি

Printed and Published by M. Afzal-ul Huque from the Metcalfe Press, 79, Balaram Dey Street, Calcutta.

'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা



লাঙল

প্রধান পরিচালক
কাজী নজরুল ইসলাম

[শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের মুখপত্র]

সম্পাদক—
শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

প্রথম খণ্ড	বুধবার, ১লা পৌষ, ১৩৩২	বিশেষ সংখ্যা

"লাঙল"

—:o:—

যেখানে দিন দুপুরে ফেরিওয়ালা মাথায় ক'রে মাটি বিক্রী করে, সেই পাষাণ শহর কলিকাতায় "লাঙল" চালাবার দুঃসাহস যারা করে, তাদের সকলেই নিশ্চিত পাগল মনে করবেন। কিন্তু এই পাষাণ শহরেই আমরা "লাঙল" নিয়ে বেরুলাম। এই পাষাণের বুক চিরে আমরা সোনা ফলাতে চাই। ব্রহ্মপুত্র স্রোত হিমালয় আটকে রেখে ছিলো, হলধর লাঙলের আঘাতে পাহাড় চিরে সেই স্রোতকে ধরায় নামিয়ে ছিলেন। সেই জল কত প্রান্তর শ্যামল ক'রে কত তৃষিত কণ্ঠের পিপাসা মিটিয়ে ধরণীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। "লাঙলবন্ধ" আজ বাংলার তীর্থ। মহাত্মাগণের আন্দোলন আজ নেতাদের পাষাণ-পাত্র-পারিষদে আটকে গেছে—তাই আজ আবার হলধরের ডাক পড়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রয়োজনে শহরের সৃষ্টি হ'য়ে পল্লীমুখী বাংলার সভ্যতা ও সাধনা লোপ পেতে বসেছে। শাসন এবং শোষণের সহায়তার মধ্যরূপে ভদ্র-সম্প্রদায় আত্মবিক্রয় ক'রে শহরে উঠে এসেছেন। গ্রামের আনন্দ উৎসব রোগ-শোকের চাপে লুপ্ত হয়ে গেছে। শহরের বেকার বাঙালী আজ বুঝছে গ্রাম ছেড়ে এসে তার কি নিরুপায় অবস্থাই হয়েছে। জমিদার আজ গ্রামের সকল কর্মের প্রাণরূপে উপস্থিত নন—তিনি শহরে এসে বাস ক'রে ঘর-বাগান মেয়েমানুষ-মোটর-বাগান এই পঞ্চ-মকারের সাধনায় নিযুক্ত আছেন। নায়েব গোমস্তার অত্যাচারে প্রজার প্রাণ ওষ্ঠাগত। মহাজনের হাতে জমির সব চ'লে যাচ্ছে। গৃহহীন ভূমিহীন লক্ষ লোক সমাজের অভিশাপ নিয়ে শহরের দিকে ছুটছে—কলকারখানায় কতক ঢুকে নিজেদের সর্বনাশ করছে—আর কতক নানা হীন উপায়ে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করছে। দেশে চুরি, ডাকাতি ও বলাৎকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

'লাঙল' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা

কারাগারে আমার বন্দিনী মায়ের আঁধার-শান্ত কোলে এ অকৃতী পুত্রকে ডাক দিয়েছে। পরাধীনা অনাথিনী জননীর বুকে এ হতভাগ্যের স্থান হবে কি না জানি না, যদি হয় বিচারককে অশ্রু-সিক্ত ধন্যবাদ দিব। আবার বলছি, আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই। আমি 'অমৃতস্য পুত্রঃ'। আমি জানি—

"ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন
আছে, তার আছে ক্ষয়;
সেই সত্য আমার ভাগ্য-বিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।"

প্রেসিডেন্সি জেল, কলিকাতা।
৭ই জানুয়ারী, ১৯২৩।
শনিবার—দুপুর।

প্রেসিডেন্সি জেলে রচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র অংশ

নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া, পরান-পিয়া!
কাঁদে পিউ কাঁহা পাপিয়া, পরান-পিয়া॥
ভুলি' বুলবুলি-সোহাগে কত ফুলবধূ জাগে
রাতি গুলশানে যাপিয়া, পরান-পিয়া॥
জেগে রয় আমার সাথী— দূরে চাঁদ, শিয়রে বাতি,
কাঁদি ফুল-শয়ন পাতিয়া, পরান-পিয়া॥
কত যার সাধের ডালা বাসি হয় নিতি যে মালা,
কত দূর যাব ভাসিয়া, পরান-পিয়া॥
গেয়ে গান চেয়ে কাহারে জেগে রই কবি এপারে,
দিলি দান কাহারে হিয়া, পরান-পিয়া॥

নজরুলের হস্তলিপি

ছায়ানট

উৎসর্গ

আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
ও
কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ
করকমলে—

বিজয়িনী

হে মোর রানি ! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে॥

আমার সমর-জয়ী অমর তরবারি
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হয়ে ওঠে ভারি,
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি,
এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে॥

ওগো জীবন-দেবি !
আমায় দেখে কখন তুমি ফেললে চোখের জল,
আজ বিশ্ব-জয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল !

আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে
বিজয়িনী ! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে,
আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে॥

কুমিল্লা
অগ্রহায়ণ ১৩২৮

কমল-কাঁটা

আজকে দেখি হিংসা-মদের মত্ত বারণ-রণে
জাগছে শুধু মৃণাল-কাঁটা আমার কমল-বনে॥

উঠল কখন ভীম কোলাহল,
আমার বুকের রক্ত-কমল
কে ছিঁড়িল—বাঁধ-ভরা জল
শুধায় ক্ষণে ক্ষণে।
ঢেউএর দোলায় মরাল-তরী নাচবে না আনমনে।।

কাঁটাও আমার যায় না কেন, কমল গেল যদি।
সিনান-বধূর শাপ শুধু আজ কুড়াই নিরবধি।

আসবে কি আর পথিক-বালা?
পরবে আমার মৃণাল-মালা?
আমার জলজ-কাঁটার জ্বালা
জ্বলবে মোরই মনে?
ফুল না পেয়েও কমল-কাঁটা বাঁধবে কে কঙ্কণে?

কলিকাতা
আশ্বিন ১৩৩১

চৈতী হাওয়া

১

হারিয়ে গেছ অন্ধকারে—পাইনি খুঁজে আর,
আজকে তোমার আমার মাঝে সপ্ত পারাবার!
আজকে তোমার জন্মদিন—
স্মরণ-বেলায় নিদ্রাহীন
হাতড়ে ফিরি হারিয়ে-যাওয়ার অকূল অন্ধকার!
এই-সে-হেথাই হারিয়ে গেছ কুড়িয়ে পাওয়া হার!

২

শূন্য ছিল নিতল দিঘির শীতল কালো জল,
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যথার নীলোৎপল?

আঁধার দিঘির রাঙলে মুখ,
নিটোল ঢেউএর ভাঙলে বুক,—
কোন পূজারী নিল ছিঁড়ে? ছিন্ন তোমার দল
ঢেকেছে আজ কোন দেবতার কোন সে পাষাণ-তল?

৩

অস্ত-খেয়ার হারামানিক-বোঝাই করা না'
আসছে নিতুই ফিরিয়ে দেওয়ার উদয়-পারের গাঁ।
ঘাটে আমি রই বসে,
আমার মানিক কই গো সে?
পারাপারের ঢেউ-দোলানি হানছে বুকে ঘা!
আমি খুঁজি ভিড়ের মাঝে চেনা কমল-পা!

৪

বইছে আবার চৈতী হাওয়া, গুমরে ওঠে মন,
পেয়েছিলাম এমনি হাওয়ায় তোমার পরশন।
তেমনি আবার মহুয়া-মউ
মৌমাছিদের কৃষ্ণা-বউ
পান করে ওই ঢুলছে নেশায় দুলছে মহুল-বন!
ফুল-শৌখিন দখিন-হাওয়ায় কানন উচাটন!

৫

পড়ছে মনে টগর চাঁপা বেল চামেলি জুঁই,
মধুপ দেখে যাদের শাখা আপনি যেত নুই।
হাসতে তুমি দুলিয়ে ডাল,
গোলাব হয়ে ফুটত গাল!
থলকমলি আঁউরে যেত তপ্ত ও-গাল ছুঁই!
বকুল-শাখা ব্যাকুল হতো, টলমলাত ভুঁই!

৬

চৈতী রাতের গাইত গজল বুলবুলিয়ার বর,
দুপুর বেলায় চবুতরায় কাঁদত কবুতর!

ভুঁই-তারকা সুন্দরী
সজনে ফুলের দল ঝরি
থোপা থোপা লাজ ছড়াত দোলন-খোঁপার 'পর,
ঝাঁজাল্ হাওয়ায় বাজত উদাস মাছ্‌রাঙার স্বর !

৭

পিয়াল-বনায় পলাশ ফুলের গেলাস-ভরা মউ
খেতো বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া বউ !
লুকিয়ে তুমি দেখতে তাই,
বলতে, 'আমি অমনি চাই !'
খোঁপায় দিতাম চাঁপা গুঁজে, ঠোঁটে দিতাম মউ !
হিজল শাখায় ডাকত পাখি 'বউ গো কথা কও !'

৮

ডাকত ডাহুক জল-পায়রা, নাচত ভরা বিল,
জোড়া ভুরু ওড়া যেন আসমানে গাঙ-চিল !
হঠাৎ জলে রাখতে পা,
কাজ্‌লা দিঘির শিউরে গা—
কাঁটা দিয়ে উঠত মৃণাল ফুটত কমল-ঝিল।
ডাগর চোখে লাগত তোমার সাগর-দিঘির নীল !

৯

উদাস দুপুর কখন গেছে, এখন বিকাল যায়,
ঘুম জড়াল ঘুম্‌তি নদীর ঘুমুর-পরা পায়।
শঙ্খ বাজে মন্দিরে,
সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে,
ঝাউএর শাখায় ভেজা আঁধার কে পিজেছে, হায়।
মাঠের বাঁশি বন-উদাসী ভীমপলাশী গায়।

১০

বউল আজি বাউল হলো আমরা তফাতে।
আম-মুকূলের গুঁজি-কাঠি দাও কি খোঁপাতে ?

ডাবের শীতল জল দিয়ে
মুখ মাজো কি আর প্রিয়ে?
প্রজাপতির ডানা-ঝরা সোনার টোপাতে
ভাঙা ভুরু দাও কি জোড়া রাতুল শোভাতে?

১১

বউল ঝরে ফলেছে আজ থোলো থোলো আম,
রসের-পীড়ায়-টসটসে-বুক ঝুরছে গোলাবজাম।
কামরাঙারা রাঙল ফের
পীড়ন পেতে ঐ মুখের
স্মরণ করে চিবুক তোমার, বুকের তোমার ঠাম—
জামরুলে রস ফেটে পড়ে, হায়, কে দেবে দাম!

১২

করেছিলাম চাউনি চয়ন নয়ন হতে তোর,
ভেবেছিলুম গাঁথব মালা—পাইনে খুঁজে ডোর!
সেই চাহনি নীল-কমল
ভরল আমার মানস-জল,
কমল-কাঁটার ঘা লেগেছে মর্ম-মূলে মোর
বক্ষে আমার দুলে আঁখির সাতনরী-হার লোর!

১৩

তরী আমার কোন কিনারায় পাইনে খুঁজে কূল,
স্মরণ-পারের গন্ধ পাঠায় কমলা নেবুর ফুল।
পাহাড়তলির শালবনায়
বিষের মতো নীল ঘনায়!
সাঁঝ পরেছে ঐ দ্বিতীয়ার-চাঁদ-ইহুদি-দুল!
হায় গো, আমার ভিন্ গাঁয়ে আজ পথ হয়েছে ভুল!

১৪

কোথায় তুমি কোথায় আমি চৈতে দেখা সেই,
কেঁদে ফিরে যায় যে চৈত—তোমার দেখা নেই!

কণ্ঠে কাঁদে একটি স্বর—
কোথায় তুমি বাঁধলে ঘর?
তেমনি করে জাগছ কি রাত আমার আশাতেই?
কুড়িয়ে-পাওয়া-বেলায় খুঁজি হারিয়ে-যাওয়া খেই।

১৫

পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না',
এই তরীতে হয়তো তোমার পড়বে রাঙা পা।
আবার তোমার সুখ-ছোঁওয়ায়
আকুল দোলা লাগবে নায়,
এক তরীতে যাব মোরা আর-না-হারা গাঁ,
পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না'॥

হুগলি
চৈত্র ১৩৩১

বেদনা-অভিমান

ওরে আমার বুকের বেদনা!
ঝন্‌ঝা-কাতর নিশীথ রাতের কপোত সম রে
আকুল এমন কাঁদন কেঁদো না॥

কখন সে কার ভুবন-ভরা ভালোবাসা হেলায় হারালি,
তাই তো রে আজ এড়িয়ে চলে সকল স্নেহে পথে দাঁড়ালি।
ভিজে ওঠে চোখের পাতা তোর,
একটি কথায়—অভিমানী মোর!
ডুকরে কাঁদিস বাঁধন-হারা, 'ওগো, আমার বাঁধন বেঁধো না'॥

বাঁধন গৃহের সইল না তোর,
তাই বলে কি মায়াও ঘরের ডাক দেবে না তোকে?

অভিমানী গৃহ-হারা রে !
চললে একা মরুর পথেও
সাঁঝের আকাশ মায়ের মতন ডাকবে নত চোখে,
ডাকবে বধূ সন্ধ্যাতারা যে !

জানি ওরে, এড়িয়ে যারে চলিস তারেই পেতে চলিস পথে।
জোর করে কেউ বাঁধে না তাই বুক ফুলিয়ে চলিস বিজয়-রথে।

ওরে কঠিন ! শিরিষ-কোমল তুই !
মর্মর তোর মর্মে ছাপা বেল কামিনী জুঁই !
বুক-পোরা তোর ভালোবাসা, মুখে মিছে বলিস 'সেধো না'।
আমার বুকের বেদনা।।

দৌলতপুর
কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

নিশীথ-প্রীতম্

হে মোর প্রিয়,
হে মোর নিশীথ-রাতের গোপন সাথী !
মোদের দুইজনারেই জনম ভরে কাঁদতে হবে গো—
শুধু এমনি করে সুদূর থেকে, একলা জেগে রাতি।।

যখন ভুবন-ছাওয়া আঁচল পেতে নিশীথ যাবে ঘুম,
আকাশ বাতাস থমথমাবে, সব হবে নিঝ্‌ঝুম,
তখন দেবো দুঁহু দোঁহার চিঠির নাম-সহিতে চুম !
আর কাঁপবে শুধু গো,
মোদের তরুণ বুকের করুণ কথা আর শিয়রে বাতি।।

মোরা কে যে কত ভালোবাসি কোনোদিনই হবে না তা বলা,
কভু সাহস করে চিঠির বুকেও আঁকব না সে কথা ;
শুধু কইতে-নারার প্রাণ-পোড়ানি রইবে দোঁহার ভরে বুকের তলা।
শুধু চোখে চোখে চেয়ে থাকার—
বুকের তলায় জড়িয়ে রাখার
ব্যাকুল কাঁপন নীরব কেঁদে কইব কি তার ব্যথা !

কভু কি কথা সে কইতে গিয়ে হঠাৎ যাব থেমে,
অভিমানে চারটি চোখেই আসবে বাদল নেমে !
কত চুমুর তৃষায় কাঁপবে অধর, উঠবে কপোল ঘেমে !
হেথা পুরবে নাকো ভালোবাসার আশা অভাগিনী,
তাই দলবে বলে কলজেখানা রইনু পথে পাতি॥

কুমিল্লা
অগ্রহায়ণ ১৩২৮

অবেলায়

বৃথাই ওগো কেঁদে আমার কাটল যামিনী।
অবেলাতেই পড়ল ঝরে কোলের কামিনী—
ও সে শিথিল কামিনী॥

খেলার জীবন কাটিয়ে হেলায়
দিন না যেতেই সন্ধেবেলায়
মলিন হেসে চড়ল ভেলায়
মরণ-গামিনী।
আহা একটু আগে তোমার দ্বারে কেন নামিনি !
আমার অভিমানিনী॥

ঝরার আগে যে কুসুমে দেখেও দেখি নাই,
ও যে বৃথাই হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল, ছোট্ট বুকের একটু সুরভি,

আজ তারি সেই শুকনো কাঁটা বিঁধচে বুকে ভাই—
আহা সেই সুরভি আকাশ কাঁদায় ব্যথায় যেন সাঁঝের পূরবী।

জানলে না সে ব্যথাহতা
পাষাণ-হিয়ার গোপন কথা,
বাজের বুকেও কত ব্যথা
কত দামিনী!
আমার বুকের তলায় রইল জমা গো—
না-কওয়া সে অনেক দিনের অনেক কাহিনী।
আহা ডাক দিলি তুই যখন, তখন কেন থামিনি!
আমার অভিমানিনী॥

দৌলতপুর
কুমিল্লা
বৈশাখ ১৩২৮

হার-মানা-হার

তোরা কোথা হতে কেম্‌নে এসে
মণি-মালার মতো আমার কণ্ঠে জড়ালি!
আমার পথিক-জীবন এমন করে
ঘরের মায়ায় মুগ্ধ করে বাঁধন পরালি॥

আমায় বাঁধতে যারা এসেছিল গরব করে হেসে
তারা হার মেনে হায় বিদায় নিল কেঁদে,
তোরা কেমন করে ছোট্ট বুকের একটু ভালোবেসে
ঐ কচি বাহুর রেশমি ডোরে ফেললি আমায় বেঁধে!
তোরা চলতে গেলে পায়ে জড়াস,
'না' 'না' বলে ঘাড়টি নড়াস,
কেন ঘর-ছাড়াকে এমন করে
ঘরের ক্ষুধা স্নেহের সুধা মনে পড়ালি॥

ওরে চোখে তোদের জল আসে না—
চমকে ওঠে আকাশ তোদের
চোখের মুখের চপল হাসিতে।
ঐ হাসিই তো মোর ফাঁসি হলো,
ওকে ছিঁড়তে গেলে বুকে লাগে,
কাতর কাঁদন্ ছাপা যে ও হাসির রাশিতে !

আমি চাইলে বিদায় বলিস, 'উঁহু,
ছাড়ব নাকো মোরা',
ঐ একটু মুখের ছোট্ট মানাই এড়িয়ে যেতে নারি।
কত দেশ-বিদেশের কান্না-হাসির
বাঁধন-ছেঁড়ার দাগ যে বুকে পোরা ;
তোরা বসলি রে সেই বুক জুড়ে আজ,
চিরজয়ীর রথটি নিলি কাড়ি।
ওরে দরদিরা ! তোদের দরদ
শীতের বুকে আনলে শরৎ,
তোরা ঈষৎ ছোঁয়ায় পাথরকে আজ
কাতর করে অশ্রুভরা ব্যথায় ভরালি।।

দৌলতপুর
কুমিল্লা
বৈশাখ ১৩২৮

লক্ষ্মীছাড়া

আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন।
শেষে সে-ই আমারে কাঁদায়, যারে করি আপ্‌নারি জন।।

দূর হতে মোর বাঁশির সুরে
পথিক-বালার নয়ন ঝুরে,
তার ব্যথায়-ভরাট ভালোবাসা হৃদয় পুরে গো !

তারে যেমনি টানি পরানপুটে
অমনি সে হায় বিষিয়ে উঠে
তখন হারিয়ে তারে কেঁদে ফিরি সঙ্গীহারা পথটি আবার নির্জন॥

মুগ্ধা ওদের নেই কোনো দোষ, আমিই ওগো ধরা দিয়ে মরি,
প্রেম-পিয়াসী প্রণয়-ভুখা শাশ্বত যে আমিই তৃপ্তিহারা ;
ঘর-বাসীদের প্রাণ যে কাঁদে
পর-বাসীদের পথের ব্যথা স্মরি,
তাই তো তারা এই উপোসির ওষ্ঠে ধরে ক্ষীরের থালা,
শান্তি-বারি-ধারা !

ঘরকে পথের বহ্নি-ঘাতে
দগ্ধ করি আমার সাথে,
লক্ষ্মী ঘরের পলায় উড়ে এই সে শনির দৃষ্টিপাতে গো !
জানি আমি লক্ষ্মীছাড়া
বারণ আমার উঠান মাড়া,
আমি তবু কেন সজল চোখে ঘরের পানে চাই ?
নিজেই কি তা জানি আমি ভাই ?
হায় পরকে কেন আপন করে বেদন পাওয়া,
পথেই যাহার কাটবে জীবন বিজন ?
আর কেউ হবে না আপন যখন, সব হারিয়ে চলতে হবে
পথটি আমার নির্জন !
আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন॥

কলিকাতা
ভাদ্র ১৩২৮

শেষের গান

আমার বিদায়-রথের চাকার ধ্বনি ঐ গো এবার কানে আসে।
পুবের হাওয়া তাই কেঁদে যায় ঝাউএর বনে দীঘল শ্বাসে॥

ব্যথায় বিবশ গুলঞ্চ ফুল
মালঞ্চে আজ তাই শোকাকুল,
মাটির মায়ের কোলের মায়া ওগো আমার প্রাণ উদাসে।।

অঙ্গ আসে অলস হয়ে নেতিয়ে-পড়া অলস ঘুমে,
স্বপন-পারের বিদেশিনীর হিম-ছোঁওয়া যায় নয়ন চুমে।
হাতছানি দেয় অনাগতা,
আকাশ-ডোবা বিদায়-ব্যথা
লুটায় আমার ভুবন ভরি বাঁধন-ছেঁড়ার কাঁদন-ত্রাসে।।

মোর বেদনার কর্পূর-বাস ভরপুর আজ দিগ্বলয়ে,
বনের আঁধার লুটিয়ে কাঁদে হরিণটি তার হারায় ভয়ে।
হারিয়ে-পাওয়া মানসী হায়
নয়ন-জলে শয়ন তিতায়,
ওগো, এ কোন জাদুর মায়ায় দু'চোখ আমার জলে ভাসে।।

আজ আকাশ-সীমায় শব্দ শুনি অচিন পায়ের আসা-যাওয়ার,
তাই মনে হয় এই যেন শেষ আমার অনেক দাবি-দাওয়ার।
আজ কেহ নাই পথের সাথী,
সামনে শুধু নিবিড় রাতি,
আমায় দূরের বাঁশি ডাক দিয়েছে, রাখবে কে আর বাঁধন-পাশে।।

কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৮

নিরুদ্দেশের যাত্রী

নিরুদ্দেশের পথে যেদিন প্রথম আমার যাত্রা হলো শুরু,
নিবিড় সে কোন বেদ্‌নাতে ভয়-আতুর এ-বুক কাঁপল দুরু-দুরু।।

মিটল না ভাই চেনার দেনা, অমনি মুহুর্মুহু
ঘরছাড়া ডাক করলে শুরু অথির বিদায়-কুহু—
উহু উহু উহু !
হাতছানি দেয় রাতের শাঙন,
অমনি বাঁধে ধরল ভাঙন,
ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঁঙন—
খুঁজে বেড়াই কোন আগুনে কাঁকন বাজে গো !
বেরিয়ে দেখি ছুটছে কেঁদে বাদলি হাওয়া হু হু !
মাথার উপর দৌড়ে টাঙন, ঝড়ের মাতন,
দেয়ার গুরু-গুরু ॥

পথ হারিয়ে কেঁদে ফিরি, 'আর বাঁচিনে ! কোথায় প্রিয়,
কোথায় নিরুদ্দেশ ?'
কেউ আসে না, মুখে শুধু ঝাপটা মারে নিশীথ-মেঘের
আকুল চাঁচর কেশ।

'তাল-বনা'তে ঝন্‌ঝা তাথৈ হাততালি দেয়, বজ্রে বাজে তূরী,
মেখলা ছিঁড়ি পাগলি মেয়ে বিজলি-বালা নাচায় হীরের চুড়ি
ঘুরি ঘুরি ঘুরি
ও সে সকল আকাশ জুড়ি !
থামল বাদল রাতের কাঁদা,
হাসল, আমার টুটল ধাঁধা,
হঠাৎ ও কার নূপুর শুনি গো ?
থামল নূপুর, ভোরের তারা বিদায় নিল ঝুরি।
আমি এখন চলি সাঁঝের বধূ সন্ধ্যাতারার চলার পথ গো !
আজ অস্তপারের শীতের বায়ু কানের কাছে বইছে ঝুরু-ঝুরু ॥

কলিকাতা
চৈত্র ১৩২৭

চিরন্তনী প্রিয়া

এস এস এস আমার চির পুরানো !
বুক জুড়ে আজ বসবে এস হৃদয়-জুড়ানো !
আমার চির পুরানো !

পথ-বিপথে কতই আমায় নিত্য-নূতন বাঁধন এসে যাচে,
কাছে এসেই অমনি তারা পুড়ে মরে আমার আগুন-আঁচে।
তারা এসে ভালোবাসার আশায়
একটুকুতেই কেঁদে ভাসায়,
ভীরু তাদের ভালোবাসা কেঁদেই ফুরানো।
বিজয়িনী চিরন্তনী মোর !
একা তুমিই হাসো বিজয়-হাসি ! দীপ দেখিয়ে পথে ঘুরানো ॥

তুমি যেদিন মুক্তি দিলে হেসে বাঁধন কাটলে আপন হাতে,
প্রেম-গরবী আপন প্রেমের জোরে,
জানতে, আমায় সইবে না কেউ বইবে না ভার,
হার মেনে সে আসতে হবে আবার তোমার দোরে।

গরবিনী ! গর্ব করে এই কপালে লিখলে জয়ের টীকা,
'চঞ্চল এই বাঁধন-হারায় বাঁধতে পারে এক এ সাহসিকা !'
প্রিয় ! তাই কি আমার ভালোবাসা
সবাই বলে সর্বনাশা,
এই ধূমকেতু মোর আগুন-ছোঁওয়া বিশ্ব-পোড়ানো ?
সর্বনাশী চপল প্রিয়া মোর !
তবে অভিশাপের বুকে তুমিই হাসবে এস
নয়ন-ঝুরানো ॥

কলিকাতা
ভাদ্র ১৩২৮

বেদনা-মণি

একটি শুধু বেদ্‌না-মানিক আমার মনের মণি-কোঠায়,
সেই তো আমার বিজন ঘরে দুঃখ-রাতের আঁধার টুটায়।।

সেই মানিকের রক্ত আলো
ভুলাল মোর মন ভুলাল গো।
সেই মানিকের করুণ কিরণ আমার বুকে মুখে লুটায়।।

আজ রিক্ত আমি কান্না-হাসির দাবি-দাওয়ায় বাঁধন ছিঁড়ে,
ঐ বেদনা-মণির শিখার মায়াই রইল একা জীবন ঘিরে।
এ কাল-ফণী অনেক খুঁজি
পেয়েছে ঐ একটি পুঁজি গো।
আমার চোখের জলে ঐ মণি-দীপ আগুন-হাসির ফিনিক ফোটায়।।

কলিকাতা
ভাদ্র ১৩২৮

পরশ-পূজা

আমি এদেশ হতে বিদায় যেদিন নেব প্রিয়তম,
আর কাঁদবে এ-বুক সঙ্গীহারা কপোতিনী সম,
তখন মুকুর-পাশে একলা গেহে
আমারি এই সকল দেহে
চুমব আমি চুমব নিজেই অসীম স্নেহে গো,
আহা পরশ তোমার জাগছে যে গো এই সে দেহে মম।।

তখন তুমি নাই বা প্রিয় নাই বা র'লে কাছে।
জানব আমার এই সে দেহে এই সে দেহে গো
তোমার বাহুর বুকের শরম-ছোঁওয়ার কাঁপন লেগে আছে।

তখন নাই বা আমার রইল মনে
কোনখানে মোর দেহের বনে
জড়িয়ে ছিলে লতার মতন আলিঙ্গনে গো,
আমি চুমোয় চুমোয় ডুবাব এই সকল দেহ মম,
এদেশ হতে বিদায় যেদিন নেব প্রিয়তম।।

কুমিল্লা
আষাঢ় ১৩২৮

অনাদৃতা

ওরে অভিমানিনী!
এমন করে বিদায় নিবি ভুলেও জানিনি।

পথ ভুলে তুই আমার ঘরে দু'দিন এসেছিলি,
সকল-সহা! সকল সয়ে কেবল হেসেছিলি।
হেলায় বিদায় দিনু যারে
ভেবেছিনু ভুলব তারে, হায়!
ভোলা কি তা যায়?
ওরে হারা-মণি! এখন কাঁদি দিবস-যামিনী।।

অভাগীরে! হাসতে এসে কাঁদিয়ে গেলি,
নিজেও শেষে বিদায় নিলি কেঁদে,
ব্যথা দেওয়ার ছলে নিজেই সইলি ব্যথা রে,
বুকে সেই কথাটাই কাঁটার মতন বেঁধে!

যাবার দিনে গোপন ব্যথা বিদায়-বাঁশির সুরে
কইতে গিয়ে উঠল দু'চোখ নয়ন-জলে পুরে!

না-কওয়া তোর সেই সে বাণী,
সেই হাসি-গান সেই মুখানি, হায়!
আজো খুঁজি সকল ঠাঁই।
তোরে যাবার দিনে কেঁদে কেন ফিরিয়ে আনিনি?
ওরে অভিমানিনী॥

দৌলতপুর, কুমিল্লা
বৈশাখ ১৩২৮

শায়ক-বেঁধা পাখি

রে নীড়-হারা, কচি-বুকে শায়ক-বেঁধা পাখি!
কেমন করে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

কোথায় রে তোর কোথায় ব্যথা বাজে?
চোখের জলে অন্ধ আঁখি, কিছুই দেখি না যে!
ওরে মানিক! এ অভিমান আমায় নাহি সাজে—
তোর জুড়াই ব্যথা আমার ভাঙা বক্ষপুটে ঢাকি।
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখি!
কেমন করে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

বক্ষে বিঁধে বিষ-মাখানো শর,
পথ-ভোলা রে! লুটিয়ে প'লি এ কার বুকের 'পর?
কে চিনালে পথ তোরে হায় এই দুখিনীর ঘর?
তোর ব্যথার শান্তি লুকিয়ে আছে আমার ঘরে নাকি?
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখি!
কেমন করে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

হায়, এ কোথায় শান্তি খুঁজিস তোর?
ডাকছে দেয়া, হাঁকছে হাওয়া, কাঁপছে কুটির মোর!

ঝন্‌ঝাবাতে নিবেছে দীপ, ভেঙেছে সব দোর,
দুলে দুঃখ-রাতের অসীম রোদন বক্ষে থাকি থাকি।
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখি!
এমন দিনে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

মরণ যে বাপ বরণ করে তারে
'মা' 'মা' ডেকে যে দাঁড়ায় এই শক্তিহীনার দ্বারে!
মানিক আমি পেয়ে শুধু হারাই বারেবারে,
ওরে তাই তো ভয়ে বক্ষ কাঁপে কখন দিবি ফাঁকি!
ওরে আমার হারামণি! ওরে আমার পাখি!
কেমন করে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

হারিয়ে-পাওয়া ওরে আমার মানিক!
দেখেই তোরে চিনেছি, আয় বক্ষে ধরি খানিক!
বাণ-বেঁধা বুক দেখে তোরে কোলে কেহ না নিক,
ওরে হারার ভয়ে ফেলতে পারে চিরকালের মা কি?
ওরে আমার কোমল-বুকে কাঁটা-বেঁধা পাখি!
কেমন করে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

এ যে রে তোর চির-চেনা স্নেহ,
তুই তো আমার নোস্ রে অতিথ্, অতীত কালের কেহ,
বারেবারে নাম হারায়ে এসেছিস এই গেহ!
এই মায়ের বুকে থাক জাদু তোর য'দিন আছে বাকি!
প্রাণের আড়াল করতে পারে সৃজন দিনের মা কি?
হারিয়ে যাওয়া? ওরে পাগল, সে তো চোখের ফাঁকি!

কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

হারা-মণি

এমন করে অঙ্গনে মোর ডাক দিলি কে স্নেহের কাঙালি !
কে রে ও তুই কে রে ? আহা ব্যথার সুরে রে, এমন চেনা স্বরে রে,
আমার ভাঙা ঘরের শূন্যতারি বুকের 'পরে রে,
এ কোন পাগল স্নেহ-সুরধুনীর আগল ভাঙালি ?

কোন জননীর দুলাল রে তুই কোন অভাগীর হারা-মণি,
চোখ-ভরা তোর কাজল চোখে রে,
আহা ছলছল কাঁদন চাওয়ার সজল ছায়া কালো মায়া
সারাখনই উছলে যেন পিছল ননী রে !
মুখ-ভরা তোর ঝর্না-হাসি
শিউলি সম রাশি রাশি
আমার মলিন ঘরের বুকে-মুখে লুটায় আসি রে !
বুক-জোড়া তোর ক্ষুব্ধ স্নেহ দ্বারে দ্বারে কর হেনে যে যায়,
কেউ কি তোরে ডাক দিল না ? ডাকল যারা তাদের কেন
দলে এলি পায় ?
কেন আমার ঘরের দ্বারে এসেই আমার পানে চেয়ে এমন
থমকে দাঁড়ালি ?
এমন চমকে আমায় চমক লাগালি ?
এই কি রে তোর চেনা গৃহ, এই কি রে তোর চাওয়া স্নেহ, হায় !
তাই কি আমার দুখের কুটির হাসির গানের রঙে রাঙালি ?
হে মোর স্নেহের কাঙালি ॥

এ সুর যেন বড়ই চেনা, এ স্বর যেন আমার বাছার,
কখন সে যে ঘুমের ঘোরে হারিয়েছিনু, হয় না মনে রে !
না চিনেই আজ তোকে চিনি, আমারি সেই বুকের মানিক,
পথ ভুলে তুই পালিয়ে ছিলি সে কোন ক্ষণে সে কোন বনে রে !

দুষ্টু ওরে চপল ওরে, অভিমানী শিশু !
মনে কি তোর পড়ে না তার কিছু ?
সেই অবধি জাদুমণি কত শত জনম ধরে
দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে রে,
আমি মা-হারা সে কতই ছেলের কতই মেয়ের
মা হয়ে বাপ খুঁজেছি তোরে !

দেখা দিলি আজকে ভোরে রে!
উঠছে বুকে হাহা ধ্বনি
আয় বুকে মোর হারা-মণি,
আমি কত জনম দেখিনি যে ঐ মুখানি রে!

পেটে-ধরা নাই বা হলি, চোখে ধরার মায়াও নহে এ,
তোকে পেতেই জন্ম জন্ম এমন করে বিশ্ব-মায়ের
ফাঁদ পেতেছি যে!
আচমকা আজ ধরা দিয়ে মরা-মায়ের ভরা-স্নেহে হঠাৎ জাগালি।
গৃহ-হারা বাছা আমার রে!
চিনলি কি তুই হারা-মায়ে চিনলি কি তুই আজ?
আজকে আমার অঙ্গনে তোর পরাজয়ের বিজয়-নিশান
তাই কি টাঙালি?
মোর স্নেহের কাঙালি॥

দৌলতপুর, কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

নীল পরী

ঐ সর্ষে ফুলে লুটাল কার
হলুদ-রাঙা উত্তরী
উত্তরী-বায় গো—
ঐ আকাশ-গাঙে পাল তুলে যায়
নীল সে পরীর দূর তরী॥

তার অবুঝ বীণার সবুজ সুরে
মাঠের নাটে পুলক পুরে,
ঐ গহন বনের পথটি ঘুরে
আসছে দূরে কচিপাতা দূত ওরি॥

মাঠ-ঘাট তার উদাস চাওয়ায়
হুতাশ কাঁদে গগন মগন
বেণুর বনে কাঁপ্‌চে গো তার
দীঘল শ্বাসের রেশটি সঘন।

তার বেতস-লতায় লুটায় তনু,
দিগ্বলয়ে ভুরুর ধনু,
সে পাকা ধানের হীরক-রেণু
নীল নলিনীর নীলিম-অণু
মেখেছে মুখ-বুক ভরি॥

ট্রেনে কুমিল্লার পথে
চৈত্র ১৩২৭

স্নেহ-ভীতু

ওরে এ কোন স্নেহ-সুরধুনী নামল আমার সাহারায়?
বক্ষে কাঁদার বান ডেকেছে, আজ হিয়া কূল না হারায়!
কণ্ঠে চেপে শুষ্ক তৃষা
মরুর সে পথ তপ্ত সীসা,
চলতে একা পাইনি দিশা ভাই;
বন্ধ নিশাস—একটু বাতাস!
এক ফোঁটা জল জহর-মিশা!—
মিথ্যা আশা, নাই সে নিশানা'ই!
হঠাৎ ও কার ছায়ার মায়া রে?—
যেন ডাক-নামে আজ গাল-ভরা ডাক ডাকছে কে ঐ মা-হারায়!

লক্ষ যুগের বক্ষ-ছাপা তুহিন হয়ে যে ব্যথা আর কথা ছিল ঘুমা,
কে সে ব্যথায় বুলায় পরশ রে?—
ওরে গলায় তুহিন কাহার কিরণ-তপ্ত সোহাগ-চুমা?
ওরে ও ভূত, লক্ষ্মী-ছাড়া,
হতভাগা বাঁধন-হারা!

কোথায় ছুটিস ! একটু দাঁড়া, হায় !
ঐ তো তোরে ডাকচে স্নেহ,
হাতছানি দেয় ঐ তো গেহ,—
কাঁদিস কেন পাগল-পারা তায় ?
এত ডুকরে কিসের তিক্ত কাঁদন তোর ?
অভিমানি ! মুখ ফেরা দেখ্ যা পেয়েচিস্ তাও হারায় !
হায়, বুঝবে কে যে স্নেহের ছোঁয়ায় আমার বাণী রা হারায়॥

দেওঘর
পৌষ ১৩২৭

পলাতকা

কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশির ডাক শুনেছিস ওরে চখা ?
ওরে আমার পলাতকা !
তোর পড়ল মনে কোন হারা ঘর,
স্বপন-পারের কোন অলকা ?
ওরে আমার পলাতকা !
তোর জল ভরেছে চপল চোখে,
বল্ কোন হারা-মা ডাকল তোকে রে ?
ঐ গগন-সীমায় সাঁঝের ছায়ায়
হাতছানি দেয় নিবিড় মায়ায়—
উতল পাগল ! চিনিস কি তুই চিনিস ওকে রে ?
যেন বুক-ভরা ও গভীর স্নেহে ডাক দিয়ে যায়, 'আয়,
ওরে আয় আয় আয়,
কোলে আয় রে আমার দুষ্টু খোকা !
ওরে আমার পলাতকা !'

দখিন হাওয়ায় বনের কাঁপনে—
দুলাল আমার ! হাত-ইশারায় মা কি রে তোর
ডাক দিয়েছে আজ ?

এত দিনে চিনলি কি রে পর ও আপনে!
নিশিভোরেই তাই কি আমার নামল ঘরে সাঁঝ!

ধানের শীষে, শ্যামার শিসে—
জাদুমণি! বল্ সে কিসে রে,
তুই শিউরে চেয়ে ছিঁড়লি বাঁধন!
চোখ-ভরা তোর উছলে কাঁদন রে!
তোরে কে পিয়াল সবুজ-স্নেহের কাঁচা বিষে রে!
যেন আচমকা কোন শশক-শিশু চমকে ডাকে হায়,
'ওরে আয় আয় আয়—
আয় রে খোকন আয়,
বনে আয় ফিরে আয় বনের সখা!
ওরে চপল পলাতকা।।

কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৮

চিরশিশু

নাম-হারা তুই পথিক শিশু এলি অচিন দেশ পারায়ে।
কোন নামের আজ পরলি কাঁকন, বাঁধন-হারার কোন কারা এ।।

আবার মনের মতন করে
কোন নামে বল্ ডাকব তোরে!
পথ-ভোলা তুই এই সে ঘরে
ছিলি ওরে এলি ওরে
বারেবারে নাম হারায়ে।।

ওরে জাদু, ওরে মানিক, আঁধার ঘরের রতন-মণি!
ক্ষুধিত ঘর ভরলি এনে ছোট্ট হাতের একটু ননী!

আজ যে শুধু নিবিড় সুখে
কান্না-সায়র উথলে বুকে,
নতুন নামে ডাকতে তোকে
ওরে ও কে কণ্ঠ রুখে
উঠছে কেন মন ভারায়ে।
অস্ত হতে এলে পথিক উদয় পানে পা বাড়ায়ে॥

কলিকাতা
ফাল্গুন ১৩২৭

মানস-বধূ

যেমন ছাঁচি পানের কচি পাতা প্রজাপতির ডানার ছোঁয়ায়,
ঠোঁট দুটি তার কাঁপন-আকুল একটি চুমায় অমনি নোয়ায়॥

জল-ছল্-ছল্ উড়ু-উড়ু চঞ্চল তার আঁখির তারা,
কখন বুঝি দেবে ফাঁকি সুদূর পথিক-পাখির পারা,
নিবিড় নয়ন-পাতার কোলে,
গভীর ব্যথার ছায়া দোলে,
মলিন চাওয়া ছাওয়া যেন দূরের সে কোন সবুজ ধোঁয়ায়॥

সিঁথির বীথির খসে-পড়া কপোল-ছাওয়া চপল অলক
পলক-হারা, সে মুখ চেয়ে নাচ ভুলেছে নাকের নোলক।
পাংশু তাহার চূর্ণ কেশে,
মুখ মুছে যায় সন্ধে এসে,
বিধুর অধর-সীধু যেন নিঙড়ে কাঁচা আঙুর চোঁয়ায়॥

দীঘল শ্বাসের বাউল বাজে নাসার সে তার জোড়-বাঁশিতে,
পান্না-ক্ষরা কান্না যেন ঠোঁট-চাপা তার চোর হাসি সে।
ম্লান্ তার লাল গালের লালিম,
রোদ-পাকা আধ-ডাঁশা ডালিম,
গাগ্‌রী ব্যথার ডুবায় কে তার টোল-খাওয়া গাল-চিবুক-কুয়ায়॥

চায় যেন সে শরম-শাড়ির ঘোমটা চিরি পাতা ফুঁড়ি,
আধ-ফোটা বৌ মউল-বউল, বোলতা-ব্যাকুল বকুল-কুঁড়ি,
বোল-ভোলা তার কাঁকন চুড়ি
ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি,
দু'চোখ-ভরা অশ্রু যেন পাকা পিয়াল শালের ঠোঙায়॥

বুকের কাঁপন হুতাশ-ভরা, বাহুর বাঁধন কাঁদন-মাখা,
নিটোল বুকের কাঁচল আঁচল স্বপন-পারের পরির পাখা।
খেয়াপারের ভেসে-আসা
গীতির মতো পায়ের ভাষা,
চরণ-চুমায় শিউরে পুলক হিম-ভেজা দুধ-ঘাসের রোঁয়ায়॥

সে যেন কোন দূরের মেয়ে আমার কবি-মানস-বধূ;
বুক-পোরা আর মুখ-ভরা তার পিছলে পড়ে ব্যথার মধু।
নিশীথ-রাতের স্বপন হেন,
পেয়েও তারে পাইনে যেন,
মিলন মোদের স্বপন-কূলে কাঁদন-ভরা চুমায় চুমায়।
নাম-হারা সেই আমার প্রিয়া, তারেই চেয়ে জনম গোঁয়ায়॥

দৌলতপুর, কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

দহন-মালা

হায় অভাগী! আমায় দেবে তোমার মোহন মালা?
বদল দিয়ে মালা, নেবে আমার দহন-জ্বালা?
কোন ঘরে আজ প্রদীপ জ্বেলে
ঘর-ছাড়াকে সাধতে এলে
গগন-ঘন শান্তি মেলে, হায়!

দু'হাত পুরে আনলে ও কি সোহাগ-ক্ষীরের থালা
আহা দুখের বরণ ডালা?
পথ-হারা এই লক্ষ্মীছাড়ার
পথের ব্যথা পারবে নিতে? করবে বহন, বালা?

লক্ষ্মীমণি! তোমার দিকে চাইতে আমি নারি,
দু'চোখ আমার নয়নজলে পুরে,
বুক ফেটে যায় তবু এ-হার ছিঁড়তে নাহি পারি,
ব্যথাও দিতে নারি, নারী! তাই যেতে চাই দূরে।

ডাকতে তোমায় প্রিয়তমা
দু'হাত জুড়ে চাইছি ক্ষমা,
চাইছি ক্ষমা চাইছি ক্ষমা গো!
নয়ন-বাঁশির চাওয়ার সুরে
বনের হরিণ বাঁধবে বৃথা লক্ষ্মী গহন-বালা।
কল্যাণী! হায় কেমনে তোমায় দেব
যে-বিষ পান করেছি নীলের নয়ন-গালা॥

কলিকাতা
চৈত্র ১৩২৭

বিদায়-বেলায়

তুমি অমন করে গো বারেবারে জল-ছলছল চোখে চেয়ো না,
জল-ছলছল চোখে চেয়ো না।
ঐ কাতর-কণ্ঠে থেকে থেকে শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না,
শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না॥

হাসি দিয়ে যদি লুকালে তোমার সারা জীবনের বেদনা,
আজো তবে শুধু হেসে যাও, আজ বিদায়ের দিনে কেঁদো না।
ঐ ব্যথাতুর আঁখি কাঁদো-কাঁদো মুখ
দেখি আর শুধু হুহু করে বুক!

চলার তোমার বাকি পথটুক—
পথিক ! ওগো সুদূর পথের পথিক—
হায় অমন করে ও অকরুণ গীতে আঁখির সলিলে ছেয়ো না,
ওগো আঁখির সলিলে ছেয়ো না।।

দূরের পথিক ! তুমি ভাবো বুঝি
তব ব্যথা কেউ বোঝে না,
তোমার ব্যথার তুমিই দরদি একাকী,
পথে ফেরে যারা পথ-হারা,
কোনো গৃহবাসী তারে খোঁজে না,
কোনো বুকে ক্ষত হয়ে জেগে আজো সেই ব্যথা-লেখা কি ?

দূর বাউলের গানে ব্যথা হানে বুঝি শুধু ধূ-ধূ মাঠে পথিকে ?
এ যে মিছে অভিমান পরবাসী ! দেখে ঘর-বাসীদের ক্ষতি কে ?
তবে জানো কি তোমার বিদায়-কথায়
কত বুক-ভাঙা গোপন ব্যথায়
আজ কতগুলি প্রাণ কাঁদিছে কোথায়—
পথিক ! ওগো অভিমানী দূর-পথিক !
কেহ ভালোবাসিল না ভেবে যেন আজো
মিছে ব্যথা পেয়ে যেয়ো না,
ওগো যাবে যাও, তুমি বুকে ব্যথা নিয়ে যেয়ো না।।

দৌলতপুর, কুমিল্লা
বৈশাখ ১৩২৮

অকরুণ পিয়া

আমার পিয়াল বনের শ্যামল পিয়ার ঐ বাজে গো বিদায় বাঁশি,
পথ-ঘুরানো সুর হেনে সে আবার হাসে নিদয় হাসি।।

পথিক বলে পথের গেহ
বিলিয়েছিল একটু স্নেহ,
তাই দেখে তার ঈর্ষা-ভরা কান্নাতে চোখ গেল ভাসি।।

তখন মোদের কিশোর বয়স যেদিন হঠাৎ টুটল বাঁধন,
সেই হতে কার বিদায়-বেণুর জগৎ জুড়ে শুনছি কাঁদন।
সেই কিশোরীর হারা মায়া
ভুবন ভরে নিল কায়া,
দুলে আজো তারি ছায়া আমার সকল পথে আসি॥

কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৮

ব্যথা-নিশীথ

এই নীরব নিশীথ রাতে
শুধু জল আসে আঁখি-পাতে।
কেন কি কথা স্মরণে রাজে?
বুকে কার হতাদর বাজে?
কোন ক্রন্দন হিয়া-মাঝে
ওঠে গুমরি ব্যর্থতাতে
আর জল ভরে আঁখি-পাতে॥

মম ব্যর্থ জীবন-বেদনা
এই নিশীথে লুকাতে নারি।
তাই গোপনে একাকী শয়নে
শুধু নয়নে উথলে বারি।
ছিল সেদিনো এমনি নিশা
বুকে জেগেছিল শত তৃষা,
তারি ব্যর্থ নিশাস মিশা
ওই শিথিল শেফালিকাতে
আর পূরবীর বেদনাতে॥

কলিকাতা
ফাল্গুন ১৩২৭

সন্ধ্যাতারা

ঘোমটা-পরা কাদের ঘরের বৌ তুমি ভাই সন্ধ্যাতারা?
তোমার চোখের দৃষ্টি জাগে হারানো কোন মুখের পারা॥

সাঁঝের প্রদীপ আঁচল ঝেঁপে
বঁধুর পথে চাইতে বেঁকে
চাউনিটি কার উঠছে কেঁপে
রোজ সাঁঝে ভাই এমনি ধারা॥

কার হারানো বধূ তুমি অস্তপথে মৌন মুখে
ঘনাও সাঁঝে ঘরের মায়া গৃহহীনের শূন্য বুকে।
এই যে নিতুই আসা-যাওয়া
এমন করুণ মলিন চাওয়া,
কার তরে হায় আকাশ-বধূ
তুমিও কি প্রিয়-হারা॥

কলিকাতা
কার্তিক ১৩২৭

দূরের বন্ধু

বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন সুদূরের নিজন-পুরে
ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে?
আমার অনেক দুখের পথের বাসা বারেবারে ঝড়ে উড়ে,
ঘর-ছাড়া তাই বেড়াই ঘুরে॥

তোমার বাঁশির উদাস কাঁদন
শিথিল করে সকল বাঁধন,
কাজ হলো তাই পথিক-সাধন—
খুঁজে-ফেরা পথ-বঁধুরে,
ঘুরে ঘুরে দূরে দূরে॥

হে মোর প্রিয় ! তোমার বুকে একটুকুতেই হিংসা জাগে,
তাই তো পথে হয় না থামা—তোমার ব্যথা বক্ষে লাগে !

বাঁধতে বাসা পথের পাশে
তোমার চোখে কান্না আসে,
উত্তরী বায় ভেজা ঘাসে
শ্বাস ওঠে আর নয়ন ঝুরে,
বন্ধু তোমার সুরে সুরে ॥

বরিশাল
আশ্বিন ১৩২৭

আশা

হয়তো তোমার পাব দেখা,
যেখানে ঐ নত আকাশ চুমছে বনের সবুজ রেখা ॥

ঐ সুদূরের গাঁয়ের মাঠে,
আলের পথে, বিজন ঘাটে ;
হয়তো এসে মুচকি হেসে
ধরবে আমার হাতটি একা ॥

ঐ নীলের ঐ গহন-পারে ঘোমটা-হারা তোমার চাওয়া,
আনলে খবর গোপন-দূতী দিক-পারের ঐ দখিন হাওয়া।

বনের ফাঁকে দুষ্টু তুমি
আস্তে যাবে নয়না চুমি,
সেই সে কথা লিখছে হেথা
দিগ্বলয়ের অরুণ-লেখা ॥

বরিশাল
আশ্বিন ১৩২৭

মরমী

কোন মরমীর মরম-ব্যথা আমার বুকে বেদনা হানে,
জানি গো, সেও জানেই জানে।
আমি কাঁদি তাইতে যে তার ডাগর চোখে অশ্রু আনে,
বুঝেছি তা প্রাণের টানে।।

বাইরে বাঁধি মনকে যত
ততই বাড়ে মর্ম-ক্ষত
মোর যে ক্ষত ব্যথার মতো
বাজে গিয়ে তারও প্রাণে,
কে কয়ে যায় হিয়ার কানে।।

উদাস বায়ু ধানের খেতে ঘনায় যখন সাঁঝের মায়া,
দুই জনারই নয়ন-পাতায় অমনি নামে কাজল-ছায়া!

দুইটি হিয়াই কেমন কেমন
বদ্ধ ভ্রমর পদ্মে যেমন,
হায়, অসহায় মূকের বেদন
বাজল শুধু সাঁঝের গানে,
পুবের বায়ুর হুতাশ তানে।।

বরিশাল
আশ্বিন ১৩২৭

মুক্তি-বার

লক্ষ্মী আমার! তোমার পথে আজকে অভিসার।
অনেক দিনের পর পেয়েছি মুক্তি-রবিবার।।

দিনের পরে দিন গিয়েছে, হয়নি আমার ছুটি,
বুকের ভিতর মৌন-কাঁদন পড়ত বৃথাই লুটি।
আজ পেয়েছি মুক্ত হাওয়া,
লাগল চোখে তোমার চাওয়া,
তাই তো প্রাণে বাঁধ টুটেছে রুদ্ধ কবিতার॥

তোমার তরে বুকের তলায়
অনেক দিনের অনেক কথা জমা,
কানের কাছে মুখটি থুয়ে
গোপন সে সব কইব প্রিয়তমা।

এবার শুধু কথায়-গানে রাত্রি হবে ভোর,
শুকতারাতে কাঁপবে তোমার নয়ন-পাতার লোর।
তোমায় সেধে ডাকবে বাঁশি,
মলিন মুখে ফুটবে হাসি,
হিম-মুকুরে উঠবে ভাসি করুণ ছবি তার॥

দেওঘর
পৌষ ১৩২৭

আপন-পিয়াসী

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন
খুঁজি তারে আমি আপনায়।
আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াসী বাসনায়॥

আমারই মনের তৃষিত আকাশে
কাঁদে সে চাতক আকুল পিয়াসে,
কভু সে চকোর সুধা-চোর আসে
নিশীথে স্বপনে জোছনায়॥

আমার মনের পিয়াল তমালে হেরি তারে স্নেহ-মেঘ-শ্যাম,
অশনি-আলোক হেরি তারে থির-বিজুলি-উজল অভিরাম।

আমারই রচিত কাননে বসিয়া
পরানু পিয়ারে মালিকা রচিয়া,
সে মালা সহসা দেখিনু জাগিয়া
আপনারি গলে দোলে হায়।।

কলিকাতা
আষাঢ় ১৩৩১

বিবাগিনী

করেছ পথের ভিখারিনী মোরে কে গো সুন্দর সন্ন্যাসী?
কোন বিবাগীর মায়া-বনমাঝে বাজে ঘর-ছাড়া তব বাঁশি?
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী।।

তব প্রেম-রাঙা ভাঙা জোছনা
হেরো শিশির-অশ্রু-লোচনা,
ঐ চলিয়াছে কাঁদি বরষার নদী গৈরিক-রাঙা-বসনা।
ওগো প্রেম-মহাযোগী, তব প্রেম লাগি নিখিল বিবাগী পরবাসী!
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী।।

মম একা ঘরে নাথ দেখেছিনু তোমা ক্ষীণ দীপালোকে হীন করি,
হেরি বাহির আলোকে অনন্ত লোকে এ কি রূপ তব মরি মরি।

দিয়া বেদনার পরে বেদনা
নাথ এ কি এ বিপুল চেতনা
তুমি জাগালে আমার রোদনে, অন্ধে দেখালে বিশ্ব-দ্যোতনা।
ওগো নিষ্ঠুর মোর! অশুভ ও-রূপ তাই এত বাজে বুকে আসি।
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী।।

হুগলি
আষাঢ় ১৩৩১

প্রতিবেশিনী

আমার ঘরের পাশ দিয়ে সে চলত নিতুই সকাল-সাঁঝে।
আর এ পথে চলবে না সে, সেই ব্যথা হায় বক্ষে বাজে॥

আমার দ্বারের কাছটিতে তার ফুটত লালী গালের টোলে,
টলত চরণ, চাউনি বিবশ, কাঁপত নয়ন-পাতার কোলে—
কুঁড়ি যেমন প্রথম খোলে গো!
কেউ কখনো কইনি কথা,
কেবল নিবিড় নীরবতা
সুর বাজাত অনাহতা
গোপন মরম-বীণার মাঝে॥

মূক পথের আজ বুক ফেটে যায় স্মরি তারি পায়ের পরশ
বুক-খসা তার আঁচর-চুমু,
রঙিন ধুলো পাংশু হলো, ঘাস শুকোল যেচে বাচাল
জোড়-পায়েলার রুমু-ঝুমু!

আজো আমার কাটবে গো দিন রোজই যেমন কাটত বেলা,
একলা বসে শূন্য ঘরে—তেমনি ঘাটে ভাসবে ভেলা
অবহেলা হেলা-ফেলায় গো!
শুধু সে আর তেমন করে
মন রবে না নেশায় ভরে
আসার আশায় সে কার তরে
সজাগ হয়ে সকল কাজে।

ডুকরে কাঁদে মন-কপোতী—
'কোথায় সাথীর কূজন বাজে?
সে-পা'র ভাষা কোথায় রাজে।'

দুপুর-অভিসার

যাস কোথা সই একলা ও তুই অলস বৈশাখে?
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে?

সাঁঝ ভেবে তুই ভর-দুপুরেই দুকূল নাচায়ে
পুকুর-পানে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজায়ে
যাসনে একা হাবা ছুঁড়ি,
অফুট জবা চাঁপা-কুঁড়ি তুই
দ্যাখ রঙ দেখে তোর লাল গালে যায়
দিগ্‌বধূ ফাগ থাবা থাবা ছুড়ি,
পিক-বধূ সব টিটকিরি দেয় বুলবুলি চুমকুড়ি—
ওলো বাউল-ব্যাকুল রসাল তরুর সরস ঐ শাখে॥

দুপুরবেলায় পুকুর গিয়ে একূল ওকূল গেল দু'কূল তোর,
ঐ চেয়ে দ্যাখ পিয়াল-বনের দিয়াল ডিঙে এল মুকুল-চোর।
সারঙ রাগে বাজায় বাঁশি নাম ধরে তোর ওই,
রোদের বুকে লাগল কাঁপন সুর শুনে ওর সই।
পলাশ অশোক শিমুল-ডালে
বুলাস কি লো হিঙুল গালে তোর?
আ— আ মলো যা! তাইতো হা দ্যাখ,
শ্যাম চুমু খায় সব সে কুসুম লালে
পাগলি মেয়ে! রাগলি নাকি? ছি ছি দুপুর-কালে
বল কেমনে দিবি সরস অধর-পরশ সই তাকে।

কলিকাতা
ফাল্গুন ১৩২৭

ছল-কুমারী

কত ছল করে সে বারেবারে দেখতে আসে আমায়।
কত বিনা-কাজের কাজের ছলে চরণ দুটি
আমার দোরেই থামায়॥

জানলা-আড়ে চিকের পাশে
দাঁড়ায় এসে কিসের আশে,
আমায় দেখেই সলাজ ত্রাসে
অনামিকায় জড়িয়ে আঁচল গাল দুটিকে ঘামায়॥

সবাই যখন ঘুমে মগন দুরু-দুরু বুকে তখন
আমায় চুপে চুপে
দেখতে এসেই মল বাজিয়ে দৌড়ে পলায়,
রঙ খেলিয়ে চিবুক গালের কূপে !
দোর দিয়ে মোর জলকে চলে
কাঁকন হানে কলস-গলে !
অমনি চোখাচোখি হলে
চমকে ভুঁয়ে নখটি ফোটায় চোখ দুটিকে নামায়॥

সইরা হাসে দেখে তাহার দোর দিয়ে মোর
নিতুই নিতুই কাজ-অকাজে হাঁটা,
করবে কি ও? রোজ যে হারায় আমার দোরেই
শিথিল বেণীর দুষ্টু মাথার কাঁটা !
একে ওকে ডাকার ভানে
আনমনা মোর মনটি টানে,
কি যে কথা সেই তা জানে
ছল-কুমারী নানান ছলে আমারে সে জানায়।
পিঠ ফিরিয়ে আমার পানে দাঁড়ায় দূরে
উদাস নয়ান যখন এলোকেশে,
জানি তখন মনে মনে আমার কথাই ভাবতেছে সে,
মরেছে সে আমায় ভালোবেসে !

বই-হাতে সে ঘরের কোণে
জানি আমার বাঁশিই শোনে,
ডাকলে রোষে আমার পানে
নয়না হেনেই রক্ত-কমল-কুঁড়ির সম চিবুকটি তার নামায়।।

দেওঘর
পৌষ ১৩২৭

পাপড়ি খোলা

রেশমি চুড়ির শিঞ্জিনীতে রিমঝিমিয়ে মরম-কথা
পথের মাঝে চমকে কে গো থমকে যায় ঐ শরম-নতা।।

কাঁখ-চুমা তার কলসি-ঠোঁটে
উল্লাসে জল উলসি ওঠে,
অঙ্গে নিলাজ পুলক ছোটে
বায় যেন হায় নরম লতা।।

অ-চকিতে পথের মাঝে পথ-ভুলানো পরদেশী কে
হানলে দিঠি পিয়াস-জাগা পথবালা এই উর্বশীকে !

শূন্য তাহার কন্যা-হিয়া
ভরল বঁধুর বেদনা নিয়া,
জাগিয়ে গেল পরদেশিয়া
বিধুর বঁধুর মধুর ব্যথা।।

দৌলতপুর, কুমিল্লা
বৈশাখ ১৩২৮

বিধুরা পথিক-প্রিয়া

আজ　নলিন-নয়ান মলিন কেন বলো সখি বলো বলো।
পড়ল মনে কোন পথিকের বিদায় চাওয়া ছল-ছল?
বলো সখি বলো বলো॥

মেঘের পানে চেয়ে চেয়ে বুক ভিজালে চোখের জলে,
ঐ সুদূরের পথ বেয়ে কি দূরের পথিক গেছে চলে—
আবার ফিরে আসব বলে গো?
স্বর শুনে কার চমকে ওঠো? আ—হা!
ওলো ও যে বিহগ-বেহাগ নির্ঝরিণীর কল-কল॥

ও নয় লো তার পায়ের ভাষা, আ—হা,
শীতের শেষের ঝরা-পাতার বিদায় ধ্বনি ও,
কোন কালোরে কোন ভালোরে বাসলে ভালো, আ—হা!
খুঁজছ মেঘে পরদেশি কোন পলাতকার নয়ন্-অমিয়?
চুমছ　কারে? ও নয় তোমার চির-চেনার চপল হাসির আলো-ছায়া,
ও যে　গুবাক-তরুর চিকন পাতায় বাদল-চাঁদের মেঘলা মায়া।

ওঠো পথিক-পূজারিণী উদাসিনী বালা!
সে যে　সবুজ-দেশের অবুঝ পাখি কখন এসে যাচবে বাঁধন,
কে জানে ভাই, ঘরকে চলো।
ওকি? চোখে নামল আবার বাদল-ছায়া ঢল ঢল?
চলো সখি ঘরকে চলো॥

দৌলতপুর, কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

মনের মানুষ

ফিরনু যেদিন দ্বারে দ্বারে কেউ কি এসেছিল?
মুখের পানে চেয়ে এমন কেউ কি হেসেছিল?

অনেক তো সে ছিল বাঁশি,
অনেক হাসি, অনেক ফাঁসি,
কই কেউ কি ডেকেছিল আমায়, কেউ কি যেচেছিল?
ওগো এমন করে নয়ন-জলে কেউ কি ভেসেছিল?

তোমরা যখন সবাই গেলে হেলায় ঠেলে পায়ে,
আমার সকল সুধাটুকুন পিয়ে,
সেই তো এসে বুকে করে তুলল আপন নায়ে
আচমকা কোন না-চাওয়া পথ দিয়ে।
আমার যত কলঙ্কে সে
হেসে বরণ করলে এসে
আহা বুক-জুড়ানো এমন ভালো কেউ কি বেসেছিল?
ওগো জানত কে যে মনের মানুষ সবার শেষে ছিল।।

কুমিল্লা
আষাঢ় ১৩২৮

প্রিয়ার রূপ

অধর নিসপিস
নধর কিসমিস
রাতুল তুলতুল কপোল;
ঝরল ফুল-কূল,
করল গুল ভুল
বাতুল বুলবুল চপল।।

নাসায় তিলফুল
হাসায় বিলকুল,
নয়ান ছলছল উদাস,
দৃষ্টি চোর-চোর
মিষ্টি ঘোর-ঘোর,
বয়ান ঢলঢল হুতাশ !

অলক দুলদুল
পলক ঢুলঢুল,
নোলক চুম খায় মুখেই,
সিঁদুর মুখটুক
হিঙুল টুকটুক,
দোলক ঘুম যায় বুকেই !

ললাট ঝলমল
মলাট মলমল,
টিপটি টলটল সিঁথির,
ভুরুর কায় ক্ষীণ
শুরুর নাই চিন,
দীপটি জ্বলজ্বল দিঠির।

চিবুক টোল খায়,
কি সুখ-দোল তায়
হাসির ফাঁস দেয়—সাবাস !
মুখটি গোলগাল,
চুপটি বোলচাল
বাঁশির শ্বাস দেয় আভাস !

আনার লাল্‌ল্যাল
দানার তার গাল,
তিলের দাগ তায় ভোমর ;
কপোল-কোল ছায়
চপল টোল, তায়
নীলের রাগ ভায় চুমোর।।

কুমিল্লা
ফাল্গুন ১৩২৮

বাদল-দিনে

আদর-গর-গর
বাদর দর-দর
এ-তনু ডর-ডর
কাঁপিছে থর-থর।

নয়ন ঢল-ঢল
সজল ছল-ছল,
কাজল কালো জল
ঝরে লো ঝর-ঝর॥

ব্যাকুল বন-রাজি শ্বসিছে ক্ষণে ক্ষণে,
সজনি ! মন আজি গুমরে মনে মনে।
বিদরে হিয়া মম
বিদেশে প্রিয়তম,
এ জনু পাখি সম
বরিষা-জর-জর॥

কাহার ও-মেঘোপরি গমন গম-গম ?
সখি রে মরি মরি, ভয়ে গা ছম-ছম !
গগনে ঘন ঘন
সঘনে শোনো শোনো—
ঝনন রন রন—
সজনি ধরো ধরো॥

জলদ-দামা বাজে জলদে তালে তালে,
কাজরি-নাচা নাচে ময়ুর ডালে ডালে।
শ্যামল মুখ স্মরি
সখিয়া বুক মোরি
উঠিছে ব্যথা ভরি
আঁখিয়া ভর-ভর॥

বিজুরি হানে ছুরি চমকি রহি রহি
বিধুরা একা ঝুরি বেদনা কারে কহি!
সুরভি কেয়া-ফুলে
এ হৃদি বেয়াকুলে,
কাঁদিছে দুলে দুলে
বনানী মর-মর॥

নদীর কল-কল, ঝাউয়ের ঝল-মল,
দামিনী জ্বল-জ্বল, কামিনী টল-মল!
আজি লো বনে বনে
শুধানু জনে জনে,
কাঁদিল বায়ু সনে
তটিনী তর-তর॥

আদুরি দাদুরি লো কহ লো কহ দেখি,
এমন বাদরি লো ডুবিয়া মরিব কি?
একাকী এলোকেশে
কাঁদিব ভালোবেসে,
মরিব লেখা-শেষে,
সজনী সর সর॥

কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৮

কার বাঁশি বাজিল?

কার বাঁশি বাজিল
নদী-পারে আজি লো?
নীপে নীপে শিহরণ কম্পন রাজিল—
কার বাঁশি বাজিল?

বনে বনে দূরে দূরে
ছল করে সুরে সুরে
এত করে ঝুরে ঝুরে
কে আমায় যাচিল?
পুলকে এ-তনু-মন ঘন ঘন নাচিল!
ক্ষণে ক্ষণে আজি লো কার বাঁশি বাজিল?

কার হেন বুক ফাটে মুখ নাহি ফোটে লো!
না-কওয়া কি কথা যেন সুরে বেজে ওঠে লো!
মম নারী-হিয়া মাঝে
কেন এত ব্যথা বাজে?
কেন ফিরে এনু লাজে
নাহি দিয়ে যা ছিল!
যাচা-প্রাণ নিয়ে আমি কেমনে সে বাঁচি লো?
কেঁদে কেঁদে আজি লো কার বাঁশি বাজিল?

কলিকাতা
চৈত্র ১৩২৮

অ-কেজোর গান

ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুঁটির ক্ষেতে
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে।।

এই রোদ-সোহাগি পউষ-প্রাতে
অথির প্রজাপতির সাথে
বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে
পুষ্পল মৌ খেতে।
আমি আমন ধানের বিদায়-কাঁদন শুনি মাঠে রেতে।।

আজ কাশ-বনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে,
ও তার হলদে আঁচল চলতে জড়ায় অড়হরের ফুলে !
বাবলা ফুলে নাকছাবি তার,
গায় শাড়ি নীল অপরাজিতার,
চলেছি সেই অজানিতার
উদাস পরশ পেতে।
আমায় ডেকেছে সে চোখ-ইশারায় পথে যেতে যেতে॥

ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুঁটির ক্ষেতে
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে তাই মেতে॥

দেওঘর
পৌষ ১৩২৭

স্তব্ধ বাদল

ঐ নীল-গগনের নয়ন-পাতায়
নামল কাজল-কালো মায়া।
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায়
তারি সজল আলো-ছায়া॥

ঐ তমাল তালের বুকের কাছে
ব্যথিত কে দাঁড়িয়ে আছে,
দাঁড়িয়ে আছে !
ভেজা পাতায় ঐ কাঁপে তার
আদুল ঢল-ঢল কায়া॥

যার শীতল হাতের পুলক-ছোঁয়ায়
কদম-কলি শিউরে ওঠে,
জুঁই-কুঁড়ি সব নেতিয়ে পড়ে
কেয়া-বধূর ঘোমটা টুটে।

আহা ! আজ কেন তার চোখের ভাষা
বাদল-ছাওয়া ভাসা-ভাসা—
জলে-ভাসা ?
দিগন্তরে ছড়িয়েছে সেই
নিতল আঁখির নীল আবছায়া ।।

ও কার ছায়া দোলে অতল কালো
শাল-পিয়ালের শ্যামলিমায় ?
আমলকি-বন থামল ব্যথায়
ঘামল কাঁদন গগন-সীমায় !

আজ তার বেদনাই ভরেছে দিক,
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্ পথিক,
এ কোন্ পথিক ?
একি স্তব্ধ তারি আকাশ-জোড়া
অসীম রোদন-বেদন-ছায়া ।।

কুমিল্লা
আষাঢ় ১৩২৯

চাঁদ-মুকুর

চাঁদ হেরিতেছে চাঁদ-মুখ তার সরসীর আরশিতে
ছুটে তরঙ্গ বাসনা-ভঙ্গ সে অঙ্গ পরশিতে ।।

হেরিছে রজনী রজনী জাগিয়া
চকোর উতলা চাঁদের লাগিয়া,
কাহাঁ পিউ কাহাঁ ডাকিছে পাপিয়া
কুমুদীরে কাঁদাইতে ।।

না জানি সজনী কত সে রজনী কেঁদেছে চকোরী পাপিয়া,
হেরেছে শশীরে সরসী-মুকুরে ভীরু ছায়া-তরু কাঁপিয়া !

কেঁদেছে আকাশে চাঁদের ঘরনি
চির-বিরহিণী রোহিণী ভরণী,
অবশ আকাশ বিবশা ধরণী
কাঁদানিয়া চাঁদিনীতে॥

হুগলি
ফাল্গুন ১৩৩১

চির-চেনা

নাম-হারা ঐ গাঙের পারে বনের কিনারে
বেতস-বেণুর বনে কে ঐ বাজায় বীণা রে॥

লতায়-পাতায় সুনীল রাগে
সে-সুর-সোহাগ-পুলক লাগে,
সে-সুর ঘুমায় দিগঙ্গনার শয়ন-লীনা রে।
আমি কাঁদি, এ-সুর আমার চির-চেনা রে॥

ফাগুন-মাঠে শিস দিয়ে যায় উদাসী তার সুর,
শিউরে ওঠে আমের মুকুল ব্যথায় ভারাতুর।
সে সুর কাঁপে উতল হাওয়ায়,
কিশলয়ের কচি চাওয়ায়,
সে চায় ইশারায় অস্তাচলের প্রাসাদ-মিনারে।
আমি কাঁদি, এই তো আমার চির-চেনা রে॥

কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

পাহাড়ী গান

মোরা ঝন্‌ঝার মতো উদ্দাম, মোরা ঝর্নার মতো চঞ্চল।
মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল।।

মোরা আকাশের মতো বাধাহীন,
মোরা মরু-সঞ্চর বেদুঈন,
মোরা জানি নাকো রাজা রাজ-আইন,
মোরা পরি না শাসন-উদূখল !
মোরা বন্ধন-হীন জন্ম-স্বাধীন, চিত্ত মুক্ত শতদল।
মোরা সিন্ধু-জোয়ার কল-কল
মোরা পাগল-ঝোরার ঝরা-জল
কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্ কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্।।

মোরা দিল্-খোলা খোলা প্রান্তর,
মোরা শক্তি-অটল মহীধর,
মোরা মুক্ত-পক্ষ নভ-চর,
মোরা হাসি-গান সম উচ্ছল।
মোরা বৃষ্টির জল বনফল খাই, শয্যা শ্যামল বন-তল,
মোরা প্রাণ-দরিয়ার কল-কল্,
মোরা মুক্ত-ধারার ঝরা-জল
চল-চঞ্চল কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্ ছল-ছল-ছল্।।

হুগলি
আষাঢ় ১৩৩১

অমর-কানন

অমর-কানন
মোদের অমর-কানন !
বন কে বলে রে ভাই, আমাদের তপোবন,
আমাদের তপোবন।।

এর দক্ষিণে 'শালী' নদী কুলুকুলু বয়,
তার কূলে কূলে শাল-বীথি ফুলে ফুল-ময়,
হেথা ভেসে আসে জলে-ভেজা দখিনা মলয়,
হেথা মহুয়ার মউ খেয়ে মন উচাটন॥

দূর প্রান্তর-ঘেরা আমাদের বাস,
দুধ-হাসি হাসে হেথা কচি দুব্-ঘাস,
উপরে মায়ের মতো চাহিয়া আকাশ,
বেণু-বাজা মাঠে হেথা চরে ধেনুগণ॥

মোরা নিজ হাতে মাটি কাটি, নিজে ধরি হাল,
সদা খুশি-ভরা বুক হেথা হাসি-ভরা গাল,
মোরা বাতাস করি গো ভেঙে হরিতকী-ডাল,
হেথা শাখায় শাখায় শাখী, গানের মাতন॥

প্রহরী মোদের ভাই 'পূরবী' পাহাড়,
'শুশুনিয়া' আগুলিয়া পশ্চিমী-দ্বার,
ওড়ে উত্তরে উত্তরী কানন-বিথার,
দূরে ক্ষণে ক্ষণে হাতছানি দেয় তালী-বন॥

হেথা খেত-ভরা ধান নিয়ে আসে অঘ্রান,
হেথা প্রাণে ফোটে ফুল, হেথা ফুলে ফোটে প্রাণ,
ওরে রাখাল সাজিয়া হেথা আসে ভগবান,
মোরা নারায়ণ-সাথে খেলা খেলি অনুখন॥

মোরা বটের ছায়ায় বসি করি গীতা পাঠ,
আমাদের পাঠশালা চাষি-ভরা মাঠ,
গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের মায়েদের হাট,
ঘরে ঘরে ভাই-বোন বন্ধু-স্বজন॥*

গঙ্গাজলঘাটী, বাঁকুড়া
আষাঢ় ১৩৩২

---

* বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটী জাতীয় বিদ্যালয়টি নদী, পাহাড়, বন ও মাঠ-ঘেরা একটি প্রান্তরে। এর নাম 'অমর কানন'। এই বিদ্যালয় অমর নামক একটি তরুণের তপস্যার ফল। সে আজ স্বর্গে। এই গানটি ঐ বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্য লিখিত।

পুবের হাওয়া*

(ঝড় : পূর্ব-তরঙ্গ)

আমি ঝড় পশ্চিমের প্রলয়-পথিক—
অসহ যৌবন-দাহে লেলিহান-শিখ
দারুণ দাবাগ্নি-সম নৃত্য-ছায়ানটে
মাতিয়া ছুটিতেছিনু, চলার দাপটে
ব্রহ্মাণ্ড ভণ্ডুল করি ! অগ্রে সহচরী
ঘূর্ণা-হাতছানি দিয়া চলে ঘূর্ণি-পরি
গ্রীষ্মের গজল গেয়ে পিলু-বারোঁয়ায়
উশীরের তার-বাঁধা প্রান্তর-বীণায়।
করতালি-ঠেকা দেয় মত্ত তালি-বন
কাহার্‌বা-দ্রুত-তালে। —আমি উচাটন
মন্মথ-উন্মাদ আঁখি রাগ-রক্ত ঘোর
ঘূর্ণিয়া পশ্চাতে ছুটি, প্রমত্ত চকোর
প্রথম-কামনা-ভীতু চকোরিনী পানে
ধায় যেন দুরন্ত বাসনা-বেগ-টানে।

সহসা শুনিনু কার বিদায়-মন্থর
শ্রান্ত শ্লথ গতি-ব্যথা, পাতা-থরথর
পথিক-পদাঙ্ক-আঁকা পুব-পথ-শেষে।
দিগন্তের পর্দা ঠেলি হিম-মরু-দেশে
মাগিছে বিদায় মোর প্রিয়া ঘূর্ণি-পরি,
দিগন্ত ঝাপসা তার অশ্রু-হিমে ভরি।
গোলে-বকৌলির দেশে মেরু-পরিস্থানে
মিশে গেল হাওয়া-পরি। অযথা সন্ধানে
দিক্‌চক্র-রেখা ধরি কেঁদে কেঁদে চলি
শ্রান্ত অশ্বশ্বসা-গতি। চম্পা-একাবলী
ছিন্ন ম্লান ছেয়ে আছে দিগন্ত ব্যাপিয়া,—
সেই চম্পা চোখে চাপি ডাকি, 'পিয়া পিয়া !'

---

* 'ঝড়' কবিতার পশ্চিম-তরঙ্গ 'বিষের বাঁশী'তে বেরিয়েছিল।

বিদায়-দিগন্ত ছানি নীল হলাহল
আকণ্ঠ লইনু পিয়া, তরল গরল-
সাগরে ডুবিল মোর আলোক-কমলা,
আঁখি মোর ঢুলে আসে—শেষ হলো চলা !
জাগিলাম জন্মান্তর-জাগরণ-পারে
যেন কোন্ দাহ-অন্ত ছায়া-পারাবারে
বিচ্ছেদ-বিশীর্ণ তনু, শীতল-শিহর !
প্রতি রোম-কূপে মোর কাঁপে থরথর !

কাজল-সুস্নিগ্ধ কার অঙ্গুলি-পরশ
বুলায় নয়নে মোর, দুলায়ে অবশ
ভার-শ্লথ তনু মোর ডাকে—'জাগো পিয়া !
জাগো রে সুন্দর মোরি রাজা শাঁবলিয়া।'

জল-নীলা ইন্দ্র-নীলকান্তমণি-শ্যামা
এ কোন্ মোহিনী তন্বী জাদুকরী বামা
জাগাল উদয়-দেশে নব মন্ত্র দিয়া
ভয়াল-আমারে ডাকি—'হে সুন্দর পিয়া !'
—আমি ঝড় বিশ্ব-ত্রাস মহা-মৃত্যু-ক্ষুধা,
ত্র্যম্বকের ছিন্নজটা—ওগো এত সুধা,
কোথা ছিল অগ্নি-কুণ্ড মোর দাব-দাহে ?
এত প্রেম-তৃষা সাধ গরল-প্রবাহে ?—

আবার ডাকিল শ্যামা, 'জাগো মোরি পিয়া !'
এতক্ষণে আপনার পানে নিরখিয়া
হেরিলাম আমি ঝড় অনন্ত সুন্দর
পুরুষ-কেশরী বীর ! প্রলয়-কেশর
স্কন্ধে মোর পৌরুষের প্রকাশে মহিমা !
চোখে মোর ভাস্করের দীপ্তি-অরুণিমা
ঠিকরে প্রদীপ্ত তেজে ! মুক্ত ঝোড়ো কেশে
বিশ্বলক্ষ্মী মালা তাঁর বেঁধে দেন হেসে !

এ কথা হয়নি মনে আগে,—আমি বীর
পরুষ পুরুষ-সিংহ, জয়-লক্ষ্মী-শ্রীর

স্নেহের দুলাল আমি ; আমারেও নারী
ভালোবাসে, ভালোবাসে রক্ত-তরবারি
ফুল-মালা চেয়ে ! চাহে তারা নর
অটল-পৌরুষ বীর্যবন্ত শক্তি-ধর !
জানিনু যেদিন আমি এ সত্য মহান—
হাসিল সেদিন মোর মুখে ভগবান
মদন-মোহন-রূপে ! সেই সে প্রথম
হেরিনু, সুন্দর আমি সৃষ্টি-অনুপম !

যাহা কিছু ছিল মোর মাঝে অসুন্দর
অশিব ভয়াল মিথ্যা অকল্যাণকর
আত্ম-অভিমান হিংসা দ্বেষ-তিক্ত ক্ষোভ—
নিমেষে লুকাল কোথা, স্নিগ্ধ-শ্যাম ছোপ
সুন্দরের নয়নের লাগি মোর প্রাণে !
পুবের পরিরে নিয়া অস্তদেশ পানে
এইবার দিনু পাড়ি। নটনটী-রূপে
গ্রীষ্মদগ্ধ তাপশুষ্ক মারী-ধ্বংস-স্তূপে
নেচে নেচে গাই নব-মন্ত্র সাম-গান
শ্যামল জীবন-গাথা জাগরণ-তান !

*

এইবার গাহি নেচে নেচে,
রে জীবন-হারা, ওঠ্ বেঁচে !
রুদ্র কালের বহ্নি-রোষ
নিদাঘের দাহ গ্রীষ্ম-শোষ
নিবাতে এনেছি শান্তি-সোম,
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম্ !
জেগে ওঠ্ ওরে মূর্ছাতুর !
হোক অশিব মৃত্যু দূর !
গাহে উদ্গাতা সজল ব্যোম,
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম্ !
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম্ !
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম্॥

*

এস মোর শ্যাম-সরসা
ঘনিমার হিঙ্গুল-শোষা
বরষা প্রেম-হরষা
প্রিয়া মোর নিকষ-নীলা !
শ্রাবণের কাজল গুলি
ওলো আয় রাঙিয়ে তুলি
সবুজের জীবন-তুলি,
মৃতে কর প্রাণ-রঙিলা ॥

আমি ভাই পুবের হাওয়া
বাঁচনের নাচন-পাওয়া,
কার্‌ফায় কাজ্‌রি গাওয়া,
নটিনীর পা-ঝিন্‌ঝিন্‌ !
নাচি আর নাচনা শেখাই
পুরবের বাইজিকে ভাই,
ঘুমুরের তাল দিয়ে যাই—
এক দুই এক দুই তিন ॥

বিল ঝিল তড়াগ পুকুর
পিয়ে নীর নীল কম্বুর
থইথই টইটুম্বুর !
ধরা আজ পুষ্পবতী !
শুশুনির নিদ্রা শুষি
রূপসী ঘুম-উপোসী !
কদমের উদ্‌মো খুশি
দেখায় আজ শ্যাম যুবতী ॥

হুরিরা দূর আকাশে
বরুণের গোলাব-পাশে
ধারা-জল ছিটিয়ে হাসে
বিজুলির ঝিলিমিলিতে !
অরুণ আর বরুণ রণে,
মাতিল ঘোর স্বননে
আলো-ছায় গগন-বনে
'শার্দুল-বিক্রীড়িতে।'

*

(শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দে)

উত্রাস ভীম
মেঘে কুচ্‌কাওয়াজ
চলিছে আজ,
সোন্মাদ সাগর
খায় রে দোল্‌!
ইন্দ্রের রথ
বজ্রের কামান
টানে উজান
মেঘ-ঐরাবত
মদ-বিভোল্‌॥

যুদ্ধের রোল
বরুণের জাঁতায়
নিনাদে ঘোর,
বারীশ আর বাসব
বন্ধু আজ।
সূর্যের তেজ
দহে মেঘ-গরুড়
ধূম্র-চূড়,
রশ্মির ফলক
বিঁধিছে বাজ॥

বিশ্রাম-হীন
যুঝে তেজ-তপন
দিক্‌ বারণ
শির-মদ-ধারায়
ধরা মগন!
অম্বর-মাঝ
চলে আলো-ছায়ায়
নীরব রণ
শার্দুল শিকার
খেলে যেমন॥

রৌদ্রের শর
খরতর প্রখর
ক্লান্ত শেষ,
দিবা দ্বিপ্রহর
নিশি-কাজল !
সোল্লাস ঘোর
ঘোষে বিজয়-বাজ,
গরজি আজ
দোলে সিংহ-বি—ক্রীড়ে দোল্॥

*

(সিংহ-বিক্রীড় ছন্দে)

নাচায় প্রাণ রণোন্মাদ— বিজয়-গান, গগনময় মহোৎসব।
রবির রথ অরুণ-যান- কিরণ-পথ ডুবায় মেঘ- মহার্ণব॥

মেঘের ছায় শীতল কায় ঘুমায় থির দিঘির জল অথই থই।
তৃষায় ক্ষীণ 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' কাঁদায় দিল্ চাতক ঐ॥

মাঠের পর সোহাগ-ঢল জলদ-দ্রব্ ছলাৎছল ছলাৎছল !
পাহাড়-গায় ঘুমায় ঘোর অসিত মেঘ- শিশুর দল অচঞ্চল॥

বিলোল-চোখ হরিণ চায় মেঘের গায়, চমক খায় গগন-কোল,
নদীর পার চখির ডাক 'কোয়াক্কো' বনের বায় খাওয়ায় দোল॥

স্বয়ম্ভূর সতীর শোক— ধ্যানোন্মাদ— নিদাঘ-দাব তপের কাল
নিশেষ আজ ! মহেশ্বর উমার গাল চুমার ঘায় রাঙায় লাল॥

*

(অনঙ্গশেখর ছন্দে)

এবার আমার বিলাস শুরু অনঙ্গশেখরে।
পরশ-সুখে শ্যামার বুকে কদম্ব শিহরে।
কুসুমেষু'র পরশ-কাতর নিতম্ব-মন্থরা
সিনান-শুচি স-যৌবনা রোমাঞ্চিত ধরা॥

ঘন শ্রোণীর, গুরু উরুর, দাড়িম-ফাটার ক্ষুধা
যাচে গো আজ পরুষ-পীড়ন পুরুষ-পরশ-সুধা।
শিথিল-নীবি বিধুর বালা শয়ন-ঘরে কাঁপে,
মদন-শেখর কুসুম-স্তবক উপাধানে চাপে॥

আমার বুকের কামনা আজ কাঁদে নিখিল জুড়ি,
বনের হিয়ায় তিয়াষ জিয়ায় প্রথম কদম-কুঁড়ি।
শাখীরা আজ শাখায় শাখায় পাখায় পাখায় বাঁধা,
কুলায় রচে; মনে শোনে শাবক-শিশুর কাঁদা॥

তাপস-কঠিন উমার গালে চুমার পিয়াস জাগে,
বধূর বুকে মধুর আশা কোলে কুমার মাগে!
তরুণ চাহে করুণ চোখে উদাসী তার আঁখি,
শোনে, কোথায় কাঁদে ডাহুক ডাহুকীরে ডাকি॥

এবার আমার পথের শুরু তেপান্তরের পথে,
দেখি, হঠাৎ চরণ রাঙা মৃণাল-কাঁটার ক্ষতে।
ওগো আমার এখনো যে সকল পথই বাকি,
মৃণাল হেরি মনে পড়ে কাহার কমল-আঁখি॥

হুগলি
শ্রাবণ ১৩৩১

আলতা-স্মৃতি

ঐ রাঙা পায়ে রাঙা আলতা প্রথম যেদিন পরেছিলে,
সেদিন তুমি আমায় কি গো ভুলেও মনে করেছিলে—
আলতা যেদিন পরেছিলে?

জানি, তোমার নারীর মনে নিত্য-নূতন পাওয়ার পিয়াস
হঠাৎ কেন জাগল সেদিন, কণ্ঠ ফেটে কাঁদল তিয়াস!

মোর আসনে সেদিন রানি
নতুন রাজায় বরলে আনি,
আমার রক্তে চরণ রেখে তাহার বুকে মরেছিলে—
আলতা যেদিন পরেছিলে॥

মর্মমূলে হানলে আমার অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ ছুরি,
সে-খুন সখায় অর্ঘ্য দিলে যুগল চরণ-পদ্মে পুরি।
আমার প্রাণের রক্ত-কমল
নিঙড়ে হলো লাল পদতল,
সেই শতদল দিয়ে তোমার নতুন রাজায় বরেছিলে—
আলতা যেদিন পরেছিলে॥

আমায় হেলায় হত্যা করে দাঁড়িয়ে আমার রক্ত-বুকে
অধর-আঙুর নিঙড়েছিলে সখার তৃষা-শুষ্ক মুখে।
আলতা সে নয়, সে যে খালি
আমার যত চুমোর লালী!
খেলতে হোরি তাইতে, গোরী, চরণ-তরী ভরেছিলে—
আলতা যেদিন পরেছিলে॥

জানি রানি, এমনি করে আমার বুকের রক্ত-ধারায়
আমারই প্রেম জন্মে জন্মে তোমার পায়ে আলতা পরায়!
এবারও সেই আলতা-চরণ
দেখতে প্রথম পায়নি নয়ন!
মরণ-শোষা রক্ত আমার চরণ-ধারে ধরেছিলে—
আলতা যেদিন পরেছিলে॥

কাহার পুলক-অলক্তকের রক্তধারায় ডুবিয়ে চরণ
উদাসিনী! যেচেছিলে মনের মনে আমার মরণ?
আমার সকল দাবি দলে
লিখলে 'বিদায়' চরণতলে!
আমার মরণ দিয়ে তোমার সখার হৃদয় হরেছিলে—
আলতা যেদিন পরেছিলে॥

বহরমপুর জেল
অগ্রহায়ণ ১৩৩১

রৌদ্র-দগ্ধের গান

এবার আমার জ্যোতির্গেহে তিমির-প্রদীপ জ্বালো।
আনো অগ্নি-বিহীন দীপ্তি-শিখার তৃপ্তি অতল কালো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো॥

নয়ন আমার তামস-তন্দ্রালসে
ঢুলে পড়ুক ঘুমের সবুজ রসে,
রৌদ্র-কুহুর দীপক-পাখা পড়ুক, টুটুক খসে,
আমার নিদাঘ-দাহে অমা-মেঘের নীল অমিয়া ঢালো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো॥

মেঘে ডুবাও সহস্রদল রবি-কমল-দীপ,
ফুটাও আঁধার-কদম-ঘুম-শাখে মোর স্বপন মণি-নীপ।
নিখিল-গহন-তিমির-তমাল-গাছে
কালো কালার উজল নয়ন নাচে,
আলো-রাধা যে-কালোতে নিত্য মরণ যাচে—
ওগো আনো আমার সেই যমুনার জল-বিজুলির আলো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো॥

দিনের আলো কাঁদে আমার রাতের তিমির লাগি
সেথায় আঁধার-বাসর-ঘরে তোমার সোহাগ আছে জাগি।
ম্লান করে দেয় আলোর দহন-জ্বালা
তোমার হাতের চাঁদ-প্রদীপের থালা,
শুকিয়ে ওঠে তোমার তারা-ফুলের গগন-ডালা।
ওগো অসিত আমার নিশীথ-নিতল শীতল কালোই ভালো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো॥

সমস্তিপুরের ট্রেন-পথে
ফাল্গুন ১৩৩০

চিত্তনামা

উৎসর্গ

মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে—

নজরুল ইসলাম

অর্ঘ্য

হায় চির-ভোলা ! হিমালয় হতে
অমৃত আনিতে গিয়া
ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের
মৃত্যু-গরল পি'য়া !
কেন এত ভালোবেসেছিলে তুমি
এই ধরণীর ধূলি ?
দেবতারা তাই দামামা বাজায়ে
স্বর্গে লইল তুলি !

হুগলি
৩রা আষাঢ় ১৩৩২

অকাল-সন্ধ্যা

[জয়-জয়ন্তী—কীর্তন]

খোলো মা দুয়ার খোলো ;
প্রভাতেই সন্ধ্যা হলো
দুপুরেই ডুবল দিবাকর গো।
সমরে শয়ান ওই,
সুত তোর বিশ্বজয়ী,
কাঁদনের উঠছে তুফান-ঝড় গো।।

সবারে বিলায়ে সুধা,
সে নিল মৃত্যু-ক্ষুধা,
কুসুম ফেলে নিল খঞ্জর গো !

তাহারি অস্থি চিরে
দেবতা বজ্র গড়ে
নাশে ঐ অসুর অসুন্দর গো॥

ঐ মা যায় সে হেসে,
দেবতার উপরে সে,
ধরা নয়, স্বর্গ তাহার ঘর গো।
যাও বীর যাও গো চলে
চরণে মরণ দলে
করুক প্রণাম বিশ্ব-চরাচর গো॥

তোমার ঐ চিত্ত জ্বেলে
ভাঙালে ঘুম ভাঙালে
নিজে হায় নিবলে চিতার 'পর গো।
বেদনার শ্মশান-দহে
পুড়ালে আপন দেহে,
হেথা কি নাচবে না শঙ্কর গো॥

আরিয়াদহ
৬ই আষাঢ় ১৩৩২

সান্ত্বনা

চিত্ত-কুঁড়ি-হাস্না-হেনা মৃত্যু-সাঁঝে ফুটল গো!
জীবন-বেড়ার আড়াল ছাপি বুকের সুবাস টুটল গো!
এই তো কারার প্রাকার টুটে
বন্দি এল বাইরে ছুটে,
তাই তো নিখিল আকুল-হৃদয় শ্মশান-মাঝে জুটল গো!
ভবন-ভাঙা আলোর শিখায় ভুবন রেঙে উঠল গো।

২

স্ব-রাজ দলের চিত্ত-কমল লুটল বিশ্বরাজের পায়,
দলের চিত্ত উঠল ফুটে শতদলের শ্বেত আভায়।
রূপের কুমার আজকে দোলে
অরূপের ঐ শিশ-মহলে,
মৃত্যু-বাসুদেবের কোলে কারার কেশব ঐ গো যায়,
অনাগত বৃন্দাবনে মা যশোদা শাঁখ বাজায়।

৩

আজকে রাতে যে ঘুমুল, কালকে প্রাতে জাগবে সে।
এই বিদায়ের অস্ত-আঁধার উদয়-ঊষার রাঙবে রে!
শোকের নিশির শিশির ঝরে,
ফলবে ফসল ঘরে-ঘরে,
আবার শীতের রিক্ত শাখায় লাগবে ফুলেল রাগ এসে।
যে মা সাঁঝে ঘুম পাড়াল, চুম দিয়ে ঘুম ভাঙবে সে।

৪

না ঝরলে তাঁর প্রাণ-সাগরে মৃত্যু-রাতের হিম-কণা
জীবন-শুক্তি ব্যর্থ হতো, মুক্তি-মুক্তা ফলত না।
নিখিল-আঁখির ঝিনুক-মাঝে
অশ্রু-মানিক ঝলত না যে!
রোদের উনুন না নিবিলে চাঁদের সুধা গলত না।
গগন-লোকে আকাশ-বধূর সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলত না।

৫

মরা বাঁশে বাজবে বাঁশি, কাটুক না আজ কুঠার তায়,
এই বেণুতেই ব্রজের বাঁশি হয়তো বাজবে এই হেথায়।
হয়তো এবার মিলন-রাসে
বংশীধারী আসবে পাশে,
চিত্ত-চিতার ছাই মেখে শিব সৃষ্টি-বিষাণ ঐ বাজায়।
জন্ম নেবে মেহেদি-ঈসা ধরার বিপুল এই ব্যথায়।

৬

কর্মে যদি বিরাম না রয়, শান্তি তবে আসত না ;
ফলবে ফসল—নইলে নিখিল নয়ন-নীরে ভাসত না !
নেইকো দেহের খোসার মায়া,
বীজ আনে তাই তরুর ছায়া ;
আবার যদি না জন্মাত, মৃত্যুতে সে হাসত না।
আসবে আবার—নইলে ধরায় এমন ভালো বাসত না !

হুগলি
১৬ই আষাঢ় ১৩৩২

ইন্দ্র-পতন

তখনো অস্ত যায়নি সূর্য, সহসা হইল শুরু
অম্বরে ঘন ডম্বরু-ধ্বনি গুরুগুরু গুরুগুরু !
আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন ইন্দ্রের আগমনী ?
শুনি, অম্বুদ-কম্বু-নিনাদে ঘন বৃংহিত-ধ্বনি।
বাজে চিক্কুর-হ্রেষা-হর্ষণ মেঘ-মন্দুরা-মাঝে,
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলয়ঙ্কর সাজে।

ঘনায় অশ্রু-বাষ্প-কুহেলি ঈশান-দিগঙ্গনে,
স্তব্ধ-বেদনা দিগ্‌-বালিকারা কী যেন কাঁদনি শোনে !
কাঁদিছে ধরার তরুলতা-পাতা, কাঁদিতেছে পশু-পাখি,
ধরার ইন্দ্র স্বর্গে চলেছে ধূলির মহিমা মাখি।
বাজে আনন্দ-মৃদঙ্গ গগনে, তড়িৎ-কুমারী নাচে,
মর্ত-ইন্দ্র বসিবে গো আজ স্বর্গ-ইন্দ্র কাছে !
সপ্ত-আকাশ-সপ্তস্বরা হানে ঘন করতালি,
কাঁদিছে ধরায় তাহারি প্রতিধ্বনি—খালি, সব খালি !

হায় অসহায় সর্বংসহা মৌনা ধরণী মাতা,
শুধু দেব-পূজা তরে কি মা তোর পুষ্প হরিৎ-পাতা ?
তোর বুকে কি মা চির-অতৃপ্ত রবে সন্তান-ক্ষুধা ?

তোমার মাটির পাত্রে কি গো মা ধরে না অমৃত-সুধা
জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে-কেহ আনিবে অমৃত-বারি,
অমৃত-অধিপ দেবতার রোষ পড়িবে কি শিরে তারি?
হয়তো তাহাই, হয়তো নহে তা, —এটুকু জেনেছি খাঁটি,
তারে স্বর্গের আছে প্রয়োজন, যারে ভালোবাসে মাটি।

কাঁটার মৃণালে উঠেছিল ফুটে যে চিত্ত-শতদল,
শোভেছিল যাহে বাণী কমলার রক্ত-চরণ-তল,
সম্ভ্রমে-নত পূজারী মৃত্যু ছিঁড়িল সে-শতদলে—
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অর্পিবে বলি নারায়ণ-পদতলে!
জানি জানি মোরা, শঙ্খ-চক্র-গদা যাঁর হাতে শোভে—
পায়ের পদ্ম হাতে উঠে তাঁর অমর হইয়া রবে।
কত সান্ত্বনা-আশা-মরীচিকা কত বিশ্বাস-দিশা
শোক-সাহারায় দেখা দেয় আসি, মেটে না প্রাণের তৃষা!
দুলিছে বাসুকি মণিহারা ফণি, দুলে সাথে বসুমতী,
তাহার ফণার দিন-মণি আজ কোন গ্রহে দেবে জ্যোতি!

জাগিয়া প্রভাতে হেরিনু আজিকে জগতে সুপ্রভাত,
শয়তানও আজ দেবতার নামে করিছে নান্দীপাঠ!
হে মহাপুরুষ, মহাবিদ্রোহী, হে ঋষি, সোহম-স্বামী!
তব ইঙ্গিতে দেখেছি সহসা সৃষ্টি গিয়াছে থামি,
থমকি গিয়াছে গতির বিশ্ব চন্দ্র-সূর্য-তারা,
নিয়ম ভুলেছে কঠোর নিয়তি, দৈব দিয়াছে সাড়া।

যখনি স্রষ্টা করিয়াছে ভুল, করেছ সংস্কার,
তোমারি অগ্রে স্রষ্টা তোমারে করেছে নমস্কার!
ভৃগুর মতন যখনি দেখেছ অচেতন নারায়ণ,
পদাঘাতে তাঁর এনেছ চেতনা, কেঁপেছে জগজ্জন!
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা বক্ষে তব পদ-চিন্ ধরি
হাঁকিছেন, 'আমি এমন করিয়া সত্য স্বীকার করি!
জাগাতে সত্য এত ব্যাকুলতা এত অধিকার যার,
তাহার চেতন-সত্যে আমার নিযুত নমস্কার!'

আজ শুধু জাগে তব অপরূপ সৃষ্টি-কাহিনী মনে,
তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ বাণীর কমল-বনে!

কখন তোমার বীণা ছেয়ে গেল সোনার পদ্ম-দলে,
হেরিনু সহসা ত্যাগের তপন তোমার ললাট-তলে !
লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী,
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি কণ্ঠে গরল দানি,
বিষ্ণু দিলেন ভাঙনের গদা, যশোদা-দুলাল বাঁশি,
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, মৃগাঙ্ক দিল হাসি।
চীর গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত-জননী কাঁদি,
প্রতাপ-শিবাজি দানিল মন্ত্র, দিল উষ্ণীষ বাঁধি।
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মন্দার-মালা, মানব মাখাল ধূলি।
নিখিল-চিত্ত-রঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি—
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী !
হিমালয় হতে বিপুল বিরাট, উদার আকাশ হতে,
বাধা-কুঞ্জর তৃণ-সম ভেসে গেল তব প্রাণ-স্রোতে !

ছন্দ-গানের অতীত হে ঋষি, জীবনে পারিনি তাই
বন্দিতে তোমা আজ আনিয়াছি চিত্ত-চিতার ছাই !
বিভূতি-তিলক। কৈলাস হতে ফিরেছ গরল পি'য়া,
এনেছি অর্ঘ্য শ্মশানের কবি ভস্ম-বিভূতি নিয়া !
নাও অঞ্জলি, অঞ্জলি নাও, আজ আনিয়াছি গীতি,—
সারা জীবনের না-কওয়া-কথার ক্রন্দন-নীরে তিতি !
এত ভালো মোরে বেসেছিলে তুমি, দাওনিকো অবসর
আমারেও ভালোবাসিবার, আজ তাই কাঁদে অন্তর !

আজিকে নিখিল-বেদনার কাছে মোর ব্যথা কতটুক,
ভাবিয়া ভাবিয়া সান্ত্বনা খুঁজি, তবু হা হা করে বুক !
আজ ভারতের ইন্দ্র-পতন, বিশ্বের দুর্দিন,
পাষাণ বাংলা পড়ে এককোণে স্তব্ধ অশ্রুহীন।
তারি মাঝে হিয়া থাকিয়া থাকিয়া গুমরি গুমরি ওঠে,
বক্ষের বাণী চক্ষের জলে ধুয়ে যায়, নাহি ফোটে !
দীনের বন্ধু, দেশের বন্ধু, মানব-বন্ধু তুমি,
চেয়ে দেখো আজ লুটায় বিশ্ব তোমার চরণ চুমি।
গগনে তেমনি ঘনায়েছে মেঘ, তেমনি ঝরিছে বারি,
বাদলে ভিজিয়া শত স্মৃতি তবে হয়ে আসে ঘন ভারি।

পয়গম্বর ও অবতার-যুগে জন্মিনি মোরা কেহ,
দেখিনিকো মোরা তাঁদের, দেখিনি দেবের জ্যোতির্দেহ।
কিন্তু যখনি বসিতে পেয়েছি তোমার চরণ-তলে,
না জানিতে কিছু না বুঝিতে কিছু নয়ন ভরেছে জলে।
সারা প্রাণ যেন অঞ্জলি হয়ে ও-পায়ে পড়েছে লুটি,
সকল গর্ব উঠেছে মধুর প্রণাম হইয়া ফুটি।
বুদ্ধের ত্যাগ শুনেছি মহান, দেখিনিকো চোখে তাহে,
নাহি আফসোস, দেখেছি আমরা ত্যাগের শাহানশাহে।
নিমাই লইল সন্ন্যাস প্রেমে, দিইনিকো তাঁরে ভেট,
দেখিয়াছি মোরা 'রাজা-সন্ন্যাসী' প্রেমের জগৎ-শেঠ !

শুনি, পরার্থে প্রাণ দিয়া দিল অস্থি বনের ঋষি ;
হিমালয় জানে, দেখেছি দধীচি গৃহে বসে দিবানিশি !
হে নবযুগের হরিশ্চন্দ্র ! সাড়া দাও, সাড়া দাও !
কাঁদিছে শ্মশানে সুত-কোলে সতী, রাজর্ষি ফিরে চাও !
রাজকুলমান পুত্র-পত্নী সকল বিসর্জিয়া
চণ্ডাল বেশে ভারত-শ্মশানে ছিলে একা আগুলিয়া !
এস সন্ন্যাসী, এস সম্রাট, আজি সে শ্মশান-মাঝে,
ঐ শোনো তব পুণ্যে জীবন-শিশুর কাঁদন বাজে !

দাতাকর্ণের সম নিজ সুতে কারাগার-যূপে ফেলে
ত্যাগের করাতে কাটিয়াছ বীর বারেবারে অবহেলে !
ইবরাহিমের মতো বাচ্চার গলে খঞ্জর দিয়া
কোরবানি দিলে সত্যের নামে, হে মানব নবি-হিয়া !
ফেরেশ্‌তা সব করিছে সালাম, দেবতা নোয়ায় মাথা,
ভগবান-বুকে মানবের তরে শ্রেষ্ঠ আসন পাতা !

প্রজা-রঞ্জন রাম-রাজা দিল সীতারে বিসর্জন,
তাঁরও হয়েছিল যজ্ঞে স্বর্ণ-জানকীর প্রয়োজন ;
তব ভাণ্ডার-লক্ষ্মীরে রাজা নিজ হাতে দিলে তুলি
ক্ষুধা-তৃষাতুর মানবের মুখে, নিজে নিলে পথ-ধূলি
হেম-লক্ষ্মীর তোমারও জীবন-যাগে ছিল প্রয়োজন,
পুড়িলে যজ্ঞে, তবু নিলে নাকো দিলে যা বিসর্জন !
তপোবলে তুমি অর্জিলে তেজ বিশ্বামিত্র-সম,
সারা বিশ্বের ব্রাহ্মণ তাই বন্দিছে নমো নমো !

হে যুগ-ভীষ্ম ! নিন্দার শরশয্যায় তুমি শুয়ে
বিশ্বের তরে অমৃত-মন্ত্র বীর-বাণী গেলে থুয়ে !
তোমার জীবনে বলে গেলে—ওগো কল্কি আসার আগে
অকল্যাণের কুরুক্ষেত্রে আজো মাঝে মাঝে জাগে
চির-সত্যের পাঞ্চজন্য, কৃষ্ণের মহাগীতা,
যুগে যুগে কুরু-মেদ-ধূমে জ্বলে অত্যাচারের চিতা !
তুমি নব ব্যাস, গেলে নবযুগ-জীবন-ভারত রচি,
তুমিই দেখালে—ইন্দ্রেরই তরে পারিজাত-মালা শচী !
আসিলে সহসা অত্যাচারীর প্রাসাদ-স্তম্ভ টুটি
নব-নৃসিংহ-অবতার তুমি, পড়িল বক্ষে লুটি
আর্ত-মানব-হৃদি-প্রহ্লাদ, পাগল মুক্তি-প্রেমে !
তুমি এসেছিলে জীবন-গঙ্গা তৃষাতুর তরে নেমে !
দেবতারা তাই স্তম্ভিত হেরো দাঁড়ায়ে গগন-তলে,
নিমাই তোমারে ধরিয়াছে বুকে, বুদ্ধ নিয়াছে কোলে !

তোমারে দেখিয়া কাহারো হৃদয়ে জাগেনিকো সন্দেহ
হিন্দু কিংবা মুসলিম তুমি অথবা অন্য কেহ।
তুমি আর্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি,
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি !
হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজিব,
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শিব !
নিন্দা-গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া, পাগল, মিলন-হেতু
হিন্দু-মুসলমানের পরানে তুমিই বাঁধিলে সেতু !
জানি না আজিকে কি অর্ঘ্য দেবে হিন্দু-মুসলমান,
ঈর্ষা-পঙ্কে পঙ্কজ হয়ে ফুটুক এদের প্রাণ !

হে অরিন্দম, মৃত্যুর তীরে করেছ শত্রু জয়,
প্রেমিক ! তোমার মৃত্যু-শ্মশান আজিকে মিত্রময় !
তাই দেখি, যারা জীবনে তোমায় দিল কন্টক-হুল,
আজ তাহারাই এনেছে অর্ঘ্য নয়ন-পাতার ফুল !
কি যে ছিলে তুমি, জানি নাকো কেহ, দেবতা কি আউলিয়া,
শুধু এই জানি, হেরি আর কারে ভরেনি এমন হিয়া।

আজি দিকে দিকে বিপ্লব-অহিদল খুঁজে ফেরে ডেরা,
তুমি ছিলে এই নাগ-শিশুদের ফণি-মনসার বেড়া !

তুমিই রাজার ঐরাবতের পদতল হতে তুলে
বিষ্ণু-শ্রীকর-অরবিন্দরে আবার শ্রীকরে থুলে !
তুমি দেখেছিলে ফাঁসির গোপীতে বাঁশির গোপীমোহন
রক্ত-যমুনা-কূলে রচে গেলে প্রেমের বৃন্দাবন !
তোমার ভগ্ন চাকায় জড়ায়ে চালায়েছে এরা রথ,
আপন মাথার মানিক জ্বালায়ে দেখায়েছে রাতে পথ !
আজ পথ-হারা আশ্রয়হীন তাহারা যে মরে ঘুরে,
গুহা-মুখে বসি ডাকিছে সাপুড়ে মারণ-মন্ত্র সুরে !

যেদিকে তাকাই কূল নাহি পাই, অকূল হতাশ্বাস,
কোন শাপে ধরা স্বরাজ-রথের চক্র করিল গ্রাস ?
যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে রণে পড়িল সব্যসাচী,
ঐ হেরো, দূরে কৌরব-সেনা উল্লাসে ওঠে নাচি।
হিমালয় চিরে আগ্নেয়-যান চিৎকার করি ছুটে,
শত ক্রন্দন-গঙ্গা যেন গো পড়িছে পিছনে টুটে !
স্তব্ধ-বেদনা গিরিরাজ ভয়ে জলদে লুকায় কায়—
নিখিল-অশ্রু-সাগর বুঝি-বা তাহারে ডুবাতে চায় !
টুটিয়াছে আজ গর্ব তাহার, লাজে নত উঁচু শির,
ছাপি হিমাদ্রি উঠিছে প্রণাম সমগ্র পৃথিবীর !
ধূর্জটি-জটা-বাহিনী গঙ্গা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলে,
তারি নিচে চিতা—যেন গো শিবের ললাটে অগ্নি জ্বলে !

মৃত্যু আজিকে হইল অমর পরশি তোমার প্রাণ,
কালো মুখ তার হলো আলোময়, শ্মশানে উঠিছে গান।
অগুরু-পুষ্প-চন্দন পুড়ে হলো সুগন্ধতর,
হলো শুচিতর অগ্নি আজিকে, শব হলো সুন্দর !
ধন্য হইল ভাগীরথী-ধারা তব চিতা-ছাই, মাখি,
সমিধ হইল পবিত্র আজি কোলে তব দেহ রাখি।

অসুর-নাশিনী জগন্মাতার অকাল উদ্বোধনে
আঁখি উপাড়িতে গেছিলেন রাম, আজিকে পড়িছে মনে,
রাজর্ষি ! আজি জীবন উপাড়ি দিলে অঞ্জলি তুমি,
দনুজ-দলনী জাগে কিনা—আছে চাহিয়া ভারত-ভূমি !

হুগলি
১১ই আষাঢ় ১৩৩২

রাজ-ভিখারি

কোন ঘর-ছাড়া বিবাগীর বাঁশি শুনে উঠেছিলে জাগি,
ওগো চির-বৈরাগী!
দাঁড়ালে ধূলায় তবে কাঞ্চন-কমল-কানন ত্যাগি—
ওগো-চির-বৈরাগী!

ছিলে ঘুম-ঘোরে রাজার দুলাল,
জানিতে না কে সে পথের কাঙাল
ফেরে পথে পথে ক্ষুধাতুর-সাথে ক্ষুধার অন্ন মাগি,
তুমি সুধার দেবতা 'ক্ষুধা' 'ক্ষুধা' বলে কাঁদিয়া উঠিলে জাগি—
ওগো-চির-বৈরাগী!

আঙিয়া তোমার নিলে বেদনার গৈরিক-রঙে রেঙে,
মোহ-ঘুমপুরী উঠিল শিহরি চমকিয়া ঘুম ভেঙে!
জাগিয়া প্রভাতে হেরে পুরবাসী
রাজা দ্বারে দ্বারে ফেরে উপবাসী,
সোনার অঙ্গ পথের ধূলায় বেদনার দাগে দাগী!
কে গো নারায়ণ, নররূপে এলে নিখিল-বেদনা-ভাগী—
ওগো-চির-বৈরাগী!

'দেহি ভবতি ভিক্ষাম্' বলি দাঁড়ালে রাজ-ভিখারি,
খুলিল না দ্বার, পেলে না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী!
বলিলে, 'দেবে না? লহ তবে দান
ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ!'—
দিল না ভিক্ষা, নিল নাকো দান, ফিরিয়া চলিলে যোগী!
যে-জীবন কেহ লইল না তাহা মৃত্যু লইল মাগি॥

হুগলি
১৭ই আষাঢ় ১৩৩২

সাম্যবাদী

সাম্যবাদী

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি?—পার্সি, জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভিল, গারো?
কন্‌ফুসিয়াস্? চার্বাক-চেলা? বলে যাও, বলো আরো!
বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক—
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও যত শখ,—
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?—পথে ফোটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখো নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফেরো দেবতা-ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!
বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।

এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হলো মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা।

এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।

ঈশ্বর

কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ-পাতাল জুড়ে?
কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে?
হায় ঋষি-দরবেশ,
বুকের মানিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজো তারে দেশ-দেশ!
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছো চোখ বুঁজে,
স্রষ্টারে খোঁজো—আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে!
ইচ্ছা-অন্ধ! আঁখি খোলো, দেখো দর্পণে নিজ-কায়া,
দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।
শিহরি উঠো না, শাস্ত্রবিদেরে করো নাকো বীর, ভয়,—
তাহারা খোদার খোদ্ প্রাইভেট সেক্রেটারি তো নয়!
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি!
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি!
রত্ন লইয়া বেচা-কেনা করে বণিক সিন্ধু-কূলে—
রত্নাকরের খবর তা বলে পুছো না ওদেরে ভুলে।
উহারা রত্ন-বেনে,
রত্ন চিনিয়া মনে করে ওরা রত্নাকরেও চেনে!
ডুবে নাই তারা অতল গভীর রত্ন-সিন্ধুতলে,
শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা, সত্য-সিন্ধু-জলে।

মানুষ

গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্ !
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।—
'পূজারী, দুয়ার খোলো,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হলো !'
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয় !—
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনিকো সাত দিন।'
সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে !
ভুখারি ফুকারি কয়,
ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয় !

মসজিদে কাল শিরনি আছিল, অঢেল গোস্ত-রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটিকুটি !
এমন সময় এল মুসাফির গায়ে আজারির চিন,
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা-ফাঁকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন !'
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা—'ভ্যালা হলো দেখি লেঠা,
ভুখা আছো মরো গো-ভাগাড়ে গিয়ে ! নামাজ পড়িস বেটা ?'
ভুখারি কহিল, 'না বাবা !' মোল্লা হাঁকিল, —'তাহলে শালা,
সোজা পথ দেখ !' গোস্ত-রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা !
ভুখারি ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে—
'আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা বলে বন্ধ করোনি প্রভু !
তব মসজিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি,
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি !'

কোথা চেঙ্গিস, গজনি-মামুদ, কোথায় কালাপাহাড় ?
ভেঙে ফেল্ ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া-দ্বার !
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা ?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি-শাবল চালা !
হায় রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয় !
মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি
ও মুখ হইতে কেতাব-গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে।
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল !—মূর্খরা সব শোনো,
মানুষে এনেছে গ্রন্থ ; —গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো !
আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর, —বিশ্বের সম্পদ,
আমাদেরি এঁরা পিতা পিতামহ, এই আমাদের মাঝে
তাঁদেরি রক্ত কম-বেশি করে প্রতি ধমনিতে রাজে।
আমরা তাঁদেরি সন্তান, জ্ঞাতি, তাঁদেরি মতন দেহ,
কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ।
হেসো না বন্ধু ! আমার আমি সে কত অতল অসীম,
আমিই কি জানি কে জানে কে আছে আমাতে মহামহিম।
হয়তো আমাতে আসিছে কল্কি, তোমাতে মেহেদি ঈসা,
কে জানে কাহার অন্ত ও আদি, কে পায় কাহার দিশা ?
কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি ?
হয়তো উহারই বুকে ভগবান জাগিছেন দিবারাতি !
অথবা হয়তো কিছুই নহে সে, মহান উচ্চ নহে,
আছে ক্লেদাক্ত ক্ষত-বিক্ষত পড়িয়া দুঃখ-দহে,
তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয় !
হয়তো ইহারই ঔরসে ভাই ইহারই কুটির-বাসে
জন্মিছে কেহ—জোড়া নাই যার জগতের ইতিহাসে !
যে বাণী আজিও শোনেনি জগৎ, যে মহাশক্তিধরে
আজিও বিশ্ব দেখেনি, —হয়তো আসিছে সে এরই ঘরে !

ও কে ? চণ্ডাল ? চমকাও কেন ? নহে ও ঘৃণ্য জীব !
ওই হতে পারে হরিশ্চন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।

আজ চণ্ডাল কাল হতে পারে মহাযোগী-সম্রাট,
তুমি কাল তারে অর্ঘ্য দানিবে, করিবে নান্দীপাঠ।
রাখাল বলিয়া কারে করো হেলা, ও-হেলা কাহারে বাজে!
হয়তো গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল-সাজে!
চাষা বলে করো ঘৃণা!
দেখো চাষা-রূপে লুকায়ে জনক বলরাম এল কি না!
যত নবি ছিল মেষের রাখাল, তারাও ধরিল হাল,
তারাই আনিল অমর বাণী—যা আছে রবে চিরকাল।
দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারি ও ভিখারিনী,
তারি মাঝে কবে এল ভোলা-নাথ গিরিজায়া, তা কি চিনি!
তোমার ভোগের হ্রাস হয় পাছে ভিক্ষা-মুষ্টি দিলে,
দ্বারী দিয়ে তাই মার দিয়ে তুমি দেবতারে খেদাইলে।
সে মার রহিল জমা—
কে জানে তোমায় লাঞ্ছিতা দেবী করিয়াছে কি না ক্ষমা!
বন্ধু, তোমার বুক-ভরা লোভ দু'চোখে স্বার্থ-ঠুলি,
নতুবা দেখিতে, তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে কুলি।
মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা, বেদনা-মথিত-সুধা,
তাই লুটে তুমি খাবে পশু? তুমি তা দিয়ে মিটাবে ক্ষুধা?
তোমার ক্ষুধার আহার তোমার মন্দোদরীই জানে
তোমার মৃত্যু-বাণ আছে তব প্রাসাদের কোনোখানে!
তোমারি কামনা-রানি
যুগে যুগে, পশু, ফিরেছে তোমায় মৃত্যু-বিবরে টানি।

পাপ

সাম্যের গান গাই!—
যত পাপী-তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।
এ পাপ-মুলুকে পাপ করেনিকো কে আছে পুরুষ-নারী?
আমরা তো ছার; —পাপে পঙ্কিল পাপীদের কাণ্ডারি!
তেত্রিশ কোটি দেবতার পাপে স্বর্গ সে টলমল,
দেবতার পাপ-পথ দিয়া পশে স্বর্গে অসুর দল!

আদম হইতে শুরু করে এই নজরুল তক্ সবে
কম-বেশি করে পাপের ছুরিতে পুণ্যে করেছে জবেহ্।
বিশ্ব পাপস্থান
অর্ধেক এর ভগবান, আর অর্ধেক শয়তান!
ধর্মান্ধরা শোনো!
অন্যের পাপ গনিবার আগে নিজেদের পাপ গোনো!
পাপের পঙ্কে পুণ্য-পদ্ম, ফুলে ফুলে হেথা পাপ!
সুন্দর এই ধরা-ভরা শুধু বঞ্চনা অভিশাপ।
এদের এড়াতে না পারিয়া যত অবতার আদি কেহ
পুণ্যে দিলেন আত্মা ও প্রাণ, পাপেরে দিলেন দেহ।
বন্ধু, কহিনি মিছে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হতে ধরে ক্রমে নেমে এস নিচে—
মানুষের কথা ছেড়ে দাও, যত ধ্যানী মুনি ঋষি যোগী
আত্মা তাঁদের ত্যাগী তপস্বী, দেহ তাঁহাদের ভোগী!
এ দুনিয়া পাপশালা,
ধর্ম-গাধার পৃষ্ঠে এখানে শূন্য পুণ্য-ছালা।
হেথা সবে সম পাপী
আপন পাপের বাটখারা দিয়ে অন্যের পাপ মাপি!
জবাবদিহির কেন এত ঘটা যদি দেবতাই হও,
টুপি পরে টিকি রেখে সদা বলো যেন তুমি পাপী নও!
পাপী নও যদি কেন এ ভড়ং ট্রেড্‌মার্কার ধুম্?
পুলিশি পোশাক পরিয়া হয়েছ পাপের আসামি গুম্!

বন্ধু, একটা মজার গল্প শোনো,
একদা অপাপ ফেরেশ্‌তা সব স্বর্গ-সভায় কোনো
এই আলোচনা করিতে আছিল বিধির নিয়মে দুষি—
দিন রাত নাই এত পূজা করি এত করে তাঁরে তুষি
তবু তিনি যেন খুশি নন্—তাঁর যত স্নেহ দয়া ঝরে
পাপ-আসক্ত কাদা ও মাটির মানুষ জাতিরই 'পরে!
শুনিলেন সব অন্তর্যামী, হাসিয়া সবারে কন,—
মলিন ধুলার সন্তান ওরা বড় দুর্বল মন,
ফুলে ফুলে সেথা ভুলের বেদনা—নয়নে, অধরে শাপ,
চন্দনে সেথা কামনার জ্বালা, চাঁদে চুম্বন-তাপ!
সেথা কামিনীর নয়নে কাজল, শ্রোণীতে চন্দ্রহার,
চরণে লাক্ষা, ঠোঁটে তাম্বুল, দেখে মরে আছে মার!

প্রহরী সেখানে চোখা চোখ নিয়ে সুন্দর শয়তান,
বুকে বুকে সেথা বাঁকা ফুল-ধনু, চোখে চোখে ফুল-বাণ।
দেবদূত সব বলে, 'প্রভু, মোরা দেখিব কেমন ধরা,
কেমনে সেখানে ফুল ফোটে যার শিয়রে মৃত্যু-জরা !'
কহিলেন বিভু—'তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ যে দুইজন
যাক পৃথিবীতে, দেখুক কি ঘোর ধরণীর প্রলোভন !'
'হারুত' 'মারুত' ফেরেশতাদের গৌরব রবি-শশী
ধরার ধুলার অংশী হইল মানবের গৃহে পশি।—
কায়ায় কায়ায় মায়া বুলে হেথা ছায়ায় ছায়ায় ফাঁদ,
কমল-দিঘিতে সাতশো হয়েছে এক আকাশের চাঁদ !
শব্দ গন্ধ বর্ণ হেথায় পেতেছে অরূপ-ফাঁসি,
ঘাটে ঘাটে হেথা ঘট-ভরা হাসি, মাঠে মাঠে কাঁদে বাঁশি !
দু'দিনে আতশি ফেরেশতা-প্রাণ ভিজিল মাটির রসে,
শফরি-চোখের চটুল চাতুরি বুকে দাগ কেটে বসে।
ঘাঘরি ঝলকি গাগরি ছলকি নাগরী 'জোহরা' যায়—
স্বর্গের দূত মজিল সে রূপে বিকাইল রাঙা পা'য় !
অধর-আনার-রসে ডুবে গেল দোজখের নার-ভীতি
মাটির সোরাহি মস্তানা হলো আঙুরি খুনে তিতি !
কোথা ভেসে গেল সংযম-বাঁধ, বারণের বেড়া টুটে,
প্রাণ ভরে পিয়ে মাটির মদিরা ওষ্ঠ-পুষ্প-পুটে।
বেহেশ্‌তে সব ফেরেশ্‌তাদের বিধাতা কহেন হাসি—
'হারুত মারুতে কি করেছে দেখো ধরণী সর্বনাশী !'
নয়না এখানে জাদু জানে সখা এক আঁখি-ইশারায়
লক্ষ যুগের মহা তপস্যা কোথায় উবিয়া যায়।
সুন্দর বসুমতী
চিরযৌবনা, দেবতা ইহার শিব নয়—কাম রতি !

চোর-ডাকাত

কে তোমায় বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে ?
চারিদিকে বাজে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরি রাজ্য চলে !

চোর-ডাকাতের করিছে বিচার কোন সে ধর্মরাজ?
জিজ্ঞাসা করো, বিশ্ব জুড়িয়া কে নহে দস্যু আজ?
বিচারক! তব ধর্মদণ্ড ধরো,
ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছে বড়!
যারা যত বড় ডাকাত-দস্যু জোচ্চোর দাগাবাজ
তারা তত বড় সম্মানী গুণী জাতি-সঙ্ঘেতে আজ।
রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত-ইঁটে,
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে।
দিব্যি পেতেছ খল কলও'লা মানুষ-পেষানো কল,
আখ-পেষা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারি মানব-দল!
কোটি মানুষের মনুষ্যত্ব নিঙাড়িয়া কলওয়ালা
ভরিছে তাহার মদিরা-পাত্র, পুরিছে স্বর্ণ-জালা!
বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া ফোলে মহাজন-ভুঁড়ি
নিরন্নদের ভিটে নাশ করে জমিদার চড়ে জুড়ি!
পেতেছে বিশ্বে বণিক-বৈশ্য অর্থ-বেশ্যালয়,
নিচে সেথা পাপ-শয়তান-সাকি, গাহে যক্ষের জয়!
অন্ন, স্বাস্থ্য, প্রাণ, আশা, ভাষা হারায়ে সকল-কিছু,
দেউলিয়া হয়ে চলেছে মানব ধ্বংসের পিছু পিছু।
পালাবার পথ নাই,
দিকে দিকে আজ অর্থ-পিশাচ খুঁড়িয়াছে গড়খাই।
জগৎ হয়েছে জিন্দানখানা, প্রহরী যত ডাকাত—
চোরে-চোরে এরা মাসতুতো ভাই, ঠগে ও ঠগে স্যাঙাৎ।
কে বলে তোমায় ডাকাত, বন্ধু, কে বলে করিছ চুরি?
চুরি করিয়াছ টাকা ঘটি বাটি, হৃদয়ে হানোনি ছুরি!
ইহাদের মতো অমানুষ নহ, হতে পারো তস্কর,
মানুষ দেখিলে বাল্মীকি হও তোমরা রত্নাকর!

বারাঙ্গনা

কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে?
হয়তো তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে।

নাই হলে সতী তবু তো তোমরা মাতা-ভগিনীরই জাতি ;
তোমাদের ছেলে আমাদেরই মতো, তারা আমাদের জ্ঞাতি ;
আমাদেরই মতো খ্যাতি-যশ-মান তারাও লভিতে পারে,
তাদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ-দ্বারে।—
স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী-পুত্র হলো মহাবীর দ্রোণ
কুমারীর ছেলে বিশ্ব-পূজ্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন,
কানীন-পুত্র কর্ণ হইল দানবীর মহারথী,
স্বর্গ হইতে পতিতা গঙ্গা শিবেরে পেলেন পতি,
শান্তনু রাজা নিবেদিল প্রেম পুন সেই গঙ্গায়—
তাঁদেরি পুত্র অমর ভীষ্ম, কৃষ্ণ প্রণমে যাঁয় !
মুনি হলো শুনি সত্যকাম সে জারজ জবালা-শিশু,
বিস্ময়কর জন্ম যাঁহার—মহাপ্রেমিক সে যিশু !—
কেহ নহে হেথা পাপ-পঙ্কিল, কেহ সে ঘৃণ্য নহে,
ফুটিছে অযুত বিমল কমল কামনা-কালিয়-দহে।
শোনো মানুষের বাণী,
জনমের পর মানব জাতির থাকে নাকো কোনো গ্লানি !
পাপ করিয়াছ বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার ?
শত পাপ করি হয়নি ক্ষুণ্ণ দেবত্ব দেবতার।
অহল্যা যদি মুক্তি লভে মা, মেরী হতে পারে দেবী,
তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা বিমল সত্য সেবি ?
তব সন্তানে জারজ বলিয়া কোন গোঁড়া পাড়ে গালি ?
তাহাদেরে আমি এই দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি খালি—
দেবতা গো জিজ্ঞাসি—
দেড়শত কোটি সন্তান এই বিশ্বের অধিবাসী—
কয়জন পিতামাতা ইহাদের হয়ে নিষ্কাম ব্রতী
পুত্রকন্যা কামনা করিল ? কয়জন সৎ-সতী ?
ক'জন করিল তপস্যা ভাই সন্তান-লাভ তরে ?
কার পাপে কোটি দুধের বাচ্চা আঁতুড়ে জন্মে মরে ?
সেরেফ্ পশুর ক্ষুধা নিয়া হেথা মিলে নরনারী যত,
সেই কামনার সন্তান মোরা ! তবুও গর্ব কত !
শোনো ধর্মের চাঁই—
জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই !

অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ-পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয় !

মিথ্যাবাদী

মিথ্যা বলেছ বলিয়া তোমায় কে দিল মনস্তাপ ?
সত্যের তরে মিথ্যা যে বলে স্পর্শে না তারে পাপ।
গোটা সত্যটা শুধু তো সত্য কথা বলাতেই নাই,
মিথ্যা কয়েও সত্যনিষ্ঠ হতে পারি আমরাই !
সত্যবাক্ সে বড় কিছু নয়, ক'জন সত্যবান্ ?
সত্যবাদীরা ক'জন দিয়াছে সত্যের তরে প্রাণ ?
অন্তরে যারা যত বেশি ভীরু যত বেশি দুর্বল,
নীতিবিদ্, তারা তত বেশি করে সত্য-কথন ছল।
সত্যকামেরও নমস্য যারা সত্যনিষ্ঠ বীর—
সত্যের তরে হাসিতে হাসিতে যারা দিল নিজ শির !
হয়তো তাহারা অনেক মিথ্যা বলেছে জীবন ভরে,
তবু তারা বীর—তারা দিল প্রাণ সত্য-রক্ষা তরে।
সত্য লইয়া করিছে ওজন কে উনি মুদির মতো ?
মনে মনে ভাবে কি কাজই করিনু আমি সে বিজ্ঞ কত !
বলি ওহে বাপু সত্য-ব্যাপারি, সত্য কি চাল ডাল ?
কোথা কয় রতি সত্য কমিল, তাই নিয়ে দেবে গাল !
সত্য মুদির তথ্য :—
অমুক বীরের জীবনে কমেছে হুঁ হুঁ এতটুকু সত্য !
ও কে আসে বাবা ? সত্যেরে তবু এরা মাপে, ও যে গণে।
দশটি কথায় বাঁধিল সত্য, হেসে মরি মনে মনে !
বাটখারা আর রশি নিয়ে এল সত্যের পিসি-মাসি,
মাপিয়া মাপিয়া ভরিল বস্তা, গুনে গুনে বাঁধে খাসি।
বন্ধু, শুনো না কূট-তর্কের যত হাতি ঘোড়া উট,
সত্যনিষ্ঠা থাকে যদি প্রাণে, বেপরোয়া বলো ঝুট !

নারী

সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা করে নারী হেয়-জ্ঞান?
তারে বলো, আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর-শয়তান।
অথবা পাপ যে—শয়তান যে—নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে।
এ-বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মোমতাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান।
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,
সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।
পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,
কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ।
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ,
পুরুষ এসেছে মরুতৃষা লয়ে, নারী জোগায়েছে মধু।
শস্যক্ষেত্র উর্বর হলো, পুরুষ চালাল হল,
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।
নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শীষে।

স্বর্ণ-রৌপ্যভার
নারীর অঙ্গ-পরশ লভিয়া হয়েছে অলঙ্কার।
নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।

নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা, সুধায় ক্ষুধায় মিলে
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে।
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।
রাজা করিতেছে রাজ্য-শাসন, রাজারে শাসিছে রানি,
রানির দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি।
পুরুষ হৃদয়হীন,
মানুষ করিতে নারী দিল তারে আধেক হৃদয় ঋণ।
ধরায় যাঁদের যশ ধরে নাকো অমর মহামানব,
বরষে বরষে যাঁদের স্মরণে করি মোরা উৎসব,
খেয়ালের বশে তাঁদের জন্ম দিয়াছে বিলাসী পিতা।
লব-কুশে বনে ত্যাজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা!
নারী সে শিখাল শিশু-পুরুষেরে স্নেহ প্রেম দয়া মায়া,
দীপ্ত নয়নে পরাল কাজল বেদনার ঘন ছায়া।
অদ্ভুতরূপে পরুষ পুরুষ করিল সে ঋণ শোধ,
বুকে করে তারে চুমিল যে, তারে করিল সে অবরোধ!
তিনি নর-অবতার—
পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন হানি কুঠার!
পার্শ্ব ফিরিয়া শুয়েছেন আজ অর্ধনারীশ্বর—
নারী চাপা ছিল এতদিন, আজ চাপা পড়িয়াছে নর!
সে-যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাকো, নারীরা আছিল দাসী!
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দি কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দি, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে!
যুগের ধর্ম এই—
পীড়ন করিলে সে-পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই!
শোনো মর্তের জীব!
অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব!

স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুরীতে নারী
করিল তোমায় বন্দিনী, বলো, কোন সে অত্যাচারী?
আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সেই ব্যাকুলতা,
আজ তুমি ভিরু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা!
চোখে চোখে আজ চাহিতে পারো না; হাতে রুলি, পায়ে মল
মাথায় ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেলো নারী, ভেঙে ফেলো ও-শিকল!
যে-ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভিরু ওড়াও সে আবরণ!
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ!

ধরার দুলালি মেয়ে!
ফিরো না তো গিরি-দরী-বনে পাখী-সনে গান গেয়ে।
কখন আসিল 'প্লুটো' যমরাজা নিশীথ-পাখায় উড়ে,
ধরিয়া তোমায় পুরিল তাহার আঁধার বিবর-পুরে।
সেই সে আদিম বন্ধন তব, সেই হতে আছো মরি
মরণের পুরে; নামিল ধরায় সেই দিন বিভাবরী।
ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মতো আয় মা পাতাল ফুঁড়ি!
আঁধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি!
পুরুষ যমের ক্ষুধার কুকুর মুক্ত ও পদাঘাতে
লুটায়ে পড়িবে ও চরণ-তলে দলিত যমের সাথে!
এতদিন শুধু বিলালে অমৃত, আজ প্রয়োজন যবে
যে হাতে পিয়ালে অমৃত, সে হাতে কূট বিষ দিতে হবে।
সেদিন সুদূর নয়—
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!

রাজা-প্রজা

সাম্যের গান গাই
যেখানে আসিয়া সম-বেদনায় সকলে হয়েছি ভাই।
এ প্রশ্ন অতি সোজা,
এক ধরণীর সন্তান, কেন কেউ রাজা, কেউ প্রজা?
অদ্ভুত দর্শন—
এই সোজা কথা বলি যদি ভাই, হবে তাহা সিডিশন।

প্রজা হয় শুধু রাজ-বিদ্রোহী, কিন্তু কাহারে কহি,
অন্যায় করে কেন হয় নাকো রাজাও প্রজাদ্রোহী!
প্রজারা সৃজন করেছে রাজায়, রাজা তো সৃজেনি প্রজা,
কৃতজ্ঞ রাজা তাই কি প্রজায় ধরে করে দিল খোজা?
বন্ধু হাসিছ চুটে,
আপনার ঘরে হয়ে আছি সব গোলাম নফর মুটে!

আপনার পুরুষত্ব অন্যে সঁপিয়া কি পেনু দাম?
আগলাতে রাজা-রাজ্য-হেরেম হয়েছি খোজা গোলাম!
এ ব্যথা কাহারে কই,
যার ঘর তার ঘর নয় আর নেপো মারে এসে দই!
যাদের লইয়া রাজ্য, রাজ্যে নাই তাহাদেরই দাবি,
রাজা-দেবতার অনন্ত ভোগ, আমরা খেতেছি খাবি!
এ নিয়ে নালিশ কার কাছে করি, জয় রাজাজি কি জয়!
আমাদের হয় সুবিচার, নাই রাজারই বিচারালয়!
গুরু গুরু বাজে যুদ্ধ-ডঙ্কা, দলে দলে ছুটে ছেলে,
হেসে বুক চিরে কল্‌সি কল্‌সি তাজা খুন দিল ঢেলে।
কলিজা-ছিদ্রে দীর্ঘশ্বাস ফুঁ দিয়া বাজায় শাঁখ,
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন-উলু, চালে চালে ওড়ে কাক;
প্রস্তুত হলো পথ—
বাজা, শাঁখ বাজা, ওই দেখো যায় জয়-লক্ষ্মীর রথ!
মাগো কাঁদ্ তোরা, আদুরি বোনেরা ধুলায় লুটায়ে পড়,
সিঁথায় সিঁদুর নাই দিলি বধূ, চল্ থেমে গেছে ঝড়।
ফেরেনি ছেলেরা, ফেরেনি ভাইরা? ফেরেনিকো পতি? ওরে,
দুঃখ কি? ওরা স্থান পেয়েছে যে জয়-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে!
আজিকে রাজ্যময়
শোকের তুফান ছাপাইয়া ওঠে—জয় রাজাজি কি জয়!
বাজা রে ডঙ্কা বাজা!
এতদিন পরে কেল্লা ছাড়িয়া বাহির হয়েছে রাজা!
নিহত আহত বীরেরে মাড়ায়ে ছুটেছে রাজার রথ,
যুদ্ধ-ফেরত খঞ্জ পঙ্গু পালা পালা ছাড়ো পথ!
বন্ধু, এমনি হয়—
জনগণ হলো যুদ্ধে বিজয়ী, রাজার গাহিল জয়।

প্রজারা জোগায় খোরাক-পোশাক, কি বিচার বলিহারি,
প্রজার কর্মচারী নন তাঁরা রাজার কর্মচারী !
মোদেরি বেতন-ভোগী চাকরেরে সালাম করিব মোরা,
ওরে 'পাব্‌লিক সারভেন্ট'দেরে আয় দেখে যাবি তোরা !
কালের চরকা ঘোর,
দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে—চড়ে দেড়শত চোর।
এ আশা মোদের দুরাশাও নয়, সেদিন সুদূরও নয়—
সমবেত রাজ-কণ্ঠে যেদিন শুনিব প্রজার জয় !

সাম্য

গাহি সাম্যের গান—
বুকে বুকে হেথা তাজা সুখ ফোটে, মুখে মুখে তাজা প্রাণ !
বন্ধু, এখানে রাজা-প্রজা নাই, নাই দরিদ্র-ধনী,
হেথা পায় নাকো কেহ ক্ষুদ-ঘাঁটা, কেহ দুধ-সর-ননী।
অশ্ব-চরণে মোটর-চাকায় প্রণমে না হেথা কেহ,
ঘৃণা জাগে নাকো সাদাদের মনে দেখে হেথা কালা-দেহ।
সাম্যবাদী-স্থান—
নাইকো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গোরস্থান।
নাইকো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গির্জা-ঘর,
নাইকো পাইক-বরকন্দাজ নাই পুলিশের ডর।
এই সে স্বর্গ, এই সে বেহেশ্‌ত, এখানে বিভেদ নাই,
যত হাতাহাতি হাতে হাত রেখে মিলিয়াছে ভাই ভাই !
নেইকো এখানে ধর্মের ভেদ শাস্ত্রের কোলাহল,
পাদরি-পুরুত-মোল্লা-ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।
হেথা স্রষ্টার ভজনা-আলয় এই দেহ এই মন,
হেথা মানুষের বেদনায় তাঁর দুখের সিংহাসন !
সাড়া দেন তিনি এখানে তাঁহারে যে নামে যে কেহ ডাকে,
যেমন ডাকিয়া সাড়া পায় শিশু যে নামে ডাকে সে মা'কে !
পায়জামা প্যান্ট্ ধুতি নিয়া হেথা হয় নাকো ঘুষাঘুষি,
ধুলায় মলিন দুখের পোশাকে এখানে সকলে খুশি।

কুলি-মজুর

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে !
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল ?
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবু সা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।
বেতন দিয়াছ ?—চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল !
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল্ !
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলো তো এ-সব কাহাদের দান ! তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা ? —ঠুলি খুলে দেখো, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জানো নাকো, কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে !
আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ !
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি ;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান !
তুমি শুয়ে রবে তেতালার 'পরে, আমরা রহিব নিচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে-ভরসা আজ মিছে !
সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতা-রসে
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে !
তারি পদরজ অঞ্জলি করি মাথায় লইব তুলি,
সকলের সাথে সাথে চলি যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি !

আজ নিখিলের বেদনা–আর্ত পীড়িতের মাখি খুন,
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ !
আজ হৃদয়ের জাম–ধরা যত কবাট ভাঙিয়া দাও,
রঙ–করা ঐ চামড়ার যত আবরণ খুলে নাও !
আকাশের আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,
মাতামাতি করে ঢুকুক এ বুকে, খুলে দাও যত খিল !
সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে
মোদের মাথায় চন্দ্র–সূর্য তারারা পড়ুক ঝরে !
সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি
এক মোহানায় দাঁড়াইয়া শোনো এক মিলনের বাঁশি।
একজনে দিলে ব্যথা
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।
একের অসম্মান
নিখিল মানব–জাতির লজ্জা—সকলের অপমান !

মহা–মানবের মহা–বেদনার আজি মহা–উত্থান,
ঊর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নিচে কাঁপিতেছে শয়তান !

পূবের হাওয়া

স্মরণে

আজ নতুন করে পড়ল মনে মনের মতনে
এই শাঙন-সাঁঝের ভেজা হাওয়ায় বারির পতনে॥

কার কথা আজ তড়িৎ-শিখায়
জাগিয়ে গেল আগুন-লিখায়,
ভোলা যে মোর দায় হলো হায়
বুকের রতনে।
এই শাঙন-সাঁঝের ভেজা হাওয়ায় বারির পতনে॥

আজ উতল ঝড়ের কাৎরানিতে গুমরে ওঠে বুক,
নিবিড় ব্যথায় মূক হয়ে যায় মুখর আমার মুখ।
জোলো হাওয়ার ঝাপটা লেগে
অনেক কথা উঠল জেগে,
পরান আমার বেড়ায় মেগে,
একটু যতনে।
এই শাঙন-সাঁঝের ভেজা হাওয়ায় বারির পতনে॥

বাদল-প্রাতের শরাব

বাদলা-কালো স্নিগ্ধা আমার কান্তা এল রিমঝিমিয়ে,
বৃষ্টিতে তার বাজল নূপুর পায়জোরেরই শিঞ্জিনী যে।
ফুটল উষার মুখটি অরুণ, ছাইল বাদল তাম্বু ধরায় ;
জমল আসর বর্ষা-বাসর, লাও সাকি লাও ভর-পিয়ালায়।
ভিজল কুঁড়ির বক্ষ-পরাগ হিম্-শিশিরের আমেজ পেয়ে,
হম্‌দম ! হরদম দাও মদ, মস্ত্ করো গজল গেয়ে !
ফেরদৌসের ঝরকা বেয়ে গুল-বাগিচায় চলছে হাওয়া,
এই তো রে ভাই ওক্ত খুশির, দ্রাক্ষারসে দিল্‌কে নাওয়া।
কুঞ্জে জরিন ফারসি ফরাস বিছিয়েছে আজ ফুলবালারা,
আজ চাই-ই চাই লাল্ শিরাজি স্বচ্ছ সরস খোর্মা-পারা !

মুক্তকেশী ঘোর নয়না আজ হবে গো কান্তা সাকি,
চুম্বন এবং মিষ্টি হাতের মদ পেতে তাই ভরসা রাখি।
কান্তা সাথে বাঁচতে জনম চাও যদি কওসর অমিয়,
সুর বেঁধে বীণ সারেঙ্গিতে খুব্‌সে শিরিন্‌ শরাব পিয়ো !
খুঁজবে যেদিন সিকান্দারের বাঞ্ছিত আব্‌-হায়াত-কুঁয়ায়,
সন্ধান তার মিলবে আশেক দিল্‌-পিয়ারার ওষ্ঠ-চুমায় !
খাম্‌খা তুমি মরছ কাজী শুষ্ক তোমার শাস্ত্র ঘেঁটে,
মুক্তি পাবে মদখোরের এই আল-কিমিয়ার পাত্র চেটে !

মানিনী

মূক করে ঐ মুখর মুখে লুকিয়ে রেখো না,
ওগো কুঁড়ি, ফোটার আগেই শুকিয়ে থেকো না !
নলিন নয়ান ফুলের বয়ান মলিন এ-দিনে
রাখতে পারে কোন সে কাফের আশেক বেদীনে ?
রুচির চারু পারুল বনে কাঁদছ একা জুঁই,
বনের মনের এ-বেদনা কোথায় বলো থুই ?
হাসির-রাশির একটি ফোঁটা অশ্রু অকরুণ,
হাজার তারা মাঝে যেন একটি কেঁদে খুন !
বেহেশ্‌তে কে আনলে এমন আবছা ব্যথার রেশ,
হিমের শিশির ছুঁয়ে গেছে হুর-পরিদের দেশ !
বরষ পরের দরশনের কই সে হরষণ,
মিলবে না কি শিথিল তোমার বাহুর পরশন ?
শরম টুটে ফুটুক কলি শিশির-পরশে,
ঘোমটা ঠেলে কুণ্ঠা ফেলে সলাজ হরষে।

আশা

মহান তুমি প্রিয়,
এই কথাটির গৌরবে মোর চিত্ত ভরে দিয়ো॥

অনেক আশায় বসে আছি যাত্রা-শেষের পর,
তোমায় নিয়েই পথের পারে বাঁধব আমার ঘর—
হে চির-সুন্দর!

পথশেষে সেই তোমায় যেন করতে পারি ক্ষমা,
হে মোর কলঙ্কিনী প্রিয়তমা!
সেদিন যেন বলতে পারি, এসো এসো প্রিয়,
বক্ষে এসো, এসো আমার পূত কমনীয়!

হায় হারানো লক্ষ্মী আমার! পথ ভুলেছ বলে
চির-সাথী যাবে তোমার মুখ ফিরিয়ে চলে?
জান্ ওঠে হায় মোচড় খেয়ে, চলতে পড়ি টলে
অনেক জ্বালায় জ্বলে প্রিয় অনেক ব্যথায় গলে!
বারেবারে নানা রূপে ছলতে আমায় শেষে,
কলঙ্কিনী! হাতছানি দাও সকল পথে এসে
কুটিল হাসি হেসে?
ব্যথায় আরো ব্যথা হানায় যে সে!

তুমি কি চাও তোমার মতোই কলঙ্কী হই আমি?
তখন তুমি সুদূর হতে আসবে ঘরে নামি—
হে মোর প্রিয়, হে মোর বিপথ-গামী!

পথের আজো অনেক বাকি,
তাই যদি হয় প্রিয়—
পথের শেষে তোমায় পাওয়ার যোগ্য করেই নিয়ো॥

হোলি

আয় ওলো সই, খেলব খেলা
ফাগের ফাজিল পিচকিরিতে।
আজ শ্যামে জোর করব ঘায়েল
হোরির সুরের গিটকিরিতে॥

বসন-ভূষণ ফেল লো খুলে,
দে দোল দে দোল দোদুল-দুলে,
কর্ লালে-লাল কালার কালো
আবির হাসির টিটকিরিতে।।

বে-শরম

আরে আরে সখি বারবার ছি ছি
ঠারত চঞ্চল আঁখির সাঁবলিয়া।
দুরু দুরু গুরু গুরু কাঁপত হিয়া উরু
হাথ্‌সে গির্ যায় কুঙ্কুম-থালিয়া।।

আরে না হোরি খেলব গোরি
আবির ফাগ দে পানি মে ডারি
হা প্যারী—
শ্যাম কি ফাগুয়া
লাল কি লুগুয়া
ছি ছি মোরি শরম ধরম সব হারি
মারে ছাতিয়া মে কুঙ্কুম বে-শরম বানিয়া।।

সোহাগ

গুলশন কো চুম চুম কহতে বুলবুল,
রুখ্‌সারা সে বে-দর্‌দি বোরকা খুল্!
হাঁস্তি হেয় বোস্তাঁ,
মস্ত হো যা দোস্তাঁ,
শিরী শিরাজি সে যা বেহোশ জাঁ।
সব্ কুছ্ আজ রঙ্গিন হেয়্ সব কুছ্ মশগুল,
হাঁস্তি হেয় গুল্ হো কর্ দোজখ্ বিল্‌কুল্।
হারে আশেক
মাশুক কি চম্‌নোঁও মে ফুল্‌তা নেই দোবারা ফুল
ফুল ফুল ফুল।।

শরাবন্ তহুরা

নার্গিস্‌–বাগ্ মে বাহার কি আগ্ মে ভরা দিল্ দাগ্ মে—
কাহাঁ মেরি পিয়ারা, আও আও পিয়ারা।
দুরু দুরু ছাতিয়া ক্যায়সে এ রাতিয়া কাটু বিনু সাথিয়া
ঘাবরায়ে জিয়ারা, তড়পত জিয়ারা॥

দরদে দিল্ জোর, রঙ্গিলা কওসর
শরাবন্ তহুরা লাও সাকি লাও ভর,
পিয়ালা তু ধর্ দে মস্তানা কর্ দে সব্ দিল্ ভর্ দে
দরদ্ মে ইয়ারা—সঙ্গ্–দিল্ ইয়ারা॥

জিগর কা খুন নেহি, ভরো মত্ সাকিয়া,
আঙ্গুরি লোহুয়ো, —ক্যাঁও ভিগা আঁখিয়া?
গিয়া পিয়া আতা নেহি মত্ কহো সহেলি,
ছোড়ো হাত্—পিয়ালা য়ো ভর্ দে তু পহেলি!
মত্ মাচা গওগা, বসন্ত মে বাহ্‌বা ম্যায় সে ক্যা তৌবা?
আহা গোলনিয়ারা সখি গোলনিয়ারা—
শরাব কা নূর সে রৌশন কর্ দে দুনিয়া আঁধিয়ারা
দুনিয়া রা দুনিয়া রা॥

বিরহ–বিধুরা

কার তরে? ছাই এ–পোড়ামুখ আয়নাতে আর দেখব না;
সুর্মা–রেখার কাজল–হরফ নয়নাতে আর লেখব না।
লাল–রঙিলা করব না কর মেহ্‌দি–হেনার ছাপ্ ঘষে,
গুল্‌ফ চুমি কাঁদবে গো কেশ চিরুণ–চুমার আফ্‌সোসে!

কপোল-শয়ান অলক-শিশুর উদাস ঘুম আর ভাঙবে না ;
চুম-হারা ঠোঁট পানের পিকের হিঙুল রঙে রাঙবে না !
কার তরে ফুল-শয্যা বাসর, সজ্জা নিজেই লজ্জা পায় ;
পিতম্ আমার দূর প্রবাসে, দেখবে কে সাজ-সজ্জা, হায় !

চাঁচর চুলে ধূম্র ওড়ে, অঙ্গ রাঙায় আগুন-রাগ,
যেম্‌নি ফোটে মন-নিকষে পিয়ার ফাগুন্-স্মৃতির দাগ।
সবাই বলে, চিনির চেয়েও শিরিন জীবন, —হায় কপাল !
পিতম্-হারা নিম-তেতো প্রাণ কেঁদেই কাটায় সাঁঝ-সকাল।

যেথায় থাকো খোশ্‌হালে রও, বন্ধু আমার—শোকের বল !
তুমি তোমার সুখ নিয়ে রও, —থাকুক আমার চোখের জল !

প্রণয়-নিবেদন

লো কিশোরী কুমারী !
পিয়াসি মন তোমার ঠোঁটের একটি গোপন চুমারি।।

অফুট তোমার অধর-ফুলে
কাঁপন যখন নাচন তুলে
একটু চাওয়ায় একটু ছুঁলে গো !
তখন এ-মন যেমন কেমন-কেমন কোন তিয়াসে কোঙারি ?—
ঐ শরম-নরম গরম ঠোঁটের অধীর মদির ছোঁয়ারি।।

বুকের কাঁচল মুখের আঁচল বসন-শাসন টুটে ঐ
শঙ্কা-আকুল কি কি আশা ভালোবাসা ফুটে সই ?

নয়ন-পাতার শয়ন-ঘেঁষা
ফুটছে যে ঐ রঙিন নেশা
ভাসা-ভাসা বেদন-মেশা গো !
ঐ বেদন-বুকে যে সুখ চোঁয়ায়, ভাগ দিয়ো তার কোঙারি !
আমার কুমার হিয়া মুক্তি মাগে অধর-ছোঁয়ায় তোমারি।।

ফুল-কুঁড়ি

আর পারিনে সাধতে লো সই এক-ফোঁটা এই ছুঁড়িকে।
ফুটবে না যে ফোটাবে কে বল্ লো সে ফুল-কুঁড়িকে॥

ঘোমটা-চাপা পারুল-কলি
বৃথাই তারে সাধল অলি,
পাশ দিয়ে হায় শ্বাস ফেলে যায় হুতাশ বাতাস চলি।
আ মলো ছিঃ! ওর হলো কি?
সুতোর গুঁতো শ্রান্ত-শিথিল টানতে ও মন-ঘুড়িকে।
আর শুনেছিস সই?
ওলো হিমেল চুমু হার মেনেছে এইটুকু আইবুড়িকে!!

সন্ধে-সকাল ছুঁয়ে কপাল রবির যাওয়া-আসাই সার,
ব্যর্থ হলো পথিক-কবির গভীর ভালবাসার হার।
জল ঢেলে যায় জংলা বধূ,
মৌমাছি দেয় কম্‌লা মধু,
শরম-চাদর খুলবে না সে আদর শুধু শুধু।
কে জানে বোন পথ-ভোলা কোন
তরুণ চোখের করুণ চাওয়ায় চোখ ঠেরেছে ছুঁড়িকে—
বসে আছে লো,
এই লজ্জাবতীর বধির বুকের সিংহ-আসন জুড়ি কে?

সর্বহারা

মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)র
শ্রীচরণারবিন্দে

সর্বসহা সর্বহারা জননী আমার !
তুমি কোনোদিন কারো করোনি বিচার,
কারেও দাওনি দোষ। ব্যথা–বারিধির
কূলে বসে কাঁদো মৌনা কন্যা ধরণীর
একাকিনী ! যেন কোন পথ–ভুলে আসা
ভিন্–গাঁর ভীরু মেয়ে ! কেবলি জিজ্ঞাসা
করিতেছ আপনারে, 'এ আমি কোথায় ?'—
দূর হতে তারকারা ডাকে, আয় আয় !
তুমি যেন তাহাদের পলাতকা মেয়ে
ভুলিয়া এসেছ হেথা ছায়া–পথ বেয়ে !
বিধি ও অবিধি মিলে মেরেছে তোমায়
—মা আমার—কত যেন ! চোখে–মুখে, হায়
তবু যেন শুধু এক ব্যথিত জিজ্ঞাসা,—
'কেন মারে ? এরা কারা ! কোথা হতে আসা
এই দুঃখ ব্যথা শোক ?'—এরা তো তোমার
নহে পরিচিত মাগো, কন্যা অলকার !
তাই সব সয়ে যাও নির্বাক নিশ্চুপ,
ধূপেরে পুড়ায় অগ্নি—জানে না তা ধূপ !...

দূর–দূরান্তর হতে আসে ছেলে–মেয়ে,
ভুলে যায় খেলা তারা তব মুখে চেয়ে !
বলে, 'তুমি মা হবে আমার ?' ভেবে কী যে !
তুমি বুকে চেপে ধরো, চক্ষু ওঠে ভিজে
জননীর করুণায় ! মনে হয় যেন
সকলের চেনা তুমি সকলেরে চেনো !
তোমারি দেশের যেন ওরা ঘর–ছাড়া,
বেড়াতে এসেছে এই ধরণীর পাড়া
প্রবাসী শিশুর দল ! যাবে ওরা চলে,

গলা ধরে দুটি কথা 'মা আমার' বলে !—
হয়তো ভুলেছ মাগো, কোনো একদিন,
এমনি চলিতে পথে মরু-বেদুঈন—
শিশু এক এসেছিল। শ্রান্ত কণ্ঠে তার
বলেছিল গলা ধরে—'মা হবে আমার ?'...
হয়তো আসিয়াছিল, যদি পড়ে মনে,
অথবা সে আসে নাই—না এলে স্মরণে
যে দুরন্ত গেছে চলে আসিবে না আর,
হয়তো তোমার বুকে গোরস্থান তার
জাগিতেছে আজো মৌন, অথবা সে নাই !
এমন তো কত পাই—কত সে হারাই !...

সর্বসহা কন্যা মোর ! সর্বহারা মাতা !
শূন্য নাহি রহে কভু মাতা ও বিধাতা।
হারা-বুকে আজ তব ফিরিয়াছে যারা—
হয়তো তাদেরি স্মৃতি এই 'সর্বহারা' !

৩৭ হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা,
১৬ই ভাদ্র ১৩৩৩

সর্বহারা

১

ব্যথার সাঁতার-পানি-ঘেরা
চোরাবালির চর,
ওরে পাগল! কে বেঁধেছিস
সেই চরে তোর ঘর?
শূন্যে তড়িৎ দেয় ইশারা,
হাট তুলে দে সর্বহারা,
মেঘ-জননীর অশ্রুধারা
ঝরছে মাথার 'পর,
দাঁড়িয়ে দূরে ডাকছে মাটি
দুলিয়ে তরু-কর।

২

কন্যারা তোর বন্যাধারায়
কাঁদছে উতরোল,
ডাক দিয়েছে তাদের আজি
সাগর-মায়ের কোল।
নায়ের মাঝি! নায়ের মাঝি!
পাল তুলে তুই দে রে আজি,
তুরঙ্গ ঐ তুফান-তাজী
তরঙ্গে খায় দোল।
নায়ের মাঝি! আর কেন ভাই?
মায়ার নোঙর তোল্!

৩

ভাঙন-ভরা অঙনে তোর
যায় রে বেলা যায়।

মাঝি রে ! দেখ কুরঙ্গী তোর
কূলের পানে চায়।
যায় চলে ঐ সাথের সাথী
ঘনায় গহন শাঙন-রাতি,
মাদুর-ভরা কাঁদন পাতি
ঘুমুস্ নে আর, হায় !
ঐ কাঁদনের বাঁধন ছেঁড়া
এতই কি রে দায় ?

৪

হীরা-মানিক চাসনিকো তুই
চাস্‌নি তো সাত ক্রোড়,
একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র-
ভরা অভাব তোর,
চাইলি রে ঘুম শ্রান্তি-হরা
একটি ছিন্ন মাদুর-ভরা,
একটি প্রদীপ-আলো-করা
একটু কুটির-দোর।
আস্‌ল মৃত্যু, আস্‌ল জরা,
আস্‌ল সিঁদেল-চোর।

৫

মাঝি রে তোর নাও ভাসিয়ে
মাটির বুকে চল !
শক্ত মাটির ঘায়ে হউক
রক্ত পদতল।
প্রলয়-পথিক চলবি ফিরি
দলবি পাহাড়-কানন-গিরি ;
হাঁকছে বাদল ঘিরি ঘিরি,
নাচছে সিন্ধুজল।
চল্ রে জলের যাত্রী এবার
মাটির বুকে চল॥

লাঙল অফিস, কলিকাতা
২৪শে চৈত্র, ১৩৩২

কৃষাণের গান

ওঠ রে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙল।
আমরা মরতে আছি—ভাল করেই মরব এবার চল॥

মোদের উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ
ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ,
ও ভাই লক্ষ হাতে টানছে ওরা লক্ষ্মী মায়ের কেশ,
আজ মা'র কাঁদনে লোনা হলো সাত সাগরের জল॥

ও ভাই আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ
তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই, গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায় বা সে গান গেল ভাই কোথায় সে কৃষাণ?
ও ভাই মোদের রক্ত জল হয়ে আজ ভরতেছে বোতল।

আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জোঁকের মতন শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, নাইকো আমার হাত্।
আজ সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল॥

ও ভাই আমরা মাটির খাঁটি ছেলে দুর্বাদল-শ্যাম,
আর মোদের রূপেই ছড়িয়ে আছেন রাবণ-অরি রাম,
ঐ হালের ফলার শস্য ওঠে, সীতা তাঁরি নাম,
আজ হরছে রাবণ সেই সীতারে—সেই মাঠের ফসল॥

ও ভাই আমরা শহীদ, মাঠের মক্কায় কোরবানি দিই জান্।
আর সেই খুনে যে ফলছে ফসল, হরছে তা শয়তান।
আমরা যাই কোথা ভাই, ঘরে আগুন বাইরে যে তুফান!
আজ চারদিক হতে ঘিরে মারে এজিদ রাজার দল॥

আজ জাগ রে কৃষাণ, সব তো গেছে, কিসের বা আর ভয়,
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হয়-কে করব নয়,
ওরে দেখবে এবার সভ্যজগৎ চাষার কত বল॥

হুগলি,
অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

শ্রমিকের গান

ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রীদল!
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই,
পায়ের সুখে ভাঙব চল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমাদেরি শক্তি-বলে
পাহাড় টলে তুষার গলে
মরুভূমে সোনার ফসল ফলে রে!
মোরা সিন্ধু মথে এনে সুধা
পাই না ক্ষুধায় বিন্দু জল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমরা কলির কলের কুলি,
কলুর বলদ চক্ষে-ঠুলি
হীরা পেয়ে রাজ-শিরে দিই তুলি রে!

আজ মানব-কুলের কালি মেখে
আমরা কালো কুলির দল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

আমরা পাতাল ফেড়ে খুঁড়ে খনি
আনি ফণীর মাথার মণি,
তাই পেয়ে সব শনি হলো ধনী রে!

এবার ফণি-মন্‌সার নাগ-নাগিনী
আয় রে গর্জ্জে মার ছোবল!
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

যত শ্রমিক শুষে নিঙড়ে প্রজা
রাজা-উজির মারছে মজা,
আমরা মরি বয়ে তাদের বোঝা রে।
এবার জুজুর দল ঐ হুজুর দলে
দলবি রে আয় মজুর দল!
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই মোদের বলে হতেছে পার,
হপ্তা রোজে সপ্ত পাথার,
সাঁতার কেটে জাহাজ কাতার কাতার রে!
তবু মোরাই জনম চলছি ঠেলে
ক্লেশ-পাথারের সাঁতার-জল!
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

আজ ছ'মাসের পথ ছ'দিনে যায়
কামান-গোলা, রাজার সিপাই
মোদের শ্রমে মোদেরি সে কৃপায় রে।
ও ভাই মোদের পুণ্যে শূন্যে ওড়ে
ঐ ভুঁড়োদের উড়োকল!
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই দালান-বাড়ি আমরা গড়ে
রইনু জনম ধুলায় পড়ে,
বেড়ায় ধনী মোদের ঘাড়ে চড়ে রে!
আমরা চিনির বলদ চিনি নে স্বাদ
চিনি বওয়াই সার কেবল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমরা মায়ের ময়লা ছেলে
কয়লা-খনির বয়লা ঠেলে
যে অগ্নি দিই দিগ্বিদিকে জ্বেলে রে!
এবার জ্বালবে জগৎ কয়লা-কাঁটা
ময়লা কুলির সেই অনল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমাদের কাজ হলে বাসি
আমরা মুটে কল্-খালাসি!
ডুবলে তরী মোরাই তুলতে আসি রে!
আমরা বলির মতন দান করে সব
পেলাম শেষে পাতাল-তল!
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

মোদের যা ছিল সব দিইছি ফুঁকে,
এইবারে শেষ কপাল ঠুকে
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে!
আবার নূতন করে মল্লভূমে
গর্জাবে ভাই দল-মাদল!
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ঐ শয়তানি চোখ কলের বাতি
নিবিয়ে আয় রে ধ্বংস-সাথী!
ধর হাতিয়ার, সামনে প্রলয়-রাতি রে!
আয় আলোক-স্নানের যাত্রীরা আয়
আঁধার-নায়ে চড়বি চল!
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

কৃষ্ণনগর
২০শে মাঘ, ১৩৩২

ধীবরদের গান

আমরা নিচে পড়ে রইব না আর
শোন রে ও ভাই জেলে,
এবার উঠব রে সব ঠেলে!
ঐ বিশ্ব-সভায় উঠলো সবাই রে,
ঐ মুটে-মজুর হেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

আজ সবার গায়ে লাগছে ব্যথা
সবাই আজি কইছে কথা রে,
আমরা এম্‌নি মরা, কইনে কিছু
মড়ার লাথি খেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

আমরা মেঘের ডাকে জেগে উঠে
পানসিতে পাল তুলি।
আমরা ঝড়-তুফানে সাগর-দোলার
নাগরদোলায় দুলি।
ও ভাই আকাশ মোদের ছত্র ধরে
বাতাস মোদের বাতাস-করে রে।
আমরা সলিল অনিল নীল গগনে
বেড়াই পরান মেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

হায় ভাই রে, মোদের ঠাঁই দিল না
আপন মাটির মায়ে,
তাই জীবন মোদের ভেসে বেড়ায়
ঝড়ের মুখে নায়ে।
ও ভাই নিত্য-নূতন হুকুম জারি
করছে তাই সব অত্যাচারী রে,

তারা বাজের মতন ছোঁ মেরে খায়
আমরা মৎস্য পেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

আমরা তল করেছি কতই সে ভাই
অথই নদীর জল,
ও ভাই হাজার করেও ঐ হুজুরদের
পাইনে মনের তল।

আমরা অতল জলের তলা থেকে
রোহিত-মৃগেল আনি ছেঁকে রে,
এবার দৈত্য-দানব ধরব রে ভাই
ডাঙাতে জাল ফেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

আমরা পাথার-জলে ডুব-সাঁতার দিই
মরেও নাহি মরি,
আমরা হাঙর-কুমির-তিমির সাথে
নিত্য বসত করি।

ও ভাই জলের কুমির জয় করে কি
কুমির হলো ঘরের ঢেঁকি রে,
ও ভাই মানুষ হতে কুমির ভালো
খায় না কাছে পেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

ও ভাই আমরা জলে জাল ফেলে রই,
হোথা ডাঙার 'পরে
আজ জাল ফেলেছে জালিম যত
জমাদারের চরে।
ও ভাই ডাঙার বাঘ ঐ মানুষ-দেশে
ছেলে-মেয়ে ফেলে এসে রে,
আমরা বুকের আগুন নিবাই রে ভাই,
নয়ন-সলিল ঢেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

ওরে সপ্ত লক্ষ শির মোদের ভাই
চৌদ্দ লক্ষ বাহু,
ওরে গ্রাস করেছে তাদের ভাই আজ
চৌদ্দজনা রাহু।
যে চৌদ্দ লক্ষ হাত দিয়ে ভাই
সাগর ম'থে দাঁড় টেনে যাই রে,
সেই দাঁড় নিয়ে আজ দাঁড়া দেখি
মায়ের সাত লাখ ছেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

ও ভাই আমরা জলের জল-দেবতা,
বরুণ মোদের মিতা,
মোদের মৎস্যগন্ধার ছেলে ব্যাসদেব
গাইল ভারত-গীতা।
আমরা দাঁড়ের ঘায়ে পায়ের তলে
জল-তরঙ্গ বাজাই জলে রে,
আমরা জলের মতন জল কেটে যাই,
কাটব দানব পেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

আমরা খেপলা জাল আর ফেলব না ভাই,
একলা নদীর তীরে,
আয় এক সাথে ভাই সাত লাখ জেলে
ধর বেড়াজাল ঘিরে।
ঐ চৌদ্দ লক্ষ দাঁড়-কাঁধে ভাই,
মল্লভূমির মল্ল-বীর আয় রে,
ঐ আঁশ-বঁটিতে মাছ কাটি ভাই,
কাটব অসুর এলে!
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

কৃষ্ণনগর
২৪শে ফাল্গুন, ১৩২৩

ছাত্রদলের গান

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল।
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে
যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই
বিষম চলার ঘায়!
যুগে-যুগে রক্তে মোদের
সিক্ত হলো পৃথ্বীতল॥
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের কক্ষচ্যুত ধূমকেতু-প্রায়
লক্ষ্যহারা প্রাণ,
আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর
নিত্য বলিদান।
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে ওঠেন
আমরা পশি নীল অতল।
আমরা ছাত্রদল॥

আমরা ধরি মৃত্যুরাজার
যজ্ঞঘোড়ার রাশ।
মোদের মৃত্যু লেখে মোদের
জীবন ইতিহাস।
হাসির দেশে আমরা আনি
সর্বনাশী চোখের জল।
আমরা ছাত্রদল॥

সবাই যখন বুদ্ধি জোগায়
আমরা করি ভুল!
সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব
আমরা ভাঙি কূল।
দারুণ রাতে আমরা তরুণ
রক্তে করি পথ পিছল!
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল
বক্ষে ভরা বাক,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন
নিত্যকালের ডাক।
আমরা তাজা খুনে লাল করেছি
সরস্বতীর শ্বেত কমল।
আমরা ছাত্রদল॥

ঐ দারুণ উপপ্লবের দিনে
আমরা দানি শির,
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে
বিংশ শতাব্দীর!
মোরা গৌরবেরি কান্না দিয়ে
ভরেছি মা'র শ্যাম আঁচল।
আমরা ছাত্রদল॥

আমরা রচি ভালবাসার
আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ-পথের আভাস দেখায়
আকাশ-ছায়াপথ!
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর
স্বপ্ন দেখা হোক সফল।
আমরা ছাত্রদল॥

কৃষ্ণনগর
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!

১

কোরাস:

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥

২

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার॥

৩

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!

৪

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চলো টানি, নিয়াছ যে মহাভার!

৫

কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশির প্রান্তর,
বাঙালির খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইভের খঞ্জর !
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

৬

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার !

কৃষ্ণনগর
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

ফরিয়াদ

১

এই ধরণীর ধূলি-মাখা তব অসহায় সন্তান
মাগে প্রতিকার, উত্তর দাও আদি-পিতা ভগবান !—
আমার আঁখির দুখ-দীপ নিয়া
বেড়াই তোমার সৃষ্টি ব্যাপিয়া,
যতটুকু হেরি বিস্ময়ে মরি ভরে ওঠে সারা প্রাণ !
এত ভালো তুমি? এত ভালোবাসো? এত তুমি মহীয়ান?
ভগবান ! ভগবান !

২

তোমার সৃষ্টি কত সুন্দর কত সে মহৎ, পিতা!
সৃষ্টি-শিয়রে বসে কাঁদো তবু জননীর মতো ভীতা।
নাহি সোয়াস্তি নাহি যেন সুখ,
ভেঙে গড়ো, গড়ে ভাঙো, উৎসুক!
আকাশ মুড়েছ মরকতে—পাছে আঁখি হয় রোদে ম্লান।
তোমার পবন করিছে বীজন জুড়াতে দগ্ধ প্রাণ!
ভগবান! ভগবান!

৩

রবি-শশী-তারা প্রভাত-সন্ধ্যা তোমার আদেশ কহে—
'এই দিবারাতি আকাশ-বাতাস নহে একা কারো নহে।'
এই ধরণীর যাহা সম্বল,—
বাসে-ভরা ফুল, রসে-ভরা ফল,
সুস্নিগ্ধ মাটি, সুধাসম জল, পাখির কণ্ঠে গান,—
সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর 'ফরমান'!
ভগবান! ভগবান!

৪

শ্বেত, পীত, কালো করিয়া সৃজিলে মানবে, সে তব সাধ।
আমরা যে কালো তুমি ভালো জান, নহে তাহা অপরাধ!
তুমি বলো নাই, শুধু শ্বেতদ্বীপে
জোগাইবে আলো রবি-শশী-দীপে,
সাদা র'বে সবাকার টুটি টিপে, এ নহে তব বিধান।
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান!
ভগবান! ভগবান!

৫

তব কনিষ্ঠা মেয়ে ধরণীরে দিলে দান ধুলা-মাটি,
তাই দিয়ে তার ছেলেদের মুখে ধরে সে দুধের বাটি!
ময়ূরের মতো কলাপ মেলিয়া

তার আনন্দ বেড়ায় খেলিয়া !
সন্তান তার সুখী নয়, তারা লোভী, তারা শয়তান !
ঈর্ষায় মাতি করে কাটাকাটি, রচে নিতি ব্যবধান !
ভগবান ! ভগবান !

৬

তোমারে ঠেলিয়া তোমার আসনে বসিয়াছে আজ লোভী,
রসনা তাহার শ্যামল ধরায় করিছে সাহারা গোবি !
মাটির ঢিবিতে দু'দিন বসিয়া
রাজা সেজে করে পেষণ কষিয়া !
সে পেষণে তারি আসন ধসিয়া রচিছে গোরস্থান !
ভাইয়ের মুখের গ্রাস কেড়ে খেয়ে বীরের আখ্যা পান !
ভগবান ! ভগবান !

৭

জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমি-দার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,
মাটির মালিক তাঁহারাই হন !
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান।
নিতি নব ছোরা গড়িয়া কশাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান।
ভগবান ! ভগবান !

৮

অন্যায় রণে যারা যত দড় তারা তত বড় জাতি,
সাত মহারথী শিশুরে বধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি !
তোমার চক্র রুধিয়াছে আজ
বেনের রৌপ্য-চাকায়, কি লাজ !
এত অনাচার সয়ে যাও তুমি, তুমি মহা মহীয়ান !
পীড়িত মানব পারে নাকো আর, স'বে না এ অপমান !
ভগবান ! ভগবান !

৯

ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা, শঙ্কা নাহিকো আর !
'মরিয়া'র মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে 'মার মার !'
রক্ত যা ছিল করেছে শোষণ,
নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ !
শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান,—
'জয় নিপীড়িত জনগণ জয় ! জয় নব উত্থান !
জয় জয় ভগবান !'

১০

তোমার দেওয়া এ বিপুল পৃথ্বী সকলে করিব ভোগ,
এই পৃথিবীর নাড়ি সাথে আছে সৃজন-দিনের যোগ।
তাজা ফুল-ফলে অঞ্জলি পুরে
বেড়ায় ধরণী প্রতি ঘরে ঘুরে,
কে আছে এমন ডাকু যে হরিবে আমার গোলার ধান ?
আমার ক্ষুধার অন্নে পেয়েছি আমার প্রাণের ঘ্রাণ—
এতদিনে ভগবান !

১১

যে আকাশ হতে ঝরে তব দান আলো ও বৃষ্টি-ধারা
সে আকাশ হতে বেলুন উড়ায়ে গোলাগুলি হানে কারা ?
উদার আকাশ বাতাসে কাহারা
করিয়া তুলিছে ভীতির সাহারা ?
তোমার অসীম ঘিরিয়া পাহারা দিতেছে কার কামান ?
হবে না সত্য দৈত্য-মুক্ত ? হবে না প্রতিবিধান ?
ভগবান ! ভগবান !

১২

তোমার দত্ত হস্তরে বাঁধে কার নিপীড়ন-চেড়ী ?
আমার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়ি ?

ক্ষুধা তৃষা আছে, আছে মোর প্রাণ,
আমিও মানুষ, আমিও মহান!
আমার অধীন এ মোর রসনা, এই খাড়া গর্দান!
মনের শিকল ছিঁড়েছি, পড়েছে হাতের শিকলে টান—
এতদিনে ভগবান!

১৩

চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির।
বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি ভেঙেছে কারা-প্রাচীর।
এতদিনে তার লাগিয়াছে ভালো—
আকাশ বাতাস বাহিরেতে আলো,
এবার বন্দী বুঝেছে, মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ।
মুক্ত-কণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে একতান—
জয় নিপীড়িত প্রাণ!
জয় নব অভিযান!
জয় নব উত্থান!

হুগলি
৭ আশ্বিন, ১৩৩২

আমার কৈফিয়ৎ

১

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি'।
কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবি!
কেহ বলে, তুমি ভবিষ্যতে যে
ঠাঁই পাবে কবি ভবীর সাথে হে!
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে বাণী কই কবি?
দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী!

২

কবি-বন্ধুরা হতাশ হইয়া মোর লেখা পড়ে শ্বাস ফেলে !
বলে, কেজো ক্রমে হচ্ছে অকেজো পলিটিক্সের পাঁশ ঠেলে।
পড়ে না কো বই, বয়ে গেছে ওটা !
কেহ বলে বৌ-এ গিলিয়াছে গোটা !
কেহ বলে, মাটি হলো হয়ে মোটা জেলে বসে শুধু তাস খেলে !
কেহ বলে, 'তুই জেলে ছিলি ভালো, ফের যেন তুই যাস্ জেলে !'

৩

গুরু কন, তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা !
প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, 'তুমি হাঁড়িচাঁচা !'
আমি বলি, প্রিয়ে হাটে ভাঙি হাঁড়ি !
অমনি বন্ধ চিঠি তাড়াতাড়ি !
সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুরা কন, 'আড়ি চাচা !'
যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি নাড়ি কাছা !

৪

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্-লা'রা কন হাত নেড়ে,
'দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে !
ফতোয়া দিলাম—কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজি ও !
'আমপারা'-পড়া হামবড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে !'
হিন্দুরা ভাবে, পার্শি শব্দে কবিতা লেখে, ও পাত-নেড়ে !

৫

আন্‌কোরা যত নন্‌ভায়োলেন্ট নন্-কো'র দলও নন্ খুশি।
'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন্' নাকি আমি বিপ্লবী-মন তুষি !
'এটা অহিংস' বিপ্লবী ভাবে,
'নয় চরকার গান কেন গাবে ?'
গোঁড়া-রাম ভাবে নাস্তিক আমি, পাতি-রাম ভাবে কন্‌ফুসি !
স্বরাজীরা ভাবে নারাজি, নারাজি ভাবে তাহাদের অঙ্কুশি !

৬

নর ভাবে, আমি বড় নারী-ঘেঁষা ! নারী ভাবে, নারী-বিদ্বেষী !
'বিলেত ফেরোনি?' প্রবাসী-বন্ধু ক'ন, 'এই তব বিদ্যে ছি !'
ভক্তরা বলে, 'নবযুগ-রবি' !—
যুগের না হই হুজুগের কবি
বটি তো রে দাদা, আমি মনে ভাবি, আর কষে কষি হৃদ-পেশি।
দু'কানে চশমা আঁটিয়া ঘুমানু, দিব্যি হতেছে নিঁদ বেশি !

৭

কি যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ডু আমিই কি বুঝি তার কিছু?
হাত উঁচু আর হলো না তো ভাই, তাই লিখি করে ঘাড় নিচু !
বন্ধু ! তোমরা দিলে নাকো দাম,
রাজ-সরকার রেখেছেন নাম !
যাহা কিছু লিখি অমূল্য বলে অ-মূল্যে নেন ! আর কিছু
শুনেছ কি, হুঁ হুঁ, ফিরিছে রাজার প্রহরী সদাই কার পিছু?

৮

বন্ধু ! তুমি তো দেখেছ আমায় আমার মনের মন্দিরে।
হাড় কালি হলো, শাসাতে নারিনু তবু পোড়া মন-বন্দীরে !
যতবার বাঁধি ছেঁড়ে সে শিকল,
মেরে মেরে তারে করিনু বিকল,
তবু যদি কথা শোনে সে পাগল ! মানিল না রবি গান্ধীরে।
হঠাৎ জাগিয়া বাঘ খুঁজে ফেরে নিশার আঁধারে বন চিরে !

৯

আমি বলি, ওরে কথা শোন ক্ষ্যাপা, দিব্যি আছিস খোশ-হালে !
প্রায় 'হাফ'-নেতা হয়ে উঠেছিস, এবার এ দাঁও ফসকালে
'ফুল'-নেতা আর হবিনে যে, হায় !—
বক্তৃতা দিয়া কাঁদিতে সভায়
গুঁড়ায়ে লঙ্কা পকেটেতে বোকা এই বেলা ঢোকা ! সেই তালে
নিস তোর ফুটো ঘরটাও ছেয়ে, নয় পস্তাবি শেষকালে।

১০

বোঝে না কো যে সে চারণের বেশে ফেরে দেশে দেশে গান গেয়ে,
গান শুনে সবে ভাবে, ভাবনা কি? দিন যাবে এবে পান খেয়ে!
র'বে নাকো ম্যালেরিয়া মহামারি,
স্বরাজ আসিছে চড়ে জুড়ি-গাড়ি,
চাঁদা চাই, তার ক্ষুধার অন্ন এনে দেয়, কাঁদে ছেলে-মেয়ে।
মাতা কয়, ওরে চুপ হতভাগা, স্বরাজ আসে যে, দেখ চেয়ে।

১১

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন।
বেলা বয়ে যায়, খায়নিকো বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন!
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছো কি? কালি ও চুন
কেন ওঠে না কো তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন?

১২

আমরা তো জানি, স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস!
কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস
এল কোটি টাকা, এল না স্বরাজ!
টাকা দিতে নারে ভুখারি সমাজ।
মা'র বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ খাও হে ঘাস!
হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ!

১৩

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে নাকো মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছো সুখে!

১৪

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে।
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ !

প্রার্থনা

[গান]

এস যুগ-সারথি নিশঙ্ক নির্ভয়।
এস চির-সুন্দর অভেদ অসংশয়
জয় জয়।
জয় জয়।

এস বীর অনাগত
বজ্র-সমুদ্যত।
এস অপরাজেয় উদ্ধত নির্দয়।
জয় জয়।
জয় জয়।

হে মৌনী জন-গণ-
বেদনা-বিমোচন-
যুগ-সেনানায়ক ! জাগো জ্যোতির্ময়।
জয় জয়।
জয় জয়।

ওঠে ক্রন্দন ওই
এস বন্ধন-জয়ী।
জাগে শিশু, মাগে আলো, এস অরুণোদয়।
জয় জয়।
জয় জয়।

গোকুল নাগ

না ফুরাতে শরতের বিদায় শেফালি,
না নিবিতে আশ্বিনের কমল দীপালি,
তুমি শুনেছিলে বন্ধু পাতা-ঝরা গান
ফুলে ফুলে হেমন্তের বিদায়-আহ্বান।
অতন্দ্র নয়নে তব লেগেছিল চুম
ঝর-ঝর কামিনীর, এল চোখে ঘুম
রাত্রিময়ী রহস্যের ; ছিন্ন শতদল
হলো তব পথ-সাথী ; হিমানী সজল
ছায়াপথ-বীথি দিয়া শেফালি দলিয়া
এল তব মায়া-বধূ ব্যথা-জাগানিয়া !
এল অশ্রু হেমন্তের, এল ফূল-খসা
শিশির-তিমির-রাত্রি ; শ্রান্ত দীর্ঘশ্বসা
ঝাউ-শাখে সিক্ত বায়ু রিক্ততার বাণী
কয়ে গেল, দুলে দুলে কাঁদিল বনানী !
তুমি দেখেছিলে বন্ধু ছায়া-কুহেলির
অশ্রু-ঘন মায়া-আঁখি, বিরহ-অথির
বুকে তব ব্যথা-কীট পশিল সেদিন !
যে-কান্না এল না চোখে, মর্মে হলো লীন
বক্ষে তাহা নিল বাসা হলো রক্তে রাঙা
আশাহীন ভালবাসা, ভাষা অশ্রু ভাঙা !

বন্ধু, তব জীবনের কুমারী আশ্বিন
পরিল বিধবা বেশ কবে কোন দিন,
কোন দিন সেঁউতির মালা হতে তার
ঝরে গেল বৃন্তগুলি রাঙা কামনার—
জানি নাই ; জানি নাই, তোমার জীবনে
হাসিছে বিচ্ছেদ-রাত্রি, অজানা গহনে
এবে যাত্রা শুরু তব, হে পথ-উদাসী !
কোন বনান্তর হতে ঘর-ছাড়া বাঁশি

ডাক দিল, তুমি জানো। মোরা শুধু জানি
তব পায়ে কেঁদেছিল সারা পথখানি!
সেধেছিল, এঁকেছিল ধূলি-তুলি দিয়া
তোমার পদাঙ্ক-স্মৃতি।
রহিয়া রহিয়া
কত কথা মনে পড়ে! আজ তুমি নাই,
মোরা তব পায়ে-চলা পথে শুধু তাই
এসেছি খুঁজিতে সেই তপ্ত পদ-রেখা
এইখানে আছে তব ইতিহাস লেখা।

জানি না কো আজ তুমি কোন্ লোকে রহি
শুনিছ আমার গান, হে কবি বিরহী!
কোথা কোন জিজ্ঞাসার অসীম সাহারা,
প্রতীক্ষার চির-রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য, তারা,
পারায়ে চলেছ একা অসীম বিরহে?
তব পথ-সাথী যারা—কিছু ডাকি কহে—
'ওগো বন্ধু শেফালির, শিশিরের প্রিয়!
তবু যাত্রা-পথে আজ নিও বন্ধু নিও
আমাদের অশ্রু-আর্দ্র এ স্মরণখানি!'
শুনিতে পাও কি তুমি, এ-পারের বাণী?
কানাকানি হয় কথা এ-পারে ও-পারে?
এ কাহার শব্দ শুনি মনের বেতারে?
কত দূরে আছো তুমি কোথা কোন বেশে
লোকান্তরে না সে এই হৃদয়েরি দেশে
পারায়ে নয়ন-সীমা বাঁধিয়াছ বাসা?
হৃদয়ে বসিয়া শোনো হৃদয়ের ভাষা? ...
হারায়নি এত সূর্য এত চন্দ্র তারা,
যেথা হোক আছ বন্ধু হওনি কো হারা! ...

সেই পথ, সেই পথ-চলা গাঢ় স্মৃতি,
সব আছে! নাই শুধু সেই নিতি নিতি
নব নব ভালোবাসা প্রতি দরশনে,
আরো প্রিয় করে পাওয়া চিরপ্রিয়জনে,—
আদি নাই, অন্ত নাই, ক্লান্তি তৃপ্তি নাই—
যত পাই তত চাই—আরো আরো চাই,—

সেই নেশা সেই মধু নাড়ি-ছেঁড়া টান
সেই কল্পলোকে নব নব অভিযান,—
সব নিয়ে গেছো বন্ধু! সে কল-কল্লোল
সে হাসি-হিল্লোল নাই চিত-উতরোল!
আজ সেই প্রাণ-ঠাসা একমুঠো ঘরে
শূন্যের শূন্যতা রাজে, বুক নাহি ভরে। ...
হে নবীন, অফুরন্ত তব প্রাণ-ধারা
হয় তো এ মরু-পথে হয়নি কো হারা,
হয় তো আবার তুমি নব পরিচয়ে
দেবে ধরা; হবে ধন্য তব দান লয়ে
কথা-সরস্বতী। তাহা লয়ে ব্যথা নয়,
কত বাণী এল, গেল, কত হলো লয়,
আবার আসিবে কত। শুধু মনে হয়
তোমারে আমরা চাই, রক্তমাংসময়
আপনারে ক্ষয় করি যে অক্ষয় বাণী
আনিলে আনন্দ-বীর, নিজে বীণাপাণি
পাতি কর লবে তাহা; তবু যেন হায়
হৃদয়ের কোথা কোন ব্যথা থেকে যায়!
কোথা যেন শূন্যতার নিঃশব্দ ক্রন্দন
গুমরি গুমরি ফেরে, হু হু করে মন! ...

বাণী তব—তব দান—সে তো সকলের,
ব্যথা সেথা নয় বন্ধু! যে ক্ষতি একের
সেথায় সান্ত্বনা কোথা? সেথা শান্তি নাই,
মোরা হারায়েছি—বন্ধু, সখা, প্রিয়, ভাই!
কবির আনন্দ-লোকে নাই দুঃখ-শোক,
সে-লোকে বিহারে যারা তারা সুখী হোক!
তুমি শিল্পী, তুমি কবি, দেখিয়াছে তারা,
তারা পান করে নাই তব প্রাণ-ধারা!

‘পথিকে’ দেখেছে তারা দেখেনি ‘গোকুলে,’
ডুবেনি কো—সুখী তারা—আজো তারা কূলে!
আজো মোরা প্রাণাচ্ছন্ন, আমরা জানি না
গোকুল সে শিল্পী গল্পী কবি ছিল কি-না।

আত্মীয়ে স্মরিয়া কাঁদি, কাঁদি প্রিয় তরে,
গোকুলে পড়েছে মনে—তাই অশ্রু ঝরে।

না ফুরাতে আশা ভাষা, না মিটিতে ক্ষুধা,
না ফুরাতে ধরণীর মৃৎ-পাত্র-সুধা,
না পুরিতে জীবনের সকল আস্বাদ—
মধ্যাহ্নে আসিল দূত ! যত তৃষ্ণা সাধ
কাঁদিল আঁকড়ি ধরা, যেতে নাহি চায় !
ছেড়ে যেতে যেন সব স্নায়ু ছিঁড়ে যায় !
ধরার নাড়িতে পড়ে টান ! তরুলতা
জল বায়ু মাটি সব কয় যেন কথা !
যেয়ো না কো যেয়ো না কো যেন সবে বলে—
তাই এত আকর্ষণ এই জলে স্থলে
অনুভব করেছিলে প্রকৃতি-দুলাল !
ছেড়ে যেতে ছিঁড়ে গেল বক্ষ লালে-লাল
হলো ছিন্ন প্রাণ ! বন্ধু, সেই রক্ত-ব্যথা
রয়ে গেল আমাদের বুকে চেপে হেথা !

হে তরুণ, হে অরুণ, হে শিল্পী সুন্দর,
মধ্যাহ্নে আসিয়াছিলে সুমেরু-শিখর
কৈলাসের কাছাকাছি দারুণ তৃষ্ণায়,
পেলে দেখা সুন্দরের, স্বরগ-গঙ্গায়
হয়তো মিটেছে তৃষ্ণা, হয়তো আবার
ক্ষুধাতুর !—স্রোতে ভেসে এসেছে এ-পার !
অথবা হয়তো আজ হে ব্যথা-সাধক,
অশ্রু-সরস্বতী কর্ণে তুমি কুরুবক !

হে পথিক-বন্ধু মোর, হে প্রিয় আমার,
যেখানে যে-লোকে থাকো করিও স্বীকার
অশ্রু-রেবা-কূলে মোর এ স্মৃতি-তর্পণ,
আমারে অঞ্জলি করি করিনু অর্পণ !

সুন্দরের তপস্যায় ধ্যানে আত্মহারা
দারিদ্র্যের দর্প তেজ নিয়া এল যারা,
যারা চির-সর্বহারা করি আত্মদান,

যাহারা সৃজন করে করে না নির্মাণ,
সেই বাণীপুত্রদের আড়ম্বরহীন
এ-সহজ আয়োজন এ স্মরণ-দিন
স্বীকার করিও কবি, যেমন স্বীকার
করেছিলে তাহাদের জীবনে তোমার !

নহে এরা অভিনেতা, দেশ-নেতা নহে,
এদের সৃজন-কুঞ্জ অভাবে, বিরহে,
ইহাদের বিত্ত নাই, পুঁজি চিত্তদল,
নাই বড় আয়োজন, নাই কোলাহল ;
আছে অশ্রু, আছে প্রীতি, আছে বক্ষ-ক্ষত,
তাই নিয়ে সুখী হও, বন্ধু স্বর্গগত !
গড়ে যারা, যারা করে প্রাসাদ নির্মাণ
শিরোপা তাদের তরে, তাদের সম্মান।

দু'দিনে ওদের গড়া পড়ে ভেঙে যায়,
কিন্তু স্রষ্টা সম যারা গোপনে কোথায়
সৃজন করিছে জাতি, সৃজিছে মানুষ—
অচেনা রহিল তারা। কথার ফানুস
ফাঁপাইয়া যারা যত করে বাহাদুরি
তারা তত পাবে মালা যশের কস্তুরী !
আজটাই সত্য নয়, ক'টা দিন তাহা ?
ইতিহাস আছে, আছে ভবিষ্যৎ, যাহা
অনন্ত কালের তরে রচে সিংহাসন,
সেখানে বসাবে তোমা বিশ্বজনগণ।
আজ তাহা নয় বন্ধু, হবে সে তখন,—
পূজা নয়—আজ শুধু করিনু স্মরণ।

হুগলি,
৩০শে কার্তিক, ১৩৩২

বুলবুল

সুর-শিল্পী, বন্ধু

দিলীপকুমার রায়

করকমলেষু

আমার শুধু এ বাণী হে বন্ধু, আমার শুধু এ গান।
তুমি তারে দিলে রূপ-রঙ্গিমা, তুমি তারে দিলে প্রাণ!
আমার ব্যথায় বেঁধেছিল নীড় যে গানের বুলবুলি,
আপনি আসিয়া আদরে তাহারে বক্ষে লইলে তুলি!
আমার পাখির কণ্ঠে মিশালে তোমার দরদ লয়ে,
আমার বেদনা বাজে আজ তাই সবার বেদনা হয়ে।
যে গান গেয়েছি একাকী নিশীথে কুসুমের কানে কানে,
ওগো গুণী, তুমি ছড়াইলে তারে সব বুকে, সব খানে।
বুকে বুকে আজ পেয়েছে আশয় আমার নীড়ের পাখি,
মুক্তপক্ষ উড়িতে যে চায়—কেন তারে বেঁধে রাখি?
তোমার কাননে উড়ে গেল মোর বাগিচার বুলবুলি,
বড় ভীরু সে যে, দোস্ত, তাহারে দস্তে লইও তুলি!

তোমার প্রতিভা ও প্রাণমুগ্ধ
নজরুল

কলিকাতা
১৫ই আশ্বিন
১৩৩৫

'বুলবুলে'র কবি

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

ফরাসি জাদুকর আনাতোল ফ্রাঁস ঘটনাটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—জীবনের সায়াহ্নে বিসমার্ক শহর ছাড়িয়া গ্রামে (Villa-তে) আসিয়া বাস করিতেছিলেন, কর্মক্লান্ত জীবনের শেষ শান্তিকে এখানেই গ্রহণ করিবেন এই আশায়। একদিন ভোরবেলা বৃদ্ধ বিসমার্ক বারান্দায় ইজিচেয়ারে একাকী বসিয়া আছেন। সম্মুখে শ্যাম বনানী, বনের গাছে গাছে তখন কচি পল্লবে সবুজের বান ডাকিয়াছে—বনে বসন্ত আসিয়া পড়িয়াছিল। ভোরের আলো বনের মাথায় মাথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে—দুই চোখ মেলিয়া তিনি তাহাই দেখিতেছিলেন। ধীরে ধীরে চোখের দুই কোণে দুই ফোঁটা অশ্রু জমিয়া উঠিল। বৃদ্ধ বিসমার্ক বলিয়া উঠিলেন—'হায়, আমার জন্য—শুধু আমারই জন্য ইউরোপের তিন তিনটা যুদ্ধ হল।' স্বর ভাঙিয়া পড়িল, আর্তস্বরে বৃদ্ধ কাঁদিয়া উঠিলেন—'এত অফুরন্ত জীবন আমার গ্রামের, এই বনখানিতে সঞ্চিত রয়েছে, আর আমি হতভাগ্য, এমনি করে জীবন থেকে বঞ্চিত হলাম। Oh, I have lost my life!'

জীবনের শেষদিনে আমি আমার জীবন হারাইয়াছি,—হায়, আমি জীবন হারাইয়াছি—এই বলিয়া বিসমার্ক যে দুই ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন, তার মাঝে তাঁর সমস্ত অগণিত কীর্তি তুচ্ছ হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। দুই ফোঁটা অশ্রুর কাছে বিসমার্কের বাকি সমস্তটা জীবন হার মানিল। বিসমার্ক শেষ হইয়াছেন—তাঁর কর্মকীর্তি ধুলায় ধূসর হইয়াছে—কালের চাকার নিষ্পেষণ সহিবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। কিন্তু এই দুই ফোঁটা চোখের জলের সাথে পরমাণু নিয়া মহাকালের লড়াই চলিল—চোখের জলের কাছে মহাকালই একদিন ক্লান্তিতে হাঁটু গাড়িয়া হার মানিবে। অনন্তকালের চোখে এই দুই ফোঁটা জল অশ্রু হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিসমার্ক চোখের দুই ফোঁটা জলে মহাকালকে ভুলাইয়াছেন—আজ চোখের জল অমর হইয়া রহিল। চিরন্তন ক্রন্দসীর ক্রন্দনের অশ্রুমালার এই দুই ফোঁটা জল ফুল হইয়া দুলিয়া রহিল। এমনই হয়—

কাজী নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া আনাতোলের এই কথা কেন মনে হইল—তাহাই বলি। নজরুল 'বিদ্রোহী' কবি বলিয়াই পরিচিত। 'বিদ্রোহী'র কবি তিনি—কাজেই তাঁর সৃষ্টি তাঁর বিশেষণ হইয়া তাঁর নামের সঙ্গে আসিয়াছে। সৃষ্টি দিয়াই সৃষ্টিকর্তাকে চিনি। এবং সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি উভয়কেই আমরা এক সঙ্গে এমনই করিয়া স্মরণ করি। নজরুলকে 'বিদ্রোহী'র কবি না বলিয়া 'বিদ্রোহী' কবি বলাই উচিত কি না সে প্রশ্ন এখানে তুলিতে চাহি না ; আমার বক্তব্য স্বতন্ত্র।

'বিদ্রোহী'তে বিসমার্কের মতোই কবি আপন শক্তির নেশায় একদিন মশ্‌গুল হইয়া উঠিয়াছিলেন,—'আমার সমুন্নত শির সৃষ্টির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া সৃষ্টির বাহিরে বহু বহু ঊর্ধ্বে সীমা হারাইয়া ফেলিয়াছে—যেখানে অস্তিত্ব পর্যন্ত নাই—এত দূরে।'

সৃষ্টিকে ধ্বংস করিয়া যে বিধাতার মাথা ডিঙাইয়া গেল, সে বিদ্রোহী, কিন্তু তবু মানুষের কাছে বড় হইতে পারিল না। কারণ মানুষ জানে যে, এই বিপুল কীর্তির পরমায়ু মহাকালের পলকের ফুৎকারে নিভিয়া যাইবে, অনন্ত দিনের ঝড়-ঝন্‌ঝা সহিবার মতো ক্ষমতা বিদ্রোহীর সমুন্নত কীর্তিস্তম্ভের নাই। বিধাতার সৃষ্টিকে ধ্বংস করিয়া বিধাতার সঙ্গে লড়াই করা চলে, কিন্তু মহাকালের দরবারে তাতে বিন্দুমাত্র বিক্ষোভ ওঠে না। তাই বিদ্রোহীকে বিস্ময়ের চোখেই দেখা যায়, ভয় ও শ্রদ্ধাও যে একটা না থাকে এমন নয়। কিন্তু ভালবাসার মাঝে যে শুচিস্নান না করিয়া আসে সে তো অমর হইতে পারে না।

বিসমার্কের অমর কীর্তি দুই ফোঁটা চোখের জল যেমন তাঁর জীবনের শেষ দিনের প্রতীক্ষায় ছিল, তেমনি কিছু একটা বিদ্রোহীর বিদ্রোহেও যেন চুপ করিয়া ছিল। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি' এই কথায় তাহার পূর্বাভাস আছে, কিন্তু সম্যক প্রকাশ নাই, কারণ আর এক হাতের রণতূর্যই তখন ভীষণ গুরুগর্জনে বাজিয়া উঠিতেছিল।

বাঁশি নীরব হইয়াই ছিল, কিন্তু বিদ্রোহীর অশান্ত তূর্যের ভৈরব গর্জন বাঁশির বুকের কবর-চাপা ঘুমন্ত সুরে মাঝে মাঝে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে—যেমন আকাশের গুরু গুরু মেঘগর্জন নিশীথনীপ-শাখায় ঘুমন্ত শিখীর কণ্ঠে আচম্‌কা প্রতিধ্বনি তোলে—তেমনি। তাই তো বিদ্রোহীর হাইদরি হাঁকের এক প্রান্তে একটি করুণ অশ্রুমুখী সুরধ্বনিকে দেখিতে পাই, শুনি—

আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি
ছল করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালবাসা তার
কাঁকন চুড়ির কনকন।

তখনই মন বলে, বিদ্রোহীর রণতূর্যে তোমার সত্যিকার পরিচয় নয়। দেশের, সমাজের জন্য তোমার এই বিদ্রোহের হয়তো অনেকখানিই প্রয়োজন আছে, যেমন আগ্রার দুর্গের একদিন প্রয়োজন ছিল, মুঘল-সাম্রাজ্যের খবরদারি করিবার। কিন্তু মহাকালের কাছে তাহা অকিঞ্চিৎকর, তার প্রচণ্ড চরণপাতে আগ্রার বিশাল দুর্গের মতোই বিদ্রোহী তুমি একদিন ধুলায় রেণু রেণু হইয়া ছড়াইয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে। তোমার বাঁশি আছে তার প্রয়োজন নাই সত্য, যেমন তাজমহলের প্রয়োজন নাই, কিন্তু সেই বাঁশিতে যে সুর লুকাইয়া রাখিয়াছ তাহাকে মুক্ত করো, যে সুরের তালে তালে মহাকাল তার প্রেয়সীর জন্য কান্নার গানখানি গাহিবে। বাঁশিই তোমাকে বিসমার্কের চোখের জলের মতো অমর করিবে, তোমাকে তখনই আমরা বড় বলিয়া স্বীকার করিব, যখন তুমি বিদ্রোহের সু-উচ্চ সুর নমিত করিয়া কাঁদিয়া বলিবে—'ওই এক ফোঁটা

শিশু-পল্লবে অনন্ত জীবন সঞ্চিত রয়েছে, ওগো তৃষ্ণাতুর মানব, তুমি তাকে বন্দী করো, তাকে উপেক্ষা করো না ; তবে জীবন হারাবে—বঞ্চিত হবে এ জীবনে।' তখন আমরাও বলিব—'ওগো কবি তোমার কণ্ঠে সে সুর বাজে, মহাকালের বীণায় তার অনন্ত প্রতিধ্বনি ওঠে।'

বিশ্বের এই বিচিত্র গন্ধ-বর্ণের অবগুণ্ঠন টানিয়া যে চিরন্তন ক্রন্দসী আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে তাহাকে আবিষ্কার করাই কবির কাজ। নিখিলের এই প্রকাশের যবনিকা উত্তোলন করিলে দেখা যায় যে, এই রূপ-রস-গন্ধের অন্তরালে একটা চিরন্তন কান্নার ফল্গুধারা অনন্তকাল প্রচ্ছন্ন হইয়া বহিতেছে। শ্রেষ্ঠ যে কবি, সে এই অবগুণ্ঠন মুহুর্মুহু উন্মোচন করিতে প্রয়াস পায়—এই সৃষ্টির আড়ালে যে রহিয়াছে, তাহাকে সৃষ্টির সামনে প্রকাশিত করে। কবি হিসাবে কাজী নজরুল এ-দিক দিয়া কতখানি সার্থক হইয়াছেন, তাহাই বিচার করিব।

কথাটা অবান্তর হইলেও না বলিয়া পারিলাম না। একাধারে এমন লাঞ্ছিত ও সমাদৃত, নজরুলের মতো আধুনিক কবিদের মধ্যে অল্পই আছে। কবির কণ্ঠে কুসুমের মালার পরিবর্তে নজরুলের ভাগ্যদোষে তাহা কণ্ঠকেই ভরিয়া আছে, এই কণ্টকমালার প্রতি কণ্টকমুখে যে জ্বালা বিচ্ছুরিত হয়, তাহার দাহে হয় মানুষ মরে, নয় গরলপায়ী নীলকণ্ঠের মতোই অমর হয়। বিধাতা তার সুখ-দুঃখের চাকা মানুষের অদৃষ্টের পথে পর্যায়ক্রমে ঘুরাইয়া নিয়া ফিরিতেছে—যেমন আকাশপথে দিবস-রাত্রি একের পর অপরে পালা করিয়া ঘুরিয়া মরে। দুঃখের চাকা শেষ পাক খাইয়া যখন অদৃশ্য হইবে, সেদিন যে কবির কণ্ঠের কণ্টক-মালার প্রতিটি কাঁটা গোলাপ হইয়া পলকে ফুটিয়া উঠিবে—এ তো মিথ্যা দুরাশা নয়।

কবি নজরুলের লেখায় ফিলজফি নাই—একটা নালিশ তাঁর সম্বন্ধে শোনা যায়। এ অভিযোগ সত্যি হইলে দুঃখ নাই—মিথ্যা হইলে তো কথা থাকে না। তবু কথাটা না থাকাই উচিত। যাহা কবির লেখায় নাই তাহার জন্য তাহাকে অপরাধী করিয়া বড় জোর গালমন্দ দেওয়া যায়, নিন্দা করা যায় ; কিন্তু কবিকে চেনা যায় না। যাহা তাঁহার আছে, তাহাই দিয়াই তাঁহাকে চিনিতে হইবে। মরুভূমির কাছে জল চাহিলে সে মরীচিকার ছলনাই করে—পিপাসা মিটায় না। নজরুল কবি, ফিলজফি চাহিলে চলিবে কেন? তাঁর কাছে যাহা চাহিতে হয় তাহা নিয়াই সমালোচনা তো করিতে হইবে।

নজরুলের প্রতি রক্তবিন্দুটি ভালবাসায় রক্তরঙিন। ভালবাসা নিয়া তিনি দর্শনশাস্ত্র রচনা করেন নাই, ব্যথায় গানই গাহিয়াছেন। রামগিরির বিরহী যক্ষ ইচ্ছা করিলে আষাঢ়ের প্রথম মেঘমালার কাছে বিরহের একটা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রূপ বর্ণনা করিতে পারিতেন, কিন্তু মেঘের হাতে তাঁর অন্তর-ব্যথা সমর্পণ করিতে পারিতেন না। আজও প্রতি বর্ষ মেঘদূতের হাতে সেই আদিম বিরহীর বিরহলিপি দেখিয়া এত দিন পরেও সভ্যজগতের সুখী মানবও বিমনা হয়। যাক—যাহা বলিতেছিলাম।

নজরুল প্রেমিক কবি। এই ধুলোমাটির তুচ্ছ মানুষের প্রেমই তাঁর সম্পদ। তাঁর সমস্ত কবিতা রক্ত-মাংসের মানুষের ব্যথায় ও কামনায় ভরপুর। সে ব্যথা যে পায় নাই—সেই অরূপ ব্যথার গান বিনাইয়া বিনাইয়া সে গাহে নাই। নিত্যকার মানুষ যে ব্যথা পায়—কাঁদিয়া আকুল হয়—তাহারই ব্যথায় সিন্ধু মথিত করিয়া কবির কাব্য জন্ম নিয়াছে।

সর্বশেষে তাহাই বলি প্রথমেই যে কথা বলা উচিত ছিল নজরুলের লেখার সমালোচনা-প্রসঙ্গে। নজরুল যৌবনের কবি। যৌবনের যে দিকটা খ্যাপা রুদ্রের মতোই ধ্বংস-মাতাল, সেদিকের সাথে কবিকে আমরা যে ডমরু বাজাইতে শুনিয়াছি তাহা অতুলনীয়। দেশের অধীনতা ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান আজ বাংলা সাহিত্যের গর্বের সামগ্রী।

যৌবনের অপর দিক—যেদিকে যৌবনের প্রতি পদক্ষেপে, সৃজনের নব নব শতদল রূপের সঙ্গে অসংখ্য জয়ধ্বনি তুলিয়া সারি বাঁধিয়া ফুটিয়া ওঠে, সে দিকের কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই মনে পড়ে বিদ্রোহীর আত্ম-সমর্পণ—

হে মোর রানি, তোমার কাছে
হার মানি আজ শেষে।

বিদ্রোহী শান্ত হইয়াছে, তার রানির কাছে নত হইয়া পরাজয় ভিক্ষা মাগিতেছে। পদতলে নত যৌবন অঙ্গুলি ইঙ্গিতে দেখাইতেছে 'এই সমরজয়ী অমর তরবারি' এই ক্লান্ত মুঠিতে শিথিল হইয়া আসিয়াছে, ওই দেখো বিদ্রোহীর রক্তরথের চূড়ায় তোমার নীলাম্বরী পতাকা হইয়া দুলিতেছে। আমি হার মানি, ওগো রানি, আমি হার মানি। বিদ্রোহী, যৌবনের এই পরাজয়, এই হার মানাই তোমার গলার হার হোক।

এই হার মানার সাথে রবীন্দ্রনাথের 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর' কবিতার পরম মিল আছে। সেখানেও যুদ্ধঅস্ত্র ধনুঃশর ফেলিয়া ভূতলে রানির রক্তপদতলে প্রেমিক ভিক্ষা মাগিতেছে—আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর, আমি তব স্বেচ্ছাবন্দী দাস।

এই 'শ্যামলা বিপুল ধরণীর পানে' চাহিয়া কবি মুগ্ধ মনে যে গান গাহিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। এই গন্ধ-বরণের যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া সে চিরন্তন প্রেয়সী ডাকে—এ হার মানি, তারই জওয়াব।

কবির গানখানি কহিবার আগে আইরিশ কবি ইয়েট্সের একটা গ্রাম্য কবিতা মনে পড়িল। মাঠের পথে গ্রাম্য বালা একা গাহিয়া চলিয়াছে—ওগো আমার প্রিয়, আমি তো দিকে দিকে আমার সন্ধান সমেত ছড়াইয়া রাখিয়াছি, তবু তুমি আমার কাছে আসিতে পারিলে না, সে কি আমার অপরাধ? বসন্তের বনভূমিকে জিজ্ঞাসা করো, সে আমার সন্ধান জানে ; হেমন্তের গোধূলি-বেলায় আমার সোনার লিখন-পথের সঙ্কেত কহে ; বর্ষাদিগন্তের শ্রাবণ-রেখায় দিগবধূ আমারই দেশের পথ দেখায় ; ধরণীর তৃণে তৃণে

আমার সোনার পুরীর অভিমুখে গোপন পথ পড়িয়াছে—তুমি যদি তাহা না জানো, সে কি আমার অপরাধ প্রিয়, সে কি আমার অপরাধ ! এই হইল আইরিশ-কবির সে কবিতার মূল সুর !

নজরুলের গানখানি এই—

আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদি ?
খুলে দাও রঙমহলার তিমির দুয়ার ডাকিলে যদি।

যদি ডাকিলে, তবে নিখিলরানি, তোমার এই বিচিত্র রূপরঙিন তিমির-দুয়ার খোলো, খোলো, রানি, তোমার দুয়ার খোলো। শুনিয়াই রবীন্দ্রনাথের সে কথা মনে পড়ে—'কে দিয়াছে হেন শাপ কেন ব্যবধান ?/কেন কাঁদে ঊর্ধ্বে চেয়ে ব্যর্থমনোরথ ?' আরও মনে পড়ে রাধিকাকে ক্রোড়ে লইয়া বিরহভিতু কৃষ্ণের কান্না। সেখানেও প্রশ্ন—'কে দিয়াছে হেন শাপ কেন ব্যবধান ?'

কবি কাঁদিয়া চলিয়াছে, গুলবাগিচায় চৈতী হাওয়ায় তোমার লিপি পাঠাইয়াছ—সে খবর কহিতে গিয়া কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া চোখদুটি লাল করঞ্জা করিয়া ফেলিল। ওগো আমার দরদি !

পাঠালে ঘূর্ণি-দূতী ঝড়-কপোতী বৈশাখে সখি,
বরষায় সেই ভরসায় মোর পানে চায় জলভরা নদী।

'বরষায় মোর পানে চায় জলভরা নদী'—একটি সুরের টানে কবি অনন্ত দিনের বিরহিণীর যে ছলছল আঁখির ছবি আঁকিয়াছে, এর তুলনা নাই ; এ অনবদ্য—অপূর্ব।

কবির গান চলে—

পউষের শূন্য মাঠে একলা বাটে চাও বিরহিণী,
দুহুঁ হায় চাই বিষাদে মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা জলধি।

তোমার আর আমার মাঝে বহিয়া চলিয়াছে হায়, কোন্ অজানা অভিশাপের মতো এই তৃষ্ণার জলধি। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা—

মিলনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিচ্ছেদ বেদনায় ;

এই চিরন্তন তৃষ্ণাজলধির ব্যবধান—এই দুস্তর বিরহ কেমন করিয়া পার হই—তখনই মানবাত্মা কাঁদিয়া আকুল হইয়া লুটাইয়া পড়ে—'ওগো, দুহুঁ হায় চাই বিষাদে মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা জলধি !' এই গানের ছোঁয়া লাগিয়া বুকের মাঝে যেন কেমন একটা ব্যথা তির্‌তির্ করিয়া কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনাইয়া ওঠে ; যাকে পাই নাই কোনো দিন, যাকে হারাই নাই কখনও—তার জন্যই কেমন একটু অবুঝ ব্যথা এমনই সত্য হইয়া উঠে যে, ঊর্ধ্বের তিমির আকাশে দেখি অন্ধকার কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, দেখি—

তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার সঙ্গ সুধারস।

—রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু কবি আশ্বাস শুনায়—

ওরে মন, এই ভোরের মলয়ার সাথে বলয় বন্ধন হউক তোমার এই তিমির-দুয়ার চিরবন্ধ রহিবে আর কতকাল?

মানুষ, রক্তমাংসে সে সীমাবদ্ধ মানুষ—এই বোধ যখন তার হয়, তখন সে আবিষ্কার করে যে, বিশ্বের এই অস্তিত্বের পিছনে একটা মর্মান্তিক ব্যথার নদী চিরবহমান—সে ধারা নিয়তির মতোই অমোঘ—দুর্বার নিষ্ঠুর। সে নদীর ছলছল গানের সাথেই সব কবি তাল রাখিয়া তাদের বীণার তার বাঁধে। কাজী নজরুল সে ব্যথা-বারিধির অনন্ত কলধ্বনিকে বুক ভরিয়া আনিয়াছে।

সব কবিরই এই ব্যথাই মূলধন। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যথার আঘাতে কাঁদিয়া ধাবমান বলাকার পলাতক পাখার স্পন্দনে আকুল হইয়া কহিলেন—

হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে।

এই ব্যথার সাধনায় রবীন্দ্রনাথ ঋষির মতোই সত্যদ্রষ্ট হইয়াছেন। পৃথিবীকে এক ক্ষণভঙ্গুর মাটির ভাণ্ড হইতে ঊর্ধ্বে—বহু ঊর্ধ্বে অমৃতের সন্ধানে চোখ ফিরাইতে কহিয়াছেন। এ-দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বিশ্বকে বিশ্বাতীত আশ্রয়ে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন তিনি।

কিন্তু ব্যথার আঘাতে নজরুল এই চোখের জলে সিক্ত সুন্দর ধরণীকে ছাড়িয়া যায় নাই। সে জানে বিরাট মৃত্যুর ভাঙনকূলে সৃষ্টির ঘর। খণ্ড পরমায়ুর আশ্রয়গুলি মুহুর্মুহু হইবে, মৃত্যুর কালো জলের ডাক ঐ শুনা যায়, ততই সে বেশি করিয়া ভালবাসিয়াছে। এই ধূলিমাটির বেদনার বন্ধনকে আরও সবলে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যথায় উদাসীন বৈরাগীর নির্লিপ্ত নির্বিকার শান্তির আভাস আছে; কিন্তু নজরুলের ব্যথায় মৃত্যুশীতল মানুষের হারাইবার বেদনা, পাইয়া না রাখিতে পারার জ্বালা আছে। ব্যথা সে পাইয়াছে—ইহাই তাহার কাছে সত্য, তাই ধরণীর গাত্রে আর কোনো সান্ত্বনার মিথ্যা আবরণ সে পরায় নাই।

রবীন্দ্রনাথ—'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল' কবিতায় একটা ব্যথাতুর মানবাত্মার মুক্তি-কান্নাকে বাঁধিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই কান্নার অন্তরালে একটা বিবাগী বাউল যে আপন মনে অতি সঙ্গোপনে একতারা বাজাইয়া চলিয়াছে—তাহা যেন আভাসের মতো টের পাওয়া যায়। 'কবে ফুরাবে সব খেলা জানিস্ যদি বল' শেষের মধ্যে নিজের এই ব্যথার একটা সমাপ্তি রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন—নিজকে শেষের একটা রূপহীন কায়াহীন নির্বিকার শান্তির ছোরা দিয়া ব্যথাকে হত্যা করিয়াছেন।

নজরুল প্রকৃতিতে রবীন্দ্রনাথ হইতে স্বতন্ত্র—একটা শেষের সন্ধান যে চাহে নাই। ব্যথা তার এত প্রবল যে শেষকে পর্যন্ত কামনা করিবার অবকাশ থাকে না। সে এই ব্যথামাখা প্রেমিকের চোখে পৃথিবীকে দেখিয়াছে—আর দেখিয়াই চলিয়াছে। নিম্নের সন্ধ্যার এই গানখানিতে 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল'—সে সুরও আছে, নারীর

যৌবন–জোয়ারের পানি না ফিরে গো আর, যৌবনের এই আসন্ন ভাঁটার ভীতি আছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকের বেদনা আছে। অবশ্য কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতার সাথে একই স্তরে রাখিয়া বিচার করা চলে না—কারণ দুটি দু'ধরনের কবিতা।

এই কবিতার সুর একটি নিরবচ্ছিন্ন সুর নহে। কোন্ খেয়ালি অসাবধানে বিরহ মিলনের তার দুটির সাথে বৈরাগ্যের একটু রেশ জড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে যে, ছড় চালাইলেই একটা অপূর্ব কান্না হৃদয়ের রন্ধ্রে মোচড় খাইয়া ওঠে, কবি কহে—

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরনে চলো লো গোরী।

তারপরে যে সুরটুকু আসে, তাহা যে ওই একাকিনীর ব্যথাটুকুই শুধু আনে, তা নয়, এই মূক বোবা প্রকৃতির সাথে ব্যথাতুর মানবাত্মার কথার যে কানাকানি চলে, সে খবরটুকুও আনে। তাই শুনি—

চল জলে চল কাঁদে বনতল
ডাকে ছলছল জললহরী।

ব্যথা এত নিবিড় হয় যে, বনতলে কান্না শুনা যায়—তার জন্য যে গাগরি কাঁখে জলকে এই পথে যাইবে। গাঁয়ের নদীটি পর্যন্ত আঙ্গিনায় নীরব বধূটিকে বেলাশেষের সুরে ডাকে—ওগো, বেলা যে যায়, জলকে এস। ব্যথা কত একান্ত হইলে সন্ধ্যার বনতল ও নদীতরঙ্গে তাহা বিলানো চলে—তাহাই ভাবি।

তারপর কবি সন্ধ্যার যে ছবি দিয়াছে তাহা সত্যই রক্তমাংসের মানুষের ব্যথায় ও বেদনায় পুঞ্জিত। কবি 'দিবা অবসান হলো' বলিয়া পূরবীর ম্লান বৈরাগ্য রাগিণী গাহে নাই। কিংবা—

ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা

বলিয়া একটা সীমাহীন মনের আবেগহীন নির্লিপ্ত মহান উদাসীনতাও প্রকাশ করে নাই।

কবি কহিল—

দিবা চলে যায় বলাকা–পাখায়
বিহগের বুকে বিহগী লুকায়,
কেঁদে চখাচখি মাগিছে বিদায়
বারোয়াঁর সুরে ঝুরে বাঁশরি।

সন্ধ্যার সমস্ত ছবি কবি বাদ দিল। নির্জন আঙিনায় একাকিনী যে বসিয়া আছে তাকে গিয়া কহিল,—'দিবা চলিয়া যাইতেছে ; সখি, বিহগের বুকে বিহগি লুকায়, চখাচখি কাঁদিয়া রাত্রির মতো বিদায় লইতেছে।' আর কোনো কথা না কহিবার অর্থ কি? অন্য সমস্ত কথা বাদ দিয়া এই খবর দিবার মাঝেই কবির বিশেষত্ব। সন্ধ্যার ছবি ধীরে ধীরে চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই, যে 'বিজনের একাকিনীকে'

কেন একা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, 'জলকে যাবে না' বলিয়া প্রশ্ন করা হইয়াছিল, সন্ধ্যায় তার অন্তর-ব্যথা এই দুইটি ছবির মাঝে ধরা দিয়াছে—'কেন' প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হইয়াছে।

সন্ধ্যার এই ছবি চয়নে যে কৃতিত্ব কবি দেখাইয়াছে তাহা অনিন্দনীয়। সেই একই মনোভাব ও রুচি ছবি সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছে—

সাঁঝ হেরে মুখ চাঁদ-মুকুরে
ছায়াপথ-সিঁথি রচি চিকুরে,

রসের দিক দিয়াই যে শুধু অপূর্ব তা নয়, বর্ণনার দিক দিয়াও এই কয় ছত্র সাহিত্যে অপূর্ব। তার পরে পাই—

নাচে ছায়া-নটী কানন-পুরে,
দুলে লটপট লতা-কবরী।

এখানেও চিত্র-নির্বাচনে প্রেমিক-মনের সেই সূক্ষ্মতার আভাস পাই। 'ছায়া-নটী' ও 'লতা-কবরী' শব্দ দুইটির সাহায্যেই কবি বিচিত্র একটি প্রেমাতুর সন্ধ্যার ছবি চোখের সামনে ধরিয়া দিয়াছে; হয়তো দিনান্তে আঙিনার খুঁটি ধরিয়া আসন্ন অভিসারিকা রাধাও একদিন সন্ধ্যার বনতলের পানে চাহিয়া এই দৃশ্যই দেখিয়াছিলেন। সেই ছবি আরও প্রসারিত হয়—

'বেলা গেল বধূ' ডাকে ননদী
চল জল নিতে যাবি লো যদি,
কালো হয়ে আসে সুদূর নদী

'বেলা গেল বধূ' এবং 'চল জল নিতে যাবি লো যদি'—ননদীর এই ডাকে মন কোন্ স্মরণাতীত অতীতের সন্ধ্যার সামনে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়, যখন সে দেখে—

নাগরিকা সাজে সাজে নগরী

শুধু ইহাই নয়। এই 'ননদী' শব্দ এবং 'চল জল নিতে যাবি লো যদি' শব্দে গাঁয়ের শান্ত নম্র সন্ধ্যাটি চোখের উপর অনাড়ম্বর মহিমায় ফুটিয়া ওঠে ; পল্লীর মুদিত দিবসের সন্ধ্যার শান্তিখানি যেন মনকে আসিয়া স্পর্শ করে। সম্মুখে অবসন্ন রজনীর অন্তরালে 'যেন ভিনগাঁর ভীরু মেয়ের' অভিসার-পদধ্বনি শুনিতে পাই।

'কালো হয়ে আসে সুদূর নদী'—এই ছত্রটির ব্যাখ্যা অসম্ভব। ইহা এমন একটি ভাবকে মনের মনে অনুভূতির মতো শিহরন তোলে যে, ভাষার আহরণে তাহাকে রূপ দিয়া বাহু বাড়াইয়া সম্মুখে আনা যায় না। অতি সুকুমার অনুভূতির ন্যায় মনের সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন শান্তনিশীথে নিস্তরঙ্গ সিন্ধুর বুকে একটা নিরবচ্ছিন্ন 'ও-

ও–ও–ম' ধ্বনি কূল হইতে কূলে প্রসারিত হইতে থাকে। কালো হয়ে আসে সুদূর নদী—কম কবির কলমেই এমন অপূর্ব মায়া সৃষ্টি ধরা দেয়। সৌভাগ্যের মতোই ইহা কদাচিৎ আসে।

এই সন্ধ্যার গানের শেষ হইল—

কারে ভেবে বেলা কাঁদিয়া কাটে
ভর আঁখিজলে ঘটগাগরী।

অনেক কিছু লিখিবার ছিল। আমি শুধু আর দুই স্থান হইতে তুলিয়া ক্ষান্ত হইব। ব্যথিতার গান—

কেন কাঁদে পরান কী বেদনায় কারে কহি,
সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি রহি।

যাকে চাই, তার জন্য ব্যথা ও কামনাকে কেমন করিয়া বাহিরের বিশ্ব আমাদের বুক হইতে লুণ্ঠন করিয়া লয় তাহা দেখিবার বস্তু বটে। এ যেন 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে বিশ্বময়' ছড়াইয়া দেওয়ার মতো। তাই তো বিরহিণী ব্যথা এমন করিয়া নালিশ করে, নিজের অক্ষমতা জানায়—

সে থাকে নীল নভে আমি নয়ন–জল সায়রে,
সাতাশ তারার সতীন সাথে সে যে ঘুরে মরে,
কেমনে ধরি সে চাঁদে রাহু নহি।

কবি যাকে ভালবাসে, সে গোপন পায়ে বকুল ছায়ে যাতায়াত করে। সেই—

উষার রাগে সাঁঝের ফাগে
যুগল তাহার কপোল রাঙে
কমল দুলে সূরয্ শশী
নিশীথ চলে আঁধার রাশে।

সূর্যকে প্রেয়সীর খোঁপার ফুল করিয়া গুঁজিয়া দেওয়া কি–যে বিশ্বগ্রাসী তাই ভাবি। এই প্রেমিকই একদিন কহিয়াছিল—

সখি, মদনের বাণ হানা শব্দ শুনিস,
ও যে বিষমাখা মিশকালো দোয়েলার শিস।

সখি, তুমি বুঝি কান পাতিয়া মদনের বাণহানার শব্দ শুনিতেছ? ও তো বাণ নয়, ও যে কালো দোয়েলের শিস সই, ও মদনের বাণহানা শব্দ নয়; সখি, তোমার ভুল, বন–মর্মরে শ্রীপতির পদধ্বনি বলিয়া ধ্রুবের যেমন ভুল হইয়াছিল তেমনই ভুল।

উপরিউক্ত দুই লাইনের তুলনা বাংলাতে কেন, যে–কোনো সাহিত্যেই হোক, অল্পই আছে—এ অতি দুঃসাহসিকের উক্তি হইতে পারে কিন্তু মিথ্যাবাদীর মিথ্যা ভাষণ নয় এ, তা জানি।

কবি বিশ্বরানিকে কহিতেছে। যার কেশে রবি শশীর কমলকলি, অলক খোঁপায় গ্রহের মালা, সাঁঝের শাখায় কানন মাঝে যার বিহগ-কাঁকন বাজে তাঁকেই কবি মিনতি করিয়া কহিতেছে—

তোমার 'লীলা- কমল' করে
নিখিল রানি, দুলাও মোরে।

এ ভক্তের নিবেদন নয়—এ প্রেমিকের আবেদন—

ঢুলাও আমার সুবাসখানি
তোমার মুখের মদির-শ্বাসে।

বাংলায় গজলের বহুল প্রচার সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ নহি। তবু কবির বিদ্বেষীদের বলিতে চাই, বিদ্বেষ ও ঘৃণায় কান বন্ধ করিবেন না। তাদের কাননে যে বুলবুলি উড়িয়া গেল, সে যে বড় ভীরু। দোস্তের মতো আদরে বুকে লইতে না পারিলে বাগিচার মালিকের অপরাধে তার বুলবুলির কণ্ঠ চাপিয়া নির্দয় হত্যা করিবেন না। একবার বুলবুলের কণ্ঠ-শিসে গজল শুনুন। তারপর যদি ভাল না লাগে তবে সেই বুলবুলই বন্ধু, তোমাকে এই বলিয়া আদাব জানাইবে—

স্বপনের স্মৃতি প্রিয়,
জাগরণে ভুলিও.
ভুলে যেও দিবালোকে
রাতের এই আলেয়ারে !

১

ভৈরবী—কাহারবা

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে
দিস্‌নে আজি দোল্।
আজো তার ফুলকলিদের ঘুম টুটেনি
তন্দ্রাতে বিলোল্॥

আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী-বায়
ঝুর্‌ছে নিশিদিন,
আসেনি দখ্‌নে হাওয়া গজল গাওয়া
মৌমাছি বিভোল্॥

কবে সে ফুল-কুমারী ঘোম্‌টা চিরি
আসবে বাহিরে,
শিশিরের স্পর্শসুখে ভাঙবে রে ঘুম
রাঙবে রে কপোল॥

ফাগুনের মুকুল-জাগা দুকূল-ভাঙা
আসবে ফুলেল বান,
কুঁড়িদের ওষ্ঠপুটে লুটবে হাসি,
ফুটবে গালে টোল॥

কবি তুই গন্ধে ভুলে ডুবলি জলে
কূল পেলিনে আর,
ফুলে তোর বুক ভরেছিস আজকে জলে
ভরবে আঁখির কোল॥

২

জৌনপুরী-আশাবরী—কাহারবা

আমারে চোখ-ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী।
খুলে দাও রঙ-মহলার তিমির-দুয়ার ডাকিলে যদি॥

গোপনে চৈতী হাওয়ায় গুল্‌-বাগিচায় পাঠালে লিপি,
দেখে তাই ডাকছে ডালে কু কু বলে কোয়েল ননদী॥

পাঠালে ঘূর্ণি-দূতী ঝড়-কপোতী বৈশাখে সখি,
বরষায় সেই ভরসায় মোর পানে চায় জল-ভরা নদী॥

তোমারি অশ্রু ঝলে শিউলি-তলে সিক্ত শরতে,
হিমানীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙে দাও দ্বার যদি রোধি॥

পউষের শূন্য মাঠে একলা বাটে চাও বিরহিণী,
দুহুঁ হায় চাই বিষাদে মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা-জলধি॥

ভিড়ে যা ভোর-বাতাসে ফুল-সুবাসে রে ভোমর-কবি,
ঊষসীর শিশ-মহলে আসতে যদি চাস নিরবধি॥

৩

ইমন-মিশ্র গজল—কাহারবা

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চল লো গোরী।
চল জলে চল কাঁদে বনতল,
ডাকে ছলছল জল-লহরী॥

দিবা চলে যায় বলাকা-পাখায়,
বিহগের বুকে বিহগী লুকায়!
কেঁদে চখা-চখি মাগিছে বিদায়
বারোয়াঁর সুরে ঝুরে বাঁশরি॥

সাঁঝ হেরে মুখ চাঁদ-মুকুরে
ছায়াপথ-সিঁথি রচি চিকুরে,
নাচে ছায়া-নটী কানন-পুরে
দুলে লটপট লতা-কবরী॥

'বেলা গেল বধূ' ডাকে ননদী,
চল জল নিতে যাবি লো যদি,
কালো হয়ে আসে সুদূর নদী,
নাগরিকা–সাজে সাজে নগরী॥

মাঝি বাঁধে তরী সিনান–ঘাটে,
ফিরিছে পথিক বিজন মাঠে,
কারে ভেবে বেলা কাঁদিয়া কাটে
ভর আঁখি–জলে ঘট গাগরী॥

ওগো বে–দরদী, ও রাঙা পায়ে
মালা হয়ে কে গো গেল জড়ায়ে !
তব সাথে কবি পড়িল দায়ে
পায়ে রাখি তারে না গলে পরি॥

৪

পিলু–কাহার্‌বা—দাদ্‌রা

ভুলি কেমনে আজো যে মনে
বেদনা–সনে রহিল আঁকা
আজো সজনী দিন রজনী
সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা॥

আগে মন করলে চুরি
মর্মে শেষে হানলে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা
তবু যেন তা মধুতে মাখা॥

চকোরী দেখলে চাঁদে
দূর হতে সই আজো কাঁদে,
আজো বাদলে ঝুলন ঝোলে
তেমনি জলে চলে বলাকা॥

বকুলের তলায় দোদুল
কাজলা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল,
চলে নাগরী কাঁখে গাগরী
চরণ ভারি কোমর বাঁকা॥

তরুরা রিক্ত-পাতা
আসল লো তাই ফুল-বারতা,
ফুলেরা গলে ঝরেছে বলে
ভরেছে ফলে বিটপি-শাখা॥

ডালে তোর হানলে আঘাত
দিস রে কবি ফুল-সওগাত,
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে
বনে কি দুলে ফুল-পতাকা॥

৫

মিশ্র বেহাগ-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

কেন কাঁদে পরান কী বেদনায় কারে কহি।
সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি রহি॥

সে থাকে নীল নভে আমি নয়ন-জল-সায়রে
সাতাশ তারার সতিন-সাথে সে যে ঘুরে মরে,
কেমনে ধরি সে চাঁদে রাহু নহি॥

কাজল করি যারে রাখি গো আঁখি-পাতে,
স্বপনে যায় সে ধুয়ে গোপন অশ্রু-সাথে!

বুকে তায় মালা করি রাখিলে যায় সে চুরি,
বাঁধিলে বলয়-সাথে মলয়ায় যায় সে উড়ি
কি দিয়ে সে উদাসীর মন মোহি॥

৬

সিন্ধু-ভৈরবী—কাহারবা

মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে
গোপন পায়ে কে ঐ আসে,
আকাশ-ছাওয়া চোখের চাওয়া
উতল হাওয়া কেশের বাসে॥

উষার রাগে সাঁঝের ফাগে
যুগল তাহার কপোল রাঙে,
কমল দুলে সূরয্ শশী
নিশীথ-চুলে আঁধার-রাশে॥

চরণ-ছোঁওয়ায় পাতার ঠোঁটে
মুকুল কাঁপে কুসুম ফোটে,
আঁখির পলক- পতন-ছাঁদে
নিশীথ কাঁদে দিবস হাসে॥

গ্রহের মালা অলখ-খোঁপায়,
কপোল শোভে তারার টোপায়,
কুসুম-কাঁটায় আঁচল-বাধে
রুমাল লুটায় সবুজ ঘাসে॥

সাঁঝের শাখায় কানন মাঝে
বালার বিহগ- কাঁকন বাজে,
জীবন তাহার সোনার স্বপন
দোলায় ঘুমায় শিশুর পাশে॥

তোমার লীলা- কমল করে
নিখিল-রানি! দুলাও মোরে।
ঢুলাও আমার সুবাসখানি
তোমার মুখের মদির-শ্বাসে॥

৭

ভৈরবী-আশাবরী—কাহারবা

কে বিদেশি বন-উদাসী
বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে।
সুর-সোহাগে তন্দ্রা লাগে
কুসুম-বাগের গুল-বদনে॥

ঝিমিয়ে আসে ভোমোরা-পাখা,
যুঁথির চোখে আবেশ মাখা,
কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা
(ভোর গগনের দর-দালানে)
দর-দালানে ভোর গগনে॥

লজ্জাবতীর লুলিত লতায়
শিহর লাগে পুলক-ব্যথায়,
মালিকা সম বঁধুরে জড়ায়
বালিকা-বধূ সুখ-স্বপনে॥

সহসা জাগি আধেক রাতে
শুনি সে বাঁশি বাজে হিয়াতে,
বাহু-শিথানে কেন কে জানে
কাঁদে গো পিয়া বাঁশির সনে॥

বৃথাই গাঁথি কথার মালা
লুকাস কবি বুকের জ্বালা,
কাঁদে নিরালা বন্‌শিওয়ালা
তোরি উতলা বিরহী মনে॥

৮

সিন্ধু—কাওয়ালি

করুণ কেন অরুণ আঁখি
দাও গো সাকি দাও শারাব।

হায় সাকি এ আঙ্গুরি খুন,
নয় ও হিয়ার খুন-খারাব ॥

দুর্দিনের এই দারুণ দিনে
শরণ নিলাম পান-শালায়,
হায় সাহারার প্রখর তাপে
পরান কাঁপে দিল্‌-কাবাব ॥

আর সহে না দিল্‌ নিয়ে এই
দিল্‌-দরদির দিল্‌লগি,
তাই তো চালাই নীল পেয়ালায়
লাল শিরাজী বে-হিসাব ॥

এই শারাবের নেশার রঙে
নয়ন-জলের রঙ লুকাই,
দেখছি আঁধার জীবন ভরি
ভর-পিয়ালার লাল খোয়াব ॥

আমার বুকের শূন্যে কে গো
ব্যথার তারে ছড় চালায়,
গাইছি খুশির মহফিলে গান
বেদন-গুণীর বীণ্‌ রবাব্‌ ॥

হারাম কি এই রঙিন পানি,
আর হালাল এই জল চোখের ?
নরক আমার হউক মঞ্জুর,
বিদায় বন্ধু, লও আদাব ॥

দেখ রে কবি, প্রিয়ার ছবি
এই শারাবের আর্শিতে,
লাল গেলাসের কাচ্‌-মহলার
পার হতে তার শোন্‌ জওয়াব ॥

৯

মান্দ্‌—কাওয়ালি

এত জল ও-কাজল-চোখে
পাষাণী, আনলে বলো কে।
টলমল জল-মোতির মালা
দুলিছে ঝালর-পলকে॥

দিল কি পুব্‌-হাওয়াতে দোল্‌,
বুকে কি বিঁধিল কেয়া?
কাঁদিয়া কুটিলে গগন
এলায়ে ঝামর-অলকে॥

চলিতে পৈঁচি কি হাতের
বাধিল বৈঁচি কাঁটাতে?
ছাড়াতে কাঁচুলির কাঁটা
বিঁধিল হিয়ার ফলকে॥

যে দিনে মোর দেওয়া-মালা
ছিঁড়িলে আনমনে সখি,
জড়াল জুঁই-কুসুমি-হার
বেণীতে সেদিন ওলো কে॥

যে-পথে নীর ভরণে যাও
বসে রই সেই পথ-পাশে,
দেখি, নিত্‌ কার পানে চাহি
কলসির সলিল ছলকে॥

মুকুলী মন সেধে সেধে
কেবলি ফিরিনু কেঁদে,
সরসীর ঢেউ পলায় ছুটি
না ছুঁতেই নলিন্‌-নোলকে॥

বুকে তোর সাত সাগরের জল,
পিপাসা মিট্‌ল না কবি,
ফটিক-জল! জল খুঁজিস যেথায়
কেবলি তড়িৎ ঝলকে॥

১০

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা

আসে বসন্ত ফুলবনে
সাজে বনভূমি সুন্দরী।
চরণে পায়েলা রুমুঝুমু
মধুপ উঠিছে গুঞ্জরি॥

ফুলরেণু–মাখা দখিনা বায়
বাতাস করিছে বন–বালায়,
বন–কবরী–নিকুঞ্জ–ছায়
মুকুলিকা ওঠে মুঞ্জরি॥

কুহু আজি ডাকে মুহুমুহু,
‘পিউ কাঁহা’ কাঁদে উহু উহু
পাখায় পাখায় দোঁহে দুহুঁ
বাঁধে চঞ্চুর চঞ্চুরী॥

দুলে আলো–ছায়া বন–দুকূল,
ওড়ে প্রজাপতি কল্‌কা ফুল,
কর্ণে অতসী স্বর্ণ–দুল
আলোক–লতার সাত–নোরী॥

পদ্ম ডলিয়া পায়ে বালা
করিয়াছে সারা বন আলা,
দ্বারে মঞ্জরী–দীপ জ্বালা,
ডালপালা রচে ফুলছড়ি॥

কবি, তোর ফুল–মালি কেমন,
ফাগুনে শূন্য পুষ্পবন,
বরিবি বঁধুরে এলে কানন
রিক্ত হাতে কি ভুল ভরি॥

১১

কাফি-সিন্ধু—কাহারবা

দুরন্ত বায়ু পুরবইয়াঁ
বহে অধীর আনন্দে।
তরঙ্গে দুলে আজি নাইয়াঁ
রণ-তুরঙ্গ-ছন্দে॥

অশান্ত অম্বর-মাঝে
মৃদঙ্গ গুরুগুরু বাজে,
আতঙ্কে থরথর অঙ্গ
মন অনন্তে বন্দে॥

ভুজঙ্গী দামিনীর দাহে
দিগন্ত শিহরিয়া চাহে,
বিষণ্ণ ভয়-ভীতা যামিনী
খোঁজে সেতারা চন্দে॥

মালঞ্চে এ কি ফুল-খেলা
আনন্দে ফোটে যূথি বেলা,
কুরঙ্গী নাচে শিখী-সঙ্গে
মাতি কদম্ব-গন্ধে॥

একান্তে তরুণী তমালী
অপাঙ্গে মাখে আজি কালি,
বনান্তে বাঁধা প'ল দেয়া
কেয়া-বেণীর বন্ধে॥

দিনান্তে বসি কবি একা
পড়িস কি জলধারা-লেখা,
হিয়ায় কি কাঁদে কুহু-কেকা
আজি অশান্ত দ্বন্দ্বে॥

১২

বাগেশ্রী-পিলু—কাহারবা

চেয়ো না সুনয়না
আর চেয়ো না এ নয়ন পানে।
জানিতে নাইকো বাকি
সই ও আঁখি কী জাদু জানে॥

একে ঐ চাউনি বাঁকা
সুর্মা–আঁকা, তায় ডাগর আঁখি।
বধিতে তায় কেন সাধ
যে মরেছে ঐ আঁখি–বাণে॥

কাননে হরিণ কাঁদে,
সলিল–ফাঁদে ঝুরছে শফরি,
বাঁকায়ে ভুরুর ধনু
ফুল–অতনু কুসুম–শর হানে॥

কুনাল কি পড়ল ধরা!
পীযূষ–ভরা ঐ চাঁদো মুখে,
কাঁদিছে নার্গিসের ফুল
লাল কপোলের কমল–বাগানে॥

জ্বলিছে দিবস রাতি
মোমের বাতি রূপের দেওয়ালি,
নিশিদিন তাই কি জ্বলি
পড়ছ গলি অঝোর নয়ানে॥

মিছে তুই কথার কাঁটায়
সুর বিঁধে হায় হার গাঁথিস কবি,
বিকিয়ে যায় রে মালা
আয় নিরালা আঁখির দোকানে॥

১৩

পিলু-দাদ্‌রা

পরান-প্রিয় ! কেন এলে অবেলায়।
শীতল হিমেল বায়ে ফুল ঝরে যায়॥

সেদিনো সকালবেলা
খেলেছি কুসুম-খেলা,
আজি যে কাঁদি একেলা
এ ভাঙা মেলায়,
কেন এলে অবেলায়॥

ক্লান্ত দিবস দুরে
কাঁদিছে পিলুর সুরে,
কেন শত পথ ঘুরে
আসিলে হেথায়॥

১৪

ভৈরবী—খং

সখি জাগো, রজনী পোহায়।
মলিন কামিনী-ফুল যামিনী-গলায়॥

চলিছে বধূ সিনানে
বসন না বশ মানে,
শিথিল আঁচল টানে
পথের কাঁটায়॥

১৫

ভৈরবী—কাহারবা

নিশি ভোর হলো জাগিয়া
পরান-পিয়া।

কাঁদে 'পিউ কাহাঁ' পাপিয়া
পরান-পিয়া॥

ভুলি বুলবুলি-সোহাগে
কত গুল্‌বদনী জাগে,
রাতি গুল্‌সনে যাপিয়া
পরান-পিয়া॥

জেগে রয় জাগার সাথী
দূরে চাঁদ, শিয়রে বাতি,
কাঁদি ফুল-শয়ন পাতিয়া,
পরান-পিয়া॥

কত আর সাজাব ডালা,
বাসি হয় নিতি যে মালা,
কত দূর যাব ভাসিয়া,
পরান-পিয়া॥

গেয়ে গান চেয়ে কাহারে
জেগে র'স্ কবি এপারে
দিলি দান কারে এ হিয়া,
পরান-পিয়া॥

১৬

বৃন্দাবনী সারঙ্ মিশ্র—দাদ্‌রা

এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে।
কেন পুন বাঁশি বাজালে কাফি ললিতে॥

নিশীথ গভীরে
কেন আঁখি-নীরে
এলে ফিরে ফিরে
গোপন কথা বলিতে॥

দলিত কুসুম-দলে রচিয়াছি শয়ন
অন্ধ তিমির রাতি, নিবু-নিবু নয়ন!

মরণ-বেলায় প্রিয়
আনিলে কি অমিয়
এলে কি গো নিঠুর
ঝরা ফুল দলিতে॥

১৭

কালাংড়া—কাওয়ালি

বসিয়া নদীকূলে এলোচুলে
কে উদাসিনী।
কে এলে পথ ভুলে
এ অকূলে বন-হরিণী॥

কলসে জল ভরিয়া চায়
করুণায় কুলবধূরা,
কেঁদে যায় ফুলে ফুলে
পদমূলে সাঁঝ-তটিনী॥

নিশিদিন চাহি তোমারে
ওপারে বাজিছে বাঁশি,
এপারে বাজে বধূর
মল-নূপুর মধু-ভাষিণী॥

আকাশে মেলিয়া আঁখি
লেখা কি পড়িছ পিয়ার,
কে গো সে রূপ-কুমার
তুমি গো যার অনুরাগিণী॥

দলিয়া কত ভাঙা মন
ও চরণ করেছ রাঙা,
কাঁদায়ে কত না দিন
এলে নিখিল-মনোমোহিনী॥

হারালি গোধূলি-লগন,
কবি, কোন্ নদী-কিনারে,
একি সেই স্বপন-চাঁদ
পেতেছে ফাঁদ প্রিয়ার সতিনী॥

১৮
বেহাগ—দাদ্‌রা

কেন দিলে এ কাঁটা
যদি গো কুসুম দিলে
ফুটিত না কি কমল
ও কাঁটা না বিঁধিলে॥

কেন এ আঁখি-কূলে
বিধুর অশ্রু দুলে,
কেন দিলে এ হৃদি
যদি না হৃদয় মিলে॥

শীতল মেঘ-নীরে
ডাকিয়া চাতকীরে
নীর ঢালিতে শিরে
বাজ কেন হানিলে॥

যদি ফুটালে মুকুল
কেন শুকাইলে ফুল,
কেন কলঙ্ক-টিপে
চাঁদের ভুরু ভাঙিলে॥

কেন কামনা-ফাঁদে
রূপ-পিপাসা কাঁদে,
শোভিত না কি কপোল
ও কালো তিল নহিলে॥

কাঁটা-নিকুঞ্জে কবি
এঁকে যা সুখের ছবি,
নিজে তুই গোপন র'বি,
তোরি আঁখির সলিলে॥

১৯

বিহারী খাম্বাজ মিশ্র—দাদরা

সখি, বলো বঁধুয়ারে নিরজনে।
দেখা হলে রাতে ফুলবনে॥

কে করে ফুল চুরি জেনেছে ফুলমালি,
কে দেয় গহীন রাতে ফুলের কূলে কালি
জেনেছে ফুলমালি গোপনে॥

কাঁটার আড়ালে গোলাবের বাগে
ফুটায়েছে কুসুম কপট সোহাগে,
সে কুসুম-ঘেরা মেহেদির বেড়া,
প্রহরী ভোমোরা সে কাননে॥

ও পথে চোর-কাঁটা, সখি, তায় বলে দিও,
বেঁধে না বেঁধে না লো যেন তার উত্তরীয় !
এ বনফুল লাগি না আসে কাঁটা দলি,
আপনি যাব আমি বঁধুয়ার কুঞ্জ-গলি,
বিকাব বিনিমূলে ও-চরণে॥

২০

দুর্গা কাওয়ালি

নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি-জল।
মলিন হয়েছে ঘুমে চোখের কাজল॥

হেরিয়া নিশি-প্রভাতে
শিশির কমল-পাতে,
ভাবো বুঝি বেদনাতে
কেঁদেছে কমল॥

মরুতে চরণ ফেলে
কেন বন-মৃগ এলে,

সলিল চাহিতে পেলে
মরীচিকা-ছল॥

এ শুধু শীতের মেঘে
কপট কুয়াশা লেগে
ছলনা উঠেছে জেগে—
এ নহে বাদল॥

কেন কবি খালি খালি
হলি রে চোখের বালি,
কাঁদাতে গিয়া কাঁদালি
নিজেরে কেবল॥

২১

ভৈরবী—কাওয়ালি

এ আঁখি-জল মোছো পিয়া,
ভোলো ভোলো আমারে।
মনে কে গো রাখে তারে
ঝরে যে ফুল আঁধারে॥

ফোটা ফুলে ভরি ডালা
গাঁথো বালা মালিকা,
দলিত এ ফুল লয়ে
দেবে গো বলো কারে॥

স্বপনের স্মৃতি প্রিয়
জাগরণে ভুলিও,
ভুলে যেয়ো দিবালোকে
রাতের আলেয়ারে॥

ঝুরিয়া গেল যে মেঘ
রাতে তব আঙিনায়,
বৃথা তারে খোঁজো প্রাতে
দূর গগন-পারে॥

ঘুমায়েছ সুখে তুমি
সে কেঁদেছে জাগিয়া,
তুমি জাগিলে গো যবে
সে ঘুমায়ে ওপারে॥

আগুনে মিটালি তৃষা
কবি কোন্ অভিমানে,
উদিল নীরদ যবে
দূর বন-কিনারে॥

২২

ভৈরবী—পোস্তা

কি হবে জানিয়া বলো
কেন জল নয়নে।
তুমি তো ঘুমায়ে আছো
সুখে ফুল-শয়নে॥

তুমি কি বুঝিবা বালা
কুসুমে কীটের জ্বালা,
কারো গলে দোলে মালা
কেহ ঝরে পবনে॥

আকাশের আঁখি ভরি
কে জানে কেমন করি
শিশির পড়ে গো ঝরি
ঝরে বারি শাওনে॥

নিশীথে পাপিয়া পাখি
এমনি তো ওঠে ডাকি,
তেমনি ঝুরিছে আঁখি
বুঝি বা অকারণে॥

কে শুধায়, আঁধার চরে
চখা কেন কেঁদে মরে,

এমনি চাতক-তরে
মেঘ ঝুরে গগনে॥

কারে মন দিলি কবি,
এ যে রে পাষাণ ছবি,
এ শুধু রূপের রবি
নিশীথের স্বপনে॥

২৩

বিহারী—ঠুংরি

পরদেশী বঁধুয়া,
এলে কি এতদিনে।
আসিলে এতদিনে
কেমনে পথ চিনে॥

তোমারে খুঁজিয়া
কত রবি শশী
অন্ধ হইল প্রিয়,
নিভিল তিমিরে
তব আশে আকাশ
তারা-দীপ জ্বালি
জাগিয়াছে নিশি
ঝুরিয়া শিশিরে!
শুকায়েছে স্বরগ,
দেবতা, তোমা বিনে॥

কত জনম ধরি
ছিলে বলো পাশরি,
এতদিনে বাঁশরি
বাজিল কি বিপিনে॥

নিতি ফুল-সনে
ফুটিয়া কাননে

ঝরিয়াছি সাঁঝে
নিরাশ হুতাশে,
নব নব গানে
বেদনা নিবেদন
করিয়াছে কবি,
প্রিয়, তব পাশে!
এলে আজি উদাসী
নিখিল-মন জিনে॥

২৪

বেহাগ-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

কেন উচাটন মন
পরান এমন করে।
কেন কাঁদে গো বধূ
বঁধুর বুকে বাসরে॥

কেন মিলন-রাতে
সলিল আঁখি-পাতে,
কেন ফাগুন-প্রাতে
সহসা বাদল ঝরে॥

ডাকিলে অনুরাগে
কেন বিদায় মাগে,
(কেন) মরিতে সাধ জাগে
পিয়ার বুকের 'পরে॥

ডাকিয়া ফুলবনে
থাকে সে আনমনে,
কাঁদায়ে নিরজনে
কাঁদে সে কিসের তরে॥

কবি, তোরে কে কবে
সাধিল বেণুর রবে,
ধরিতে গেলি যবে
বিঁধিল কুসুম-শরে॥

২৫

পিলু-ভৈরবী—কাহার্‌বা

আসিলে এ ভাঙা ঘরে
কে মোর রাঙা অতিথি।
হরষে বরিষে বারি
শাওন-গগন তিতি॥

বকুল-বনের সাকি
নটীন পুবালি হাওয়া
বিলায় সুরভি সুরা,
মাতায় কানন-বীথি॥

বনের কেশর গাঁথে
কদম-কেশর ঝুরি,
শিশির-চুনির হারে
উজল উশীর-সিঁথি॥

তিতির শিখীর সাথে
নোটন-কপোতী নাচে,
ঝিঁঝির ঝিয়ারি গাহে
ঝুমুর কাজরী-গীতি॥

হিঙুল হিজল-তলে,
ডাহুক পিছল-আঁখি,
বধূর তমাল-চোখে
ঘনায় নিশীথ-ভীতি॥

তিমির-ময়ূর আজি
তারার পেখম খোলে,
জড়ায় গগন-গলে
চাঁদের ষোড়শী তিথি॥

মিলন-মালায় বাজে
গোপন মৃণাল-কাঁটা,
নয়ন-জলে কি করি
আঁকিস তাহারি স্মৃতি॥

২৬

কালাড়ো-বসন্ত-হিন্দোল—দাদ্‌রা

আজি দোল-পূর্ণিমাতে দুলবি তোরা আয়।
দখিনার দোল্ লেগেছে দোলন-চাঁপায়॥
দোলে আজ দোল্-ফাগুনে
ফুল-বাণ আঁখির তূণে,
দুলে আজ বিধুর হিয়া মধুর ব্যথায়॥

দুলে আজ শিথিল বেণী, দুলে বধুর মেখলা,
দুলে গো মালার পলা জড়াতে বঁধুর গলা।
মাধবীর দোলন্-লতায়
দোয়েলা দোল্ খেয়ে যায়,
দুলে যায় হল্‌দে পাখি সোঁদাল্-শাখায়॥

বিরহ-শীর্ণা নদীর আজিকে আঁখির কূলে
ভরে জল কানায় কানায় জোয়ারে উঠল দুলে।
দুলে বসন্ত-রানি
কুসুমিত বনানী
পলাশ রঙন দোলে নোটন-খোঁপায়॥

দোলে হিন্দোল-দোলায় ধরণী শ্যাম পিয়ারী,
দুলিছে গ্রহ তারা আলোক-গোপ-ঝিয়ারী।
নীলিমার কোলে বসি
দুলে কলঙ্কী-শশী,
দোলে ফুল-উর্বশী ফুল-দোলনায়॥

২৭

পিলু—দাদ্‌রা

রুমুঝুমু রুমুঝুম্
কে এলে নূপুর-পায়।
ফুটিল শাখে মুকুল
ও রাঙা চরণ-ঘায়॥

সে নাচে তটিনী-জল
টলমল টলমল,
বনের বেণী উতল
ফুলদল মুরছায়॥

বিজুরি জরির আঁচল
ঝলমল ঝলমল,
নামিল নভে বাদল
ছলছল বেদনায়॥

দুলিছে মেখলা-হার
শ্যামলী মেঘমালার,
উড়িছে অলক কার
অলকার ঝরোকায়॥

তালীবন থৈ তাথৈ
করতালি হানে ঐ
কবি, তোর তমালী কই—
শ্বসিছে পুবালি-বায়॥

২৮

সিন্ধু কাফি-খাম্বাজ—যৎ

আজি এ কুসুম-হার সহি কেমনে।
ঝরিল যে ধুলায় চির-অবহেলায়
কেন এ অবহেলায় পড়ে তারে মনে॥

তব তরে মালা গেঁথেছি নিরালা
সে ভরেছে ডালা নিতি নব ফুলে।
(আজি) তুমি এলে যবে বিপুল গরবে
সে শুধু নীরবে মিশাইল বনে॥

আঁখি-জলে ভাসি গাহিত উদাসী
আমি শুধু হাসি আসিয়াছি ফিরে।
(আজি) সুখ-মধুমাসে তুমি যবে পাশে
সে কেন গো আসে কাঁদাতে স্বপনে॥

কার সুখ লাগি রে কবি বিবাগী,
সকল তেয়াগি সাজিলি ভিখারি!
(তুই) কার আঁখি-জলে বেঁচে রবি বলে
ফুলমালা দলে লুকালি গহনে॥

২৯

মালকোষ—ত্রিতালী

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু।
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু॥

সে নাচ-হিল্লোলে জটা-আবর্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন-প্রাঙ্গণে।
আকাশে শূল হানি
শোনাও নব বাণী,
তরাসে কাঁপে প্রাণী
প্রসীদ শম্ভু॥

ললাট-শশী টলি জটায় পড়ে ঢলি,
সে-শশী-চমকে গো বিজুলি ওঠে ঝলি।
ঝাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা,
মুরছে ভয়-ভীতা নিশি নিরঞ্জনা।
আঁধারে পথ-হারা
চাতকী কেঁদে সারা,
যাচিছে বারিধারা
ধরা নিরম্বু॥

৩০

ছায়ানট—কাওয়ালি

হাজার তারার হার হয়ে গো
দুলি আকাশ-বীণার গলে।
তমাল-ডালে ঝুলন ঝুলাই
নাচাই শিখী কদম-তলে॥

'বৌ কথা কও' বলে পাখি
করে যখন ডাকাডাকি,
ব্যথার বুকে চরণ রাখি
নামি বধূর নয়ন-জলে॥

ভয়ঙ্করের কঠিন আঁখি
আঁখির জলে করুণ করি,
নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলি
আকাশ-বধূর নীলাম্বরী।

লুটাই নদীর বালুতটে,
সাধ করে যাই বধূর ঘটে,
সিনান-ঘাটের শিলা-পটে
ঝরি চরণ-ছোঁওয়ার ছলে॥

৩১

হাম্বীর—কাওয়ালি

অধীর অম্বরে গুরু গরজন মৃদঙ্ বাজে।
রুমু রুমু ঝুম্ মঞ্জীর-মালা চরণে আজ উতলা যে॥

এলোচুলে দুলে দুলে বন-পথে চল আলি
মরা গাঙে বালুচরে কাঁদে যথা বন-মরালী।
উগারি গাগরি ঝারি
দে লো দে করুণা ডারি,
ঘুঙট উতারি বারি
ছিটা লো গুমোট সাঁঝে॥

তালীবন হানে তালি, ময়ূরী ইশারা হানে,
আসন পেতেছে ধরা মাঠে মাঠে চারা-ধানে।

মুকুলে ঝরিয়া পড়ি আকূতি জানায় যুথি,
ডাকিছে বিরস শাখে তাপিতা চন্দনা তূতী।
কাজল-আঁখি রসিলি
চাহে খুলি ঝিলিমিলি,
চলো লো চলো সেহেলি,
নিয়ে মেঘ-নটরাজে॥

৩২

দেশ-সুরট—একতালা

ঝরে ঝরঝর কোন্ গভীর গোপন ধারা এ শাঙনে।
আজি রহিয়া রহিয়া গুমরায় হিয়া একা এ আঙনে॥

ঘনিমা ঘনায় ঝাউ-বীথিকায় বেণু-বন-ছায় রে,
ডাহুকিরে খুঁজি ডাহুক কাঁদে আঁধার গহনে॥

কেয়া-বনে দেয়া তূণীর বাঁধিয়া
গগনে গগনে ফেরে গো কাঁদিয়া।
বেতস-বিতানে নীপ-তরুতলে
শিখী নাচ ভোলে পুছ-পাখা টলে।

মালতী-লতায় এলাইয়া বেণী কাঁদে বিষাদিনী রে,
কাজল-আঁখি কে নয়ন মোছে তমাল-কাননে॥

৩৩

জয়জয়ন্তী—একতালা

হৃদয় যত নিষেধ হানে নয়ন ততই কাঁদে।
দূরে যত পলাতে চাই নিকট ততই বাঁধে॥

স্বপন-শেষে বিদায়-বেলায়
অলক কাহার জড়ায় গো পায়,
বিধুর কপোল স্মরণ আনায়
ভোরের করুণ চাঁদে॥

বাহির আমার পিছল হলো কাহার চোখের জলে।
স্মরণ ততই বারণ জানায় চরণ যত চলে।

পার হতে চাই মরণ-নদী
দাঁড়ায় কে গো দুয়ার রোধি,
আমায় ওগো বে-দরদী,
ফেলিলে কোন্ ফাঁদে॥

৩৪

কালাংড়া-ভৈরোঁ—আদ্ধা কাওয়ালি

শুকাল মিলন-মালা আমি তবে যাই।
কি যেন এ নদী-কূলে খুঁজিনু বৃথাই॥

রহিল আমার ব্যথা
দলিল কুসুমে গাঁথা,
ঝুরে বলে ঝরা পাতা—
নাই কেহ নাই॥

যে-বিরহে গ্রহতারা সৃজিল আলোক,
সে-বিরহে এ-জীবন জ্বলি পুণ্য হোক্।

চক্রবাক চক্রবাকী
করে যেমন ডাকাডাকি,
তেমনি এ কূলে থাকি
ও-কূলে তাকাই॥

৩৫

দরবারি কানাড়া—ষৎ

স্মরণ-পারের ওগো প্রিয়, তোমায় আমি চিনি যেন।
তোমার চাঁদে চিনি আমি, তুমি আমার তারায় চেন॥

নতুন পরিচয়ের লাগি
তারায় তারায় থাকি জাগি,

বারেবারে মিলন মাগি
বারেবারে হারাই হেন॥

নতুন চোখের প্রদীপ জ্বালি চেয়ে আছি নিরিবিলি,
খোলো প্রিয় তোমার ধরার বাতায়নে ঝিলিমিলি।

নিবাও নিবু-নিবু বাতি,
ডাকে নতুন তারার সাথী,
ওগো আমার দিবস রাতি
কাঁদে বিদায়-কাঁদন কেন॥

৩৬

পিলু—কাহারবা

গহীন রাতে
ঘুম কে এলে ভাঙাতে।
ফুল-হার পরায়ে গলে
দিলে জল নয়ন-পাতে॥

যে জ্বালা পেনু জীবনে
ভুলেছি রাতে স্বপনে,
কে তুমি এসে গোপনে
ছুঁইলে সে বেদনাতে॥

যবে কেঁদেছি একাকী
কেন মুছালে না আঁখি,
নিশি আর নাহি বাকি
বাসি ফুল ঝরিবে প্রাতে॥

কেন এ কুহেলি ঠেলে
দখিনা বাতাস এলে,
কবি তুই হৃদয় মেলে
ছিলি কি এরি আশাতে॥

৩৭

সিন্ধু-কাওয়ালি

কোন্ শরতে পূর্ণিমা-চাঁদ আসিলে এ ধরাতল।
কে মথিল তব তরে কোন্ সে ব্যথার সিন্ধু-জল॥

দুয়ার-ভাঙা জাগল জোয়ার বেদনার ঐ দরিয়ায়।
আজ ভারতী অশ্রুমতী মধ্যে দুলে টলমল॥

কখন তোমার বাজল বেণু প্রাণের বংশী-বট-ছায়।
মরা গাঙের ভাঙা ঘাটে ঘট ভরে গোপিনীদল॥

বিদ্যুতের বাঁকা হাসি হাসিয়া কালো মেঘ,
আসিলে কে অভিমানী বহায়ে মরুতে ঢল॥

লয়ে হাতে জিয়ন-কাঠি আসিলে কে রূপ-কুমার
উঠল জেগে রূপ-কুমারী আঁধারে ঐ ঝলমল॥

আকাশে চকোরী কাঁদে, তড়াগে চাহে কুমুদ,
ঝরুক আঁখির শেফালিকা ছুঁয়ে তব পদতল॥

৩৮

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা

জাগিলে 'পারুল' কিগো 'সাত ভাই চম্পা' ডাকে।
উদিলে চন্দ্র-লেখা বাদলের মেঘের ফাঁকে॥

চলিলে সাগর ঘুরে
অলকার মায়ার পুরে,
ফোটে ফুল নিত্য যথায়
জীবনের ফুল্ল-শাখে॥

আঁধারের বাতায়নে চাহে আজ লক্ষ তারা,
জাগিছে বন্দিনীরা, টুটে ঐ বন্ধ কারা।

থেকো না স্বর্গে ভুলে
এ পারের মর্ত কূলে,
ভিড়ায়ো সোনার তরী
আবার এই নদীর বাঁকে॥

৩৯

খাম্বাজ—আড়-খেমটা

চরণ ফেলি গো মরণ-ছন্দে
মথিয়া চলি গো প্রাণ।
মর্তের মাটি মহীয়ান করি
স্বর্গেরে করি ম্লান॥

চিতার বিভূতি মাখিয়া গায়
লজ্জা হানি গো অন্নদায়,
বাঁধিয়াছি বিদ্যুল্লতায়,
দেবরাজ হতমান।
পাতাল ফুঁড়িয়া করি গো মাতাল
রসাতল-অভিযান॥

৪০

বৃন্দাবনী সারং—ঝাঁপতাল

নমো হে নমো যন্ত্রপতি নমো নমো অশান্ত।
তন্ত্রে তব ত্রস্ত ধরা, সৃষ্টি পথভ্রান্ত॥

বিশ্ব হল বস্তুময়
মন্ত্রে তব হে
নন্দন-আনন্দে তুমি
গ্রাসিলে মহাধ্বান্ত॥

শঙ্কর হে, সে কোন্ সতী-শোকে হয়ে নৃশংস
বসেছ ধ্যানে হয়েছ জড় সাধিতেছ এ ধ্বংস।

রুক্ষ তব দৃষ্টি-দাহে
শুষ্ক সব হে,
ভীষণ তব চক্রঘাতে
নির্জিত যুগান্ত॥

৪১

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা

পুরবের তরুণ অরুণ
পুরবে আসলে ফিরে,
কাঁদায়ে মহাশ্বেতায়
হিমানীর শৈল-শিরে॥

কুহেলির পর্দা ডারি
ঘুমাত রূপ-কুমারী,
জাগালে স্বপনচারী
তাহারে নয়ন-নীরে॥

তোমার ঐ তরুণ গলার
শুনি গান সিন্ধু-পারে,
দুলিছ মধ্যমণি
সুরমার কণ্ঠ-হারে।

খেয়ানী দিলে ধরা,
হলো সুর স্বয়ম্বরা,
এলে কি পাগল-ঝোরা
পাষাণের বক্ষ চিরে॥

৪২

দেশ—গীতঙ্গী

কে শিব-সুন্দর শরৎ-চাঁদ-চূড়
দাঁড়ালে আসিয়া এ অঙ্গনে।
পীড়িত নর-নারী আসিল গেহ ছাড়ি
ভরিল নভতল ক্রন্দনে॥

বেদনা-মন্দিরে আরতি বাজে তব,
কে তুমি সুন্দর শ্মশান-চারী নব,
দিগ্‌দিগন্তরে জীবন-উৎসব-
শঙ্খ শুনি তব আগমনে॥

মৃত্যু-জয়ী তুমি হওনি সুধা পিয়ে,
দুখেরে দহিয়াছ বিষের দাহ দিয়ে।
ভূষণ করি ফণি আদরে দিয়ে দোলা
কি মণি পেলে বলো ওগো ও চির-ভোলা !

কভু সে ডম্বরু বাজাও অম্বরে,
প্রলয়-নর্তন জাগে চরাচরে,
ললাট-জ্বালা-পাশে
চন্দ্র-লেখা হাসে
নবীন সৃষ্টির হরষণে॥

পতিতা গঙ্গায়ে ধরিলে নিজ শিরে,
কন্যারূপে তাই পেলে কি ভারতীরে,
স্বরগ এল নেমে মরতে তব প্রেমে,
নমামি দেব-দেব ও-চরণে॥

৪৩

গারা-ভৈরবী—কাহারবা

কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে
আসলে প্রাতে পুষ্পচোর।
ডাকছে পাখি 'বৌ গো জাগো,
আর ঘুমায় না, রাত্রি ভোর'॥

জুঁই-কুঁড়িরা চোখ মেলে চায়,
চুম্‌কুড়ি দেয় মৌমাছি।
শাপ্‌লা-বনে চাঁদ ডুবে যায়
ম্লান চোখে হায় চায় চকোর॥

ঘোম্‌টা ঠেলি কয় চামেলি,
গোল কোরো না গুল্‌-ডাকাত,
ঢুলছে নয়ন, দুলছে গলায়
বেল-টগরের ছিন্ন ডোর॥

বোরকা খুলি বন-কেতকীর
ফুলরেণুতে রাঙলে গা,
পারুল-বধূর মাগলে মধু,
হাস্‌নাহেনার ভাঙলে দোর॥

গায় কাওয়ালি বাদলি রুম্‌ঝুম,
তয়ফাওয়ালি নাচে মউর্‌
ঝুরছে কদম, মেঘ-তমালে
বিজলি-চোখে চায় কিশোর॥

শোন্‌ রে কবি পুষ্পলোভী
আজ ধরেছি ফুল চুরি,
হুল ফুটিয়ে, ফুলবালাদের
কূল ভুলানো ভাঙবে তোর॥

৪৪

ভীমপলশ্রী—কাহারবা

কেন আনো ফুল-ডোর
আজি বিদায়-বেলা।
মোছো মোছো আঁখি-লোর
যদি ভাঙিল মেলা॥

কেন মেঘের স্বপন
আনো মরুর চোখে,
ভুলে দিয়ো না কুসুম
যারে দিয়েছ হেলা॥

আছে বাহুর বাঁধন
তব শয়ন-সাথী,

আমি এসেছি বাঁধন
আমি চলি একেলা ॥

যবে শুকাল কানন
এলে বিধুর পাখি,
লয়ে কাঁটা-ভরা প্রাণ
একি নিঠুর খেলা ॥

যদি আকাশ-কুসুম
পেলি চকিতে কবি,
চলো চলো মুসাফির,
ডাকে পারের ভেলা ॥

৪৫

(রাতের) দুর্গা—আদ্ধা কাওয়ালি

কেমনে রাখি
আঁখি-বারি চাপিয়া।
প্রাতে কোকিল কাঁদে,
নিশীথে পাপিয়া ॥

এ ভরা ভাদরে
আমার মরা নদী,
উথলি উথলি
উঠিছে নিরবধি।

আমার এ ভাঙা ঘটে
আমার এ হৃদিতটে
চাপিতে গেলে ওঠে
দু'কূল ছাপিয়া ॥

নিষেধ নাহি মানে
আমার পোড়া আঁখি,
জল লুকাব কত
কাজল মাখি মাখি।

ছলনা করে হাসি
অমনি জলে ভাসি,
ছলিতে গিয়া আসি
ভয়েতে কাঁপিয়া॥

গাঁথিতে ফুলমালা
বিঁধে সে কাঁটা হয়ে,
কাঁটার হার গাঁথি—
সে আসে ফুল লয়ে।

কবি রে, জলধি এ
তাহারে মন দিয়ে
গেলি রে জল নিয়ে
জীবন ব্যাপিয়া॥

৪৬

(দিনের) দুর্গা—আদ্ধা কাওয়ালি

কেন আসিলে যদি যাবে চলি।
গাঁথিলে না মালা ছিঁড়ে ফুল-কলি॥

কেন বারেবারে আসিয়া দুয়ারে
ফিরে গেলে পারে কথা নাহি বলি॥

কি কথা বলিতে আসিয়া নিশীথে
শুধু ব্যথা-গীতে গেলে মোরে ছলি॥

প্রভাতের বায়ে কুসুম ফুটায়ে
নিশীথে লুকায়ে উড়ে গেল অলি॥

কবি শুধু জানে, কোন্ অভিমানে
চাহি যারে গানে কেন তারে দলি॥

৪৭

যোগিয়া—ঝাঁপতাল

সাজিয়াছ যোগী বলো কার লাগি
তরুণ বিবাগী॥

হেরো তব পায়ে
কাঁদিছে লুটায়ে
নিখিলের প্রিয়া
তব প্রেম মাগি
তরুণ বিবাগী॥

ফাল্গুন কাঁদে
দুয়ারে বিষাদে
খোলো দ্বার খোলো!
যোগী, যোগ ভোলো!

এত গীত হাসি
সব আজি বাসি,
উদাসী গো জাগো!
নব অনুরাগে
জাগো অনুরাগী
তরুণ বিবাগী॥

৪৮

বারোয়াঁ—কাহার্‌বা

মুসাফির! মোছ্ এ আঁখি-জল
ফিরে চল্ আপনারে নিয়া।
আপনি ফুটেছিল ফুল
গিয়াছে আপনি ঝরিয়া॥

রে পাগল! এ কি দুরাশা,
জলে তুই বাঁধিবি বাসা!

মেটে না হেথায় পিয়াসা
হেথা নাই তৃষ্ণা–দরিয়া॥

বরষায় ফুটল না বকুল
পউষে ফুটবে কি সে ফুল,
এ দেশে ঝরে শুধু ভুল
নিরাশার কানন ভরিয়া॥

রে কবি, কতই দেয়ালি
জ্বালিলি তোর আলো জ্বালি,
এল না তোর বনমালি
আঁধার আজ তোরই দুনিয়া॥

৪৯

মন্দ্—কাহারবা

এ নহে বিলাস বন্ধু, ফুটেছি জলে কমল।
এ যে ব্যথা–রাঙা হৃদয় আঁখি–জলে টলমল॥

কোমল মৃণাল–দেহ ভরেছে কণ্টক–ঘায়,
শরণ লয়েছি গো তাই শীতল দিঘির জল॥

ডুবেছি এ কালো নীরে কত যে জ্বালা সয়ে,
শত ব্যথা ক্ষত লয়ে হইয়াছি শতদল॥

আমার বুকের কাঁদন তুমি বলো ফুল–বাস,
ফিরে যাও, ফেলো না গো শ্বাস
দখিনা বায়ু চপল॥

ফোটে যে কোন্ ক্ষত–মুখে
কবি রে তোর গীত–সুর,
সে ক্ষত দেখিল না কেউ,
দেখিল তোরে কেবল॥

চোখের চাতক

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া বীণাকণ্ঠী
শ্রীমতী প্রতিভা সোম
জয়যুক্তাসু

১

খাম্বাজ-পিলু—দাদ্‌রা

আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়ল তরী
এ কোন্ সোনার গাঁয়।
আমার ভাটির তরী আবার কেন
উজান যেতে চায়॥

আমার দুঃখেরে কাণ্ডারি করি
আমি ভাসিয়েছিলাম ভাঙা তরী,
তুমি ডাক দিলে কে স্বপন-পরী
নয়ন-ইশারায়॥

আমার নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
ডেকেছিল ঝড়ের রাতি,
তুমি কে এলে মোর সুরের সাথী
গানের কিনারায়॥

ওগো সোনার দেশের সোনার মেয়ে,
তুমি হবে কি মোর তরীর নেয়ে,
এবার ভাঙা তরী চলো বেয়ে
রাঙা অলকায়॥

২

জয়জয়ন্তী—একতালা

কাঁদিতে এসেছি আপনারে লয়ে
কাঁদাতে আসিনি হে প্রিয় তোমারে।
এ মম আঁখি-জল আমারি নয়নের
ঝরিবে না এ জল তোমার দুয়ারে॥

ভালো যদি বাসি একাকী বাসব,
বিরহ-পাথারে একাকী ভাসিব।

কভু যদি ভুলে আসি তব কূলে,
চমকি চলিয়া যাব দূর-পারে॥

কাঁটার বনে মোর ক্ষণিকের তরে
ফুটেছ রাঙা ফুল শুধু লীলা-ভরে।
মালা হয়ে কবে দুলিবে গলে কার
জাগিবে একাকী লয়ে স্মৃতি কাঁটার।
কেহ জানিবে না শুকাল কে কোথা,
কার ফুলে কারে সাজালে দেবতা।
নিশীথ-অশ্রু মোর যাইবে শুকায়ে
তব সুখ-দিনে হাসির মাঝারে॥

৩

খাম্বাজ—দাদরা

ছাড়িতে পরান নাহি চায়
তবু যেতে হবে, হায়!
মলয়া মিনতি করে
তবু কুসুম শুকায়॥

রবে না এ মধু-রাতি
জানি তবু মালা গাঁথি,
মালা চলিতে দলিয়া যাবে
তবু চরণে জড়ায়॥

যে-কাঁটার জ্বালা সয়ে
ফোটে ব্যথা ফুল হয়ে,
আমি কাঁদিব সে কাঁটা লয়ে
নিশীথ-বেলায়।

তুমি রবে যবে পরবাসে,
আমি দূর নীলাকাশে
জাগিব তোমারি আশে
নূতন তারায়॥

৪

পূরবী—একতালা

কে তুমি দূরের সাথী
এলে ফুল ঝরার বেলায়।
বিদায়ের বংশী বাজে
ভাঙা মোর প্রাণের মেলায়॥

গোধূলির মায়ায় ভুলে
এলে হায় সন্ধ্যা-কূলে,
দীপহীন মোর দেউলে
এলে কোন্ আলোর খেলায়॥

সেদিনো প্রভাতে মোর
বেজেছে আশাবরী,
পূরবীর কান্না শুনি
আজি মোর শূন্য ভরি।

অবেলায় কুঞ্জবীথি
এলে মোর শেষ অতিথি,
ঝরা ফুল শেষের গীতি
দিনু দান তোমার গলায়॥

৫

মিয়া কি মল্লার—কাওয়ালি

আজি এ শ্রাবণ-নিশি কাটে কেমনে।
গুরু দেয়া-গরজন কাঁপে হিয়া ঘনঘন
শনশন কাঁদে বায়ু নীপ-কাননে॥

অন্ধ নিশীথ, মন খোঁজে কারে আঁধারে,
অন্ধ নয়ন ঝরে শাওন-বারিধারে।

ভাঙিয়া দুয়ার মম এস এস প্রিয়তম,
শ্বসিছে বাহির ঘর ভেজা পবনে॥

কার চোখে এত জল ঝরে দিক প্লাবিয়া,
সহিতে না পারি কাঁদে 'চোখ গেল' পাপিয়া।

কাহার কাজল-আঁখি চাহি মোর নয়নে
ঝুরেছিল একা রাতে কবে কোন্ শাওনে,
আজি এ বাদল-ঝড়ে সেই আঁখি মনে পড়ে,
বিজলি খুঁজিছে তারে নভ-আগুনে॥

৬

ভৈরবী-আশাবরী—আদ্ধা কাওয়ালি

আজি বাদল ঝরে মোর একেলা ঘরে।
হায় কী মনে পড়ে মন এমন করে॥

হায় এমন দিনে কে নীড়হারা পাখি
যাও কাঁদিয়া কোথায় কোন্ সাথীরে ডাকি।
তোর ভেঙেছে পাখা কোন্ আকুল ঝড়ে॥

আয় ঝড়ের পাখি আয় এ একা বুকে,
আয় দিব রে আশয় মোর গহন-দুখে।
আয় রচিব কুলায় আজ নূতন করে॥

এই ঝড়ের রাতি নাই সাথের সাথী,
মেঘ- মেদুর-গগন বায় নিবেছে বাতি।
মোর এ ভীরু প্রণয় হায় কাঁপিয়া মরে॥

এই বাদল-ঝড়ে হায় পথিক-কবি
ঐ পথের পরে আর কতকাল রবি,
ফুল দলিবি কত হায় অভিমান-ভরে॥

৭

ভৈরবী-গজল—দাদ্‌রা

মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নম, নমো নম, নমো নম।
শ্রাবণ-মেঘে নাচে নটবর
ঝমঝম, রমঝম, ঝমঝম॥

শিয়রে বসি চুপি চুপি চুমিলে নয়ন,
মোর বিকশিল আবেশে তনু
নীপ-সম, নিরুপম, মনোরম॥

মোর ফুলবনে ছিল যত ফুল
ভরি ডালি দিনু ঢালি, দেবতা মোর
হায় নিলে না সে ফুল, ছি ছি বেভুল,
নিলে তুলি খোঁপা খুলি কুসুম-ডোর।

স্বপনে কী যে কয়েছি তাই গিয়াছ চলি,
জাগিয়া কেঁদে ডাকি দেবতায়—
প্রিয়তম প্রিয়তম প্রিয়তম॥

৮

মান্দ—কাহারবা

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ দুখ লয়ে কাঁদে,
কেউ ভুলিতে গায় গীতি॥

কেউ শীতল জলদে
হেরে অশনির জ্বালা,
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে
তার শুষ্ক কুঞ্জ-বীথি॥

হেরে কমল-মৃণালে
কেউ কাঁটা কেহ কমল।
কেউ ফুল দলি চলে
কেউ মালা গাঁথে নিতি॥

কেউ জ্বালে না আর আলো
অর চির-দুখের রাতে,
কেউ দ্বার খুলি জাগে
চায় নব চাঁদের তিথি॥

৯

ভৈরবী—দাদ্‌রা

যাও যাও তুমি ফিরে
এই মুছিনু আঁখি।
কে বাঁধিবে তোমারে
হায় বনের পাখি॥

মোর এত প্রেম আশা
মোর এত ভালোবাসা
আজ সকলি দুরাশা
আর কি দিয়ে রাখি॥

এই অভিমান-জ্বালা
মোর একেলারি কালা,
ম্লান মিলনেরি মালা
দাও ধূলাতে ঢাকি॥

তোমার বেঁধেছিল নয়ন
শুধু এ রূপের জালে,
তাই দুদিন কাঁদিয়া
হায় সে বাঁধন ছাড়ালে।

মোর বাঁধিয়াছে হিয়া
তায় ছাড়াব কি দিয়া,
সখা হিয়া তো নয়ন নহে
সে ছাড়ে না কাঁদিয়া
দুদিন কাঁদিয়া।
আজ যে ফুল প্রভাতে
হায় ফুটিল শাখাতে,
তায় দেখিল না রাতে
সে ঝরিল না কি॥

হায় রে কবি প্রবাসী
নাই হেথা সুখ-হাসি,
ফুল ঝরে হলে বাসি
রয় কাঁটার ফাঁকি॥

১০

পিলু—কাহারবা

ফাগুন-রাতের ফুলের নেশায়
আগুন-জ্বালায় জ্বলিতে আসে।
যে-দীপশিখায় পুড়িয়া মরে
পতঙ্গ ঘোরে তাহারি পাশে॥

অথই দুখের পাথার-জলে
সুখের রাঙা কমল দোলে,
কূলের পথিক হারায় দিশা
দিবস নিশা তাহারি বাসে॥

সুখের আশায় মেশায় ওরা
বুকের সুধায় চোখের সলিল।
মণির মোহে জীবন দহে
বিষের ফণির গরল-শ্বাসে॥

বুকের পিয়ায় পেয়ে হিয়ায়
কাঁদে পথের পিয়ার লাগি,
নিতুই নতুন স্বরগ মাগি
নিতুই নয়ন- জলে ভাসে॥

১১

ভৈরবী—দাদ্‌রা

নিশীথ-স্বপন তোর
ভুলে যা এ নিশি-শেষে।
বাদল-অবসানে
আকাশ উঠেছে হেসে॥

চখার পাশে আসে
বিরহ-রাতের চখী!
আঁধার লুকাল ঐ
দূর বনে এলোকেশে॥

শরম-রাঙা গালে,
জাগিল কুমারী উষা,
তরুণ অরুণ ঐ
এস রাঙা বর-বেশে॥

১২

বাগেশ্রী—কাওয়ালি

ঘোর তিমির ছাইল
রবি শশী গ্রহ তারা।
কাঁপে তরাসে ভীতা ধরণী
অসীম আঁধারে হারা॥

প্রলয়েশ মহাকাল
এলায়েছে জটাজাল,
নাচিছে ঝড়ের বেগে
সুরধুনী-জলধারা॥

চমকি চমকি ওঠে
চপলা চপল-ফণা,
লুকাইল শিশুশশী,
মুরছিতা দিগঙ্গনা।
চাতকী চাতক-বুকে
বিভল কাঁদিয়া সারা॥

১৩

জয়জয়ন্তী—একতালা

দারুণ পিপাসায় মায়া-মরীচিকায়
চাহিতে এলি জল বনের হরিণী।
দগ্ধ মরুতল কে তোরে দেবে জল
ঝরিবে আঁখি-নীর তোরি নিশিদিনই॥

নিবায়ে গৃহ-দীপ আপন নিশ্বাসে
আলেয়ার পিছে এলি সুখ-আশে,
সে সুখ অবসান সুমুখেতে শ্মশান
পিছনে অন্ধকার চির-নিশীথিনী॥

কেন তুই বনফুল বিলাস-কাননে
করিয়া পথ ভুল এলি অকারণে।
ছিঁড়ে সাঁঝে তোরে মালা গাঁথি ভোরে
দলিল বিলাসী পথ-ধূলি সনে॥

সন্ধ্যা-গোধূলির রাঙা রূপে ভুলে
আসিলি এ কোথায় তমসার কূলে।
শ্রাবণ-মেঘ হায় ভাবিয়া কুয়াশায়
হারালি পথ তোর রে হতভাগিনী॥

১৪

খাম্বাজ-দেশ—দাদ্‌রা

এত কথা কি গো কহিতে জানে
চঞ্চল ঐ আঁখি।
নীরব ভাষায় কি যে কয়ে যায়
মনের বনের পাখি—
চঞ্চল ঐ আঁখি॥

মুদিত কমলে ভ্রমরেরি প্রায়
বন্দি হইয়া কাঁদিয়া বেড়ায়,
চাহিয়া চাহিয়া মিনতি জানায়
সুনীল আকাশে ডাকি—
চঞ্চল ঐ আঁখি॥

বুঝিতে পারি না ও-আঁখির ভাষা
জলে ডুবে তবু মেটে না পিয়াসা,
আদর সোহাগ প্রেম ভালোবাসা
অভিমান মাখামাখি॥

মানস-সায়রে মরালেরি প্রায়
গহন সলিলে ভেসে ভেসে চায়।
আমার হিয়ার নিভৃত ব্যথায়
সাধ যায় ধরে রাখি।
চঞ্চল ঐ আঁখি॥

১৫

(শুদ্ধ) সারং—একতালা

মন কেন উদাসে।
(এই) ফাগুন-বাতাসে॥

যাহারে না পাইনু কভু এ জীবনে,
সে কেন গো কাঁদাতে আসে নিতি স্মরণে।

কুসুমের গন্ধে গো
তারি সুবাস ভাসে॥

কেন এ সমীরে
সে আসে ফিরে ফিরে,
নয়ন-নদী তীরে
কেন জল উছাসে॥

১৬

ভাটিয়ালি—কাহারবা

আমার গহীন জলের নদী।
আমি তোমার জলে রইলাম ভেসে জনম অবধি॥

তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাঁধা ঘর
চরে এসে বসলাম রে অই ভাসালে সে চর।
এখন সব হারায়ে তোমার জলে রে
আমি ভাসি নিরবধি॥

আমার ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই
ভাঙলে কেন মন,
হারালে আর পাওয়া না যায়
মনের রতন।
জোয়ারে মন ফেরে না আর রে
(ও সে) ভাটিতে হারায় যদি॥

তুমি ভাঙো যখন কূল রে নদী
ভাঙো একই ধার,
আর মন যখন ভাঙো রে নদী
দুই কূল ভাঙো তার।
চর পড়ে না মনের কূলে রে
একবার সে ভাঙে যদি॥

১৭

ভাটিয়ালি—কার্ফা

তোমার কূলে তুলে বন্ধু
আমি নামলাম জলে।
আমি কাঁটা হয়ে রই নাই বন্ধু
তোমার পথের তলে॥

আমি তোমায় ফুল দিয়েছি কন্যা
তোমার বন্ধুর লাগি
যদি আমার শ্বাসে শুকায় সে ফুল
তাই হলাম বিবাগী।
তুমি বুকের তলায় আছ আমার গো
পরে শুকাইনিকো গলে॥

যে দেশ তোমার ঘর রে বন্ধু
সে দেশ হতে এসে
আমার দুখের তরী দিছি ছেড়ে
চলতেছে সে ভেসে,
এখন যে পথে নাই তুমি বন্ধু গো
তরী সেই পথে মোর চলে॥

১৮

ভাটিয়ালি—কার্ফা

আমার 'সাম্পান' যাত্রী না লয়
ভাঙা আমার তরী।
আমি আপনারে লয়ে রে ভাই
এপার ওপার করি॥

আমায় দেউলিয়া করেছে যে ভাই রে নদীর জল
আমি ডুবে দেখতে এসেছি ভাই সেই জলেরি তল।
আমি ভাসতে আসি, আসিনিকো কামাতে ভাই কড়ি॥

আমি এই জলেরি আয়নাতে ভাই দেখেছিলাম তায়
এখন আয়না আছে পড়ে রে ভাই
আয়নার মানুষ নাই।
চোখের জলে নদীর জলে রে
আমি তারেই খুঁজে মরি॥

আমি তারির আশায় 'সাম্পান' লয়ে ঘাটে বসে থাকি,
আমার তারির নাম ভাই জপমালা, তারেই কেঁদে ডাকি।
আমার নয়ন-তারা লইয়া গেছে রে
নয়ন নদীর জলে ভরি॥

ঐ নদীর জলও শুকায় রে ভাই, সে জল আসে ফিরে,
আর মানুষ গেলে ফিরে না কি দিলে মাথার কিরে।
আমি ভালোবেসে গেলাম ভেসে গো
আমি হলাম দেশান্তরী॥

১৯

ভাটিয়ালি—কার্ফা

ওরে মাঝি ভাই!
তুই কি দুখ পেয়ে কূল হারালি
অকূল দরিয়ায়॥

তোর ঘরের রশি ছিঁড়ে রে গেল—
ঘাটের কড়ি নাই,
তুই মাঝ-দরিয়ায় ভেসে চলিস
ভাসিয়ে তরী তাই।
ও ভাই দরিয়ায় আসে জোয়ার ভাটি রে
তোর ঐ চক্ষের পানি চাই॥

তোর চোখের জল ভাই ছাপাতে চাস
নদীর জলে এসে,
শেষে নদীই এল চক্ষে রে তোর
তুই চলিলি ভেসে।

তুই কলস দেখে নামলি জলে রে
এখন ডুবে দেখিস কলস নাই॥

তুই কূলে যাহার কূল না পেলি,
তারে অগাধ জলে
মিছে খুঁজে মরিস ওরে পাগল
তরী বাওয়ার ছলে।
ও ভাই দুধারে এর চোরা বালু রে
তোর হেথায় মনের মানুষ নাই॥

২০

কীর্তন

কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গো।
আমি যত ভুলি ভুলি করি
তত আঁকড়িয়া ধরি
তত মরি সাধিয়া
সাধিয়া সাধিয়া সাধিয়া গো।

শ্যামের সে রূপ ভোলা কি যায়
নিখিল শ্যামল যার শোভায়।
আকাশ সাগরে বনে কান্তারে
লতায় পাতায় সে রূপ ভায়।

আমার বঁধুর রূপের ছায়া বুকে ধরি
আকাশ-আরশি নীল গো,
বহে ভুবন প্লাবিয়া কালারে ভাবিয়া
কালো সাগর-সলিল গো।

আমার শ্যামেরে কাজল পরাইতে মেঘ
ঝুরে ঝুরে ঘুরে গগনে।

আমার শ্যামের মুকুট-চূড়া হয়ে শিখী
নেচে ফেরে বন-ভবনে।

সখি গো—
সখি নিখিল তারে খেয়ায় গো।
এই রাধিকার পায়ে কোটি শশী তারা
তার নীল বুকে লুটায় গো।
যদি ফুল হয়ে ফুটি তরু-শাখে
সে যে পল্লব হয়ে ঘিরে থাকে।
যদি একাকিনী চলি বনতলে
সে যে ছায়া হয়ে পিছে পিছে চলে।
যদি একা ঘরে মোর দীপ জ্বালি
আসে আঁধারের রূপে বনমালি।—
সখি গো—
আমার কলঙ্কী চাঁদ।
অর কলঙ্ক চেয়ে জ্যোৎস্না বেশি,
কলঙ্ক তার দেখে কে।
লোকে আমার চাঁদে কলঙ্কী কয়
জ্যোৎস্না তাহারি মেখে।
আমি তারির লাগি
কুমুদিনী হয়ে জলে ডুবে রই তারির লাগি
আমি চকোরিণী হয়ে নিশীথ জাগি তারি লাগি।

আমার প্রাণের সাগরে জোয়ার জাগে চাঁদের লাগি।
রাতে রবির কিরণ শরণ মাগে চাঁদের লাগি।
আমার কলঙ্কী চাঁদ।

আমি যেদিকে তাকাই হেরি ও-রূপ কেবল,
সে যে আমারি মাঝারে রহে করি নানা ছল।
সে যে বেণী হয়ে দুলে পিঠে চপল চতুর।
সে যে আঁখির তারায় হাসে কপট নিঠুর।
সখি গো—
সখি আঁখি মোর বিবাদী হলো
কালো রূপে সেও ছলে।
আমার চোখের জল বিবাদী হলো
সেও কালার রূপে গলে।

আমার বুকের কথা চোখে এল
চোখের জল সই সেও কালো।
সখি লো মোর মরণ ভালো!
সে যে আঁখিপাতা হয়ে থাকে ঘিরিয়া আঁখি
বনে বনে ডাকে তারি আঁখি কোয়েলা পাখি।

কাঁদে ফাল্গুনে গুনগুন ফুল-ভোমরা,
বন- হরিণীর চোখে তারি কাজল পরা।
তারে কেমনে ভুলিব।
বল্ সখি তারে কেমনে ভুলিব।

আমার অঙ্গ জড়ায়ে দুলে সে রঙ্গে
শাড়ি সে নীলাম্বরী গো।
আমি কুল ছাড়িয়াছি, আজ দেখি সখি
দুকূল লইয়া মরি গো।
আমার বসন-ভূষণ তারির সখা
কেমনে তায় ভুলিব।
থাকে কবরী-বন্ধে কালো ডোর হয়ে
কাল্‌ফণি কালো কেশে গো।
থাকে কপালের টিপে, চোখের কাজলে,
কপোলের তিলে মিশে গো।

আমার একূল ওকূল দুকূল গেল।
আমার কুলে সই পড়িল কালি
সেও কালার রূপে এল।
আমার কপালের কলঙ্ক-তিলক
সেও কালার রূপে এল।
রাখি কি দিয়া মন বাঁধিয়া,
আমার সকলি ভাসিল সখি
কালো যমুনারি জলে
সকলি ভাসিল—
রাখি কি দিয়া মন বাঁধিয়া
বাঁধিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া গো।।

২১

দেশ-পিলু—দাদ্‌রা

আঁধার রাতে কে গো একেলা।
নয়ন-সলিলে ভাসালে ভেলা॥

কাঁদিয়া কারে খোঁজো ওপারে
আজো যে তোমার প্রভাতবেলা॥

কি দুখে আজি যোগিনী সাজি
আপনারে লয়ে এ হেলা-ফেলা॥

সোনার কাঁকন ও দুটি করে
হেরো গো জড়ায়ে মিনতি করে।
খুলিয়া ধূলায় ফেলো না গো তায়
সাধিছে নূপুর চরণ ধরে।

হেরো গো তীরে কাঁদিয়া ফিরে
আজিও রূপের রঙের মেলা॥

২২

ভাটিয়ালি—কার্ফা

কি হবে লাল পাল তুলে ভাই
'সাম্পানের' উপর।
তোর পালে যত লাগবে হাওয়া রে
ও ভাই ঘর হবে তোর ততই পর॥

তোর কি দুঃখ হায় ভুলতে চাস ভাই,
ছেঁড়া পাল রাঙিয়ে,
এবার পরান ভরে কেঁদে নে তুই
অগাধ জলে নেয়ে।
তোর কাঁদনে উঠে আসুক রে
ঐ নদীর থেকে বালুর চর॥

তুই কিসের আশায় দিবি রে ভাই
কূলের পানে পাড়ি,
তোর দীয়া সেথা না জ্বলে ভাই
আঁধার যে ঘর-বাড়ি।
তুই জীবন-কূলে পেলিনে তায় রে
এবার মরণ-জলে তালাশ কর॥

২৩

সিন্ধু-ভৈরবী—পাঞ্জাবি ঠেকা

ভাঙা মন আর জোড়া নাহি চায়।
ঝরা ফুল আর ফেরে না শাখায়॥

শীতের হাওয়ায় তুষার হয়ে
গলি খর-তাপে বারি যায় বয়ে,
গলে নাকো আর হৃদয়-তুষার
উষ্ণ ছোঁওয়ায়॥

গাঁথি ফুলমালা নাহি দিয়া গলে
শুকালে নিঠুর তব মুঠি-তলে,
হাসিবে না সে ফুল শত আঁখি-জলে
আর সে শোভায়॥

স্রোতের সলিলে
যে বাঁধ বাঁধিলে
ভাঙিয়া সে বাঁধ
তোমারে ভাসায়॥

২৪

ছায়নট-কেদারা—একতালা

আমার দুখের বন্ধু, তোমার কাছে
চাইনি তো এ সুখ।

আমি জানিনি তো বুকে পেয়েও
কাঁদবে এমন বুক॥

আমার শাখায় যবে ফোটেনি ফুল
আমি চেয়েছি পথ আশায় আকুল,
আজ ফোটা ফুলে কাঁদে কেন
কুসুম ঝরার দুখ॥

প্রিয়, মিলন–আশায় ছিনু সুখে
ছিলে যবে দূর।
আজ কাছে পেয়ে পরান কাঁদে
বিদায়–ভয়াতুর।

এ যে অমৃতে গরল মিশা
প্রাণে কেবলি বাড়িছে তৃষা,
আমার স্বর্গে কেন মলিন ধরার
বেদন জাগরূক॥

২৫

কীর্তন

আমি কি সুখে লো গৃহে রবো।
আমার শ্যাম হলো যদি যোগী ওলো সখি
আমিও যোগিনী হব॥

সে আমারই ধেয়ান করিত গো সদা
তার সে ধ্যান ভাঙিল যদি,
ওলো সে ভোলে ভুলুক, আমি ঐ রূপ
ধেয়াইব নিরবধি।
আমিও যোগিনী হবো!
শ্যাম যে তরুর মূলে বসিবে লো ধ্যানে
সেথা আঁচল বিছায়ে রবো।

আমি ধুলায় বসতে দেবো না সই,
তার সোনার অঙ্গ মলিন হবে
ধুলায় বসতে দেবো না সই।
কুয়াশায় চাঁদ পড়বে ঢাকা
সহিতে পারিব না সই।
সখি ধূলাই যদি সে মাগে,
আমি আপনি হইব রাঙা পথ-ধূলি
বঁধুয়ার অনুরাগে।
শ্যাম যে পথ দিয়ে চলে যাবে
সেই পথের ধূলি হব।

সে চলে যেতে দলে যাবে
সেই সুখে গো ধূলি হব।

হব ভিক্ষার ঝুলি, শ্যাম লবে তুলি
বাহুতে আমারে জড়ায়ে,
সখি আমার বেদনা-গৈরিক-রাঙা
বাস দেব তারে পরায়ে।
নবীন যোগীরে সাজাইব আমি,
আমার প্রাণের গোধূলি-বেলার
রঙে রঙে তারে সাজাইব আমি।

সখি তার অনাদর-আগুনে জ্বালায়ে
পোড়াব লাবণি মোর,
ওলো তারির হাতের আঘাতে আঘাতে
হবে এ দেহ কঠোর।

আমার এ তনু শুকাবে গভীর অভিমানের জ্বালা,
আমি তাই দিয়ে তার হব গলায় রুদ্রাক্ষেরই মালা।

আমি শ্যামের গলার মালা হব,
আমি জীবনে পেয়েছি জ্বালা শুধু সখি,
মরে এবার মালা হব।

আমার চোখের জলে বইবে নদী,
আমি নদী হয়ে কেঁদে যাব
চরণে তার নিরবধি।
আমি কি সুখে লো গৃহে রবো,
আমার শ্যাম হলো যদি যোগী ওলো সখি
আমিও যোগিনী হব॥

২৬

জৌনপুরী—দাদ্‌রা

ফুল-কিশোরী ! জাগো জাগো, নিশি ভোর।
দুয়ারে দখিন-হাওয়া
খোলো খোলো পল্লব-দোর॥

জাগাইয়া ধীরে ধীরে
যৌবন তনু-তীরে,
যাব চলি উদাসী কিশোর॥

চিনি গো দেবতা চিনি
ও নূপুর-রিনিঝিনি,
ভেঙো না ভেঙো না ঘুম-ঘোর।
মধুমাসে আসো তুমি ফুলবাস-চোর।
প্রভাতে ফুটায়ে আঁখি
নিশীথে বহাবে আঁখি-লোর॥

২৭

ভৈরবী-ভূপাল—যৎ

জাগো জাগো, পোহাল রাতি।
গগন-আঙনে ম্লান চাঁদের বাতি।
পোহাল রাতি॥

মধুমাছি মধু বোলে,
ফুলমুখী ঘুম ভোলে,
শরমে নয়ন খোলে
শয়ন-সাথী।
পোহাল রাতি॥

সলিল লুটায় ঘটে
বধূর বুকের তটে,
বাজে বাঁশি ছায়া-বটে
আবেশে মাতি।
পোহাল রাতি॥

২৮

কালাংড়া—কাহারবা-দাদ্‌রা

কে এল।
ডাকে চোখ গেল, ডাকে চোখ গেল,
ডাকে চোখ গেল॥

ওলো ও ডাকে কি ও
ঘুমের সতিনী ও,
ও যে চোখের বালি।
ঘুম ভাঙায় খালি।
সখি আঁখি মেলো।
মেল আঁখি মেলো॥

২৯

কাজরি—কার্ফা

এলে কি শ্যামল পিয়া কাজল মেঘে।
চাঁচর চিকুর ওড়ে পবন-বেগে॥

তোমার লাবণি ঝরে
পড়িছে অবনী পরে,
কদম শিহরে কর-পরশ লেগে॥

তড়িত ত্বরিত পায়ে
বিরহী-আঁখির ছায়ে
তরাসে লুকায়।
ছুটিতে পথের মাঝে
ঝুমুর ঝুমুর বাজে
ঘুমুর দুপায়।
অশনি হানার ছলে
প্রিয়ারে ধরাও গলে,
রাতের মুকল কাঁদে
কুসুমে জেগে॥

৩০

বাগেশ্রী—কাওয়ালি

জনম জনম গেল আশা-পথ চাহি।
মরু-মুসাফির চলি, পার নাহি নাহি॥

বরষ পরে বরষ আসে যায় ফিরে,
পিপাসা মিটায়ে চলি নয়নের নীরে।
জ্বালিয়া আলেয়া-শিখা
নিরাশার মরীচিকা
ডাকে মরু-কাননিকা শত গীত গাহি॥

এ মরু ছিল গো কবে সাগরের বারি,
স্বপন হেরি গো তারি আজো মরুচারী।
সেই সে সাগর-তলে
যে তরী ডুবিল জলে
সে তরী-সাথীরে খুঁজি মরু-পথ বাহি॥

৩১

ভৈরবী—দাদ্‌রা-কার্ফা (ফর্‌তা)

কেন নিশি কাটালি অভিমানে।
ডুবে গেল চাঁদ দূর বিমানে॥

মান-ভরে চাতকী এ বাদলে
মিটালি না পিপাসা মেঘ-জলে।
কোথা রবে এ-মেঘ কে বা জানে॥

রহে চাঁদ দূরে অমা নিশীথে,
তবু ফোটে কুমুদী সরসীতে।
রহে চাহি কলঙ্কী শশী পানে॥

যে ফাগুনে ফুল ফুটিল রাতে,
রবে না সে ফাগুন কালি প্রাতে।
যে ফুটিল না, সে শুকাবে বাগানে॥

৩২

খাম্বাজ—ঠুংরি

পেয়ে কেন নাহি পাই হৃদয়ে মম
হে চির-সুদূর প্রিয়তম॥

তুমি আকাশের চাঁদ,
(আমি) পাতিয়া সরসী-ফাঁদ
জনম জনম কাঁদি
কুমুদীর সম।
হে চির-সুদূর প্রিয়তম॥

(আমি) ফুলের কূলের রাধা,
বৃন্তের কলে বাঁধা,
চপল গগন-চারী
তুমি নিরমম।
হে চির-সুদূর প্রিয়তম॥

নিখিলের রূপে রূপে
দেখা দাও চুপে চুপে,
এলে না মুরতি ধরি
ওগো নিরুপম !
হে চির-সুদূর প্রিয়তম ॥

৩৩

ভূপালী—আদ্ধা কাওয়ালি

আসিলে কে অতিথি সাঁঝে
পূজার ফুল ঝরে বন-মাঝে ॥

দেউল মুখরিত বন্দনা-গানে,
আকাশ-আঁখি চাহে তব পানে।
দোলে ধরাতল
দীপ-ঝলমল,
নৌবতে ভূপালি বাজে ॥

৩৪

ভৈরবী—কাওয়ালি

না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়।
গভীর আঁধার ছেয়ে আজো হিয়ায় ॥

আমার নয়ন ভরে
এখনো শিশির ঝরে,
এখনো বাহুর পরে
বঁধু ঘুমায় ॥

এখনো কবরী-মূলে
কুসুম পড়েনি ঢুলে,
এখনো পড়েনি খুলে
মালা খোঁপায় ॥

নিবায়ে আমার বাতি
পোহাল সবার রাতি ;
নিশি জেগে মালা গাঁথি,
প্রাতে শুকায়॥

৩৫

গরজ—একতালা

পরজনমে দেখা হবে প্রিয়।
ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও॥

এ জনমে যাহা বলা হলো না,
আমি বলিব না, তুমিও বলো না।
জানাইলে প্রেম করিও ছলনা,
যদি আসি ফিরে, বেদনা দিও॥

হেথায় নিমেষে স্বপন ফুরায়,
রাতের কুসুম প্রাতে ঝরে যায়,
ভালো না বাসিতে হৃদয় শুকায়,
বিষ জ্বালা-ভরা হেথা অমিয়॥

হেথা হিয়া ওঠে বিরহে আকুলি,
মিলনে হারাই দু দিনেতে ভুলি,
হৃদয় যথায় প্রেম না শুকায়,
সেই অমরায় মোরে স্মরিও॥

৩৬

ছায়ানট—দাদ্‌রা

বনে বনে দোলা লাগে।
মনে মনে দোলা লাগে।
দখিনা-সমীর জাগে॥

এ কি এ বেদনা লয়ে
ফুটিল ফুল হৃদয়ে,
গোপনে মধুর ভয়ে
না-জানা পরশ মাগে॥

অশোক রঙিন ফুটে
কিশোর হৃদয়পুটে,
কপোল রাঙিয়া উঠে
অতনুর অনুরাগে॥

৩৭
ভৈরবী—কার্ফা

কে ডাকিল আমারে আঁখি তুলে,
এই প্রভাতে তটিনী-কূলে কূলে॥

ঐ ঘুমায়ে সকলি, জাগেনি কেউ,
জল নিতে আসেনি এখনো বউ,
শুধু তব নদীতে জেগেছে ঢেউ,
মেলেছে নয়ন কানন-ফুলে॥

যে সুবাস ঝরে ও এলোকেশে
কমলে তা দিলে নাহিতে এসে,—
তব তনু-বাস দিঘিতে ভেসে—
মাতাইছে, মধুপ পথ ভুলে॥

ও শিশির কপোল-স্বেদ-বারি
পড়িল ঝরি নয়নে আমারি,
জাগিয়া হেরি রূপ মনোহারী
দাঁড়ায়ে উষসী তোরণ-মূলে॥

৩৮

মেঘ রাগ—ত্রিতালী (দ্রুতগতি)

ঘেরিয়া গগন মেঘ আসে।
বিহ্বল ধরণী,
দশ দিশি কাঁপে তরাসে॥

বিদ্যুৎ ঝলকে
ঝামর অলকে
ঝমঝম ঝাঝর
বাজে ঘন আকাশে॥

শিখী নাচে হরষে
বারিধারা বরষে,
চাতক চাতকী
পাগল পিয়াসে॥

৩৯

হিন্দোল—গীতাঙ্গী

দুলে চরাচর হিন্দোল-দোলে।
বিশ্বরমা দোলে বিশ্বপতি কোলে॥

গগনে রবি শশী গ্রহ তারা দুলে,
তড়িত-দোলনাতে মেঘ ঝুলন ঝুলে।
বরিষা-শতনোরি
দুলিছে মরি মরি,
দুলে বাদল-পরী
কেতকী-বেণী খোলে॥

নদী-মেঘলা দোলে, দোলে নটিনী ধরা,
দুলে আলোক নভ-চন্দ্রাতপ ভরা।

করিয়া জড়াজড়ি দোলে দিবস নিশা,
দোলে বিরহ-বারি, দোলে মিলন-তৃষা।
উমারে লয়ে বুকে
শিব দুলিছে সুখে,
দোলে অপরূপ
রূপ-লহর তোলে॥

৪০

হিন্দোল—সাদ্রা

হিন্দোলি হিন্দোলি
ওঠে নীল সিন্ধু।
গগনে উঠিল তার
কোন পূর্ণ ইন্দু॥

শত শুক্তি-আঁখি দিয়া
পিইছে চাঁদ অমিয়া,
শিশির রূপে ঝরিয়া
পড়ে জ্যোৎস্না-বিন্দু॥

৪১

(ভজন) ভৈরবী—দাদ্‌রা

ওগো সুন্দর আমার!
সুন্দর আমার, এ কি দিলে উপহার॥

আমি দিনু পূজা-ফুল,
বর দিতে দিলে ভুল,
ভাঙিল আমার কূল,
তব স্রোতধার॥

গরল দিলে যে এই
অমৃত আমার সেই,

শুকাল নিশি-শেষেই
রাতের নীহার॥

তোমারি সুখ-ছোঁওয়ায়
ফুটেছে ফুল শাখায়,
তোমারি উতল বায়
ঝরিল আবার॥

৪২

টোরি—যৎ

জাগো জাগো, খোলো গো আঁখি।
নিকুঞ্জ-ভবনে তব জাগিল পাখি।
খোলো গো আঁখি॥

তোমার রাতের ঘুমে
রবির কিরণ চুমে,
বাঁধিল কানন-ভূমে
ফুলের রাখি।
খোলো গো আঁখি॥

স্বপনে হেরিছ যারে
সে এল পূরব দ্বারে,
বাতায়ন খুলি তারে
লহ গো ডাকি।
খোলো গো আঁখি॥

৪৩

আড়ানা—যৎ

বাজায়ে জল-চুড়ি কিঙ্কিণী,
কে চলো জল-পথে উদাসিনী॥

পথিকে ডেকে বলো
'ছল গো ছলছল'
ছুঁতে উছলে জল
গরবিনী॥

তোমার কোল মাগি
কূলের হতভাগী
রহে ও কূলে জাগি
নিশীথিনী॥

বুকেতে বহে তরী,
চাহ না জল–পরী
চল সাগরে স্মরি
পূজারিণী॥

৪৪

মাঢ়—কাওয়ালি

পরদেশী বঁধু! ঘুম ভাঙায়ো চুমি আঁখি।
যদি গো নিশীথ জেগে ঘুমাইয়া থাকি।
ঘুম ভাঙায়ো চুমি আঁখি॥

যদি দীপ নেভে গো কুটিরে,
বাতায়ন–পানে চাহি যেয়ো না গো ফিরে,
নিবেছে আঁখির শিখা প্রাণ আছে বাকি।
ঘুম ভাঙায়ো চুমি আঁখি॥

যদি গান থামে মোর মুখে,
ফিরিয়া যেয়ো না, বীণা রবে তবু বুকে,
নাহি গান, কুলায়েতে আছে তবু পাখি।
ঘুম ভাঙায়ো চুমি আঁখি॥

৪৫

মল্লার—কাওয়ালি

ঝরিছে অঝোর বরষার বারি।
গগন সঘন ঘোর,
পবন বহিছে জোর,
একাকী কুটিরে মোর
রহিতে নারি॥

শিয়রে নিবেছে বাতি,
অন্ধ তমসা রাতি,
গরজে আওয়াজ বাজ
গগন-চারী॥

চমকিছে চপলা,
জাগি ভয়-বিভলা
একা কুমারী॥

৪৬

পুরীয়া—ত্রিতালী

চলো সখি জল নিতে
চল ত্বরিতে।
শ্রান্ত দিনের রবি
ডোবে সরিতে॥

ঘিরিছে আঁধার
তটিনী-কিনার,
গোধূলির ছায়া পড়ে
বন-হরিতে॥

ধেনু-ডাকা বেণু বাজে
বংশী-বটে,
পাখি ওড়ে, আঁকা যেন
আকাশ-পটে।
বধূ ঘাটে যায়,
বঁধু পথে চায়,

চিনি চিনি বাজে চুড়ি
গাগরীতে ॥

৪৭

মুলতান—একতালা

কার বাঁশরি বাজে মুলতান-সুরে
নদী-কিনারে কে জানে।
সে জানে না কোথা সে সুরে
ঝরে ঝর-নির্ঝর পাষাণে ॥

একে চৈতালি-সাঁঝ অলস
তাহে ঢলঢল কাঁচা বয়স
রহে চাহিয়া, ভাসে কলস,
ভাসে হৃদি বাঁশুরিয়া পানে ॥

বেণী বাঁধিতে বসি অঙ্গনে
বধূ কাঁদে গো বাঁশরী-স্বনে।

যারে হারায়েছে হেলা-ভরে
তারে ও-সুরে মনে পড়ে,
বেদনা বুকে গুমরি মরে
নয়ন ঝুরে, বাধা না মানে ॥

৪৮

পাহাড়ি মিশ্র—কাহারবা

মোর ধেয়ানে মোর স্বপনে
পরান-প্রিয়, দিও হে দেখা !
মোর শয়নে মোর নয়নে
লিখিয়া যেয়ো সলিললেখা ॥

পথ চলিতে আসিলে ভুলে
নিও না তুলে তব দেউলে,
হবে না পূজা এ বন-ফুলে,
দেবতা মম, ঝরিব একা ॥

৪৯

ধবলশ্রী—মধ্যমান

নাইয়া, করো পার!
কূল নাহি, নদী-জল সাঁতার॥

দুকূল ছাপিয়া জোয়ার আসে,
নামিছে আঁধার, মরি তরাসে
দাও দাও কূল কূলবধূ ভাসে
নীর পাথার।
নাইয়া, করো পার॥

৫০

মধুমাত সারং—কাওয়ালি

মাধবী-তলে চলো মাধবিকা-দল
আইল সুখ-মধুমাস।
বহিছে খরতর থরথর মরমর
উদাস চৈতী-বাতাস॥

পিককূল কলকল অবিরল ভাষে,
মদালস মধুপ পুষ্পসুবাসে।
বেণু-বনে উঠিছে নিশ্বাস॥

তরুণ নয়ন সম আকাশ আনীল,
তট-তরুছায়া ধরে নীর নিরাবিল,
বুকে বুকে স্বপন-বিলাস॥

৫১

বৃন্দাবনী সারং—কাওয়ালি

বৃন্দাবনে এ কি বাঁশরি বাজে।
গোপিনী উন্মনা, মন নাহি কাজে॥

কুলবধূ-ঘটে ঘটে সে বাঁশি স্বনে
উছলি উছলি ওঠে নীর ক্ষণে ক্ষণে।
নয়ন-সলিল ঝরে গাগরি-মাঝে॥

৫২

গৌড়সারং—যৎ

নিশীথ নিশীথ জাগি গোঁয়ানু রাতি।
জ্বলিয়া জ্বলিয়া নেভে শিয়রের বাতি॥

সারা দিন গাঁথি মালা তুলিয়া কুসুম,
পথ চাহি চাহি কবে চোখে আসে ঘুম,
রহে পড়ি নব শেজ, কুসুমের পাঁতি॥

আমার কাননে আসি অলি যয়ি ফিরে,
গাহি গান ফেরে সাঁঝে পাখি সব নীড়ে।
একেলা রহি গো শুধু আমি বিনা সাথী॥

৫৩

নাগধ্বনি কানাড়া—মধ্যমান

দেখা দাও, দাও দেখা, ওগো দেবতা।
মন্দিরে পূজারিণী আশাহতা॥

ধূপ পুড়িয়া গেছে, শুকায়েছে মালা,
বন্ধ হলো বা দ্বার, একা কুলবালা।
প্রভাতে জাগিবে সবে, রটিবে বারতা॥

জাগো জাগো দেবতা শূন্য দেউলে,
আরতি উঠিছে মোর বেদনার ফুলে।
বাণীহীন মন্দির, কহ কহ কথা॥

রিক্তের বেদন

নিবেদন

রণকোলাহলের মত্ততার মাঝে জন্মেছিল তরুণ কবির ভাবরাজ্যের দ্যোতনা–ভরা এই উচ্ছ্বাস। মেসোপটেমিয়ার ধূলি ঝেড়ে আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকেই একে কোল দিতে হয়েছিল। আমার অযোগ্যতাই এতদিন কবির হৃদয়োচ্ছ্বাসকে চেপে রেখে সহৃদয় পাঠকবর্গের সহিত তার পরিচয়ের ব্যাঘাত জন্মিয়েছে। এতে কবি ও তাঁর পাঠকবর্গের প্রতি অন্যায়–অত্যাচারের জন্য আমি দায়ী। অদ্য প্রায়শ্চিত্ত করলাম।

কলিকাতা
বড় দিন ১৯২৪

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

রিক্তের বেদন

[ক]

বীরভূম

আঃ ! এ কি অভাবনীয় নতুন দৃশ্য দেখলুম আজ ? ...

জননী জন্মভূমির মঙ্গলের জন্যে সে-কোন অদেখা-দেশের আগুনে প্রাণ আহুতি দিতে একি অগাধ-অসীম উৎসাহ নিয়ে ছুটেছে তরুণ বাঙালিরা,—আমার ভাইরা ! খাকি পোশাকের ম্লান আবরণে এ কোন আগুনভরা প্রাণ চাপা রয়েছে !—তাদের গলায় লাখো হাজার ফুলের মালা দোল খাচ্ছে, ওগুলো আমাদের মায়ের-দেওয়া ভাবী-বিজয়ের আশিস-মাল্য,—বোনের দেওয়া স্নেহ-বিজড়িত অশ্রুর গৌরবোজ্জ্বল-কণ্ঠহার !

ফুলগুলো কত আর্দ্র-সমুজ্জ্বল ! কি বেদনা-রাঙা মধুর ! ওগুলো তো ফুল নয়, ও যে আমাদের মা-ভাই-বোনের হৃদয়ের পূততম প্রদেশ হতে উজাড়-করে-দেওয়া অশ্রুবিন্দু ! এই যে অশ্রু ঝড়েছে আমাদের নয়ন গলে, এর মতো শ্রেষ্ঠ অশ্রু আর ঝরেনি,—ওঃ সে কত যুগ হতে !

আজ ক্ষান্ত-বর্ষণ প্রভাতের অরুণ কিরণ চিরে নিমিষের জন্যে বৃষ্টি নেমে তাদের খাকি বসনগুলোকে আরো গাঢ়-ম্লান করে দিয়েছিল। বৃষ্টির ঐ খুব মোটা ফোঁটাগুলো বোধ হয় আর কারুর ঝরা অশ্রু ! সেগুলো মায়ের অশ্রু-ভরা শান্ত আশীর্বাদের মতো তাদিগে কেমন অভিষিক্ত করে দিল !

তারা চলে গেল ! একটা যুগবাঞ্ছিত গৌরবের সার্থকতার রুদ্ধবক্ষ বাষ্পরথের বাষ্পরুদ্ধ ফোঁস ফোঁস শব্দ ছাপিয়ে আশার সে কি করুণ গান দুলে দুলে ভেসে আসছিল—

'বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটিরবাসী,
হেরিব বিরহ-বিধুর-অধরে মিলন-মধুর হাসি,
শুনিব বিরহ নীরব কণ্ঠে মিলন-মুখর বাণী,—
আমার কুটির-রানি সে যে গো আমার হৃদয়-রানি।'

সমস্ত প্রকৃতি তখন একটা বুকভরা স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছিল ! বাংলার আকাশে, বাংলার বাতাসে সে বিদায়-ক্ষণে ত্যাগের ভাস্বর অরুণিমা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল। কে বলে মাটির মায়ের প্রাণ নেই ?

এই যে জল-ছলছল শ্যামোজ্জ্বল বিদায়-ক্ষণটুকু অতীত হয়ে গেল, কে জানে সে আবার কত যুগ বাদে এমনি একটা সত্যিকার বিদায়-মুহূর্ত আসবে ?

আমরা 'ইস্তকনাগাদ' ত্যাগের মহিমা কীর্তন পঞ্চমুখে করে আসছি, কিন্তু কাজে কতটুকু করতে পেরেছি ? আমাদের করার সমস্ত শক্তি বোধ হয় এই বলার মধ্য দিয়েই গলে যায় !

পারবে ? বাংলার সাহসী যুবক ! পারবে এমনি করে তোমাদের সবুজ, কাঁচা, তরুণ জীবনগুলো জ্বলন্ত আগুনে আহুতি দিতে, দেশের এতটুকু সুনামের জন্যে ? তবে এস ! 'এস নবীন, এস ! এস কাঁচা, এস !' তোমরাই তো আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশা, ভরসা, সব ! বৃদ্ধদের মানা শুনো না। তাঁরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সুনাম কিনবার জন্যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তোমাদের উদ্বুদ্ধ করেন, আবার কোনো মুগ্ধ যুবক নিজকে ঐ রকম বলিদান দিতে আসলে আড়ালে গিয়ে হাসেন এবং পরোক্ষে অভিসম্পাৎ করেন ! মনে করেন, 'এই মাথা-গরম' ছোকরাগুলো কি নির্বোধ।' ভেঙে ফেলো ভাই, এদের এ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-বন্ধন !

অনেকদিন পরে দেশে একটা প্রতিধ্বনি উঠছে, 'জাগো হিন্দুস্থান, জাগো ! হুঁশিয়ার।'

নান্নুর

মা ! মা ! কেন বাধা দিচ্ছ ? কেন এ-অবশ্যম্ভাবী একটা অগ্ন্যুৎপাতকে পাথর চাপা দিয়ে আটকাবার বৃথা চেষ্টা করছ ?—আচ্ছা মা ! তুমি বি-এ পাশ-করা ছেলের জননী হতে চাও, না বীর-মাতা হতে চাও ? এ ঘুমের নিঝুম-আলস্যের দেশে বীরমাতা হবার মতো সৌভাগ্যবতী জননী কয়জন আছেন মা ? তবে, কোনটি বরণীয় তা জেনেও কেন এ অন্ধস্নেহকে প্রশ্রয় দিচ্ছ ? গরীয়সী মহিমান্বিত মা আমার ! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—তোমার এ জনম-পাগল ছেলেকে ছেড়ে দাও ! দুনিয়ার সব কিছু দিয়েও এখন আমায় ধরে রাখতে পারবে না। আগুন আমার ভাই—আমায় ডাক দিয়েছে ! সে যে কিছুতেই আঁচল-চাপা থাকবে না। আর, যে থাকবে না, সে বাঁধন ছিঁড়বেই। সে সত্যসত্যই পাগল, তার জন্য এখনো এমন পাগলা-গারদের নির্মাণ হয়নি, যা তাকে আটকে রাখতে পারবে !

পাগল আজকে ভাঙরে আগল
পাগলা-গারদের

আর ওদের

সকল শিকল শিথিল করে বেরিয়ে পালা বাইরে
দুশমন স্বজনের মতো দিন-দুনিয়ায় নাইরে !
ও তুই বেরিয়ে পালা বাইরে !

* * *

আজ যুদ্ধে যাবার আদেশ পেয়েছি ! ... পাখি যখন শিকলি কাটে তখন তার আনন্দটা কি রকম বেদনা-বিজড়িত মধুর। ...

আহ্, আমায় আদেশ দিয়ে শেষ আশিস করবার সময় মার গলার আওয়াজটা কি-রকম আর্দ্র-গভীর হয়ে গিয়েছিল ! সে কি উচ্ছ্বসিত রোদনের বেগ আমাদের দুজনকেই মুষড়ে দিচ্ছিল। ... হাজার হোক, মায়ের মন তো !

আকাশ যখন তার সঞ্চিত সমস্ত জমাট-নীর নিঃশেষে ঝরিয়ে দেয়, তখন তার অসীম নিস্তব্ধ বুকে সে কি একটা শান্তসজল স্নিগ্ধতার তরল কারুণ্য ফুটে ওঠে !

মার একমাত্র জীবিত সন্তান, বি-এ পড়ছিলুম ; মায়ের মনে যে কত আশাই না মুকুলিত পল্লবিত হয়ে উঠেছিল ! আমি আজ সে-সব কত নিষ্ঠুরভাবে দলে দিলুম ! কি করি, এদিনে এরকম যে না করেই পারি না।

আমার পরিচিত সমস্ত লোক মিলে আমায় তিরস্কার করতে আরম্ভ করেছে যেন আমি একটা ভয়ানক অন্যায় করেছি। সবাই বলছে, আমার সহায়-সম্বলহীন মাকে দেখবে কে ! ... হায়, আজ আমার মা যে রাজরাজেশ্বরীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা, তা কাউকে বোঝাতে পারব না !

কাকে বোঝাই যে, লক্ষপতি হয়ে দশ হাজার টাকা বিলিয়ে দিলে তাকে ত্যাগ বলে না, সে হচ্ছে দান। যে নিজকে সম্পূর্ণ রিক্ত করে নিজের সর্বস্বকে বিলিয়ে দিতে না পারলে, সে তো ত্যাগী নয়। মার এই উঁচু ত্যাগের গগনস্পর্শী চূড়া কেউ যে ছুঁতেই পারবে না। তাঁর এ গোপন বরেণ্য ত্যাগের মহিমা একা অন্তর্যামীই জানেন !

এই তো, সেই সত্যিকারের মোসলেম জননী, যিনি নিজ হাতে নিজের একমাত্র সন্তানকে যুদ্ধসাজে সাজিয়ে জন্মভূমির পায়ে রক্ত ঢালতে পাঠাতেন।

এ বিসর্জন, না অর্জন ?

সালার

জননী আর জন্মভূমির দিকে কখনো আর এত স্নেহ এত ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখিনি, যেমন তাঁদিগে ছেড়ে আসবার দিনে দেখেছিলুম। ... শেষ চাওয়া মাত্রেই বোধ হয় এমনি প্রগাঢ় করুণ ! ...

নাঃ, আমাকে হয়রান করে ফেললে এদের অতিভক্তির চোটে। আমি যেন মহামহিমান্বিত এক সম্মানার্হ ব্যক্তিবিশেষ আর কি ! দিন নেই, রাত নেই, শুধু লোক আসছে আর আসছে। যে-আমাকে তারা এইখানেই হাজারবার দেখেছে তারাও আবার আমাকে নতুন করে দেখছে। এ যেন এক তাজ্জব ব্যাপার। আমি আমার চির-পরিচিত শৈশব-সাথী বন্ধুদের মাঝে থেকেও মনে করছি যেন 'আবু হোসেনে'র মতো এক রাত্তিরেই

আমি ঐরকম একটা রাজা-বাদশা গোছের কিছু হয়ে পড়েছি ! সবচেয়ে বেশি দুঃখ হচ্ছে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের ভক্তি দেখে। বন্ধুরা যদি ভক্তি করে, তাহ'লে বন্ধুদের ঘাড়ে পড়ল একটা প্রকাণ্ড মুদগর ! তাদিগে যতই বলছি, ভো ভো আহম্মকবৃন্দ, তোমাদের এ চোরের লক্ষণ, ওর্ফে অতিভক্তি সংবরণ কর, ততই যেন তারা আমার আরো মহত্ত্বের পরিচয় পাচ্ছে ! ... বাইরে তো বেরোনো দায় ! বেরোলেই অমনি স্ত্রী-পুরুষের ছোট বড় মাঝারি প্রাণী আমার দিকে প্রাণপথে চক্ষু বিস্ফারিত করে চেয়ে থাকে, আর অন্যকে আমার সবিশেষ ইতিবৃত্ত জ্ঞাত করিয়ে বলে, 'ঐ রে, ঐ লম্বা সুন্দর ছেলেটা যুদ্ধে যাচ্ছে।'

তারা কোনটা দেখে আমার,—ভিতর—না বাহির ?

[খ]

রেলপথে

(অন্ডালের কাছাকাছি)

যাক, এতক্ষণে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধার আক্রমণ হতে রেহাই পাওয়া গেল !—উঃ, যুদ্ধের আগেই এও তো একটা মন্দ যুদ্ধ নয়, রীতিমতো দ্বন্দ্বযুদ্ধ ! এখন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ...

একটা ভালো কাজ করে যা আনন্দ আর আত্মপ্রসাদ মনে মনে লাভ করা যায়, তার অনেকটা নষ্ট করে দেয় বাইরের প্রশংসায়।

সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়েছিল কলকাতায় আর হাবড়ার স্টেশনে।—ওঃ, সে কি বিপুল জনতা আর সে কি আকুল আগ্রহ আমাদিগকে দেখবার জন্যে ! আমরা মঙ্গলগ্রহ হতে অথবা ঐ রকমের স্বর্গের কাছাকাছি কোনো একটা জায়গা হতে যেন নেমে আসছি আর কি ! যাঁদের সঙ্গে কখনো আলাপ করবারও সুযোগ পাইনি, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে কোলাকুলি করেছেন আর অশ্রু গদগদ কণ্ঠে আশিস করেছেন—ঐ যে হাজার হাজার পুর-মহিলার হৃদয় গলে সহানুভূতির পূত অশ্রু ঝরছে, ওতেই আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সূচিত হচ্ছে !—সকলেরই দৃষ্টি আজ কত স্নেহ-আর্দ্র কোমল ! ... ...

স্টেশনে স্টেশনে এই যে উপহারের আর বিদায়-সম্ভাষণের ধুমধাম, এতে কিন্তু বড্ডো বেশি ব্যতিব্যস্ত করে ফেলছে !—এসব রাজ্যের জিনিস খাবে কে ?—আহা, না, না, এই রকম উপহার দিয়েই যদি ওরা তৃপ্ত হয়, একটা অশ্রুময় গৌরবে বক্ষ ভ'রে ওঠে, তবে তাই হোক !

মন ! বুঝে নাও কি জন্যে এত ভক্তি-শ্রদ্ধা। ভেবে নাও কি ঘোর দায়িত্ব মাথায় করছ !

আমার কম্পিত বুকে থেকে থেকে এখনোও সেই আর্ত বন্দনার ঘন ঘন প্রতিধ্বনি হচ্ছে, 'বন্দে মাতরম—বন্দে মাতরম।'

রেলগাড়ি

নিশিভোর

কি সুন্দর জলে-ধোওয়া আকাশ ! কি স্নিগ্ধ নিঝুম নিশি-ভোর ! সারা প্রকৃতি এখনো তন্দ্রালস নয়নে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে রয়েছে। গোলাবি রঙের মসলিনের মতো খুব পাতলা একটা আবছায়া তার ধূমভরা ক্লান্ত দেহটায় জড়িয়ে রয়েছে। আর একটু পরেই এমন সুন্দর প্রকৃতি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে জেগে উঠবে, তার পরে সেই তেমনি নিত্যকার গোলমাল।

(ঐ, প্রত্যুষে)

এখন বোধ হচ্ছে যেন সমস্ত দেশটা এইমাত্র বিছানা ছেড়ে উঠে উদাস-অলস নয়নে তার চেয়েও উদার আকাশটার দিকে চেয়ে রয়েছে ! এখনো তার আঁখির পাতায় পাতায় ঘুমের জড়িমা মাখানো ! হাই তোলার মতো মাঝে মাঝে দমকা বাতাস ছুটে আসছে !

পাকা তবলচির মতো রেলগাড়িটা কি সুন্দর কার্ফা বাজিয়ে যাচ্ছে, 'পাঁঠা কেটে ভাগ দিন—পাঁঠা কেটে ভাগ দিন !' ইচ্ছে করছে রেল-চলার এই কার্ফা তালের তালে তালে একটা ভৈরোঁ কি টোড়ি রাগিণী ভাঁজি, কিন্তু গান গাইবার মতো এখন আদৌ সুর নেই যেন আমার কণ্ঠে।

মধুপুর

নিশিশেষের গ্যাসের আলো পড়ে আমাদের মুখগুলো কি করুণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ঐ ফ্যাকাশে আলোর পাণ্ডুর আভা প্রতিভাত হয়ে আমার ঘুমন্ত সৈনিকবন্ধুর সিক্ত নয়ন-পল্লবগুলি কিরকম চকচক করছে ! ও কিসের অশ্রুবিন্দু ? বিদায়-ব্যথার ?—কে জানে ! ...

আজ এই প্রভাতের গ্যাসের আলোর মতোই পাণ্ডুর রক্তহীন একটি তরুণ মুখ ক্ষণে ক্ষণে আমার বুকের মাঝে ভেসে উঠছে। এখন যেন একটা বাষ্পময় কুয়াশার মতো আধো-আলো আধো-আঁধার ভাব দেখা যাচ্ছে, কদিন ধরে তার দৃষ্টিটিও এই রকম ঝাপসা সজল হয়ে উঠেছিল ! সে কিন্তু কখনো কিছু বলেনি—কিছু বলতে পারেনি—আমিও কখনো মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনি—হাজার চেষ্টাতেও না ! কি যেন একটা লজ্জামিশ্রিত কিছু আমায় প্রাণপণে চোখমুখ ঢেকে মানা করত—না, না, না, তবু কি করে আমাদের দুটি প্রাণের গোপন কথা দুজনেই জেনেছিলুম।—ওঃ, প্রথম যৌবনের

এই গোপন ভালোবাসাবাসির মাধুর্য কত গাঢ়। আমার বিদায়দিনেও আমি একটি মুখের কথা বলতে পারিনি তাকে! শুধু একটা জমাট অশ্রুখণ্ড এসে আমার বাকরোধ করে দিয়েছিল! সেও কিছু বলেনি, যতদিন বাড়িতে ছিলুম, ততদিন শুধু লুকিয়ে কেঁদেছে আর কেঁদেছে! তারপর বিদায়ের ক্ষণে তাদের ভাঙা দেয়ালটা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রক্ত-ভরা আঁখিতে ব্যাকুল বেদনায় চেয়েছিল!—মা যেন আমার গোপন-ব্যথার রক্ত-ক্ষরা দেখেই সেদিন বলেছিলেন, 'যা বাপ, একবার শহিদাকে দেখা দিয়ে আয়। সে মেয়ে তো কেঁদে কেঁদে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে!'—আমি তখন জোর করে বলেছিলুম, 'না মা, মরুকগে সে, আমি কিছুতেই দেখা করতে পারব না।'—হায়রে, খামখেয়ালির অহেতুক অভিমান!

আজ বড় দুঃখে আমার সেই প্রিয় গানটা মনে পড়ছে,—

'দুজনে দেখা হলো মধু-যামিনীরে—
কেন কথা কহিল না-চলিয়া গেল ধীরে?
নিকুঞ্জে দখিনাবায়, করিছে হায় হায়—
লতাপাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে!—
দুজনের আঁখিবারি গোপনে গেল ঝরে—
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে;
আর তো হলো না দেখা জগতে দোঁহে একা,
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা-তীরে!—'

উঃ, কি পানসে উদাস আজকার ভোরের বাংলাটা!—সদ্যসুপ্তোত্থিত বনের বিহগের আনন্দ-কাকলি আজ যেন কিরকম অশ্রুজড়িত আর দীর্ণ ব্যথিত!

এই গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দটা কত অরুন্তুদ গভীর! ঠিক যেন গির্জায় কোনো অতীত হতভাগার চিরবিদায়ের শেষ ঘণ্টাধ্বনি।

লাহোরের অদূরে
(নিশীথ)

একটা বিরাট মহিষাসুরের মতো কি একরোখা ছুট ছুটছে এই উন্মাদ বাষ্প-রথটা! ... ছোটো, ওগো আগুন-আর-বাষ্প-পোরা দানব, ছোটো! আর দোল দাও—দোল দাও এই তরুণ তোমার ভাইদের! ছোটো, ওগো খ্যাপা দৈত্য, ছোটো—আর পিষে দিয়ে যাও তোমার এই লৌহময় পথটাকে! তোমার পথের পাশে ঘুমিয়ে যারা, তাদের জাগিয়ে দিয়ে যাও তোমার এই ছোটার শব্দে! ...

নিশীথের জমাট অন্ধকার চিরে শান্ত বনশ্রীকে চকিত শঙ্কিত করে কত জোরে ছুটেছে এই খামখেয়ালি মাথাপাগলা রাক্ষসটা,—কিন্তু তার চেয়েও লক্ষ গুণ বেগে আমার মন উল্টোদিকে ছুটেছে—যেখানে আমার সেই গোপন আকাঙ্ক্ষিতার বাষ্পরুদ্ধ চাপাকান্নার আকুলতা গ্রামের নিরীহ অন্ধকারকে ব্যথিত ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে! মন

আমার তারি সাথে শ্বাস ফেলছে, যে হতভাগিনীর ফুলে-ফুলে-ওঠা দীর্ঘশ্বাস সরল-মেঠো বাতাসটিকে নিষ্ঠুরভাবে আহত করছে! আলুথালু আকুলকেশ, ধূলি-লুণ্ঠিত শিথিল-বসন, উজাড় করে দেওয়া আঁসুয় ভেজা উপাধান,—সব যেন মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি আর এই মধু-কল্পনার স্নিগ্ধকারুণ্য আমার বুকে কেমন একটি গৌরবের ছোঁয়া দিয়ে যাচ্ছে!

সমস্ত শাল আর পিয়াল বন কাঁপিয়ে যেন একটা পুত্রশোকাতুরা দৈত্য-জননী ডুকরে ডুকরে কাঁদছে 'ঔ—ঔ—ঔ!' আর মাতৃহারা দৈত্যশিশুর মতো এই খ্যাপা গাড়িটাও এপার থেকে কাৎরে' কাৎরে' উঠছে, উ—উ—উঃ!

[গ]

নৌশেরা

এস আমার বোবা সাথী, এস! আজ কতদিন পরে তোমায় আমায় দেখা! তোমার বুকে এমনি করে আমার প্রাণের বোঝা নামিয়ে না রাখতে পারলে এতদিন আমার ঘাড় দুমড়ে পড়ত!

আহ্ কি জ্বালা! এত হাড়ভাঙা পরিশ্রম, এত গাধাখাটুনির মাঝেও সেই একান্ত অন্ধস্মৃতিটার ব্যথা যেন বুকের উপর চেপে বসে আছে! ... আজ তাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে! হৃদয়, শক্ত হও—বাঁধন ছিঁড়তে হবে। যে তোমার কখনো হয়নি, যাকে ককখনো পাও নি, যে তোমার হয়তো ককখনো হবে না, যাকে ককখনো পাবে না, যার অজানা ভালোবাসার স্মৃতিটাই ছিল—তোমার সারা বক্ষ বেদনায় ভরে, সেই শহিদার স্মৃতিটাকেও ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে! উঃ! তা ... পারবে? সাহস আছে? 'না বললে চলবে না, এ যে পারতেই হবে! মনে পড়ে কি আমাদের দেশের মা-ভাই-বোনের দেওয়া উপহার? বুঝেছিলে কি যে, ওগুলি তাঁদের দেওয়া দায়িত্বের, কর্তব্যের গুরুভার? আমাদের কাজের উপর আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কষ্টিপাথরের মতো সহ্যগুণ আমাদের থাকা চাই, তবে না জগতের লোকে যাচাই করে নেবে যে, বাঙালিরাও বীরের জাতি। এ সময় একটা গোপন স্মৃতি-ব্যথা বুকে পুষে মুষড়ে পড়লে চলবে না। তাকে চাপা দিতেও পারবে না, নিঃশেষে বিসর্জন দিতে হবে! একেবারে বাইরের ভিতরের সব কিছু উজাড় করে বিলিয়ে দিতে হবে, তবে না রিক্ততার—বিজয়ের পূর্ণরূপ ফুটে উঠবে প্রাণে! অনেকে জীবন দিয়েছে, তবু এই প্রাণপণে-আঁকড়ে ধরে থাকা মধু-স্মৃতিটুকু বিসর্জন দিতে পারেনি! তোমাকে সেই অসাধ্য সাধন করতে হবে! পারবে? সাধনার সে জোর আছে?—যদি না পারো তবে কেন নিজেকে 'মুক্ত', 'রিক্ত', 'বীর' বলে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাচ্ছ? যার প্রাণের গোপনতলে এখনো কামনা জেগে রয়েছে, সে ভোগী-মিথ্যুক আবার ত্যাগের দাবি করে কোন লজ্জায়? সে কাপুরুষের

আবার বীরের পবিত্র শিরস্ত্রাণের অবমাননা করবার কি অধিকার আছে? দেশের জন্য প্রাণ দিবে যারা, তারা প্রথমে হবে ব্রহ্মচারী, ইন্দ্রিয়জিৎ!—

মাথার ওপর মা আমার ভাবী-বিজয়ী বীর-সন্তানের মুখের দিকে আশা-উৎসুক নয়নে চেয়ে রয়েছেন, আর পায়ের নিচে এক তরুণী তার অশ্রুমিনতি-ভরা ভাষায় সাধছে, 'যেয়ো না গো প্রিয়, যেয়ো না।' কি করবে? ... নিশ্চয়ই পারবে! তুমি যে মায়ামমতাহীন কঠোর সৈনিক! ...

শক্ত হও হৃদয় আমার, শক্ত হও! আজ তোমার বিসর্জনের দিন! আজ ঐ কাবুল নদীর ধারের উষর প্রান্তরটার মতোই বুকটাকে রিক্ত শূন্য করে ফেলতে হবে। তবে না তোমার সমস্ত তৃষ্ণা, সমস্ত সুখ-দুঃখ বৈরাগ্যের যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিতে পূর্ণ রিক্ততার গান ধরবে,—

'ওগো কাঙাল, আমায় কাঙাল করেছ
আরো কি তোমার চাই?
ওগো ভিখারি, আমার ভিখারি,—
পলকে সকলি সঁপেছি চরণে আর তো কিছুই নাই।—
আরো কি তোমার চাই'

* * *

কুর্দিস্তান

পেয়েছি,—পেয়েছি! ওঃ, আজ দীর্ঘ এক বৎসর পরে আমার প্রাণ কেন পূর্ণ-রিক্ততায় ভরে উঠেছে বলে বোধ হচ্ছে! ... এই এক বৎসর ধরে সে কি ভয়ানক যুদ্ধ মনের সাথে! এ সময়ে কত কিছুই না মারা গেল! ... বাইরের যুদ্ধের চেয়ে ভিতরের যুদ্ধ কত দুরন্ত দুর্বার! রণজিৎ অনেকেই হতে পারে, কিন্তু মনজিৎ কজন হয়?—সে কেমন একটা প্রদীপ্ত কাঠিন্য আমাকে ক্রমেই ছেয়ে ফেলছে। সে কি সীমাহীন বিরাট শূন্য হয়ে গেছে হৃদয়টা আমার!—এই কি রিক্ততা? ... ভোগও নেই—ত্যাগও নেই; তৃষ্ণাও নেই—তৃপ্তিও নেই; প্রেমও নেই—বিচ্ছেদও নেই;— এ যেন কেমন একটা নির্বিকার ভাব! না ভাই, না, এমন রিক্ততা-ভরা তিক্ততা দিয়ে জীবন শুধু দুর্বিষহই হয়ে পড়ে! এমন কঠিন অকরুণ মুক্তি তো আমি চাইনি! এ যেন প্রাণহীন মর্মর-মন্দির! ...

তবু কিন্তু রয়ে রয়ে মর্মরের শক্ত বুকে শুক্লা চাঁদিনির মতো করুণ মধুর হয়ে সে কার স্নিগ্ধশান্ত আলো হৃদয় ছুঁয়ে যায়?—হায়, ছুঁয়ে যায় বটে, কিন্তু আর তো তেমন নুয়ে যায় না! ... দেখেছ? আমার অহঙ্কারী মন তবু বলতে চায় যে, ওটি নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দেওয়ার একটা অখণ্ড আনন্দের এক কণা শুভ্র জ্যোতি!—তবু সে বলবে না যে ওটা একটি বিসর্জিতা প্রতিমার প্রীতির কিরণ! ...

আঃ, আজ এই আরবের উলঙ্গ প্রকৃতির বুকে-মুখে মেঘমুক্ত শুভ্রজ্যোৎস্না পড়ে তাকে এক শুক্লবসনা সন্ন্যাসিনীর মতো দেখাচ্ছে! এদেশের এই জ্যোৎস্না এক উপভোগ

করবার জিনিস। পৃথিবীর আর কোথাও বুঝি জ্যোৎস্না এত তীব্র আর প্রখর নয়। জ্যোৎস্নারাত্রিতে তোলা আমার ফটোগুলো দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না যে এগুলো জ্যোৎস্নালোকে তোলা ফটো। ঠিক যেন শরৎপ্রভাতের সোনালি রোদ্দুর।

হাঁ,—এতে মস্ত আর এক মুশকিলে পড়লুম দেখছি। ... ডালিম ফুলের মতোই সুন্দর রাঙা টুকটুকে একটি বেদুঈন যুবতী পাকড়ে বসেছে যে, তাকে বিয়ে করতেই হবে। সে কি ভয়ানক জোর-জবরদস্তি! আমি যত বলছি 'না', সে তত একরোখা ঝোঁকে বলে, 'হাঁ, নিশ্চয়ই হাঁ!' সে বলছে যে, সে আমাকে বড্ডো ভালোবেসে ফেলেছে, আমি বলছি যে, আমি তাকে একদম ভালোবাসিনি। সে বলছে, তাতে কিছু আসে যায় না,—আমাকে ভালোবেসেছে, আমাকেই তার জীবনের চিরসাথী বলে চিনে নিয়েছে—ব্যস! এই যথেষ্ট! আমার ওজর-আপত্তির মানেই বোঝে না সে! আমি যতই তাকে মিনতি করে বারণ করি, সে ততই হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে বলে, 'বাঃ-রে, আমি যে ভালোবেসেছি, তা তুমি বাসবে না কেন?'—হায়, একি জুলুম।

ওরে মুক্ত! ওরে রিক্ত! তোর ভয় নেই, ভয় নেই! এই যে হৃদয়টাকে শুষ্ক করে ফেলেছিস, হাজার বছরের বৃষ্টিপাতেও এতে ঘাস জন্মাবে না, ফুল ফুটবে না! এ বালি-ভরা নীরস সাহারায় ভালোবাসা নেই।

যে ভালোবাসবে না, তাকে ভালোবাসায় কে? যে বাধা দেবে না, তাকে বাঁধে কে?—'আমাকে যে বাঁধবে ধরে, এই হবে যার সাধন, সে কি অমনি হবে? ...'

কারবালা

এই সেই বিয়োগান্ত নিষ্করুণ নাটকের রঙ্গমঞ্চ,—যার নামে জগতের সারা মোসলেম নরনারীর আঁখি-পল্লব বড় বেদনায় সিক্ত হয়ে ওঠে! এখানে এসেই মনে পড়ে সেই হাজার বছর আগের ধর্ম আর দেশ রক্ষার জন্যে লক্ষ লক্ষ তরুণ বীরের হাসতে হাসতে 'শহীদ' হওয়ার কথা! তেমনি বয়ে যাচ্ছে সেই ফোরাত নদী, যার একবিন্দু জলের জন্য দুধের ছেলে, 'আসগর' কচি বুকে জহর-মাখা তীরের আঘাত খেয়ে বাবার কোলে তৃষ্ণার্ত চোখ দুটি চিরতরে মুদেছিল! ফোরাতের এই মরুময় কূলে কূলে না জানি সে কত পবিত্র বীরের খুন বালির সঙ্গে মাখানো রয়েছে। আঃ, এ বালির পরশেও যেন আমার অন্তর পবিত্র হয়ে গেল।

কয়েকটা পাষাণময় নিস্তব্ধ গৃহ খাড়া রয়েছে জমাট হয়ে,—উদার অসীম আকাশেরই মতো বিবৃত মরুভূমি তার বালুভরা আঁচল পেতে চলেই গিয়েছে,—ছোট্ট দুটি তৃষ্ণাতুর দুম্বা-শিশু 'মা 'মা করে চিৎকার করতে করতে ফোরাতের দিকে ছুটে আসছে,—শিশির-বিন্দুর মতো সুন্দর কয়েকটি বুভুক্ষু বালিকা ফোরাতের এক হাঁটু জলে নেমে আঁজলা আঁজলা জল পান করে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করছে—বালিতে আর বাতাসে মাতামাতি,—এইসব মিলে কারবালার একটি করুণ চিত্র চোখের সামনে ফুটে উঠছে।

কারবালা ! কারবালা ! আজ তোমারই আকাশ, তোমারই বাতাস, তোমারই বক্ষের মতো আমার আকাশ বাতাস বক্ষ সব একটা বিপুল রিক্ততায় পূর্ণ ! ...

সেদিনও সেই বেদুইন যুবতীগুলোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।—এই অবাধ্য অবুঝ তরুণী সে কি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল আমার পিছু পিছু ছুটছে। আমি বাইরে বেরোলেই দেখতে পাই, সে একটা মস্ত আরবি ঘোড়ায় চড়ে ফোরাতের কিনারে কিনারে আরবি গজল গেয়ে বেড়াচ্ছে ! সে সুরের গিটকারি কত তীব্র—কি তীক্ষ্ণ। প্রাণে যেন খেদং তীরের মতো এসে বিঁধে !

আমি বললুম, 'ছিঃ গুল, একি পাগলামি করছ ?—আমার প্রাণে যে ভালোবাসাই নেই, তা ভালোবাসব কি করে ?' সে তো হেসেই অস্থির। মানুষের প্রাণে যে ভালোবাসা নেই, তা সে নতুন শুনলে।—আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আমায় ভালোবাসবার তোমার তো কোনো অধিকার নেই গুল !'—সে আমার হাতটা তার কচি কিশলয়ের মতো কম্পিত ওষ্ঠপুটে ছুঁইয়ে আর মুখটা পাকা বেদানার চেয়েও লাল করে বললে, 'অধিকার না থাকলে আমি ভালোবাসছি কি করে হাসিন ?'—এ সরল যুক্তির পরে কি আর কোনো কথা খাটে ?

[ঘ]

আজিজিয়া

কি মুশকিল ! কোথায় কারবালা আর কোথায় আজিজিয়া ! আর সে কতদিন পরেই না এখানে এসেছি ! ... তবু গুল এখানে এল কি করে ?

শুনছি এদেশের সুন্দরীরা এমনি মুক্ত স্বাধীন আবার এমনি একগুঁয়ে। একবার যাকে ভালোবাসে, তাঁকে আর চিরজীবনেও ভোলে না। এদের এ সত্যিকারের ভালোবাসা। এ উদ্দাম ভালোবাসায় মিথ্যা নেই, প্রতারণা নেই !—কিন্তু আমি তো এ 'সাপে-নেঙুড়ে' ভালোবাসায় বিলকুল রাজি নই। তা হলে আমার এ রিক্ততার অহঙ্কারের মাথা কাটা যাবে যে। ...

কাল যখন গুল আমার পাশ দিয়ে ঘোড়াটা ছুটিয়ে চলে গেল, তখন তার 'নরগেস' ফুলের মতো টানা চোখ দুটোয় কি একটা ব্যথা-কাতর মিনতি কেঁপে কেঁপে উঠছিল ! তার সেই চকিত চাওয়ার মৌনভাষা যেন কেঁদে কেঁদে কয়ে গেল, 'বহুৎ দাগা দিয়া তু বেরহম !' ...

আমি আবার বললুম, 'আমি যে মুক্ত, আমায় বাঁধতে পারবে না ! ... আমি যে রিক্ত, আমি তোমায় কি দিব ?' সে তা'র ফিরোজা রঙের উড়ানিটা দিয়ে আমার হাতদুটো এক নিমেষে বেঁধে ফেলে বললে, 'এই তো বেঁধেছি ! ... আর তুমি রিক্ত বলছ

হাসিন? তা হোক, আমার কুম্ভ-ভরা ভালোবাসা হতে না হয় খানিক ঢেলে দিয়ে তোমার রিক্ত চিত্ত পূর্ণ করে দেবো!'

আমি যত বলছি, 'না—না', সে তত হাসছে আর বলছে, 'মিথ্যুক, মিথ্যুক, বেরহম!'

সত্যিই তো, একি নতুন উন্মাদনা জাগিয়ে দিচ্ছ প্রাণে গুল? কেন আমার শুষ্ক প্রাণকে মুঞ্জরিত করে তুলছ—নাঃ, এখান হতেও সরে পড়তে হবে দেখছি।—আমার কি একটা কথা মনে পড়ছে, 'সকল গরব হায়, নিমেষে টুটে যায়, সলিল বয়ে যায় নয়নে।'

ওরে আকাশের মুক্ত পাখি, ওরে মুগ্ধ বিহগী! একি শিকলি পরতে চাচ্ছিস তা তুই এখন কিছুতেই বুঝতে পারছিসনে।—এড়িয়ে চল—এড়িয়ে চল সোনার শিকল! ... 'মানুষ মরে মিঠাতে, পাখি মরে আঠাতে!'

*　　　*　　　*

কুতল-আমারা

(শেষ বসন্তের নিশীথ রাত্রি)

আঃ, খোদা! কেমন করে তুমি এমন দু দুটো আসন্ন বন্ধন হতে আমায় মুক্তি দিলে, তাই ভাবছি আর অবিশ্রান্ত অশ্রু এসে আমাকে বিচলিত করে তুলছে! এ মুক্তির আনন্দটা বড় নিবিড় বেদনায় ভরা! রিক্তের বেদন আমার মতো এমনি বাঁধা আর ছাড়ার দুটানার মধ্যে না পড়লে কেউ বুঝতে পারবে না ... হাঁ, এই সঙ্গে একটা নীরস হাসির বেগ কিছুতেই যেন সামলাতে পারছিনে এই দুটো ব্যর্থ-বন্ধনের নিষ্ঠুর কঠিন পরিণাম দেখে। তাই এই নিশীথে একটা পৈশাচিক হাসি হেসে গাইছি, 'নিঠুর, এই করেছ ভালো! এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দাহন জ্বালো! এই করেছ ভালো!' কি হয়েছে, তাই বলছি!—

সেদিন চিঠি পেলুম, শহিদার, আমার গোপন ঈপ্সিতার বিয়ে হয়ে গেছে,—সে সুখী হয়েছে! ... মনে হলো, যেন এক বন্ধন হতে মুক্তি পেলাম।—না, না, আর অসত্য বলব না, আমার সেই সময় কেমন একটা হিংসা আর অভিমানে সারা বুক যেন আলোড়িত হয়ে উঠেছিল, তাই এই কদিন ধরে বড় হিংস্রের মতোই ছুটে বেড়িয়েছি, কিন্তু শান্তি পাইনি। এই আমাদের রক্তমাংসময় শরীর আর তারই ভিতরকার মনটা নিয়ে যতটা অহঙ্কার করি, বাইরে তার কতটুকু টিকে?—যেমনি মনটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে এক নিমেষের জন্য দুরস্ত করে রাখি, অমনি মনে হয় 'এই তো এক মস্ত দরবেশ হয়ে পড়েছি।' তারপরই আবার কখন কোন ক্ষণে যে মনের মাঝে ক্ষুধিত বাসনা হাহাকার ক্রন্দন জুড়ে দেয়, তা আর ভেবেই পাই না! আবার, পেলেও সেটা মিথ্যা দিয়ে

ঢাকতে চাই!—হায়রে মানুষ! বুঝি বা এই বন্ধনেই সত্যিকার মুক্তি রয়েছে! কে জানে? ... ভুলে যাও অভাগিনী শহিদা, ভুলে যাও—সকল অতীত, সব স্মৃতির বেদনা, সব গোপন আকাঙ্ক্ষা, সব কিছু। সমাজের চারিদিকে অন্ধকার খাঁচায় বন্দিনী থেকে কেন হতভাগিনী তোমরা এমন করে অ-পাওয়াকে পেতে চাও? কেন তোমাদের মুগ্ধ অবোধ হিয়া এমন করে তারই পায়ে সব ঢেলে দেয়, যাকে সে কখখনো পাবে না? তবে কেন এ অন্ধ কামনা? ... বিশ্বের গোপনতম অন্তরে অন্তরে তোমাদের এই ব্যর্থপ্রেমের বেদনা-ধারা ফল্গুনদীর মতো বয়ে যাচ্ছে, প্রাণপণে এই মূঢ় ভালোবাসাকে রুখতে গিয়ে তোমার হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে আর সেই বিদীর্ণ হৃদয়ের খুনে সমাজের আবরণ লালে-লাল হয়ে গেছে, তবু সে তোমাদের এই আপনি-ভালোবাসার, পূর্বরাগের প্রশ্রয় দেয়নি। তাই আজো পাথরের দেবতার মতো বিশাল দণ্ডহস্তে সে তোমাদের সতর্ক পাহারা দিচ্ছে!

ভুলে যাও শহিদা, ভুলে যাও, নতুনের আনন্দে পুরাতন ভুলে যাও! তোমাদের কোনো ব্যক্তিত্বকে ভালোবাসবার অধিকার নেই, জোর করে স্বামীত্বকে ভালোবাসতে হবেই! ...

আঃ, আজ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের চাঁদের ম্লান রশ্মি পাতলা মেঘের বসন ছিঁড়ে কি মলিন করুণ হয়ে ঝরছে!—গত নিশির কথাটা মনে পড়ছে আর গুরুব্যথায় নিজেই কেঁপে কেঁপে উঠছি!—

কাল রাত্তিরে এমনি সময়ে যখন এখানকার সান্ত্রীদের অধিনায়করূপে রিভলভার-হাতে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করে বেড়াচ্ছি, তখন শুনলুম, পেছনের সান্ত্রী একবার গুরুগম্ভীর আওয়াজে 'চ্যালেঞ্জ' করলে, 'হল্ট, হু কামস দেয়ার?' আর একবার সে জোরে বললে, 'কৌন হেয়? খাড়া রহো! হিলো মৎ!—মাগো!—উঃ!' তারপর আর কোনো আওয়াজ পাওয়া গেল না। শুধু একটা অব্যক্ত গোঙানি হাওয়ায় ভেসে এল! আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে দেখলুম, লাল পোশাক-পরা একটি আরব রমণী সান্ত্রীর রাইফেলটা নিয়ে ছুটছে আর সান্ত্রীর হিমদেহ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রয়েছে। আমার আর বুঝতে বাকি থাকল না কেন এতদিন ধরে আমাদের রাইফেল চুরি যাচ্ছে আর সান্ত্রী মারা পড়ছে! ওঃ কি দুর্ধর্ষ-সাহসী এই বেদুইন রমণীরা! আমি পলকে স্থির হয়ে রমণীকে লক্ষ্য করে গুলি ছাড়লুম, তার গায়ে লাগল না। আর একটা গুলি ছাড়তেই বোধ হয় নিজের বিপদ ভেবেই সে সহসা আমার দিকে মুখ ফিরে দাঁড়াল, তারপর বিদ্যুদ্বেগে পাকা সিপাইয়ের মতো রাইফেলটা কাঁধে করে নিয়ে আমার দিকে লক্ষ্য করল; খট করে বোল্ট বন্ধ করার শব্দ হল, তারপর কি জানি-কেন হঠাৎ সে রাইফেলটা দূরে ছুড়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল!—আত্মরক্ষার্থে আমি ততক্ষণ 'বোল্ট' বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। এই সুযোগে এক লাফে রিভলভারটা

নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই যা দেখলুম, তাতে আমারও হাতের রিভলভারটা এক পলকে খসে পড়ল।—তখন তার মুখের বোরকা খসে পড়েছে আর মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমা-শশীর পূর্ণ শ্বেত জোছনা তার চোখে মুখে যেন নিঃশেষিত হয়ে পড়েছে! আমি স্পষ্ট দেখলুম, জানু পেতে বসে বেদুইন যুবতী গুল। তার বিস্ময়চকিত চাউনি ছাপিয়ে জ্যোৎস্নার চেয়েও উজ্জ্বল অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে। একটা বেদনাতুর আনন্দের আতিশয্যে সে থরথর করে কাঁপছিল। তার প্রাণের ভাষা তারই ঐ অশ্রুর আখরে যেন আঁকা যাচ্ছিল, 'এতদিনে এমন করে দেখা দিলে নিষ্ঠুর! ছি, এত কাঁদানো কি ভালো!' পাথর কেটে সে কে যেন আমার চোখে অনেকদিন পরে দুফোঁটা অশ্রু এনে দিল!

এ কি পরীক্ষায় ফেললে খোদা? আমার এ বিস্ময়মুগ্ধ ভাব কেটে যাবার পরেই মনে হলো, কি করা উচিত? ভয় হল আজ বুঝি সব সংযম, সব ত্যাগ-সাধনা এই মুগ্ধা তরুণীর চোখের জলে ভেসে যায়!—আবার এই সঙ্গে মনে পড়ল শহিদার কথা, এমনি একটি কচি অশ্রুস্নাত মুখ! ...

সমস্ত কূতল-আমারার মরুভূমি আর পাহাড়ের বুকে দোল খাইয়ে কার জলদমন্দ্র আওয়াজ ছুটে এল, '...সেনানী—হুঁশিয়ার!'

আবার আমি যেমন দেখতে পেলুম, আশিস-বারির মঙ্গলঝারি আর অশ্রুসমুজ্জ্বল বিজয়মালা হস্তে বাংলা আমাদের দিকে আশা-উত্তেজিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে!—প্রেমের চরণে কর্তব্যের বলিদান দেবো? না, না, ককখনো না!

আপনা-আপনি আমার কঠিন মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'খোদা, হৃদয়ে বল দাও! বাহুতে শক্তি দাও! আর কর্তব্য-বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করো প্রাণের শিরায় শিরায়!' ...

নিমেষে আমার সমস্ত রক্ত উষ্ণ হয়ে ভীমতেজে নেচে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে বজ্রমুষ্টিতে পিস্তলটা সোজা করে ধরলুম! সমস্ত স্তব্ধ প্রকৃতির বুকে বাজ পড়ার মতো কড় কড় করে কার হুকুম এল, 'গুলি করো!' ...

দ্রুম! দ্রুম!! দ্রুম!!! ... একটা যন্ত্রণা-কাতর কাৎরানি—আম্মা!—মাঃ!! আঃ!! ...

তারপরেই সব শেষ।

* * *

তারপরেই আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লুম! ... ছুটে গিয়ে গুলের এলিয়ে-পড়া দেহলতা আমার চিরতৃষিত অতৃপ্ত বুকে বিপুল বলে চেপে ধরলুম! তারপর তার বেদনাস্ফুরিত ওষ্ঠপুটে আমার পিপাসী ওষ্ঠ নিবিড়ভাবে সংলগ্ন করে আর্তকণ্ঠে ডাকলুম, 'গুল—গুল—গুল!' প্রবল একটা জলো-হাওয়ার নাড়া পেয়ে শিউলি ঝরে পড়ার মতো শুধু একরাশ ঝরা অশ্রু তার আমার মুখে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল!

অবশ অলস তার ভূজলতা দিয়ে বড় কষ্টে সে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরলে, তারপর আরো কাছে—আরো কাছে সংলগ্ন হয়ে নিসাড় নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল ! ... মেঘের কোলে লুকিয়ে-পড়া চাঁদের পানসে জ্যোৎস্না তার ব্যথা-কাতর মুখে পড়ে সে কি একটা স্নিগ্ধ করুণ মহিমশ্রী ফুটিয়ে তুলেছিল ! ... সেই অকরুণ স্মৃতিটাই বুঝি আমার ভাবী জীবনের সম্বল, বাকি পথের পাথেয় ! ... অনেকক্ষণ পরে সে আস্তে চোখ খুলে আমার মুখের পানে চেয়েই চোখ বুজে বললে, 'এই 'আশেকের' হাতে 'মাশুকের' মরণ বড় বাঞ্ছনীয় আর মধুর, নয় হাসিন?' আমি শুধু পাথরের মতো বসে রইলুম। আর তার মুখে এক টুকরা মলিন হাসি কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে গেল ! শেষের সে তৃপ্ত হাসি তার ঠোঁটে আর ফুটল না, শুধু একটা ভূমিকম্পের মতো কিসের ব্যাকুল শিহরণ সঞ্চরণ করে গেল ! ... তার বুকের লোহুতে আর আমার আঁখের আঁসুতে এক হয়ে বয়ে যাচ্ছিল ! সে তখনো আমায় নিবিড় নিষ্পেষণে আঁকড়ে ধরে ছিল আর তার চোখে-মুখে চিরবাঞ্ছিত তৃপ্তির স্নিগ্ধ শান্তশ্রী ফুটে উঠেছিল !—এই কি সে চাচ্ছিল? তবে এই কি তার নারী-জীবনের সার্থকতা? ... আর একবার—আর একবার—তার মৃত্যুশীতল ওষ্ঠপুটে আমার শুষ্ক অধরোষ্ঠ প্রাণপণে নিষ্পেষিত করে হুমড়ি পড়ে ডাক দিলুম,—'গুল, গুল, গুল !' বাতাসে আহত একটা কঠোর বিদ্রূপ আমায় মুখ ভ্যাংচিয়ে গেল, 'ভুল—ভুল—ভুল !' ...

আবার সমস্ত মেঘ ছিন্ন করে চাঁদের আলোর যেন ফিং ফুটছিল। গুলের নিঝুম দেহটা সমেত আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ছিলুম, এমন সময় বিপুল ঝন্‌ঝার মতো এসে এক প্রৌঢ়া বেদুইন মহিলা আমার বক্ষ হতে গুলকে ছিনিয়ে নিলে এবং উন্মাদিনীর মতো ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, 'গুল—আম্মা—গুল !'

* * *

প্রৌঢ়া তার মৃতা কন্যাকে বুকে চেপে ধরে আর একবার আর্তনাদ করে উঠতেই আমি তার কোলে মূর্ছাতুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাকলুম, 'আম্মা—আম্মা !' মার মতো গভীর স্নেহে আমার ললাট চুম্বন করে প্রৌঢ়া কেঁদে উঠল, 'ফরজন্দ, ফরজন্দ !' কাবেরীর জলপ্রপাতের চেয়েও উদ্দাম একটা অশ্রুস্রোত আমার মাথায় ঝরে পড়ল। ...

আঃ ! কত নিদারুণ সে কন্যাহীনা মার কান্না !

* * *

আমি আবার প্রাণপণে গা ঝেড়ে উঠে কাৎরে উঠলুম, 'আম্মা—আম্মা—মা !' — একটা রুদ্ধ কণ্ঠের চাপা কান্নার প্রতিধ্বনি পাগল হাওয়ায় বয়ে আনলে—'ফরজন্দ !'...

অনেক দূরে ... পাহাড়ের ওপর হতে, ... সে কোন শোকাতুরা মাতার কাঁদনের রেশ ভেসে আসছিল, 'আহ্—আহ্ আহ্।' ... আরবি ঘোড়ার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটার পাষাণে আহত শব্দ শোনা গেল—খট খট খট ! ! !

[ঙ]

করাচি

(মেঘম্লান সন্ধ্যা,—সাগর বেলা)

আমি আজ কাঙাল না রাজাধিরাজ ? বন্দী না মুক্ত ? পূর্ণ না রিক্ত ? ...

একা এই ম্লান মৌন আরব সাগরের বিজনবেলায় বসে তাই ভাবছি আর ভাবছি। আর আমার মাথার ওপর মুক্ত আকাশ বেয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি ঝরছে—রিম ঝিম ঝিম !

বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী

[ক]

[বাঙালি পল্টনের একটি বওয়াটে যুবক আমার কাছে তাহার কাহিনী বলিয়াছিল নেশার ঝোঁকে : নিচে তাহাই লেখা হইল। সে বোগদাদে গিয়া মারা পড়ে।]

'কি ভায়া ! নিতান্তই ছাড়বে না ? একদম এঁটেল মাটির মতো লেগে থাকবে ? আরে, ছোঃ ! তুমি যে দেখছি চিটে গুড়ের চেয়েও চামচিটেল ! তুমি যদিও হচ্ছ আমার এক গ্লাসের ইয়ার, তবুও সত্যি বলতে কি, আমার সেসব কথাগুলো বলতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। কারণ খোদা আমায় পয়দা করবার সময় মস্ত একটা গলদ করে বসেছিলেন, কেননা চামড়াটা আমার করে দিলেন হাতির চেয়েও পুরু, আর প্রাণটা করে দিলেন কাদার চেয়েও নরম ! আর কাজেই দু-চার জন মজুর লাগিয়ে আমার এই চামড়ায় মুগুর বসালেও আমি গোঁপে তা দিয়ে বলব, 'কুচ পরওয়া নেই', কিন্তু আমার এই 'নাজোক' জানটায় একটু আঁচড় লাগলেই ছোট্ট মেয়ের মতো চেঁচিয়ে উঠব ! তোমার 'বিরাশি দশ আনা' ওজনের কিলগুলো আমার এই স্থূল চর্মে স্রেফ আরাম দেওয়া ভিন্ন আর কোনো ফলোৎপাদন করতে পারে না, কিন্তু যখনই পাকড়ে বসো, 'ভাই, তোমার সকল কথা খুলে বলতে হবে', তখন আমার অন্তরাত্মা ধুকধুক করে ওঠে,—পৃথিবী ঘোরার ভৌগোলিক সত্যটা তখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। চক্ষেও যে সর্ষপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হতে পারে বা জোনাকি পোকা জ্বলে উঠতে পারে, তা আমার মতো এই রকম শোচনীয় অবস্থায় পড়লে তুমিও অস্বীকার করবে না।

[খ]

'হাঁ, আমার ছোটকালের কোনো কথা বিশেষ ইয়াদ হয় না। আর আবছায়া রকমের একটু একটু মনে পড়লেও তাতে তেমন কোনো রস বা রোমান্স (বৈচিত্র্য) নেই !—সেই সরকারি রাম-শ্যামের মতো পিতামাতার অত্যধিক স্নেহ, পড়ালেখায় নবডঙ্কা, ঝুলঝাপপুর ডাণ্ডাগুলি খেলায় 'দ্বিতীয় নাস্তি', দুষ্টামি-নষ্টামিতে নন্দদুলাল কৃষ্ণের তদানীন্তন অবতার, আর ছেলেদের দলে অপ্রতিহত প্রভাবে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের ক্ষুদ্র সংস্করণ ! আমার অনুগ্রহে ও নিগ্রহে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিশেষ খোশ ছিলেন কিনা, তা আমি

কারুর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি না ; তবে সকলেই আমার পরমার্থ কল্যাণের জন্য যে সকাল-সন্ধ্যে প্রার্থনা করত সেটা আমার তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় না-ওয়াকেফ ছিল না। একটা প্রবাদ আছে, 'উৎপাত করলেই চিৎপাত হতে হয়।' সুতরাং এটা বলাই বাহুল্য যে, আমার পক্ষেও উক্ত মহাবাক্যটির ব্যতিক্রম হয়নি. বরং ও কথাটা ভয়ানকভাবেই আমার উপর খেটেছিল ; কারণ ঘটনাচক্রে যখন আমি আমার জননীর কক্ষচ্যুত হয়ে সংসারের কর্মবহুল ফুটপাথে চিৎপাত হয়ে পপাত হলুম, তখন কত শত কর্মব্যস্ত সবুট-ঠ্যাং যে অহম-বেচারার ব্যথিত পাঁজরের উপর দিয়ে চলে গেল, তার হিসেব রাখতে শুভঙ্কর দাদাও হার মেনে যায়।—থাক আমার সেসব নীরস কথা আউড়িয়ে তোমার আর পিত্তি জ্বালাব না। শুনবে মজা?

একদিন পাঠশালায় বসে আমি বঙ্কিমবাবুর মুচিরাম গুড়ের অনুকরণে ছেলেদের মজলিস সর-গরম করে আবৃত্তি করছিলুম, 'মানময়ী রাধে! একবার বদন তুলে গুড়ুক খাও!' এতে শ্রীমতী রাধার মানভঞ্জন হয়েছিল কিনা জানবার অবসর পাইনি, কারণ নেপথ্যে ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে 'আরে রে, দুর্বৃত্ত পামর' বলে হুঙ্কার করে আমার ঘাড়ে এসে পড়লেন সশরীরে আমাদের আর্কমার্কা পণ্ডিতমশাই। যবনিকার অন্তরালে যে যাত্রার দলের ভীম মশাইয়ের মতো ভীষণ পণ্ডিমশাই অবস্থান করছিলেন, তা এ নাবালকের একেবারেই জানা ছিল না!—তার ক্রোধ-বহ্নি যে দুর্বাসার চেয়েও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল তা আমি বিশেষরকম উপলব্ধি করলুম তখন, যখন তিনি একটা প্রকাণ্ড মেষের মতো এসে আমার নাতিদীর্ঘ শ্রবণেন্দ্রিয় দুটি ধরে দেওয়ালের সঙ্গে মাথাটার বিষম সংঘর্ষণ আরম্ভ করলেন। তখনকার পুরোদস্তুর সংঘর্ষণের ফলে কোনো নূতন বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার উদ্ভাবন হয়নি সত্য, কিন্তু আমার সর্ব শরীরের 'ইলেকট্রিসিটি' যে সাংঘাতিক রকম ছুটাছুটি করেছিল, সেটা অস্বীকার করতে পারব না। মার খেয়ে খেয়ে ইটপাটকেলের মতো আমার এই শক্ত শরীরটা যত না কষ্ট অনুভব করেছিল, তাঁর সালঙ্কার গালাগালির তোড়ে তার চেয়ে অনেক কষ্ট অনুভব করেছিল আমার মনটা। আদৌ মুখরোচক নয় এরূপ কতকগুলো অখাদ্য তিনি আমার পিতৃপুরুষের মুখে দিচ্ছিলেন, এবং একেবারেই সম্ভব নয় এরূপ কতকগুলো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দাবি আমার কাছে করেছিলেন। তাঁর পাঁচপুয়া পরিমিত চৈতন্য চুটকিটা ভেক-ছানাসম শিরোপরি অস্বাভাবিক রকমের লম্ফ-ঝম্প প্রদান করছিল। সঙ্গে সঙ্গে খুব হাসিও পাচ্ছিল, কারণ 'চৈতন তেড়ে ওঠার' নিগূঢ় অর্থ সেদিন আমি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলুম! ক্রমে যখন দেখলুম, তাঁর এ প্রহারের কবিতায় আদৌ যতি বা বিরামের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, তখন আর বরদাস্ত হলো না! জানো তো, পুরুষের রাগ আনাগোনা করে আমিও তাই, ঐখানেই একটা হেস্তনেস্ত করে দেবার অভিপ্রায়ে তার খাঁড়ার মতো নাকটায় বেশ মাঝারি গোছের একটা ঘুষি বাগিয়ে দিয়ে বীরের মতো সটান স্বগৃহাভিমুখে হাওয়া দিলুম। বাড়ি গিয়েও আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করলুম না। তাই পিতৃভয়ে সেঁধুলম গিয়ে একেবারে চালের মরাইয়ে ; উদ্দেশ্য, এরূপ নিভৃত স্থান হতে কেউ আর সহজে আবিষ্কার করতে পারবে

না—কি জানি কখন কি হয় ! খানিক পরে—আমার সেই গুপ্তপুর হতেই শুনতে পেলুম পণ্ডিতমশাই ততক্ষণে সালঙ্কারে আমার জন্মদাতার কাছে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিলেন যে, আমার মতো দুর্ধর্ষ বাউণ্ডেলে ছোকরার লেখা-পড়া তো 'ক' অক্ষর গোমাংস, তদুপরি গুরুমশাইয়ের নাসিকায় গুরুপ্রহার ও গুরুপত্নীর নিন্দাবাদ অপরাধে আপাতত এই দুনিয়াতেই আমাকে লোখুঠুঁটোর মতো চাটু হস্তে মাছি মারতে হবে, অর্থাৎ কুষ্ঠব্যাধি হবে, তারপর নরকে যাতে আমার 'স্পেশাল' (বিশেষ) শাস্তির বন্দোবস্ত হয়, তার জন্যেও নাকি তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ঠিকঠাক করতে পারেন ! প্রথমত অভিশাপটার ভয়ে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম। গুরুপত্নীর নিন্দাবাদ কথাটা আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে অবগত হলুম, পণ্ডিতমশাইয়ের অর্ধাঙ্গিনীর নামও নাকি শ্রীমতী রাধা,—আর তাঁর এক-আধটু গুড়ুক খাওয়ারও নাকি অভ্যাস আছে, অবিশ্যি সেটা স্বামীদেবতার অগোচরেই সম্পন্ন হয়, আমি নাকি তাই দেখে এসে ছেলেদের কাছে স্বহস্তে গুড়ুক সেজে অভিমানিনী শ্রীমতী রাধার মানভঞ্জনার্থ করুণ মর্মস্পর্শী সুরে উপরোধ করছিলুম,—'মানময়ী রাধে, একবার বদন তুলে গুড়ুক খাও'—আর পণ্ডিতমশাই অন্তরালে থেকে সব শুনছিলেন।—আমার আর বরদাশত হলো না, চালের মরাইয়ে থেকেই উসখুস করতে লাগলুম, ইতিমধ্যে গরমেও আমি রীতিমত গলদঘর্ম হয়ে উঠেছিলুম। আমি মোটেই জানতুম না পণ্ডিতমশাইয়ের গিন্নীর নাম শ্রীমতী রাধা—আর তিনি যে গুড়ুক খান, তা তো বিলকুলই জানতুম না। কাজেই এতগুলো সত্যের অপলাপে আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলুম না, তুড়ুক করে চালের মরাই হতে পিতৃসমীপে লাফিয়ে পড়ে, আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্যে অশ্রুগদগদ-কণ্ঠে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগ করতে লাগলুম, কিন্তু ততক্ষণে ক্রোধান্ধ পিতা আমার আপিল অগ্রাহ্য করে ঘোড়ার গোগালচির মতো আমার সামনের লম্বা চুলগুলো ধরে দমাদ্দম প্রহার জুড়ে দিলেন। বাস্তবিক, সে রকম প্রহার আমি জীবনে আশা করিনি।—চপেটাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, পদাঘাত ইত্যাদি চার হাত-পায়ের যত রকম আঘাত আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, সব যেন রবিবাবুর গানের ভাষায় 'শ্রাবণের ধারার মতো' পড়তে লাগল আমার মুখের 'পরে—পিঠের 'পরে। সেদিনকার পিটুনি খেয়ে আমার পৃষ্ঠদেশ বেশ বুঝতে পেয়েছিল যে, তার 'পিঠ' নাম সার্থক হয়েছে। একেই আমাদের ভাষায় বলে, 'পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেওয়া।' বৃন্দাবন না দেখি তার পরদিনই কিন্তু বাবা আমায় বর্ধমান এনে 'নিউ স্কুলে' ভর্তি করে দিলেন ! কি করি, আমি নাচারের মতো সব সহ্য করতে লাগলুম।—কথায় বলে 'ধরে মারে, না সয় ভালো।'

[গ]

'প্রথম প্রথম শহরে এসে আমার মতো পাড়াগেঁয়ে গোঁয়ারকে বিষম বিব্রত হয়ে উঠতে হয়েছিল, বিশেষ করে শহুরে ছোকরাদের দৌরাত্মিতে। সে ব্যাটারা পাড়াগেঁয়ে

ছেলেগুলোকে যেন ইঁদুর–প্যাঁচার মতো পেয়ে বসে। যাহোক, অল্পদিনেই আমি শহুরে কায়দায় কেতা–দুরস্ত হয়ে উঠলুম! ক্রমে 'অহম' পাড়া–গেঁয়ে ভূতই আবার তাদের দলের একজন হুমরো–চুমরো ওস্তাদ ছোকরা হয়ে পড়ল। সেই—আগেকার পগেয়া—খচ্চর ছেলেগুলোই এখন আমায় বেশ একটু সমীহ করে চলতে লাগল।—বাবা, এ শর্মার কাছে বেঁড়ে–ওস্তাদি, এ ছেলে হচ্ছে অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি! দেখতে দেখতে পড়ালেখায় যত না উন্নতি করলুম, তার চেয়ে বহুল পরিমাণে উন্নতি করলুম রাজ্যের যত দুষ্টুমির গবেষণায়। তখন আমায় দেখলে বর্ধমানের মতো পবিত্র স্থানও তটস্থ হয়ে উঠত। ক্রমে আমাদের মস্ত একটা দল পেকে উঠল। পুলিশের ঘাড়ে দিনকতক এগারো–ইঞ্চি ঝাড়তেই তারা আমাদের সঙ্গে গুপ্ত সন্ধি করে ফেললে। এইরূপে ক্রমেই আমি নিচু দিকে গড়িয়ে যেতে লাগলুম—তাই বলে যে আমাদের দিয়ে কোনো ভালো কাজ হয়নি, তা বলতে পারবে না; মিশন, কুষ্ঠরোগ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে আমাদের এই বওয়াটে ছেলেদের দল যা করেছে তার শতাংশের একাংশও করে উঠতে পারেনি ঐ গোবেচারা নিরীহ ছাত্রের দল। তারা আমাদের মতো অমন অদম্য উৎসাহ–ক্ষমতা পাবে কোথায়? তারা তো শুধু বইয়ের পোকা। বর্ধমান যখন ডুবে যায়, তখন আমরাই শহরের সিকি লোককে বাঁচিয়েছিলুম, সে সময়ে আমাদের দলের অনেকে নিজের জীবন উৎসর্গ করে আর্তের জীবন রক্ষা করেছি! কনফারেন্সের, সভা–সমিতির চাঁদা আদায়ের প্রধান উদ্যোগ আয়োজনের প্রধান পাণ্ডা ছিলুম আমরা। আমাদেরই চেষ্টায় 'স্পার্টস', 'জিমনাস্টিক', 'সার্কাস', 'থিয়েটার', 'ক্লাব' প্রভৃতির আড্ডাগুলোর অস্তিত্ব অনেকদিন ধরে লোপ পায়নি।

পিতার অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও মাসোহারাটা ঠিকরকমই পাঠাতেন। তিনি তো আর আমার এতদূর উন্নতির আশা করেননি, আর এত খবরও রাখতেন না। কারণ কোনো ক্লাসে আমার 'প্রমোশন' স্টপ হয়নি। বহু গবেষণার ফলেও হেড মাস্টার মহাশয় আবিষ্কার করতে পারেননি—আমার মতো বওয়াটে ছোকরা কি করে পাসের নম্বর রাখে। ভায়া, ঐখানেই তো genius-এর (প্রতিভার) পরিচয়!—'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।' পরীক্ষার সময় চার–পাঁচজোড়া অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আমার পেছনে লেগে থাকতই, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যার কূল–কিনারা পান না, তাকে ধরবেন 'পদীর ভাই গৌরীশঙ্কর'। তাছাড়া খালি চুরি বিদ্যায় কি চলে? এতে অনেক মাথা ঘামাতে হয়। পরীক্ষকের ঘর হতে তাঁর ছেলে বা অন্য কোনো ক্ষুদ্র আত্মীয়ের থ্রু দিয়ে রজত চক্রের বিনিময়ে খাতাটি বেমালুম বদলে ফেলা, প্রেস হতে প্রশ্ন চুরি, প্রভৃতি অনেক বুদ্ধিই এ শর্মার আয়ত্ত ছিল। সেসব শুনলে তোমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে উঠবে!—যাহোক, এই রকমেই 'যেন তেন প্রকারেণ' থার্ড ক্লাসের চৌকাঠে পা দিলুম গিয়ে।

বাড়ি খুব কম যেতুম, কারণ পাড়াগাঁ তখন আর ভালো লাগত না। পিতাও বাড়ি না গেলে দুঃখিত হতেন না, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল, আমি এইবার একটা কিছু না হয়ে যাই না। আমাদের গ্রামের কুল্লে আমিই পড়তে এসেছিলুম ইংরেজি স্কুলে, তার উপর

আমি নাকি পাশগুলো পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো তড়াত্তর ডিঙিয়ে যাচ্ছিলুম! কেবল একজনের আঁখি দুটি সর্বদাই আমার পথপানে চেয়ে থাকত, তিনি আমার স্নেহময়ী জননী! মায়ের মন তো এত শত বোঝে না, তাই দুমাস বাড়ি না গেলেই মা কেঁদে আকুল হতেন। সংসারে মার কাছ ভিন্ন আর কারুর কাছে একটু স্নেহ-আদর পাইনি। দুষ্ট বদমায়েস ছেলে বলে, আমায় যখন সকলেই মারত, ধমকাত, তখন মাই কেবল আমায় বুকে করে সান্ত্বনা দিতেন। আমার এই দুষ্টুমিটাই যেন তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগত। আমার পিঠে প্রহারের দাগগুলোয় তেল মালিশ করে দিতে দিতে কতদিন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুর নদী বয়ে গেছে!

যখন থার্ড ক্লাশে উঠলুম, তখন বোধ হয় মায়ের জিদেই বাবা আমায় চতুষ্পদ করে ফেললেন, অর্থাৎ বিয়ে দিয়ে দিলেন। আমি 'কটিদেশ বন্ধনপূর্বক' নানা ওজর আপত্তি দেখাতে লাগলুম, কিন্তু মায়ের আদালতে ও তাঁর অশ্রুজলের ওকালতিতে আমার সমস্ত ওজর বাতিল ও নামঞ্জুর হয়ে গেল। কি করি, যখন শুভদৃষ্টি হয়ে গেল, তখন তো আর কথাই নাই! তাছাড়া, কনেটি মন্দ ছিল না, আজকালকার বাজারে পাড়াগাঁয়ে ওরকম কনে শয়ে একটি মেলে না। বয়সও বারো-তেরো হয়েছিল। ঐ বারো-তেরো বছরের কিশোরীটিকেই মা নাকি সোমত্ত মেয়ে দেখে বউ করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিলেন! আমারও বয়স তখন উনিশের কাছাকাছি। এতেই নাকি মেয়েমহলে মাকে কত কথা শুনতে হতো। প্রথম প্রথম কনে বৌ একটি পুঁটুলিরই মতো জড়সড় হয়ে তার নির্দিষ্ট একটি কোণে চুপ করে বসে থাকত। নববধূদের নাকি চোখ তেড়ে চাইতে নেই, তাই সে প্রায়ই চোখ বুজে থাকত। কিন্তু অনবরত চোখ বুজে থাকা, সেও যে এক বীভৎস ব্যাপার, তাই সে দু-একবার অন্যের অলক্ষ্যে ভয়-চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে নিত, যদি তার এই বেহায়াপনা কেউ দেখে ফেলে, তাহলেই মহাভারত অশুদ্ধ আর কি! আমাকে দেখলে তো আর কথাই নেই, নিজেকে কাছিমের মতো তৎক্ষণাৎ শাড়ি ওড়না প্রভৃতির ভিতর ছাপিয়ে ফেলত। তখন একজন প্রকাণ্ড অনুসন্ধিৎসু লোকের পক্ষেও বলা দুঃসাধ্য হয়ে উঠত, ওটা মানুষ, না কাপড়ের একটা বোঁচকা! তবে এটা আমার দৃষ্টি এড়াত না যে, আমি অন্যদিকে চাইলেই সে তার বেনারসি শাড়ির ভিতর থেকে চুরি করে আমার দিকে চেয়ে দেখত, কিন্তু আমি তার দিকে চাইতে না চাইতেই সে সটান চোখ দুটোকে বুজে ফেলে গম্ভীর হয়ে বসে থাকত, যেন আমায় দেখবার তার আদৌ গরজ নাই। আমি মুখ টিপে হাসতে হাসতে পালিয়ে এসে বাড়িময় উচ্চৈঃস্বরে বউয়ের লজ্জাহীনতার কথা প্রকাশ করে ফেলতুম। মা তো হেসেই অস্থির। বলতেন, 'হ্যাঁরে, তুই কি জনমভর এই রকম ক্ষ্যাপাই থাকবি?' আমার ভগ্নিগুলি কিন্তু কিছুতেই ছাড়বার পাত্রী নন, তাঁরা বউয়ের রীতিমতো কৈফিয়ত তলব করতেন। সে বেচারির তখনকার বিপদটা ভেবে আমার খুব আমোদ হতো, আমি হেসে লুটোপুটি যেতুম। যাহোক এ একটা খেলা মন্দ লাগছিল না। ক্রমে আমি বুঝতে পারলুম, কিশোরী কনে' আমায় ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে। আমি কিন্তু পারতপক্ষে তাকে

জ্বালাতন করতে ছাড়তুম না। আমার পাগলামির ভয়ে সে বেচারি আমার সঙ্গে চোখাচোখি চাইতে পারত না, কিন্তু দরজার ফাঁক দিয়ে সে যে আমার পানে তার পটলচেরা চোখ দুটির ভাসা-ভাসা করুণ দৃষ্টি দিয়ে হাজার বার চেয়ে দেখত, তা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারতুম, আর গুন গুন স্বরে গান ধরে দিতুম—

'সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়ানে
কেন, কি বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে।'

ক্রমে আমারও ভালোবাসা এই ছেলেমির মধ্যে দিয়ে এক আধটু করে বেরিয়ে পড়তে লাগল। তারপর পরীক্ষা নিকট দেখে শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা আমার আর বাড়িতে থাকা নিরাপদ বিবেচনা করলেন না। আমি চ'লে আসার দিনে আর জ্যাঠামি দিয়ে হৃদয় লুকিয়ে রাখতে পারিনি। হাসতে গিয়ে অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত করেছিলুম। সজল নয়নে তার হাত দুটি ধরে বলেছিলুম, 'আমার সকল দুষ্টুমি ক্ষমা করো লক্ষ্মীটি, আমায় মনে রেখো।' সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলে না, কিন্তু তার ঐ চোখের জলই যে বলে দিলে সে আমায় কত ভালোবেসে ফেলেছে। আমি ছেড়ে দেবার পর সে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে অব্যক্ত স্বরে কাঁদতে লাগল। আমি চোখে রুমাল চেপে কোনো রকমে নিজের দুর্বলতাকে সম্বরণ করে ফেললুম। কে জানত, আমার সেই প্রথম সম্ভাষণই শেষ বিদায়-সম্ভাষণ—আমার সেই প্রথম চুম্বনই শেষ চুম্বন! কারণ, আর তাকে দেখতে পাইনি। আমি চলে আসবার মাস দুই পরেই পিত্রালয়ে সে আমায় চিরজনমের মতো কাঁদিয়ে চলে যায়। প্রথম যখন সংবাদটা পেলুম, তখন আমার কিছুতেই বিশ্বাস হলো না। এত বড় দুঃখ দিয়ে সে আমায় চলে যাবে? আমার এই আহত প্রাণ চিৎকার করে কাঁদতে লাগল, 'না গো না, সে মরতেই পারে না! স্বামীকে না জানিয়ে সে এমন করে চলে যেতেই পারে না। সব শত্রু হয়ে তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা জানিয়েছে।' আমি পাগলের মতো রাবেয়াদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলুম। আমায় দেখে তাদের পুরানো শোক আবার নতুন করে জেগে উঠল। বাড়িময় এক উচ্চ ক্রন্দনের হাহাকার রোল আমার হৃদয়ে বজ্রের মতো এসে বাজল। আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লুম।—ওগো, আর তার মৌন অশ্রুজল আমার পাষাণ বক্ষ সিক্ত করবে না? একটি কথাও যে বলতে পারেনি সে! সে যাবে না, ককখনো যাবে না। 'হায় অভিমানিনি! ফিরে এস! ফিরে এস!'

সে এল না, যখন নিঝুম রাত্তির, কেউ জেগে নেই, কেবল একটা 'ফেরু' ফেউ ফেউ চিৎকার করে আমার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর করে তুলছিল, তখন একবার তার গোরের উপর গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লুম—'রাবেয়া! প্রিয়তমে! একবার ওঠো, আমি এসেছি, সকল দুষ্টুমি ছেড়ে এসেছি। আমার সারা বক্ষ জুড়ে যে তোমারই আলেখ্য আঁকা তাই দেখাতে এই নিভৃত গোরস্থানে নীরব যামিনীতে একা এসেছি। ওঠো, অভিমানিনী রাবেয়া আমার, কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না।' কবর ধরে সমস্ত রাত্তির কাঁদলুম, রাবেয়া এল না। আমার চারিদিকে একটা ঘূর্ণিবায়ু হুহু করে কেঁদে ফিরতে লাগল, ছোট্ট শিউলি গাছ থেকে শিশিরসিক্ত ফুলগুলো আমার মাথায় ঝ'রে পড়তে লাগল। ও আমার রাবেয়ার

অশ্রুবিন্দু, না কারুর সান্ত্বনা? দুএকটা ধসে যাওয়া কবরে দপ দপ করে আলেয়ার আলো জ্বলে উঠতে লাগল। আমি শিউরে উঠলুম। তখন ভোর হয়ে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সর্বাঙ্গে তার কবরের মাটি মেখে আবার ছুটে এলুম বর্ধমানে। হায়, সে তো চলে গেল, কিন্তু আমার প্রাণে স্মৃতির যে আগুন জ্বেলে গেল সে তো আর নিবল না। সে আগুন যে ক্রমেই বেড়ে চলছে, আমার বুক যে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। এই প্রাণ-পোড়ানো স্মৃতির আগুন ছাড়া একটা কোনো নিদর্শন যে সে রেখে যায়নি, যাতে করে আমার প্রাণে এতটুকু সান্ত্বনা পেতুম।

সেই যে আঘাত পেলুম, তাতেই আমার বুকের পাঁজর ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। আমি আর উঠতে পারলুম না।

[ঘ]

'দিন যায়, থেমে থাকে না। আমারও নীরস দিনগুলো কেটে যেতে লাগল কোনো রকমে। ক্রমে ফার্স্ট ক্লাসে উঠলুম। তখন অনেকটা শুধরেছি। ইতিমধ্যে বর্ধমান নিউ স্কুল উঠে যাওয়ায়, তাছাড়া অন্য জায়গায় গেলে কতকটা প্রকৃতিস্থ হতে পারব আশায়, আমি রানিগঞ্জে এসে পড়তে লাগলুম। আমাদের ভূতপূর্ব হেড-মাস্টার রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ-স্কুলের হেড-মাস্টারি পদ পেয়েছিলেন। তাঁর পুরানো ছাত্র বলে তিনি আমায় স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন, আমিও পড়া-লেখায় একটু মন দিলুম। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটা বিভ্রাট বেধে গেল, আমার আবার বিয়ে হয়ে গেল। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে, আমি এ বিয়েতে কোনো ওজর-আপত্তি করিনি। তখন আমার মধ্যে সে উৎসাহ, সে একগুঁয়েমি আর ছিল না। রাবেয়ার মৃত্যুর সঙ্গে আমি যেন একেবারেই পরনির্ভরশীল বালকের মতো হয়ে পড়লুম। যে যা বলত তাতে উদাসীনের মতো 'হাঁ' বলে দিতুম। কোনো জিনিস তলিয়ে বুঝবার বা নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করবার ক্ষমতা যেন তখন আমার আদৌ ছিল না। আমার পাগলামি, হাসি সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এইসব দেখেই বোধ হয় মা আমার আবার বে' দেবার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া আমি আরো ভেবেছিলুম হয়তো এই নবোঢ়ার মধ্যেই আমার রাবেয়াকে ফিরে পাব, আর তার স্নেহকোমল স্পর্শ হয়তো আমার বুকের দারুণ শোক-যন্ত্রণার মধ্যে শান্তি আনতে পারবে। কিন্তু হায়! যার জীবন চিরকালই এই রকম বিষাদময় হবে বলে বিধাতার মন্তব্য-বহিতে লিখিত হয়ে গেছে, তার 'সবর' ও 'শোকর' ভিন্ন 'নান্যগতি'। তার কপাল চিরদিনই পুড়বে। নববধূ সখিনা দেখতে শুনতে মন্দ নয়, তাই বলে ডানাকাটা পরিও নয়; আর আমার নিজের চেহারার গুণ বিচার না করে ওরকম একটি পরির কামনা করাও অন্যায় ও ধৃষ্টতা। গুণও আমার তুলনায় অনেক বেশি, সেসব বিষয়ে কোথাও খুঁৎ ছিল না। আজকালকার ছোকরারা নিতান্ত বেহায়ার মতো নিজে বৌ পছন্দ করে আনে। নিজের শরীর যে আবলুস কাঠের চেয়েও কালো বা কেঁদ কাঠের

চেয়েও একড়োথেবড়ো সেদিকে দৃষ্টি নেই, কিন্তু বৌটির হওয়া চাই দস্তুরমতো দুধে-আলতার রং, হরিণের মতো নয়ন, অন্তত পটলচেরা তো চাই-ই, সিংহের মতো কটিদেশ, চাঁদের মতো মুখ, কোকিলের মতো কণ্ঠস্বর, রাজহংসীর মতো গমন ; রাতুল চরণকমল, কারণ মানভঞ্জনের সময় যদি 'দেহি পদপল্লবম উদাম' বলে তাঁর চরণ ধরে ধন্না দিতে হয়, আর সেই যে চরণ যদি God forbid (খোদা না করেন) গদাধরের পিসির ঠ্যাং-এর মতোই শক্ত কাঠপারা হয়, তাহলে বেচারারা একটা আরাম পাওয়া হতে যে বঞ্চিত হয়, আর বেজায় রসভঙ্গও হয়। তৎসঙ্গে আরো কত কি কবিপ্রসিদ্ধির চিজবস্তু, সেসব আমার আর এখন ইয়াদ নেই। এইসব বোকারা ভুলেও ভাবে না যে, মেয়েগুলো নিতান্ত সতীলক্ষ্মী গোবেচারা জাত হলেও তাদেরও একটা পসন্দ আছে। তারাও ভালো বর পেতে চায়। আমরা যত সব পুরুষ মানুষ বেজায় স্বার্থপর বলে তাদের কোনো কষ্ট দেখেও দেখিনে। মেয়েদের 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না' ভাব আমি বিলকুল না-পছন্দ করি। অন্তত যার সঙ্গে সারা জীবনটা কাটাতে হবে, পরোক্ষেও যদি তার সম্বন্ধে বেচারিরা কিছু বলতে কইতে না পায়, তবে তাদের পোড়াকপালি নাম সার্থক হয়েছে বলতে হবে। থাক, আমার মতো চুটোপুঁটির এসব ছেঁদো কথায় বিজ্ঞ সমাজ কেয়ার তো করবেনই না, অধিকন্তু হয়তো আমার মস্তক লোমশূন্য করে তা'তে কোনো বিশেষ পদার্থ ঢেলে দিয়ে তাঁদের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দিবেন। অতএব আমি নিজের কথাই বলে যাই।

নব-পরিণীতা সখিনার এসব গুণ থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে ভালোবাসতে পারলুম না। অনেক 'রিহার্স্যাল' দিলুম, কিছুতেই কিছু হলো না। হৃদয় নিয়ে এ ছিনিমিনি খেলার অভিনয় যেন আর ভালো লাগছিল না। তাছাড়া তুমি বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, রাবেয়া যেন আমার হৃদয় জুড়ে রানির মতো সিংহাসন পেতে বসেছিল, সেখানে অন্য কারুর প্রবেশাধিকার ছিল না। একনিষ্ঠ প্রেমে মানুষকে এতটা আত্মহারা যদি না করে ফেলত তবে 'কায়েস' 'মজনু' হয়ে লায়লির জন্য এমন করে বনে-পাহাড়ে ছুটে বেড়াত না, ফরহাদের ও-রকম পরিণাম হতো না। সখিনা কত ব্যথা পাচ্ছে বুঝতে পারতুম, কিন্তু হায় বুঝেও কিছু করতে পারতুম না। বিবাহিতা পত্নীর প্রতি কর্তব্যের অবহেলা আমার বুকে কাঁটার মতো বিঁধছিল। মা ক্ষুণ্ন হলেন, বোনেরা বউকেই দোষী সাব্যস্ত করে তামিল করতে লাগল। কিন্তু কোথায় কি ফাঁক রয়ে গেল জানি না, কিছুতেই তার হৃদয়ের সঙ্গে আমার হৃদয়ের মিশ খেল না। সে কেঁদে মাটি ভিজিয়ে দিলে, তবু আমার মন ভিজল না। অনুশোচনার ও বাক্যজ্বালার যন্ত্রণায় বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এলুম। রাবেয়া আমার বুকে যে আঘাত করে গিয়েছিল তাই সইতে পারছিলুম না, তার উপর—হা খোদা, একি করলুম নিতান্ত অর্বাচীনের মতো? এ হতভাগিনীর জীবন কেন আমার সঙ্গে এমন করে জড়িয়ে ফেলুলম? অসহ্য এই বৃশ্চিক যন্ত্রণা কাঁটার ছুরির মতো আমার আগেকার আঘাতটায় খোঁচা মারতে লাগল। আমি পাগল হয়ে যাবার মতো হলুম। এরই মধ্যে রানিগঞ্জে এসে 'টেস্ট একজামিনেশন' দিলুম। সমস্ত বছর হট্টগোলে কাটিয়েছি। পাশ করব কোত্থেকে? আগেকার সে চুরি বিদ্যায়ও

প্রবৃত্তি ছিল না—অর্থাৎ এখন সাফ বুঝতে পাচ্ছ যে, টেস্টে এলাউ হইনি ; সুতরাং ওটা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন? এই শুভ সংবাদ বাবার কর্ণগোচর হবা মাত্র তিনি কিঞ্চিদধিক এক দিস্তা কাগজ খরচ করে আমায় বিচিত্র সম্ভাষণের উপসংহারে জানিয়ে দিলেন যে, আমার মতো কুপুত্তুরের লেখাপড়া ঐখানেই খতম হবে তা তিনি বহু পূর্বেই আন্দাজ করে রেখেছিলেন,—অনর্থক এক রাশ টাকা জলে ফেলে দিলেন ইত্যাদি। আমার জানটা তেতোবেরক্ত হয়ে উঠল। দুত্তোর বলে দফতর গুটালুম ; পরে, যা মনে আসতে লাগল তাই করতে লাগলুম। লোকে আমায় বহরমপুর যাবার জন্য বিনা ফি-তে যেচে উপদেশ দিতে লাগল। আমি তাদের কথায় 'ড্যামকেয়ার' করে দিনরাত বোঁ হয়ে রইলুম। দু-চারদিন সইতে সইতে শেষে একদিন বোর্ডিং সুপারিনটেন্ডেন্ট মশাই শুভক্ষণে আমায় অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় দিলেন। আমি ফের বর্ধমানে চলে এলুম। আমাদের ছত্রভঙ্গ দলের ভূতপূর্ব গুণ্ডাগণ আমায় সাদরে বরণ করে নিল। পিতা সব শুনে আমায় ত্যাজ্যপুত্র করলেন। এক বৎসর পরে খবর এল সখিনা আমায় নিষ্ঠুর পরিহাস করে অজানার রাজ্যে চলে গেছে। মরবার সময়ও নাকি হতভাগিনী আমার মতো পাপিষ্ঠের চরণ-ধুলোর জন্য কেঁদেছে, আমার ছেঁড়া পুরানো একটা ফটো বুকে ধরে মরেছে। ক্রমেই আমার রাস্তা ফর্সা হতে লাগল। আরো ছয় মাস পরে মা-ও চলে গেলেন। আমি তখন অট্টহাসি হেসে বোতলের পর বোতল উড়াতে লাগলুম। তারপর শুভক্ষণে পল্টনে এসে সেঁধিয়ে পড়লুম বোম কেদার নাথ বলে! আর এক গ্লাস জল দিতে পারো ভাই?

মেহের-নেগার

[ক]

ঝিলম

বাঁশি বাজছে, আর এক বুক কান্না আমার গুমরে উঠছে! আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো তখন, যখন বৈশাখের গুমোটভরা উদাস-মদির সন্ধ্যায় বেদনাতুর পলু-বারোয়া রাগিণীর ক্লান্ত কান্না হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বেরুচ্ছিল! আমাদের দুজনারই যে এক-বুক করে ব্যথা, তার অনেকটা প্রকাশ পাচ্ছিল ঐ সরল-বাঁশের বাঁশির সুরে। উপুড়-হয়ে পড়ে-থাকা সমস্ত স্তব্ধ ময়দানটার আশেপাশে পথ হারিয়ে গিয়ে তারই উদাস প্রতিধ্বনি ঘুরে মরছিল। দুষ্টু দয়িতকে খুঁজে খুঁজে বেচারা কোকিল যখন হয়রান পেরেশান হয়ে গিয়েছে, আর অশান্ত অশ্রুগুলো আটকে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় বারম্বার চোখ দুটোকে ঘষে ঘষে কলিজার মতো রক্ত-লোহিত করে ফেলেছে, তখন তরুণী কোয়েলিটা তার প্রণয়ীকে এই ব্যথা দেওয়ায় বোধ হয় বাস্তবিকই ব্যথিত হয়ে উঠেছিল,—কেননা, তখখনই কলামোচার আম গাছটার আগডালে কচি আমের থোকার আড়ালে থেকে মুখ বাড়িয়ে সকৌতুকে সে কুক দিয়ে উঠল 'কূ—কূ—কূ।' বেচারা শ্রান্ত কোকিল তখন রুদ্ধকণ্ঠে তার এই পাওয়ার আনন্দটা জানাতে আকুলিবিকুলি করে চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু ডেকে ডেকে তখন তার গলা বসে গিয়েছে, তবু অশোক গাছ থেকে ঐ ভাঙা গলাতেই তার যে চাপা বেদনা আটকে যাচ্ছিল, তারই আঘাত খেয়ে সাঁঝের বাতাস ঝিলমতীরের কাশের বনে মুহুর্মুহু কাঁপন দিয়ে গেল।

আমি ডাক দিলুম, 'মেহের-নেগার!' কাশের বনটা, তার হাজারো শুভ্রশীষ দুলিয়ে বিদ্রূপ করলে, '... আ ... র!' ঝিলমের ওপারের উঁচু চরে আহত হয়ে আমারই আহ্বান কেঁদে ফেললে, আর সে রুদ্ধশ্বাসে ফিরে এসে এইটুকু বলতে পারলে, 'মেহের—নেই—আর!'

পশ্চিমে সূর্যের চিতা জ্বলল এবং নিবে এল। বাঁশির কাঁদন থামল। মলয়-মারুত পারুল বনে নামল বড় বড় শ্বাস ফেলে। পারুল বললে, 'উ-হু—মলয় বললে, 'আ—হ্—আঃ!'

আমি বুক ফুলিয়ে চুল দুলিয়ে মনটাকে খুব একচোট বকুনি দিয়ে আনন্দভৈরবী আলাপ করতে করতে ফিরলুম—আমার মতো অনেক হতভাগাই ঐ ব্যথাবিজড়িত চলার পথ ধরে। এমন সাধা গলাতেও আমার সুরটার কলতান শুধু হোঁচট খেয়ে লজ্জায়

মরে যাচ্ছিল। আমার কিন্তু লজ্জা হচ্ছিল না। আমার বন্ধু তানপুরাটা কোলে করে তখন শ্রীরাগ ভাঁজছেন দেখলুম। তিনি হেসে বললেন, 'কি য়ুসোফ। এ-আসন্নসন্ধ্যা বুঝি তোমার আনন্দ-ভৈরবী আলাপের সময়? তুমি যে দেখছি অপরূপ বিপরীত!' আমার তখন কান্না আসছিল। হেসে বললুম, 'ভাই তোমার শ্রীরাগেরও তো সময় পেরিয়ে গেছে?' সে বললে 'তাই তো! কিন্তু তোমার হাসি আজ এত করুণ কেন,—ঠিক পাথর-কোঁদা মূর্তির হাসির মতো হিম-শীতল আর জমাট?' আমি উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলতে লাগলুম।

আদরিণী অভিমানী বধূর মতো সন্ধ্যা তার মুখটাকে ক্রমশই কালিপানা আঁধার করে তুলছিল। এমন সময় কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথির এক-আকাশ তারা তাকে ঘিরে বললে, 'সন্ধ্যারানি! বলি এত মুখভার কিসের? এত ব্যস্ত হসনে লো, ঐ—চন্দ্রদেব এল বলে।' অপ্রতিভ বেচারি সন্ধ্যার মুখে জোর করে হাসার সলজ্জ-মলিন ঈষৎ আলো ফুটে উঠল। চাঁদ এল মদখোর মাতালের মতো টলতে টলতে, চোখ মুখ লাল করে। এসেই সে জোর করে সন্ধ্যা-বধূর আবরু ঘোমটা খুলে দিলে। সন্ধ্যা হেসে ফেললে। লুকিয়ে-দেখা বৌ-ঝির মতো একটা পাখি বকুল গাছে থেকে লজ্জারাঙা হয়ে টিটকারি দিয়ে উঠল, 'ছি—ছি!' তারপর চাঁদে আর সন্ধ্যায় অনেক ঝগড়াঝাটি হয়ে সন্ধ্যার চিবুক আর গাল বেয়ে খুব খানিক শিশির ঝরবার পর সে বেশ খুশি মনেই আবার হাসি-খেলি করতে লাগল। কতকগুলো বেহায়া তারা ছাড়া অধিকাংশকেই আর দেখা গেল না।

আমার বিজন কুটিরে ফিরে এলুম। চাঁদ উঠেছে, তাই আর প্রদীপ জ্বাললুম না। আর, জ্বালালেও দীপশিখার ঐ ম্লান ধোওয়ার রাশটা আমার ঘরের বুকভরা অন্ধকারকে একেবারে তাড়াতে পারবে না। সে থাকবে লুকিয়ে পাতার আড়ালে, ঘরের কোণে, সব জিনিসেরই আড়ালে; ছায়া হয়ে আমাকে মধ্যে রেখে ঘুরবে আমারই চারপাশে। চোখের পাতা পড়তে না পড়তে হড়পা বানের মতো হুপ করে আবার সে এসে পড়বে—যেই একটু সরে যাবে এই দীপশিখাটা!—ওগো আমার অন্ধকার! আর তোমায় তাড়াব না! আজ হতে তুমি আমার সাথী, আমার বন্ধু, আমার ভাই!—বুঝলে ভাই আঁধার, এই আলোটার পেছনে খামখা এতগুলো বছর ঘুরে মরলুম।

আমি বলুলম, 'ওগো মেহের-নেগার! আমার তোমাকে চাই-ই! নইলে যে আমি বাঁচব না! তুমি আমার। নইলে এত লোকের মাঝে তোমাকে আমি নিতান্ত আপনার বলে চিনলুম কি করে?—তুমিই তো আমার স্বপ্নে-পাওয়া সাথী!—তুমিই আমার, নিশ্চয়ই আমার!'—চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে সে আমার পানে চাইলে, পলাশ ফুলের মতো ডাগর টানাটানা কাজল-কালো চোখ দুটির গভীর দৃষ্টি দিয়ে আমার পানে চাইলে! কলসিটি-কাঁখে ঐ পথের বাঁকেই অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সে। তারপর বললে, 'আচ্ছা,—তুমি পাগল!'—আমি ঢোক গিলে একরাশ অশ্রু ভিতর দিকে ঠেলে দিয়ে মাথা দুলিয়ে বললুম, 'হু! তার আঁখির ঘনকৃষ্ণ পল্লবগুলোতে আঁসু উথলে এল! তারপর সে তাড়াতাড়ি চলে যেতে যেতে বললে, 'আচ্ছা, আমি তোমারই!'

একটা অসম্ভব আনন্দের জোর ধাক্কায় আমি অনেকক্ষণ মুষড়ে পড়েছিলুম। চমকে উঠে চেয়ে দেখলুম, সে পাথর বাঁক ফিরে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।

আমি দৌড়ুতে দৌড়ুতে ডাকলুম, মেহের-নেগার! সে উত্তর দিল না। কলসিটাকে কাঁখে জড়িয়ে ধরে ডান হাতটাকে তেমনি ঘন ঘন দুলিয়ে সে যাচ্ছিল। তারপর তাদের বাড়ির সিঁড়িতে একটা পা ধুয়ে আমার দিকে তিরস্কারভরা মলিন চাওয়া চেয়ে চলে গেল। আর বলে গেল, 'ছি! পথে-ঘাটে এমন করে নাম ধরে ডেকো না!—কি মনে করবে লোকে!' পথ না দেখে দৌড়ুতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে একবার পড়ে গেছিলুম, তাতে আমার নাক দিয়ে তখনো ঝরঝর করে খুন ঝরছিল; আমি সেটা বাঁ-হাত দিয়ে লুকিয়ে বললুম, 'আঃ, তাইতো!—আর অমন করে ডাকব না!'

বুঝলে সখা আঁধার! যে জন্মান্ধ, তার তত বেশি যাতনা নেই, যত বেশি যাতনা আর দুঃখ হয়—একটা আঘাত পেয়ে যার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে যায়। কেননা, জন্মান্ধ তো কখনো আলোক দেখেনি। কাজেই এ জিনিসটা সে বুঝতে পারে না, আর যে জিনিস সে বুঝতে পারে না তা নিয়ে তার তত মর্মাহত হবারও কোনো কারণ নেই। আর, এই একবার আলো দেখে তারপর তা হতে বঞ্চিত হওয়া,—ওঃ কত বেশি নির্মম নিদারুণ।

তোমায় ছেড়ে চলে যাওয়ার যে প্রতিশোধ নিলে তুমি, তাতে ভাই আঁধার, আর যেন তোমায় ছেড়ে না যাই। তোমায় ছোট ভেবে এই যে দাগা পেলাম বুকে ওঃ তা,—

সেদিন ভোরে ঝিলম নদীর কূলে তার সঙ্গে আবার দেখা হলো। সে আসছিল একা নদীতে স্নান করে। কালো কশকশে ভেজা চুলগুলো আর ফিরোজা রঙের পাৎলা উড়ানিটা ব্যাকুল আবেগে তার দেহ-লতাকে জড়িয়ে ধরেছিল। আকুল কেশের মাঝে সদ্যস্নাত সুন্দর মুখটি তার দিঘির কালোজলে টাটকা ফোটা পদ্মফুলের মতো দেখাচ্ছিল। দূরে একটা জলপাই গাছের তলায় বসে সরল রাখাল বালক গাচ্ছিল,—

'গৌরী ধীরে চলো, গাগরি ছলক নাহি যায়—
শিরোপরি গাগরি, কমর মে ঘড়া,
পাৎরি কমরিয়া তেরি বলখ না যায়, আহা না যায়;—
গৌরী ধীরে চলো!'

আমিও সেই গানের প্রতিধ্বনি তুলে বললুম, 'ওগো গৌরবর্ণা কিশোরী, একটু ধীরে চলো,—ধীরে!—তোমার ভরা কুম্ভ হতে জল ছলকে পড়বে যে। অত সূক্ষ্ম তোমার কটিদেশ ভরা গাগরি আর ঘড়ার ভারে মুচকে ভেঙে যাবে যে! ওগো তন্বী গৌরী, ধীরে একটু ধীরে চলো!' আমায় দেখে তার কানের গোড়াটা সিঁদুরের মতো লাল হয়ে উঠল। আমার দিকে শরম-অনুযোগভরা কটাক্ষ হেনে সে বললে, 'ছি ছি, সরে যাও! একি পাগলামি করছ?'—আমি ব্যথিত-কণ্ঠে ডাকলুম, মেহের-নেগার! সে একবার আমার রুক্ষ কেশ, ব্যথাতুর মুখ, ধূলিলিপ্ত দেহ আর ছিন্ন মলিন বসন দেখে কি মনে করে

চুপটি করে দাঁড়াল। তারপর ম্লান হেসে বললে 'ও হলো ! আমার নাম 'মেহের-নেগার' কে বললে?—আচ্ছ, তুমি আমায় ও নামে ডাকো কেন? সে তোমার কে?' আমি দেখলুম, কি একটা ভীতি আর বিস্ময় তার স্বরটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে গেল। তার শঙ্কাকুল বুকে ঘন স্পন্দন মূর্ত হয়ে ফুটল। আমারও মনে অমনি বিস্ময় ঘনিয়ে এল। দৃষ্টি ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছিল। তাই তার গায়ে হেলান দিয়ে বললুম, 'আহ ! তুমি তবে সে নও? না—না, তুমি তো সেই আমার—আমার মেহের-নেগার ! অমনি হুবহু মুখ, চোখ,—অমনি ভুরু, অমনি চাউনি, অমনি কথা !—না গো না, আর আমায় প্রতারণা কোরো না। তুমি সেই ! তুমি— !' সে বললে, 'আচ্ছা, মেহের-নেগারকে কোথায় দেখেছিলে?' আমি বললুম, 'কেন, খোওয়াবে !' তার মুখটা এক নিমিষে যেন দপ করে জ্বলে উঠল ! তার সাদা মুখে আবার রক্ত দেখা গেল। সে ঝরনার মতো ঝরঝর করে হাসির ঝরা ঝরিয়ে বললে, 'আচ্ছা, তুমি কবি, না চিত্রকর?' আমি অপ্রতিভ হয়ে বললুম, 'চিত্র ভালোবাসি, তবে চিত্রকর নই। আমি কবিতাও লিখি, কিন্তু কবি নই।' সে এবার হেসে যেন লুটোপুটি খেতে লাগল।

আমি বললুম, 'দেখ, তুমি বড্ডো দুষ্টু !' সে বললে, 'আচ্ছা, আমি আর হাসব না ! তুমি কিসের কবিতা লেখ? আমি বললুম, 'ভালোবাসার' !'

সে ভিজা কাপড়ের একটা কোণ নিঙড়াতে নিঙড়াতে বললে, 'ও তাই,—তা কাকে উদ্দেশ করে?'

আমি সেইখানেই সবুজ ঘাসে বসে পড়ে বললুম, 'তোমাকে—মেহের-নেগার ! তোমাকে উদ্দেশ করে !' আবার তার মুখে যেন কে এক থাবা আবির ছড়িয়ে দিলে। সে কলসিটা কাঁখে আর একবার সামলে নিয়ে বললে, 'তুমি কদ্দিন হতে এরকম কবিতা লিখছ?' আমি বললুম 'যেদিন হতে তোমায় খোওয়াবে দেখেছি !' সে বিস্ময়-পুলকিত নেত্রে আমার দিকে একবার চাইলে, তারপর বললে, 'তুমি এখানে কি করো?' আমি বললুম, 'গান-বাজনা শিখি।' সে বললে, 'কোথায়?' আমি বললুম, 'খাঁ সাহেবের কাছে।' সে খুব উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'একদিন তোমার গান শুনব'খন।—শুনাবে?' তারপর চলে যেতে যেতে পিছন ফিরে বললে, আচ্ছা, তোমার ঘর কোনখানে? আমি বললুম, 'ওয়াজিরিস্থানের পাহাড়।' সে অবাক বিস্ময়ে ডাগর চক্ষু দিয়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে চাইলে ; তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, 'তুমি তাহলে এদেশের নও? এখানে নূতন এসেছ?'—আমি তার চোখে চোখ রেখে বললুম, 'হুঁ,—আমি পরদেশি।' ... সে চুপি চুপি চলে গেল আর একটিও কথা কইল না। ... আমার গলায় তখন বড্ডো বেদনা, কে যেন টুঁটি চেপে ধরেছিল। পেছন হতে ঘাসের শ্যামল বুকে লুটিয়ে পড়ে, আবার ডাকলুম তাকে। কাঁখের কলসি তার টিপ করে ঝরে পড়ে ভেঙে গেল। সে আমার দিকে একটা আর্তদৃষ্টি হেনে বললে, 'আর ডেকো না অমন করে !' দেখলুম তার দুই কপোল দিয়ে বেয়ে চলছে দুইটি দীর্ঘ অশ্রুরেখা !

[খ]

প্রাণপণে চেষ্টা করেও সেদিন সুর-বাহারটার সুর বাঁধতে পারলুম না। আদুরে মেয়ের জেদ-নেওয়ার মতো তার ঝঙ্কারে শুধু একরোখা বেখাপ্পা কান্না ডুকরে উঠছিল। আমার হাতে আমার এই প্রিয় যন্ত্রটি আর কখনো এরূপ অশান্ত অবাধ্য হয়নি, এমন একজিদে কান্নাও কাঁদেনি। আদর-আবদার দিয়ে অনেক করেও মেয়ের কান্না থামাতে না পারলে মা যেমন সেই কাঁদুনে মেয়ের গালে আরো দুতিন থাপপড় বসিয়ে দেয়, আমিও তেমনি করে সুর-বাহারের তারগুলোতে অত্যাচারীর মতো হাত চালাতে লাগলুম। সে নানান রকমের মিশ্রসুরে গোঙানি আরম্ভ করে দিলে!

ওস্তাদজি আঙুর-গালা মদিরার প্রসাদে খুব খোশ-মেজাজে ঘোর দৃষ্টিতে আমার কাণ্ড দেখছিলেন। শেষে হাসতে হাসতে বলেন, 'কি বাচ্চা, তোর তবিয়ত আজ ঠিক নেই,—না! মনের তার ঠিক না থাকলে বীণার তারও ঠিক থাকে না। মন যদি তোর বেসুরা বাজে, তবে যন্ত্রও বেসুরা বাজবে, এ হচ্ছে খুব সাচ্চা আর সহজ কথা।—দে আমি সুর বেঁধে দিই!' ওস্তাদজি বেয়াদব সুর-বাহারটার কান ধরে বার কতক মোলায়েম ধরনের কানুটি দিতেই সে শান্তশিষ্ট ছেলের মতো দিব্যি সুরে এল। সেটা আমার হাতে দিয়ে, সামনের প্লেট হতে দুটো গরম গরম শিক কাবাব ছুরি দিয়ে ছাড়াতে ছাড়াতে তিনি বললেন, 'আচ্ছা, একবার বাগেশ্রী রাগিণীটা আলাপ কর তো বাচ্চা! হাঁ,—আর ও সুরটা ভাঁজবারও সময় হয়ে এসেছে। এখন কত রাত হবে? হাঁ, আর দেখ বাচ্চা, তুই গলায় আর একটু গমক খেলতে চেষ্টা কর, তাহলেই সুন্দর হবে।' কিন্তু সেদিন যেন কণ্ঠ-ভরা বেদনা। সুরকে আমার গোর দিয়ে এসেছিলুম ঐ ঝিলম দরিয়ার তীরের বালুকার তলে। তাই কষ্টে যখন অতিতারের কোমল গান্ধারে উঠলুম তখন আমার কণ্ঠ যেন দীর্ণ হয়ে গেল, আর তা ফেটে বেরুল শুধু কণ্ঠভরা কান্না! ওস্তাদজি দ্রাক্ষারসের নেশায় 'চড় বাচ্চা আর দু'পরদা পঞ্চমে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সান্ত্বনা-ভরা স্বরে কইলেন, 'কি হয়েছে আজ তোর বাচ্চা? দে আমায় ওটা।' বাগেশ্রীর ফোঁপিয়ে-ফোঁপিয়ে-কান্না ওস্তাদজির গভীর কণ্ঠ সঞ্চরণ করতে লাগল অনুলোমে বিলোমে—সাধা গলার গমকে মিড়ে! তিনি গাইলেন, 'বীণা-বাদিনীর বীণ আজ আর রোয়ে রোয়ে বনের বুকে মুহুর্মুহু স্পন্দন জাগিয়ে তুলছে না। আঁসু এসে তার কণ্ঠ চেপে ধরেছে। তাই সুর পূর্ণ হয়ে বেরোচ্ছে না। ওগো, তার যে খাদের আর অতিতারের দুইটি তারই ছিন্ন হয়ে গেছে।' আমার তখন ওদিকে মন ছিল না। আমার মন প'ড়েছিল সেই আমার স্বপ্নে-পাওয়া তরুণীটির কাছে।

ওঃ, সে স্বপ্নের চিন্তাটা এত বেশি তীব্র মধুর, তাতে এত বেশি মিঠা উন্মাদনা যে দিনে হাজার বার মনে করেও আমার আর তৃপ্তি হচ্ছে না। সে কি অতৃপ্তির কন্টক বিঁধে গেল আমার মর্মতলে, ওগো আমার স্বপ্ন-দেবী! ওই কাঁটা যে হৃদয়ে বিঁধেছে, সেইটেই এখন পেকে সারাবুক বেদনায় টনটন করছে। ওগো আমার স্বপ্নলোকের ঘুমের দেশের

রানি। তোমার সে আকাশ ঘেঁশা ফুল, আর পরাগ-পরিমলে-ভরা দেশ কোথায়? সে জ্যোৎস্না-দীপ্ত কুটির যেখানে পায়ের আলতা তোমার রক্তরাগে পাতার বুকে ছোপ দিয়ে যায়, সে কুটির কোন নিকুঞ্জের আড়ালে, কোন তড়াগের তরঙ্গ-মর্মরিত তীরে?

সে স্বপ্নচিত্রটা কি সুন্দর!—

সেদিন সাঁঝে অনেকক্ষণ কুস্তি করে খুব ক্লান্ত হয়ে যেমনি বিছানায় গা দিয়েছি, অমনি যেন রাজ্যের ঘুম এসে, আমার সারা দেহটাকে নিষ্কম্প অলস করে ফেললে, আমার চোখের পাতায় পাতায় তার সোহাগ-ভরা ছোঁওয়ার আবেশ দিয়ে। শীঘ্রই আমার চেতনা লুপ্ত করে দিলে সে যেন কার শিউরে-ওঠা কোমল অধরের উম্মাদনা ভরা চুম্বন-মদিরা! ... হঠাৎ আমি চমকে উঠলুম। ... কে এসে আমার দুইটি চোখেই স্নিগ্ধ কাজল বুলিয়ে দিলে! দেখলুম, যেখানে আসমান আর দরিয়া চুমোচুমি করছে, সেইখানে একটি কিশোরী বীণা বাজাচ্ছে; বরফের ওপর পূর্ণ-চাঁদের চাঁদনি পড়লে যেমন সুন্দর দেখায়, তাকে তেমনি দেখাচ্ছিল, সূক্ষ্ম রেশমি নীল পেশোয়াজের শাসন টুটে বীণাবাদিনীর কৈশোর-মাধুর্য ফুটে বেরুচ্ছিল—আসমানের গোলাবি নীলিমায় জড়িত প্রভাত অরুণশ্রীর মতো মহিমশ্রী হয়ে। সে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলে। আমার চোখের ঘুমের রঙিন কুয়াশা মসলিনের মতো একটা ফিনফিনে পরদা টেনে দিলে। বীণার চেয়েও মধুর বীণাবাদিনীর মঞ্জু গুঞ্জন প্রেয়সীর কানে-কানে-কওয়া গোপন কথার মতো আমায় কয়ে গেল, 'ঐ যে চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে দরিয়ার কিনার, ঐখানে আমার ঘর। ঐখানে আমি বীণ বাজাই। তোমার ঐ সরল বাঁশির সহজ সুর আমার বুকে বেদনার মতো বেজেছে, তাই এসেছি! আবার আমাদের দেখা হবে সূর্যাস্তের বিদায়-ম্লান শেষ-আলোক-তলে। আর মিলন হবে এই উদার আকাশের কোলে এমনি এক অরুণ-অরুণিমা-রক্ত নিশি-ভোরে—যখন বিদায় বাঁশির ললিত বিভাসের কান্না তরল হয়ে ঝরে পড়বে।' আমি আবিষ্টের মতো তার আঁচল ধরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে তুমি, স্বপ্নরানি?' সে বললে, 'আমায় চিনতে পারলে না, য়ুসোফ? আমি তোমারই মেহের-নেগার!' ... অচিন্ত্য অপূর্ব অনেক-কিছু পাওয়ার আনন্দে আমার বুক ভরে উঠেছিল। আমি রুদ্ধকণ্ঠে কইলুম, 'তুমি আমায় কি করে চিনলে?—হাঁ, আমি তোমাকেই চাইছিলুম—তবে তোমার নাম জানতুম না। আর তোমায় নাকি অনেকেই জীবনের এমনি ফাগুন-দিনে ডাকে? তবে শুধু কি আমায়ই দেখা দিলে, আর কাউকে না?' সে তার তাম্বুলরাগ-রক্ত পাপড়ির মতো পাৎলা ঠোঁট উলটিয়ে বললে, 'না—আমি তোমায় কি করে চিনব?—এই হালকা হাওয়ায় ভেসে আমি সব জায়গাতেই বেড়াই; কাল সাঁঝে তাই এদিক দিয়ে পেরিয়ে যেতে যেতে শুনলুম তুমি আমায় বাঁশির সুরে কামনা করছ! তাই তোমায় দেখা দিলুম। ... আর, হাঁ—যারা তোমার মতো এমনি বয়সে এমনি করে তাদের অজানা অচেনা প্রেয়সীর জন্য কেঁদে মরে, কেবল তাকেই দেখা দিয়ে যাই। ... তবু আমি তোমারই!' ... মেঘের কোলে সে কিশোরীর কম-মূর্তি ঝাপসা হয়ে এল।

আমার ঘুম ভাঙল। কোকিল ডাকলে, 'উ—হু—উ!' প্যাপিয়া শুধালে, 'পিউ কাহাঁ?' বুলবুল ঝুঁটি দুলিয়ে গলা ফুলিয়ে বললে, 'জা—নি—নে।' ঝরা-হেনার-শেষ সুবাস আর পীত-পরাগ-লিপ্ত ভোরের বাতাস আমার কানের কাছে শ্বাস ফেলে গেল, 'হু—হু—হু!'

[গ]

আমার স্নেহের বাঁধনগুলো জোর বাতাসে পালের দীর্ণ দড়ির মতো পট পট করে ছিঁড়ে গেল। তারপর ঢেউ-এর মুখে ভাসতে ভাসতে, খাপছাড়া—ঘরছাড়া আমি এই ঝিলমে এলুম!—প্রথম দেখলুম এই হিন্দুস্থানের বীরের দেশ প্যাঁচট্টা দরিয়ার তরঙ্গ-সঙ্কুল পাঞ্জাব, যেখানের প্রতি বালুকণা বীরের বুকের রক্ত জড়ানো—যেখানের লোকের তৃষ্ণা মিটাত দেশদ্রোহী—আর দেশ-শত্রু 'জিগরের খুন।'

* * *

যে ডাল ধরতে গেলুম, তাই ভেঙে আমার মাথায় পড়ল! তাই নিরাশ্রয়ের কুটো ধরার মতো অকেজোর কাজ এই সঙ্গতকেই আশ্রয় করলুম আমার কাজ আর সান্ত্বনা স্বরূপে!

ওঃ, আমার এই বলিষ্ঠ মাংসপেশীবহুল শরীর, মায়া-মমতাহীন—লৌহ কবাটের মতো শক্ত বক্ষ, তাকে আমি চেষ্টা করেও উপযুক্ত ভালো কাজে লাগাতে পারলুম না, খোদা! দেশের মঙ্গলের জন্য এর ক্ষয় হলো না!—প্রিয় ওয়াজিরিস্তানের পাহাড় আমার! তোমার দেহটাকে অক্ষত রাখতে গিয়ে যদি আমার এই বুকের উপর তোমারি অনেকগুলো পাথর পড়ে পাঁজরাগুলো গুঁড়ো করে দিত, তা'হলে সে কত সুখের মরণ হতো আমার! ওই তো হতো আমার হতভাগ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা!—আমার জন্যে কেউ কাঁদবার নেই বলে হয়তো তাতে মানুষ কেউ কাঁদত না, কিন্তু তোমার পাথরে—মরুতে—উষ্ণ মারুতে শুকনো শাখায় একটা আকুল অব্যক্ত কম্পন উঠত! সেই তো দিত আত্মায় আমার পূর্ণ তৃপ্তি! আহ্, এমন দিন কি আসবে না জীবনে!

আচ্ছা,—ওগো অলক্ষ্যের মহান স্রষ্টা! তোমার সৃষ্ট পদার্থে এত মধুর জটিলতা কেন? পাহাড়ের পাথরবুকে নির্ঝরের স্রোত বইছে, আর আমাদের মতো পাষাণের বুকেও প্রেমের ফল্গুধারা লুকিয়ে রেখেছ! ... আর তুমি যদি ভালোবাসাই সৃষ্টি করলে, তবে আলোর নিচে ছায়ার মতো তার আড়ালে নিরাশাকে গোপন রাখলে কেন?

আমাকে সবচেয়ে ব্যথিয়ে তুলছে গত সন্ধ্যার কথাটা!—

আবার সহসা তার সঙ্গে দেখা হলো সন্ধেবেলার খানিক আগে। তখন ঝিলমের তীরে তীরে ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁঝিট রাগিণীর ঝমঝমানি ভরে উঠছিল। সে ঠিক সেই স্বপ্নে-দেখা কিশোরীর মতোই হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকলে, 'এখানে এস!' ... আমি

শুধোলুম, 'মেহের-নেগার, স্বপ্নের কথা কি সত্যি হয়?' সে বললে, 'কেন?' আমি তাকে আমার সেই স্বপ্নের কথা জানিয়ে বললুম, 'তুমিই তো সেদিন নিশি-ভোরে আমায় অমন করে দেখা দিয়ে এসেছিলে আর তোমার নামও বলে এসেছিলে! ... তুমি যে আমার!' একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল তার বুকের বসনে দোল দিয়ে! সে বললে, 'য়ুসোফ, আমি তো মেহের-নেগার নই, আমি—গুলশন!' সে কেঁদে ফেললে। ... আমি বললুম, 'তা হোক, তুমিই সেই! ... আমি তোমাকে মেহের-নেগার বলেই ডাকব।' সে বললে, 'এস, সেদিন গান শুনাবে বলেছিলে না?' আমি বললুম, 'তুমিই গাও, আমি শুনি।' সে গাইলে,—

'ফারাকে জানাঁ মে হামনে সাকি লোহু পিয়া হেয় শারাব করকে
তপে আলম নে জেগর কো ভুনা উয়ো হামনে খায়া কবাব করকে॥'

আহ্! এ কোন দগ্ধহৃদয়ের ছটফটানি?—প্রিয়তমের বিচ্ছেদে আমার নিজের খুনকেই শরাবের মতো করে পান করেছি, আর ব্যথার তাপে আমার হৃৎপিণ্ডটাকে পুড়িয়ে কাবাব করে খেয়েছি।—ওগো সাকি, আর কেন? এসরাজের ঝঙ্কার থামাতে অনেক সময় লাগল।

আমি গাইলুম, 'ওগো, সে যদি আমার কথা শুধায়, তবে বলো যে, সারা জনম অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে সে আজ বেহেশতের বাইরে তোমারই প্রতীক্ষায় বসে আছে!' সে কেঁদে আমার মুখটা চেপে ধরে বললে, 'না—না, এমন গান গাইতে নেই!' তারপর বললে, 'আচ্ছা, এই গান-বাজনায় তোমার খুব আনন্দ হয়, —না?' আবার সে কোন অজানা-নিষ্ঠুরের প্রতি অভিমানে আমার বক্ষে ক্রন্দন গুমরে উঠল! আমি গাইলুম—

'শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে?
অশান্তি যে আঘাত করে তাইতে বীণা বাজে!
নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা,
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা।'

বিদায়ের ক্ষণে সে হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে বললে, 'আচ্ছা, তুমি আমায় ভালোবাস, তাই আমি একটা ভিক্ষা চাইছি। .. বলো, আর আমায় ভালোবাসবে না, আমায় চাইবে না।' সে উপুড় হয়ে আমার পায়ে পড়ল। ... চাঁদের সমস্ত আলো এক লহমায় নিবে গেল বিরাট একটা জলোমেঘের কালো ছায়ার আড়ালে পড়ে! ... আমি কষ্টে উচ্চারণ করতে পারলুম, 'কেন?' সে একটু থেমে, চোখ দুটো আঁচল দিয়ে চেপে বললে, 'দেখো, পবিত্র জিনিসের পূজা পবিত্র জিনিস দিয়েই হয়। কলুষ যা, তা দিয়ে পূতকে পেতে গেলে পূজারীর পাপের মাত্রা চরমে গিয়ে পৌঁছে। ... এই যে তোমার ভালোবাসা,—হোক না তা মাদকতা আর উন্মাদনার তীব্রতায় ভরা,—তা অকৃত্রিম আর প্রগাঢ় পবিত্র! তাকে অবমাননা করতে আমার যে একবিন্দু সামর্থ্য নেই। ... আমাকে চেনো না? এই শহরে যে খুরশেদজান বাইজির নাম শুন, আমি তারই মেয়ে।' বলেই সে সোজা হয়ে

দাঁড়াল, তার সারা অঙ্গ কাঁপতে লাগল ! সে বললে, 'রূপজীবিনীর কন্যা আমি, ঘৃণ্য, অপবিত্র। ওগো আমার শিরায়-শিরায় যে অপবিত্র পঙ্কিল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে ! কেটে দেখো, সে লোহু রক্তবর্ণ নয়, বিষ-জর্জরিত মুমূর্ষুর মতো তা নীল-সিয়াহ্।' দেখলুম, তার চোখ দিয়ে আগুনের ফিনকির মতো জ্বালাময়ী অশ্রু নির্গত হচ্ছে। বুঝলুম, এ তো স্নিগ্ধ গৈরিক নির্ঝর নয়, এ যে আগ্নেয়-গিরির উত্তপ্ত দ্রবময়ী স্রোতের বিপুল নিঃস্রাব !

বিছার কামড়ের মতো কেমন একটা দংশন-জ্বালা বুকের অন্তরতম কোণে অনুভব করলুম। ভাবলুম স্বভাব-দুর্গন্ধ যে ফুল, সে দোষ তো সে ফুলের নয়। সে দোষ যদি দোষ হয়, তবে তা স্রষ্টার। অথচ তার বুকেও যে সুবাস আছে, তা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারে অসাধারণ যে, সে-ই ; সাধারণে কিন্তু তার নিকটে গেলেই মুখে কাপড় দেয়, নাক সিঁটকায়। ... আমি ছিন্নকণ্ঠ বিহগের মতো আহত স্বরে বললুম, 'তা—তা হোক, মেহের-নেগার ! সে দোষ তো তোমার নয়। তুমি ইচ্ছা করলে কি পবিত্র পথে চলতে পারো না ? স্রষ্টার সৃষ্টিতে তো তেমন অবিচার নেই। আর বোধ হয় এমনই ভাগ্যহত যারা তাদের প্রতিই তাঁর করুণা, অন্তত সহানুভূতির একটু বেশি পরিমাণেই পড়ে, এ যে আমরা না ভেবেই পারিনে ! ... আর তুমি তো আমায় সত্য করে ভালোবেসেছ ! এ ভালোবাসায় যে কৃত্রিমতা নেই, তা আমি যে আমার হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারছি। আর এ প্রেমের আসল নকল দুটি হৃদয় ছাড়া সারা বিশ্বের কেউ বুঝতে পারবে না। ... হাঁ, আর ভালোবাসায় জীব যখন কাঁদতে পারে, তখন সে অনেক উঁচুতে উঠে যায়। নিচের লোকেরা ভাবে, 'এ লোকটার অধঃপতন নিশ্চিত।' অবশ্য একটু পা পিছলে গেলেই যে সে অত উঁচু হতে একেবারে পাতালে এসে পড়বে, তা সেও বোঝে। তাই সে কারু কথা না শুনে সাবধানে অমনি উঁচুতেই উঠতে থাকে। ... না মেহের-নেগার, তোমাকে আমার হতেই হবে।' ... সে স্থির হয়ে বসল, তারপর মুর্ছাতুরের মতো অস্পষ্ট কণ্ঠে কইলে, 'ঠিই বলেছ য়ুসোফ, আমার সামনে অনেকেই এল, অনেকেই ডাকল ; কিন্তু আমি কোনদিন তো এমন করে কাঁদিনি। যে আমার সামনে এসে তার ভরা অর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে, মনে হতো আহা, একেই ভালোবাসি। এখন দেখছি, তা ভুল। সময় সময় যে অমন হয়, আজ বুঝেছি তা ক্ষণিকের মোহ আর প্রবৃত্তির বাইরের উত্তেজনা। কিন্তু যেদিন তুমি এসে বললে, তুমি আমারই, সে দিন আমার প্রাণমন সব কেন একযোগে সাড়া দিয়ে উঠল, 'হাঁগো হাঁ, আমার সব তোমারই। ওঃ, সে কি অনাবিল গভীর প্রশান্ত প্রীতির জোয়ার ছুটে গেল ধমনীর প্রতি রক্ত-কণিকায় ! সে এমন একটা মধুর সুন্দর ভাব, যা মানুষ জীবনে একবার মাত্র পেয়ে থাকে,—সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে ! আমাদের এই ভালোবাসায় আর দরবেশের প্রেমের সমান গভীরতা, এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, যদি সেই ভালোবাসা চিরন্তন হয়।' .. ক্লান্ত কান্তার মতো সে আমার স্কন্ধে মাথাটা ভর করে আস্তে আস্তে কইলে, 'তোমাকে পেয়েও যে এই আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি, এ তোমাকে ভালোবাসতে,—প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পেরেছি বলেই ! ... আমার—আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে য়ুসোফ, তবে তোমাকে পাবার আশা আমাকে জোর করে ত্যাগ করতেই হবে। যাকে ভালোবাসি তারই অপমান তো করতে পারিনে

আমি! এইটুকু ত্যাগ, এ আমি খুব সইতে পারব। অভাগিনী নারী জাতি আমাদের এর চেয়েও যে অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তোমরা যাই-ইভাবো, আমাদের কাছে এ কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়, আর কঠিনও নয়।... ওঃ, কেন তুমি আমার পথে এলে? কেন তোমার শুভ্র শুচি প্রেমের সোনার কাঠির পরশ দিয়ে আমার অ-জাগন্ত ভালোবাসা জাগিয়ে দিলে?—না, তোমাকে না পেলেও তুমি থাকবে আমারই। তবু আমাদের দুজনকে দুদিকে সরে যেতে হবে।—যে বুকে প্রেম আছে, সেই বুকেই কামনা ওৎ পেতে বসে আছে। আমাদের নারীর মনকে বিশ্বাস নেই য়ুসোফ, সে যে বড়ই কোমল, সময়ে একটু তাপেই গলে পড়ে। কে জানে এমন করে থাকলে কোন দিন আমাদের এই উঁচু জায়গা হতে অধঃপতন হবে।... না, না প্রিয়তম, আর এই কলুষবাষ্পে তোমার স্বচ্ছ দর্পণ ঝাপসা করে তুলব না।... আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না। যদি হয়, তবে আমাদের মিলন হবে ঐ—ঐখানে যেখানে আকাশ আর দরিয়া দুই উদার অসীমে কোলাকুলি করছে!... বিদায় প্রিয়তম! বিদায়!' বলেই সে আমার হস্ত চুম্বন করে উন্মাদিনীর মতো ছুটে বেরিয়ে গেল।

ঝড় বইছিল শন—শন—শন। আর অদূরের বেণুবনে আহত হয়ে তারই কান্না শোনা যাচ্ছিল আহ্—উহ্—আহ্! স্নায়ু ছিন্ন হওয়ার মতো কট কট করে বেদনার্ত বাঁশগুলোর গিঁঠে গিঁঠে শব্দ হচ্ছিল।

এক বুক ব্যথা নিয়ে ফিরে এলুম! ফিরতে ফিরতে চোখের জলে আমার মনে পড়ল—সেই আমার স্বপ্নরানির শেষ কথা! সেও তো এর মতোই বলেছিল, 'আমাদের মিলন হবে এই উদার আকাশের কোলে এমনি এক তরুণ অরুণিমা-রক্ত-নিশিভোরে যখন বিদায় বাঁশির সুরে সুরে ললিত বিভাসের কান্না তরল হয়ে ক্ষরবে!'

[ঘ]

সেদিন যখন আমায় একেবারে বিস্ময়-পুলকিত আর চকিত করে সহসা আমার জন্মভূমি-জননী আমার বুকের রক্ত চাইলে, তখন আমার প্রাণ যে কেমন ছটফট করে উঠলে তা কইতে পারব না!... শুনলুম আমাদের স্বাধীন পাহাড়িয়া জাতিটার উপর ইংরেজ আর কাবুলের আমির দুজনারই লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে। আর কয়েকজন দেশদ্রোহী শয়তান দুভাগে বিভক্ত হয়ে দেশটাকে অন্যের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে। তারা ভুলে যাচ্ছে যে, আমাদের এই ঘরবাড়িহীন পাঠানদের বশে আনতে কেউ কখনো পারবে না। আমরা স্বাধীন—মুক্ত। সে যেই হোক না কেন, আমরা কেন তার অধীনতা স্বীকার করতে যাব? শিকল সোনার হলেও তা শিকল।—না, না, যতক্ষণ এই য়ুসোফ খাঁর এক বিন্দু রক্ত থাকবে গায়ে আর মাথাটা ধড়ের সঙ্গে লাগা থাকবে, ততক্ষণ কেউ, কোনো অত্যাচারী সম্রাট আমার জন্মভূমির এক কণা বালুকাও স্পর্শ করতে পারবে না! ওঃ একি দুনিয়াভরা অবিচার আর অত্যাচার, খোদা তোমার এই মুক্ত

সাম্রাজ্যে? এইসব ছোট মনের লোকই আবার নিজের 'উচ্চ' 'মহান' 'বড়' বলে নিজেদের ঢাক পিটায়।—ওঃ যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের অবস্থা কেমন হবে যেমন আকাশের অনেকগুলো পাখিকে ধরে এনে চারিদিকে লোহার শিক দেওয়া একটা খাঁচার ভিতর পুরে দিলে হয়। ওঃ আমার সমস্ত স্নায়ু আর মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। আরো শুনছি দুইপক্ষেই আমাদিগকে রীতিমতো ভয় দেখানো হচ্ছে।—হাঃ হাঃ হাঃ! গাছের পাখিগুলোকে বন্দুক দেখিয়ে শিকারী যদি বলে, 'সব এসে আমার হাতে ধরা দেও, নইলে গুলি ছাড়লুম!' তাহলে কি পাখিরা এসে তার হাতে ধরা দেবে? কখনোই না, তারা মরবে, তবুও ধরা দেবে না—দেবে না! এ শিকারীদের বুকে যে ছুরি লুকানো আছে, তা পাখিরা আপনিই বোঝে। এ তাদের শিখিয়ে দিতে হয় না। হাঁ, আর যদিই যোগ দিতে হয়, তবে নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে যেখানে অন্যায় দেখব সেইখানেই আমাদের বজ্রমুষ্টির ভীম তরবারির আঘাত পড়বে। আমার জন্মভূমি কোনো বিজয়ীর চরণ স্পর্শে কখনো কলঙ্কিত হয়নি, আর হবেও না। 'শিব দিব, তবু স্বাধীনতা দিব না।'

তোমার পবিত্র নামের শপথ করে এই যে তরবারি ধরলুম খোদা, এ আর আমার হাত হতে খসবে না! তুমি বাহুতে শক্তি দাও!—এই তরবারির তৃষ্ণা মিটাব—প্রথমে দেশদ্রোহী শয়তানদের জিগরের খুনে, তারপর দেশ-শত্রুর কলুষরক্তে।—আমিন!!!

* * *

হাঁ, আমার মনে হচ্ছে হয়তো আমার দেশের ভাই-ই আমায় হত্যা করবে জল্লাদ হয়ে! ... তা হোক, তবুও সুখে মরতে পারব, কেননা আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ দেশের পায়েই উৎসর্গীকৃত হবে!—'খোদা! আমার এ দান যেন তুমি কবুল করো।'

* * *

বেশ হয়েছে! খুব হয়েছে!! আচ্ছা হয়েছে!!!

আমার এই চিরবিদায়ের সময় কেন কাল মনে হলো, সে অভাগীকে একবার দেখে যাই। কেন সে ইচ্ছাকে কিছুতেই দমন করতে পারলুম না। ... গিয়ে দেখলুম তার ত্যক্ত বাড়িটা ধুলি আর জঙ্গলময় হয়ে সদ্যবিধবা নারীর মতো হাহাকার করছে! ... আর—আর ও কি? ... ঘরের আঙ্গিনায় ও কার কবর? যেন কার একবুক বেদনা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। কার পাহাড়পারা ব্যথা জমাট হয়ে যেন মূর্ছিত হয়ে মাটি আঁকড়ে রয়েছে। ... কবরের শিরানে কার বুকের রক্ত দিয়ে মর্মরফলকে লেখা, 'অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলেও ওগো পথিক, আমায় ঘৃণা করো না! একবিন্দু অশ্রু ফেলো, আমার কল্যাণ কামনা করে—আমি অপবিত্র কি-না জানি না, কিন্তু পবিত্র ভালোবাসা আমার এই বুকে তার পরশ দিয়েছিল! ... আর ওগো স্বামিন! তুমি যদি কখনো এখানে আস,—আঃ, তা আসবেই—তবে আমায় মনে করে কেঁদো না। যেখানেই থাকি প্রিয়তম, আমাদের মিলন হবেই। এমন আকুল প্রতীক্ষার শেষ অবসান এই দুনিয়াতেই হতে পারে না! খোদা নিজে যে প্রেমময়!—অভাগিনী—গুলশন!'

আমার এক বুক অশ্রু ঝরে মর্মর-ফলকের মলিন রক্ত লেখাগুলিকে আরো অরুণোজ্জ্বল করে দিলে। ...

ঝিলমের ওপার হতে কার আর্ত আর্দ্র সুর এপারে এসে আছাড় খাচ্ছিল,

'আগর, মেয় বাগবাঁ হোতে তো গুলশন কো লুটা দেতে।
পাকড় কর দস্তে বুলবুল কো চমন সে জাঁ মেলা দেতে॥'

হায়রে অবোধ গায়ক ! তুই যদি মালি হতিস, তাহলে বুলবুলের হাত ধরে ফুলের সঙ্গে মিলন করিয়ে দিতিস—অসম্ভব রে, তা অসম্ভব। খোদা হয়তো তোকে সে শক্তি দেননি, কিন্তু যাদের সে শক্তি আছে ভাই, তাঁরা তো কই এমন করা তো দূরের কথা, একবার তোর এই কথা মুখেও আনতে পারে না। তোরই এই ক্ষমতা থাকলে হয়তো তুই এ গান গাইতে পারতিস নে ! ...

* * *

তবু আমার চিরবিদায়ের দিনে ঐ গানটা বড্ডো মর্মস্পর্শী মধুর লেগেছিল।

সাঁঝের তারা

সাঁঝের তারার সাথে যেদিন আমার নতুন করে চেনা-শোনা, সে এক বড় মজার ঘটনা।

আরব-সাগরের বেলার ওপরে একটি ছোট্ট পাহাড়। তার বুক রঙবেরঙ-এর শাঁখের হাড়ে ভরা। দেখে মনে হয়, এটা বুঝি একটা শঙ্খ-সমাধি। তাদেরই ওপর একলা পা ছড়িয়ে বসে যে কথা ভাবছিলাম সে কথা কখনো বাজে উদাস পথিকের কাঁপা গলায়, কখনো শুনি প্রিয়-হারা ঘুঘুর উদাস ডাকে ; আর ব্যথাহত কবির ভাষায় কখনো কখনো তার আচমকা একটি কথা-হারা কথা—উড়ে-চলা পাখির মিলিয়ে-আসা ডাকের মতো শোনায়।

সেদিন পথ-চলার নিবিড় শ্রান্তি যেন আমার অণুপরমাণুতে আলস-ছোঁওয়া বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। ঘুমের দেশের রাজকুমারী আমার রুখু চুলের গোছাগুলি তার রজনীগন্ধার কুঁড়ির মতো আঙুল দিয়ে চোখের ওপর হতে তুলে দিতে দিতে বললে, 'লক্ষ্মীটি এবার ঘুমোও !' বলেই সে তার বুকের কাছটিতে কোলের ওপর আমার ক্লান্ত মাথাটি তুলে নিলে। তার সইদের কণ্ঠে আর বীণায় সুর উঠছিল—

'অশ্রু-নদীর সুদূর পারে
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।'

আমার পরশ-হরষে সদ্য-বিধবার কাঁদনের মতো একটা আহত-ব্যথা টোল খাইয়ে গেল। আমি ঘুম-জড়ানো কণ্ঠে কণ্ঠ-ভরা মিনতি এনে বললাম, 'আবার ঐটে গাইতে বলো না ভাই !' গানের সুরের পিছু পিছু আমার পিপাসিত চিত্ত হাওয়ার পারে কোন দিশেহারা উত্তরে ছুটে চলল। তারপর ... কেউ কোথাও নেই। একা—একা—শুধু একা ! ওগো কোথায় আমার অশ্রু-নদী ? কোথায় তার সুদূর পার ? কোথায় বা তার ঘাট, আর সে কার দ্বারে ? দিকহীন দিগন্ত সারা বিশ্বের অশ্রুর অতলতা নিয়ে আরেক সীমাহারার পানে মৌন ইঙ্গিত করতে লাগল,—'ঐ—ঐ দিকে গো ঐ দিকে !' ... হায় ? কোথায় কোন দিকে কে কী ইঙ্গিত করে ?

অলস-আঁখির উদাস-চাওয়া আমার সারা অঙ্গে বুলিয়ে মলিন কণ্ঠে কে এসে বিদায়-ডাক দিলে,—'পথিক ওঠো ! আমার যাবার সময় হয়ে এল।' আমি ঘুমের দেশের বাদশাজাদির পেশোয়াজ-প্রান্ত দু-হাত দিয়ে মুঠি করে ধরে বললাম, 'না, না, এখনো তো আমার ওঠবার সময় হয়নি। ... কে তুমি ভাই ? তোমার সবকিছুতে এত উদাস কান্না ফুটে উঠচে কেন ?' তার গলার আওয়াজ একদম জড়িয়ে গেল। ভেজা কণ্ঠে সে বললে, 'আমার নাম শ্রান্তি, আজ আমি তোমায় বড্ডো নিবিড় করে পেয়েছিলাম। ... এখন আমি যাই, তুমি ওঠো। আয় সই ঘুম, ওকে ছেড়ে দে !'

জেগে দেখি, কেউ কোথাও নেই, আমি একা। তখন সাঁঝের রানির কালো ময়ূরপঙ্খী ডিঙিখানা ধূলি-মলিন পাল উড়িয়ে সাগর বুকে নেমেছে। ... জানটা কেমন উদাস হয়ে গেল। ... যারা আমার সুপ্তির মাঝে এমন করে জড়িয়ে ছিল, তাদের চেতনার মাঝে হারালাম না। কেন? এই জাগরণের একা-জীবন কী দুর্বিষহ বেদনার ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত, কী নিষ্করুণ শুষ্কতা তিক্ততায় ভরা! সেইদিন বুঝলাম, কত কষ্টে ক্লান্ত পথিকের ব্যর্থ সন্ধ্যা-পথে উদাস পূরবীর অলস ক্রন্দন এলিয়ে এলিয়ে যায়—

'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে,
শূন্য ঘাটে একা আমি,
পার করে নাও খেয়ার নেয়ে!'

হায়রে উদাসীন পথিক! তোর সব ব্যর্থ ভাই, সব ব্যর্থ! কোথায় খেয়ার নেয়ে ভাই? কোন অচিন মাঝিকে এমন বুক-ফাটা ডাক ডাকিস তুই? কোথায় সে? কার পথ চেয়ে তোর বেলা গেল? কে সে তোর জন্ম-জন্ম ধরে-চাওয়া না-পাওয়া ধন? কোন ঘাটে তুই একা বসে এই সুরের জাল বুনছিস? এ ঘাটে কি কোনোদিন সে তার কলসিটি-কাঁখে চলতে গিয়ে দুহাতে ঘোমটা ফাঁক করে তোর মুখে চোখে বধূর আধখানা পুলক-চাওয়া থুয়ে গিয়েছিল? না—কি—সে তার কমল-পায়ের জল-ভেজা পদচিহ্ন দিয়ে তোর পথের বুকে স্মৃতির আলপনা কেটে গিয়েছিল? কখনো কাউকে জীবন ভরে পেলিনে বলেই কি তোর এত কষ্ট ভাই? হায় ও-পারের যাত্রী, তোমার সেই 'কবে-কখন একটুখানি-পাওয়া' হৃদয়-লক্ষ্মীর চরণ-ছোঁওয়া একটি ধূলি-কণাও আজ তোমার জন্যে পড়ে নেই! বৃথাই সে রেণু-পরিমল পথে পথে খোঁজা ভাই, বৃথা-বৃথা!

অবুঝ মন ওসব কিচ্ছু শুনতে চায় না, বুঝতে চায় না। তার মুখে খ্যাপা মনসুরের একটি কথা 'আনল হক'-এর মতো যুগ-যুগান্তের ওই একই অতৃপ্ত শোর উঠছে, 'হায় হারানো লক্ষ্মী আমার! হায় আমার হারানো লক্ষ্মী!'

ঘুমিয়ে বরং থাকি ভালো! তখন যে আমি স্বপনের মাঝে আমার না-পাওয়া লক্ষ্মীকে হাজার বার হাজার রকমে পাই। তাকে এই যে জাগরণের মধ্যে পাবার একটা বিপুল আকাঙ্ক্ষা,—বুকে বুকে মুখে মুখে চেপে নিতে, সেই তার উষ্ণ-পাওয়াকে আমি ঘুমের দেশে স্বপনের বাগিচায় বড় নিবিড় করেই পাই। মানুষের মন মস্ত প্রহেলিকা। মন নিক্তির মতন যখন যেদিকে ভার বেশি পায়, সেই দিকেই নুয়ে পড়ে। তাই কখনো মনে করি পাওয়াটাই বড়, পাওয়াতেই সার্থকতা। আবার পরক্ষণেই মনে হয়, না—না-পাওয়াটাই পাওয়া, ওই না-পাওয়াতেই সকল পাওয়া সুপ্ত রয়েছে। এ সমস্যার আর মীমাংসা হলো না। অথচ দুই পথেরই লক্ষ্য এক। দুই স্রোতেরই লক্ষ্য সাগর-প্রিয়ার সীমাহারা বুকে নিজের সমস্ত বেগ সমস্ত গতি সমস্ত স্রোত একেবারে শেষ করে ঢেলে দেওয়া, তারপর নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাওয়া—শুধু এক আর এক! কিন্তু এই 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর' কথাটার এমন একটা নেশা আর মাদকতা রয়েছে, যেটা অনবরত আমার মনের কামনা-কিশোরীকে শিউরিয়ে তুলছে এবং বলছে, 'বন্ধনেই মুক্তি'—এই যে মানব-মনের চিরন্তনী বাণী, সেটা কি মিথ্যা? না, এ সমস্যার সমাধান নেই।

আবার মনটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

আমার মনের ভোগ আর বৈরাগ্যের একটা নিষ্পত্তিও হলো না আর তাই কাউকে জীবন ভরে পাওয়াও হলো না!

তবে?....

কাউকে না পেয়েও আমার মনে এ কোন আদিম-বিরহী ভুবন-ভরা বিচ্ছেদ-ব্যথায় বুক পুরে মুলুকে মুলুকে ছুটে বেড়াচ্ছে? খ্যাপার পরশ-মণি খোঁজার মতন আমিও কোন পরশ-মণির ছোঁওয়া পেতে দিকে দিকে দেশে দেশে ঘুরে মরছি? কোন লক্ষ্মীর আঁচল-প্রান্তে বাঁধা রয়েছে সে মানিক? কোন তরুণীর গলায় রক্ষা-কবচ হয়ে ঝুলছে সে পাথর?

ভাবতে ভাবতে চোখে জল গড়িয়ে এল। সেই জলবিন্দুতে সহসা কার দুষ্টু হাসির চপল কিরণ ছলছলিয়ে উঠল। আমি চমকে সামনে চোখ চাইতেই দেখলাম, আকাশের মুক্ত আঙিনায় ললাটের আধফালি ঘোমটায় ঢেকে প্রদীপ-হাতে সাঁঝের তারা দাঁড়িয়ে। তার চোখের কিনারায়, মুখের রেখায়, অধরপুটের কোণে কোণে দুষ্টুমির হাসি লুকোচুরি খেলছে। বারেবারে-উছলে-ওঠা নিলাজ হাসি ঠোঁটের কাঁপন দিয়ে লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টায় তার হাতের মঙ্গল-প্রদীপ কেঁপে কেঁপে লোলুপ শিখা বাড়িয়ে সুন্দরীর রাঙা গালে উষ্ণ চুম্বন এঁকে দেওয়ার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। পাগলা হাওয়া বারেবারে তার বুকের বসন উড়িয়ে দিয়ে বেচারিকে আরো অসম্বৃত, আরো বিব্রত করে তুলছে।

অনেকক্ষণ ধরে সেও আমার পানে চেয়ে রইল, আমিও তার পানে চেয়ে রইলাম। আমার কণ্ঠ তখন কথা হারিয়ে ফেলেছে।

সে ক্রমেই অস্তপারের-পথে পিছু হেঁটে যেতে লাগল। তার চোখের চাওয়া ক্রমেই মলিন সজল হয়ে উঠতে লাগল। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলার দরুন তার বুকের কাঁচুলি বায়ুর মুখে কচিপাতার মতো থরথর করে কাঁপতে লাগল। যতই সে আকাশ-পথ বেয়ে অস্ত-পল্লির পথে চলতে লাগল, ততই তার মুখ-চোখ মূর্ছাতুরের মতন হলদে ফ্যাকাসে হয়ে যেতে লাগল। তারপর পথের শেষ-বাঁকে দাঁড়িয়ে সে তার শেষ অচপল অনিমেষ চাওয়া চেয়ে আমায় একটি ছোট্ট সেলাম করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হিয়ায় হিয়ায় আমার শুধু একটি কাতর মিনতি মূঢ়ের মতো না-কওয়া ভাষায় ধ্বনিত হচ্ছিল —'হায় সন্ধ্যা-লক্ষ্মী আমার, হায়!'

হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি কত বছর ধরে যে এই রকম করে, রোজ সন্ধ্যা-লক্ষ্মীর পানে চেয়ে চেয়ে আসছি তা কিছুতেই স্মরণ হয় না। শুধু এইটুকু মাত্র মনে পড়ে যে, সে-কোন যুগে যেন আমি আজিকার মতনই এমনি করে প্রভাতের শুকতারাটির পানে শুধু উদয়-পথে তাকিয়ে থাকতাম। আমার সমস্ত সকাল যেন কোন প্রিয়তমার আসার আশায় নিবিড় সুখে ভরে উঠত। রোজ প্রভাতে উদয়-পথে মুঠি-মুঠি করে ফাগ-মাখা ধূলি-রেণু ছড়াতে ছড়াতে সে আসত, তারপর আমার পানে চেয়েই সলজ্জ তৃপ্তির হাসি হেসে যেন বারেবারে আড়-নয়নের বাঁকা চাউনি হেনে বলত, 'ওগো

পথ-চাওয়া বন্ধু আমার, আমি এসেছি।' আমি তার চোখের ভাষা বুঝতে পারতাম, তার চাওয়ার কওয়া শুনতে পেতাম। ... তারপর অরুণদেব তাঁর রক্তচক্ষু দিয়ে আমাদের পানে চাইলেই সে ভীতা বালিকার মতো ছুটে আকাশ-আঙিনা বেয়ে ঊর্ধ্বে—ঊর্ধ্বে—আরো ঊর্ধ্বে উধাও হয়ে যেত। ছুটতে ছুটতেও কত হাসি তার ! সারাদিন আমি শুনতে পেতাম তার ঐ পালিয়ে যাওয়া পথের বুকে তার কটি-কিঙ্কিণীর রিনিরিনি, হাতের পান্নার চুড়ির রিনিঝিনি আর পায়ের গুজরি পাঁইজোরের রুমুঝুমু। ... এমন করে দিন যায়। ... একদিন আমি বললাম, 'তুমি কি আমার পথে নেমে আসবে না প্রিয়?' সে আমার পানে একটু তাকিয়েই সিঁদুরে আমের মতো রেঙে উঠে আধ-ফোটা কথায় কেঁপে কেঁপে বললে, 'না প্রিয়, আমায় পেতে হলে তোমাকে এই তারারই একটি হতে হবে। আমি নেমে যেতে পারি নে, তোমাকে আমার পথেই উঠে আসতে হবে।' বলবার সময় অনামিকা অঙ্গুলি দিয়ে তার বেনারসি চেলির আঁচলপ্রান্ত যেমন সে আনমনে জড়িয়ে যাচ্ছিল, তার চোখের চাওয়া মুখের কথা সেদিন যেন তেমনি করেই অসহ্য ব্যথা-পুলকে জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। বুঝলাম, সে বিশ্বের চিরন্তন ধারাটি বজায় রেখেই আমার সঙ্গে মিলতে চায়। আমার সৃষ্টিছাড়া-পথে বেরিয়ে পড়তে তার কোমল বুকে সাহস পাচ্ছে না। যতই ভালোবাসুক না, আমার পথ-হারা পথে চলতে—আমার বিপুল ভার বয়ে সেই অজানা ভয়ের পথে চলতে—সে যেন কিছুতেই পারবে না।

কিন্তু তাই কি?

হয়তো তা ভুল। কেননা একদিন যেন সে বলেছিল, 'প্রিয়তম, এ যে তোমার ভুলের পথ, এ পথ তো মঙ্গলের নয়। আঘাত দিয়ে তোমায় এ পথ হতে ফিরাতেই হবে। তোমায় কল্যাণের পথে না আনতে পারলে তো আমি তোমার লক্ষ্মী হতে পারিনে!' সেকথা যেন আজকের নয়, কোন অজানা নিশীথে আমি ঘুমের কানে শুনেছিলাম। তখন তা কিন্তু বুঝতে পারিনি।

আমি যেমন কিছুতেই তার চিরন্তন ধারাটির একগুঁয়েমি সইতে পারলাম না, সেও তেমনি নিচে নেমে আমার পথে এল না।

বিদায় নেবার দিনও সে তেমনি করে হেসে গেছে। তেমনি করেই তার দুষ্টু চটুল চাউনি দিয়ে সে আমায় বারেবারে মিষ্টি বিদ্রূপ করেছে। শুধু একটি নতুন কথা শুনিয়ে গেছ্‌ল, 'আর এপথে আমাদের দেখা হবে না প্রিয়, এবার নতুন করে নতুন পথে নতুন পরিচয় নিয়ে আমরা আমাদের পূর্ণ করে চিনব।'

তার বিদায়-বেলার যে দীঘল শ্বাসটি শুনিনি, আজ আমি সারা বাতাসে যেন সেই ব্যথিত কাঁপুনিটুকু অনুভব করছি। এখন সে বাতাস নিতেও কষ্ট হয়। ... কবে আমার এ নিশ্বাস-প্রশ্বাসে-টেনে-নেওয়া বায়ুর আয়ু চিরদিনের মতো ফুরিয়ে যাবে প্রিয়? ... তার বিদায় চাওয়ার যে ভেজা দৃষ্টিটুকু আমি দেখেও দেখিনি, আজ সারা আকাশের কোটি কোটি তারার চোখের পাতায় সেই অশ্রুকণাই দেখতে পাচ্ছি। এখন তারা হাসলেও মনে হয়, ও শুধু কান্না আর কান্না।

তারপর রোজ আসি রোজ যাই, কিন্তু উদয়-পথে আর তার রাঙা চরণের আলতার আলপনা ফুটল না! এখন অরুণ রবি আসে হাসতে হাসতে। তার সে হাসি আমার অসহ্য। পাখির কণ্ঠে বিভাস সুর আমার কানে যেন পূরবীর মতো করুণ হয়ে বাজে।...

আমি বললাম, 'হায় প্রিয়তম, তোমায় আমি হারিয়েছি!' দেখলাম, আকাশ-বাতাস আমার সে কান্নায় যোগ দিয়ে বলছে, 'তোমায় হারিয়েছি!' তখন সন্ধ্যা—ঐ সিন্ধু-বেলায়।

হঠাৎ ও' কার চেনা-কণ্ঠ শুনি? ও' কার চেনা-চাওয়া দেখি? ও' কে রে, কে?

বললাম, 'আজ এ বধূর বেশে কোথায় তুমি প্রিয়?' সে বললে, 'অস্ত-পথে!'

সে আরো বলে গেছে যে, সে রোজই তার ম্লানমূর্তি নিয়ে এই অস্ত-গাঁয়ের আকাশ-আঙিনায় সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখাতে আসবে। আমি যেন আর তার দৃষ্টির সীমানায় না আসি।

বুঝলাম সে যতদিন অস্ত-পারের দেশে বধূ হয়ে থাকবে, ততদিন তার দিকে তাকাবারও আমার অধিকার নেই। আজো সে তার জগতের সেই চিরন্তন সহজ ধারাটুকুকে বজায় রেখে চলছে। সে তো বিদ্রোহী হতে পারে না। সে যে নারী—কল্যাণী। সে-ই না বিশ্বকে সহজ করে রেখেছে, তার অনন্ত ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ সামঞ্জস্য দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

শুধোলাম, 'আবার কবে দেখা হবে তবে? আবার কখন পাবো তোমায়?' সে বললে, 'প্রভাতবেলায় ওই উদয়-পথেই।'

আজ সে বধূ, তাই তার সাঁঝের-পথে আর তাকাইনি।

জানিনে, কবে কোন উদয়-পথে কোন নিশিভোরে কেমন করে আমাদের আবার দেখা শোনা হবে। তবু আমার আজো আশা আছে, দেখা হবেই, তাকে পাবই।

* * *

সিন্ধু পেরিয়ে ঘরের আঙিনায় যখন একা এসে ক্লান্ত চরণে দাঁড়ালাম, তখন ভাবিজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁ ভাই, তুমি নাকি বে করেছ?' আমি মলিন হাসি হেসে বললাম 'হাঁ।' তিনি হেসে শুধোলেন, 'তা বেশ করেছ। বধূ কোথায়? নাম কি তার?'

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলাম। শ্রী-রাগের সুরে সুর-মূর্ছিতা মলিনা সন্ধ্যার ঘোমটার কালো আবছায়া যেন সিয়াহ্ কাফনের মতো পশ্চিম-মুখী ধরণীর মুখ ঢেকে ফেলতে লাগল। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

তারপর অতিকষ্টে ঐ পশ্চিম-পারের পানে আঙুল বাড়িয়ে বললাম, 'অস্তপারের সন্ধ্যালক্ষ্মী।'

ভাবিজানের ডাগর আঁখিপল্লব সিক্ত হয়ে উঠল; দৃষ্টিটুকু অব্যক্ত ব্যথায় নত হয়ে এল। কালো সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে নেমে এল!

রাক্ষুসী

(বীরভূমের বাগদীদের ভাষায়)

[ক]

আজ এই পুরো দুটো বছর ধরে ভাবছি, শুধু ভাবছি,—আর সবচেয়ে আশ্চয্যি হচ্ছি, লোকে আমাকে দেখলেই এমন করে ছুটে পালায় কেন। পুরুষেরা, যাঁরা সব পর্দার আড়ালে গিয়ে মেয়ে-মহলে খুব জাঁদরেলি রকমের শোরগোল আর হল্লা করেন, আর যাঁদের সেই বিদঘুটে চেঁচানির চোটে ছেলেমেয়েরা ভয়ে 'নফসি নফসি' করে, সেই মদ্দরাই আবার আমায় দেখলে হুঁকো হাতে দাওয়া হতে আস্তে আস্তে সরে পড়েন, তখন নাকি তাদের অন্দর-মহলে যাবার ভয়ানক 'হাজত' হয়। মেয়েরা আমাকে দেখলেই কাঁক হতে দুম করে কলসি ফেলে সে কি লম্বা ছুট দেয় ! ছেলেমেয়েরা তো নাকমুখ সিঁটকে ভয়ে একেবারে আঁৎকে ওঠে ! হাজার গজ দূর থেকে বলে, 'ওরে বাপরে, ঐ এল পাগলি রাক্ষুসী মাগি, পালা—পালা ! খেলে, খেলে !'—কেনে। আমি কোন উনোনমুখো সুঁটকোর পাকা ধানে মই দিয়েছি? কোন খালভরা ড্যাকরার মুখে আগুন দিয়েছি? কোন চোখখাগি আবাগির বেটির বুকে বসে তপ্ত খোলা ভেঙেছি? কার গতর আমকাঠ না কুল-কাঠের আখায় চড়িয়েছি? কোন ছেলেমেয়ের কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছি? বল তো বুন, তাদের কি 'সরোকার' আছে আমায় যা তা বলবার? কে তারা আমার?—মেরেছি?—বেশ করেছি, নিজের 'সোয়ামিকে' মেরেছি ! ... শুধু মেরেছি? দা দিয়ে কেটেছি। তাতে ওদের এত বুক চড় চড় করবে কেনে? ওদের কারুর বুক থেকে তো সোয়ামিকে কেড়ে লি নাই, আর হত্যেও করি নাই, তাতে ওদের কথা বলবার আর সাওখুড়ি করবার কি আছে? ওরা কি আমার সাতপুরুষে কুটুম না গিয়াস্ত? যদি এই রকমই করতে থাকে, তবে আমি সত্যিকারের রাক্ষুসীই হয়ে দাঁড়াব বলে রাখছি। তখন এক এক দায়ের কোপে ওদের সোয়ামির মাথাগুলো ধড় থেকে আলাদা করে দিব, মেয়েগুলোর বুক ফেঁড়ে কলজেগুলো ধরে পিষে পিষে দিব, তবে না সে আমার নাম সত্যিসত্যিই রাক্ষুসী হয়ে দাঁড়াবে !

আমায় পাগল করলে কে? এই মানুষগুলোই তো—আমি তো ফের তেমনি করেই যেন কিছু হয় নাই—ঘর পেতেছিলুম। রাত্তির দিন আমার কানের গোড়ায় আনাচে-কানাচে, পথে-ঘাটে, কাজেকর্মে, মজলিসে-জৌলুসে আমার নামে রাক্ষুসী রাক্ষুসী বলে

কুৎসা, ঘেন্না, মুখ ব্যাঁকানি, চোখ রাঙানি,—এইসব মিলেই তো আমার মাথার মগজ বিগড়ে দিল? যে ব্যথাটাকে আমি আমার মনের মাঝেই চেপে রেখেছিলুম, সেটাকে আবার জাগিয়ে তুলে চোখের সামনে সোজা করে ধরলে তো এরাই! আচ্ছা তুই বল তো বুন, এ পাগল হওয়ার দোষটা কার? একটা ভালো মানুষকে খোঁচা মেরে মেরে ক্ষেপিয়ে তুললে সে দোষটা কি সেই ভালো মানুষের, না যে ভালো মানুষেরা তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে, তাদের?—

'আমার সোয়ামি ছিল সাদাসিধে মানুষ, সে তো সোজা ছাড়া বাঁকা কিছু জানত না। সে চাষ করত, কিরষাণি করত, আমি সারাটি দিন মাছ ধরে চাল কেঁড়ে, ধান ভেনে' আনতুম। তা না হলে চলবে কি করে দিদি? তখন আমাদের তিনটি পুষ্যি,—বড় ছেলে সোমত্থ হয়ে উঠেছে, বেথা না দিলে 'উপর-নজর' হবে, মেয়েটাও ঢ্যাং-ঢেঙিয়ে বেড়ে উঠেছিল আর আমার 'কোলপুঁছা' ছোট মেয়েটিরও তখন হাঁক্কো হাঁক্কো করে দু-একটি কথা ফুটছিল। ছা-পোষা মানুষ হলেও দিদি আমাদের সংসারে তো অভাব ছিল না কোনো কিছুর, তোমাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে। এই বিন্দিই তখন নাই নাই করে দিনের শেষে তিনটি সের চাল তরকারির জন্যে মাছ রে, শামুক রে, গুগলি রে পিথিমির জিনিস জোগাড় করে আনত। তাছাড়া বড় ছেলেটাও তোমাদের শীচরণের আশীর্বাদে করে-কর্মে দুপয়সা ঘরে আনছিল। মেয়েটাও পাড়ার বৌ-ঝিদের সঙ্গে যা দু-চারটে শাগ-মাছ আনত, তাতেও নেহাৎ কম পয়সা হত না। লুন-তেলের খরচটা ওর দিয়েই বেশ দিব্যি চলে যেত। এসবের উপর সোয়ামি বছরের শেষে চাষবাস আর কিরষাণি করে যা ধান-চাল আনত, তাতে সারা বছর খুব 'সচল বচল' করে খেয়েও ফুরাত না। সংসারের তখন কি ছিরিই ছিল। লক্ষ্মী যেন মুখ তুলে চেয়েছিলেন। এত সব কার জন্যে—ঐ ছেলে-মেয়েগুলির জন্যেই তো? সারাদিন রেতে একটি সেরের বেশি চাল রাঁধতুম না। বলি আহা, শেষে আমার ছেলেরা কষ্ট পাবে! সোয়ামি আর ছেলেগুলোকে দিতুম ভাত, আর নিজে খেতুম মাড়-শুদ্ধু ভাতের ফেন! মেয়েমানষের আবার সুখ কি, ছেলেমেয়ে যদি ঠাণ্ডা রইল তাতেই আমাদের জান-ঠাণ্ডা! নাইবা হলুম জমিদার। আমরা তো কারুর কাছে ভিক্ষে করতুম না, চুরি-দারিও করতুম না। নিজের মেহনতের পয়সা নেড়ে-চেড়ে খেতুম। নিজে খেতুম, আর পালে রে পার্বণে রে যেমন অবস্থা দু-দশটা অত্তিথ-ফকিরকেও খাওয়াতুম। আহা, ওতেই তো আমার বুক ভরে ছিল দিদি! লোকে বলত আমি নাকি বড্ডো 'কিরপিন'; কারণ আমি একটি পয়সা বাজে খরচ করতুম না। তা বললে আর কি করব, তাতে আমার বয়ে যেত না। তারা তো জানত না, আমার মাথায় কি বোঝা চাপানো রয়েছে। দু'দুটো মেয়ে আর একটি ছেলের বিয়ে দিতে হবে, বাড়িতে বউ আসবে, জামাই আসবে, আমার এই মাটির ঘরই আনন্দে ইন্দিরপুরী হয়ে উঠবে, দুটো সাদ-আরমান আছে—তাতে কত খরচ বল দিকিনি বুন? দায়ে ঠেকলে কেউ একটা পয়সা কর্জ দিয়ে চালাবে? বাপরে বাপ এই বিন্দির অজানা নেই গো, গলায় সাপ বেঁধে পড়লেও কোনো বেটি একটি খুদকণা দিয়ে শুধোয় না। তার আবার গুমোর!

আমার কাছে ও–সব শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না বাপু! তরে বুঝতুম, অনেক কড়ুই রাঁড়ির বুক চচ্চড় করত হিংসেয়, আমাদের এই এতটুকু সুখ দেখে।

এমনি করেই খুব সুখে দিন যাচ্ছিল আমাদের। আমি মনে করতুম, আর যটা দিন বাঁচি এমনি করে সোয়ামির সেবা করে, ছেলে–মেয়ে চরিয়ে, নাতিপুতি দেখে আমার হাতের নোওয়া অক্ষয় রেখে মরি; কিন্তু তা আমার পোড়া বিধাতার সইল না। আমার সাধের ঘরকন্না শ্মশানপুরী হয়ে গেল! আমার এত আশা–ভরসা সব–তাতে চুলোর ছাই–পাঁশ পড়ল! শুনে যা দিদি, শুনে যা সব, আর যদি দোষ দেখিস তো তোর ঐ মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে আমার বিষ ঝেড়ে দিয়ে যাস, সাত উনুনের বাসি ছাই আমার পোড়া মুখে দিয়ে দিস! হায় বুন, আমার 'দুখখুর' কথা শুনলে পাথর গলে মোম হয়ে যায়, কিন্তু গাঁয়ের এই বেদিল মানুষগুলো আমায় এতটুকু পেরবোধ তো দেয়ই না, তার উপর রাত্তির–দিন নানান কথা বলে জানটাকে খেপিয়ে তুলেছে। মনে করি আমার সব পেটের কথা কারুর কাছে তন্নতন্ন করে বলি আর খুব একচোট কেঁদে নিয়ে মনটাকে হালকা করি। তা যারই কাছ ঘেঁষতে চাই, সেই মনে করে এই আমায় খেলেরে! আমি যেন ডাইনি কুহুকিরও অধম! এই 'হেনস্থা' আর ভয় করার দরুনে আমার সমস্ত মগজটা চমচম করে ধরে যায়। কাজেই আমার পাগলামি তখন আরো বেড়ে যায়। সাধে কি আমার মুখ দিয়ে এত গালিগালাজ শাপমন্যি বেরোয়, বুন! তুই সব কথা শুন আর নাথি মেরে আমার খোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে যা!

[খ]

তু তো বরাবরই জানতিস দিদি, আমাদের পাঁচুর বাপ ছিল বরাবরকার সিদেসাধা মানুষ, সে হের–ফের বা কথার প্যাঁচ বুঝত না। নাকটা সোজাসুজি না দেখিয়ে হাতটা পিঠের দিক দিয়ে বাঁকিয়ে এনে দেখানোটা তার মগজে আদৌ ঢুকত না। কত আঁটকুঁড়ো নদী–ভরাই যে ওকে দিয়ে বিনি পয়সায় বেগার খাটিয়ে নেত, হাত হতে পয়সা ভুলিয়ে নেত, তার আর সংখ্যা নাই। ঐ নিয়ে বেচারাকে আমি কতদিন গালমন্দ দিয়েছি, কত বুদ্ধি দিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না মলে'— ওর আর একটা বদ–অভ্যেস ছিল, ও বড্ড মদ খেত। কতদিন বলেছি, 'তুমি মদ খাও ক্ষতি নাই, দেখো তোমায় মদে যেন না খায়!' কিন্তু সে তা শুনত না; একটু ফাঁক পেলেই যা রোজগার করত তা সব শুঁড়ির পায়ে ঢেলে আসত। যাক, ওরকম দুচারটে বদ–অভ্যাস পুরুষমানুষের থাকেই থাকে—ওতে তেমন আসত যেত না, কিন্তু অমন শিবের মতো সোয়ামি আমার শেষে এমন কাজ করে ফেললে, যা বুন তুই কেন— আমারও এখন বিশ্বাস হচ্ছে না। তার মত অমন সোজা লোক পেয়ে কে কি খাইয়ে দিয়ে তাকে যে অমন করে দিয়েছিল, তা আমি নিজেই বুঝতে পারি নাই।

জানিস ওপাড়ার রথো বাগদির দু-তিনটে 'স্যাঙ্গা-করা' 'কড়ুই রাঁড়ি' মেয়েটা কি-রকম পাড়া মাথায় করে তুলেছিল। ছুঁড়ি কখনো সোয়ামির ঘর তো করেই নাই, মাঝ থেকে পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের কাঁচা বুকে ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর তার বাপ-মাকেই বা কি বলব,—ছি, আমারই মনে হতো যে, বিষ খেয়ে মরি! মাগো মা, বাগদী জাতটার ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিলে!—

তু তো জানিস মাখন-দি, ঝুটমুট আমাদের গাঁয়ের লোকের আর আমাদের বাগদিগুলোর বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের হাতে অনেক টাকা আছে। আবার সে কত পুত্‌খাগির বেটিরা লোকের ঘরে ঘরে রটিয়ে এসেছিল, আমরা নাকি যক্ষির টাকা পেয়েছি। বল তো বুন, এতে হাসি পায় না?

'হেঁ,—আমাদের ঐ টাকার লোভেই ঐ 'রাঁড় হয়ে ষাঁড় হওয়া' ছুড়িটা ঐ শিবের মতন সোজা ভোলানাথ সোয়ামিকে আমার পেয়ে বসল। আর সত্যি বলতে কি, মিনসের চেহারাও তো আর নেহাৎ মন্দ ছিল না! ধুতি-চাদর পরিয়ে দিলে মনে হতো একটি খাসা 'ভদ্দরনুক'।

ওরে যেদিন আমি পেত্থম এই কথাটি শুনলুম, তখন আমার মনটা যে কেমন হয়ে গেল, তা বুন তোকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। মাথায় বাজ পড়লেও বোধ হয় লোকে অত বেথা পায় না। আমি সেদিন তাকে রাতে খুব ঝাঁটাপেটা করলুম। অ বুন!—যে অমন মাটির মানুষ, সাত চড়ে যার রা বেরোত না, সেও কিনা সেদিন আমার এই ঝুঁটি ধরে একটা চেলাকাঠে করে উঃ সে কি মার মারলে! কাঠটার চেয়েও বেশি ফেটে ফেটে আমার পিঠ দিয়ে রক্ত পড়তে নাগল। কিন্তু সত্যি বলতে কি, তখনকার এত যে বাইরের বেথা, তাতো আমি বুঝতে পারছিলুম না, কেননা আমার বুকটা তখন আরো বেশি ফেটে গিয়েছিল। আমি যে সেদিন স্পষ্ট বুঝলুম, আমার নিজের সোয়ামি আজ পর হলো। আমি দেখতে পেলুম, আমার কপাল পুড়েছে। তখন ঠিক যেন কেউ তপ্ত লোহা দিয়ে আমার বুকের ভিতরটায় ছ্যাঁকা দিচ্ছিল—আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলুম!

সেই সঙ্গে আমার যত রাগ হলো, সেই হারামজাদি বেটির উপর। মনে হতে লাগল, এখন যদি তাকে পাই, তো নখে করে ছিঁড়ে ফেলি। কিন্তু কোনোদিনই তার নাগাল পাই নাই। সে আমাকে দেখলেই সরে পড়ত।

[গ]

ক্রমেই আমার সোয়ামি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলে। সে আর প্রায়ই ঘরে আসত না! মুনিব-ঘরে খাটত, খেত, আর ওদের ঘরটাতেই গিয়ে শুয়ে থাকত! আমি, আমার ছেলে, পাড়ার সব ভালো লোক মিলে কত বুঝালুম তাকে। কিন্তু হায়, তাকে আর ফিরাতে পারলুম না, ছুঁড়ি যে ওকে জাদু করেছিল! একেবারে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছিল!

তখন বুঝলুম এতদিনে মিনসের ভীমরতি ধরেছে ; ওকে 'ঊনপঞ্চাশে' পেয়েছে ; তা নইলে কি এমন চোখের মাথা খেয়ে বসে লোকে ! একদিন পায়ে ধরে জানালুম, সে কত বড় ভুল করতে যাচ্ছে। সে আমার মুখে লাথি মেরে চলে গেল। আমার সারা দেহ দিয়ে আগুনের মতো গরম কি একটা ঠিকরে বেরুতে লাগলো। বুঝলুম সে এত বেশি এগিয়ে গিয়েছে নরকের দিকে যে, তাকে ফেরানো যায় না।

তার উপর রাস্তায়-ঘাটে ঐ বিশ্রী কথাটা নিয়ে আমায় গঞ্জনা—খোঁচা। আমি খেপার মতো হয়ে পেতিজ্ঞা করলুম, শোধ নেব, শোধ নেব। তবে আমার নাম বিন্দি !

আর একদিন মাঠ হতে এসে শুনলুম মিনসে নাকি আমার বাকস ভেঙে জোর করে যা দু-চার পয়সা জমিয়েছিলুম সব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, একটা কানাকড়িও থুয়ে যায় নাই। আরো শুনলুম, তার দু-দিন পরেই নাকি ঐ ছুঁড়ির সঙ্গে তার 'স্যাঙ্গা' হবে। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সে নাকি ঐ সমস্ত নগদ টাকা নিয়ে গিয়ে তার হবু-শ্বশুরের 'শীপাদপদ্দে' ঢেলেছে।—হায়রে আমার রক্তের চেয়েও পিয়ারা টাকা ! তার এই দশা হলু শেষে ? মানুষ এত নিচু দিকে যেতে পারে ? তখন ভাববার ফুরসৎ ছিল না ; ঐ দু-দিনের মধ্যেই যা করবার একটা করে নিতে হবে, তারপর আর সময় পাওয়া যাবে না। ভাবতে লাগলুম, কি করা যায় ? একটা দেবতার মতো লোক সিধা নরকে নেমে যাচ্ছে এক-এক পা করে, আর বেশি দূর নাই, অথচ ফিরাবার কোনো উপায় নাই। তখন তাকে হত্যা করলে কি পাপ হয় ? তাছাড়া আমি তার 'ইস্ত্রি', আমারও তো একটা কর্তব্য আছে, আমার সোয়ামি যদি বেপথে যায়, তো আমি না ফিরালে অন্য কে এসে ফিরাবে ? আর সে এই রকম বেপথে গেলে ভগবানের কাছে ধর্মত আমিই তো দায়ী। ধর আমি যদি তাকে এই সময়ে একেবারে শেষ করে ফেলি তাহলে তার তো আর কোনো পাপ থাকবে না। যত পাপ হবে আমার। তা হোক, সোয়ামির পাপ তার 'ইস্ত্রি' নেবে না তো কি নেবে এসে শেওড়াগাছের ভূত ?

আমি মনকে শক্ত করে ফেললুম ! হাঁ, হত্যেই করব যা থাকে কপালে !—ভগবান, তুমি সাক্ষী রইলে, আমি আমার দেবতাকে নরকে যাবার আগে তাঁর জানটা তোমার পায়ে জবা ফুলের মতো 'উচ্ছুগ্গু' করব, তুমি তাঁর সব পাপ খণ্ডণ করে আমাকে শুধু 'দুখখু' আর কষ্ট দাও। আমার তাই আনন্দ।

'সেদিন সাঁঝে একটু ঝিমঝিম বিষ্টির পর মেঘটা বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে ! এমন সময় দেখতে পেলুম, আমার সোয়ামি একা ঐ আবাগিদের বাড়ির পেছনের তেঁতুল গাছটার তলায় বসে খুব মন দিয়ে একটা খাটের খুরোয় র‍্যাদা বুলোচ্ছে !—কি করতে হবে ঝাঁ করে ভেবে নিলুম ! চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম কেউ কোথাও নাই। আমি পাগলির মতো ছুটে এসে দাটা বের করে নিলুম, সাঁঝের সূর্যটার লাল আলো দাটার উপর পড়ে চকমক করে উঠল ! ঐ ঝাপসা রোদেই আবার বিষ্টি নেমে এল—ঝিম ঝিম ঝিম ! বাড়ির পাশে তখন একপাল ন্যাংটা ছেলে জলে ভিজতে ভিজতে গাইছিল—

'রোদে রোদে বিষ্টি হয়,
খ্যাকশিয়ালের বিয়ে হয়।'

আমি আঁচলে দাটা লুকিয়ে দৌড়ে বাঘিনীর মতো গিয়ে, ওঃ সেকি জোরে তার বুকে চেপে বসলুম। সে হাজার জোর করেও আমায় উলটিয়ে ফেলতে পারলে না। তার ঘাড়ে মস্ত একটা কোপ বসিয়ে দিতেই আমার হাতটা অবশ হয়ে এল। তখন সে দৌড়ে পাশের পাটখেতটায় গিয়ে চিৎকার করে পড়ল! আমি তখন রক্তমুখো হয়ে উঠেছি। আমি আবার গিয়ে দুটো কোপ বসাতেই তার ঘাড় হতেই মাথাটা আলাদা হয়ে গেল। তারপর খালি লাল আর লাল! আমার চারিদিকে শুধু রক্ত নেচে বেড়াতে লাগল। তারপর কি হয়েছিল আমার আর মনে নেই।

'যেদিন আমার বেশ জ্ঞান হলো সেদিন দেখলুম আমি একটা নতুন জায়গায় রয়েছি, আর তার চারিদিকে সে কতই রং-বেরং-এর লোক। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছিলুম এই দেখে যে, আমিও তাদের মাঝে খুব জোরে জাঁতা পিষছি! এতদিনের পর সূর্যের আলো—ওঃ সে কত সুন্দর সাদা হয়ে দেখাল! এর আগে চোখের পাতায় শুধু একটা লাল রঙ ধু ধু করত। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, ওটা শিউড়ির জেলখানা। আমার সাত বছরের জেল হয়েছে! এই-মাত্তর তিনমাস গিয়েছে। আমি নাকি মাজিস্টার সাহেবের কাছে সব কথা নিজ মুখে স্বীকার করেছিলুম। তবে আমার শাস্তি অত হতো না—দারোগাবাবু গাঁয়ে গিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করায় আমি নাকি তাকে খ্যাংরোপেটা করে বলেছিলুম, সে যেন জোরজুলুম না করে গাঁয়ে, সে-ই নাকি সাহেবকে বলে এত শাস্তি দিইয়ে দিয়েছে।

'মাগো মা! সে কি খাটুনি জেলে! তবু দিদি, যতদিন মনে ছিল না কিছু, ততদিন যে বেশ ভালো ছিলুম। জ্ঞান হয়ে সে কি জ্বালা। তখন কাজের অকাজের মাঝে চোখের সামনে ভেসে উঠত সেই ফিং-দিয়ে-ওঠা হলকা হলকা রক্ত! ওঃ কত সে রক্তের তেজ! বাপরে বাপ! সে মনে পড়লেও আমি এখনো বেহুঁশ হয়ে পড়ি! মাথাটা যখন কাটা গেল, তখন ঐ আলাদা ধড়টা, কাৎলা মাছকে ডেঙায় তুললে যেমন করে, ঠিক তেমনি করে কাৎরে কাৎরে উঠছিল! এত রক্তও থাকে গো একটা এতটুকু মানুষের দেহে! আমি একটুকুও আঁধারে থাকতে পারতুম না ভয়ে! কেননা তখন স্পষ্ট এসে দেখা দিত সেই মাথাছাড়া দেহটা আর দেহছাড়া মাথাটা! —ওঃ—

তারপর দিদি, কোন জজ নাকি –সাত–সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এসে দিল্লির বাদশাহি তকতে বসলেন, আর সব কয়েদিরা খালাস পেলে। আমিও তাদের সাথে ছাড়া পেলুম।

'দেখলি দিদি, ভগবান আছেন! তিনি তো জানেন, আমি ন্যায় ছাড়া অন্যায় কিছু করি নাই। নিজের সোয়ামি-দেবতাকে নরকে যাবার আগেই ও-পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। পুরুষেরা ওতে যাই বলুক, আমি আর আমার ভগবান এই দুই জনাতেই জানতুম, এ একটা মস্ত সোজাসুজি সত্যিকার বিচার! আর পুরুষেরা ও-রকম চেঁচাবেই,—কারণ তারা দেখে আসছে যে, সেই মান্ধাতার আমল থেকে শুধু মেয়েরাই কাটা পড়েছে তাদের দোষের জন্যে। মেয়েরা পেথম পেথম এই পুরুষদের মতোই

চেঁচিয়ে উঠেছিল কি না এই অবিচারে, তা আমি জানি না। তবে ক্রমে তাদের ধাতে যে এ খুবই সয়ে গিয়েছে এ নিশ্চয়। আমি যদি ঐরকম একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসতুম আর যদি আমার সোয়ামি ঐ জন্যে আমাকে কেটে ফেলত, তাহলে পুরুষেরা একটি কথাও বলত না। তাদের সঙ্গে মেয়েরাও বলত, 'হাঁ, ওরকম খারাপ মেয়েমানুষের ঐ রকমেই মরা উচিত।' কারণ তারাও বরাবর দেখে আসছে, পুরুষদের সাত খুন মাফ।

'তাছাড়া, আমি মানুষের দেওয়ার চেয়ে অনেক বড় শাস্তি পেয়েছিলুম নিজের মনের মাঝে। আমার জ্বালাটা যে সদা-সর্বদা কিরকম মোচড়ে মোচড়ে উঠত, তা কে বুঝত বল দেখি, বুন? নিজের হাতে কাটলেও সে তো ছিল আমার নিজেরই সোয়ামি! কোন জজ নাকি তার নিজের ছেলের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন, তাহলেও—অত শক্ত হলেও—তাঁর বুকে কি একটুকুও লাগে নাই ঐ হুকুমটা দিবার সময়?—আহা, যখন তার বুকে বসে একটা পেরকাণ্ড রাক্ষুসীর মতোই তার গলায় দাটা চেপে ধরলুম, তখন আঃ, কি মিনতি-ভরা গোঙানিই তার গলা থেকে বেরোচ্ছিল! চোখে কি সে একটা ভীত চাউনি আমার ক্ষমা চাইছিল।—আঃ! আঃ!

'জেলে রাত্তিরদিন কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকে কোনো কিছু ভাববার সময় পেতুম না। মনটাকে ভাববারই সময় দিতুম না। কাজের উপর কাজ চাপিয়ে তাকে এত বেশি জড়িয়ে রাখতুম যে, শেষে যে ঘুম এসে আমাকে অবশ করে দিয়ে যেত, তা বুঝতেই পারতুম না। এখন, যেদিন ছাড়া পেলুম, সেদিন আমার সমস্ত বুকটা কিসের কান্নায় হা হা করে চেঁচিয়ে উঠল। এতদিন যে বেশ ছিলুম এই জেলের মাঝে! এতদিন আমার মনটা যে খুব শান্ত ছিল! এখন এই ছাড়া পেয়ে আমি যাই কোথা? ওঃ ছাড়া পাওয়ার সে কি বিষের মতন জ্বালা!

'ঘরেই এলুম!—দেখলুম আমার ছেলে বে করেছে। বেশ টুকটুকে মেনিপরা বৌটি। আমি ফিরে এসেছি শুনে গাঁয়ের লোকে 'হাঁ হাঁ' করে ছুটে এল; বললে 'গাঁয়ে এবার মড়কচণ্ডি হবে। বাপরে, সাক্ষাৎ তাড়কা রাক্ষসী এবার গাঁয়ে ফিরে এসেছে, এবার আর রক্ষা নাই—নিঘ্‌ঘাত যমালয়!—' পেথম পেথম আমি তাদের কথায় কান দিতুম না। মনে করলুম, 'কান করেছি ঢোল, কত বলবি বল।' শেষে কিন্তু আর কান না দিয়েও যে পারলুম না। তাদের বলার মাঝে যে একটুও থামা ছিল না। যেন কিছুই হয় নাই এই ভেবে আমি আমার বৌ-বেটা নিয়ে ঘর-সংসার নতুন করে পাতলুম, লোকে তা লণ্ডভণ্ড করে দিলে। মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলুম, কেউ বিয়ে করলে না, বললে, 'রাক্ষুসীর মেয়ে রাক্ষুসী হবে, এ ডাহা সত্যি কথা!' এতদিন যে বেথাটা আমি দুহাত দিয়ে চাপা দিতে চাইছিলুম, সেইটাই দেশের লোক উসকে উসকে বের করে চোখের সামনে ধরতে লাগল! সোনার চাঁদ ছেলে আমার একটি কথাও শুনলে না—আমার যে কেমন করে কি হলো তা ভুলেও কোনো কথার মাঝে জিজ্ঞেস করলে না, খুশি হয়েই আমাকে সংসারের সব ভার ছেড়ে দিলে; কেননা সে বুঝেছিল, যা গিয়েছে তার খেসারতের জন্যে আর একজনকে হারাব কেনে! আর এই কড়ুইরাড়ি আঁটকুড়িরা যারা আমার সাত পুরুষের গিয়াত্‌কুটুম

নয়, তারা কিনা রাত্তিরদিন খেয়ে না খেয়ে লেগে গেল আমার পেছনে! দেবতাদের শাপের মতো এসে আমাদের সব সুখশান্তি নষ্ট করে দিলে!—আমার ছেলেকে তারা একঘরে পতিত করলে, তাতেও সাধ মিটল না। নানান পেকারে—নানান ছুতোয় এই দুটো বছর ধরে কিনা কষ্টই দিয়েছে এই গাঁয়ের লোকে! দিদি, পথের কুকুরকেও এত ঘেন্না হেনস্থা করে না! এতে যে ভালো মানুষেরই মাথা বিগড়ে যায়, আমার মতো শতেকখুয়ারি ডাইনি রাক্ষুসীর তো কথাই নাই! তাও দিদি খুবই সয়ে থাকি, নিতান্ত বিরক্ত না করে তুললে ওদের গালমন্দ দিই না। বত্রিশ নাড়ি পাক দিলে তবে কখনো লোকের মুখ দিয়ে 'শাপমন্যি' বেরোয়!

'এখন তো তুই সব শুনলি দিদি, এখন বল, দোষ কার? আর তুই ঐ হাতের মালসাটা আমার মাথায় ভেঙে আমার মাথাটা চৌচির করে দে—সব পাপের শাস্তি হোক!—ওঃ ভগবান!!'

সালেক

[ক]

আজকার প্রভাতের সঙ্গে শহরে আবির্ভূত হয়েছেন এক অচেনা দরবেশ। সাগরমন্থনের মতো হুজুগে লোকের কোলাহল উঠেছে পথে, ঘাটে, মাঠে,—বাইরের সব জায়গায়। অন্তঃপুরচারিণী অসূর্যস্পশ্যা জেনানাদের হেরেম তেমনি নিস্তব্ধ নীরব,—যেমন রোজই থাকে দুনিয়ার সব কলরব 'হ-য-ব-র-ল'র একটেরে! বাইরে উঠছে কোলাহল,—ভিতরে ছুটছে স্পন্দন!

সবারই মুখে এক কথা 'ইনি কে? যাঁর এই আচমকা আগমনে নূতন করে আজ নিশিভোরে ঊষার পাখির বৈতালিক গানে মোচড় খেয়ে খেয়ে কেঁপে উঠল আগমনীর আনন্দ ভৈরবী আর বিভাস?'

ছুটেছে ছেলে মেয়ে বুড়ো সব একই পথে ঘেঁষাঘেঁষি করে দরবেশকে দেখতে। তবুও দেখার বিরাম নাই। দুঃশাসন টেনেই চলেছে কোন দ্রৌপদীর লজ্জাভরণ, এক মূক বিস্ময়-বিস্ফারিত-অক্ষি বিশ্বের চোখের সুমুখে, আর তা বেড়েই চলেছে! তার আদিও নেই, অন্তও নেই। ওগো, অলক্ষ্যে যে এমন একটি দেবতা রয়েছেন, যিনি গোপনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন না!

দরবেশ কথাই কয় না,—একবারে চুপ!

অনেকে বায়না ধরলে, দীক্ষা নেবে; দরবেশ ধরা-ছোঁয়াই দেয় না। যে নিতান্তই ছাড়ে না, তাকে বলে, 'কাপড় ছেড়ে আয়!' সে ময়লা কাপড় ছেড়ে খুব 'আমিরানাশানের' জামা জোড়া পরে আসে। দরবেশ শুধু হাসে আর হাসে, কিছুই বলে না।

শহরের কাজি শুনলেন সব কথা। তিনিও ধন্না দিতে শুরু করলেন দরবেশের কাছে। দরবেশ যতই আমল দিতে চায় না, কাজি সাহেব ততই নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকেন। দরবেশ বুঝলেন, এ ক্রমে 'কমলিই ছোড় তা নেই' গোছের হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাঁর মুখে ফুটে উঠল ক্লান্ত সদয় হাসির ঈষৎ রেখা।

[খ]

দরবেশ বললেন, 'শোনো কাজি সাহেব, আমি যা বলব তাই করতে পারবে?'

কাজি সাহেব আস্ফালন করে উঠলেন, 'হাঁ, হুজুর, বান্দা হাজির।'

দরবেশ হাসলে, তারপর বললে, 'দেখো, কাল জুম্মা। মুল্লুকের বাদশা আসছেন এখানে। নামাজ পড়বার সময় তোমায় 'ইমামতি' করতে বলবেন। তুমি সেই সময় একটা কাজ করতে পারবে?'

কাজি সাহেব বলে উঠলেন, 'আলবৎ হুজুর, আলবৎ! কি করতে হবে?'

দরবেশ বললে, 'তোমার দুবগলে দুটি মদের বোতল দাবিয়ে নিয়ে যেতে হবে; তারপর যেই নামাজে দাঁড়াবে, অম্নি মদের বোতল দুটি দিব্যি 'জায়নামাজের' উপর ভেঙে দেবে।'

কাজি সাহেবের মুখ হয়ে গেল নীল! কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'হুজুর, তাহলে আপনি আমা হতে মুক্তি পাবেন সত্যি, কেননা ওর পরেই আমার মাথা ধড় হতে আলাদা হয়ে যাবে, —কিন্তু আমার মুক্তি হবে কি?'

দরবেশ বললেন, 'অনেককেই ভব-যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিয়েছ তুমি, একবার নিজের মুক্তিটাও তো দেখতে হবে!'

কাজি সাহেব চলে এলেন। ভাবলেন, 'যা থাকে অদৃষ্টে, কাল নিয়ে যাওয়া যাবে দুটো মদের বোতল মসজিদে। দরবেশ নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশি জানেন।'

[গ]

বাদশা এসেছেন। সঙ্গে আছে সেনা-সামন্ত উজির-নাজির সব। জুম্মার নামাজ হচ্ছে! এমাম (আচার্য) হয়েছেন কাজি সাহেব। একটু পরই কাজি সাহেবের বগলতলা হতে খসে পড়ল দুটি ধেনো মদের বোতল! আর এটা বলাই বাহুল্য যে, সে বোতল সশব্দে বিদীর্ণ হয়ে যে বিশ্রী গন্ধে মসজিদ ভরিয়ে তুললে তাতে সকলেই একবাক্যে সমর্থন করলে যে, কাজি সাহেবের মতো মাতাল আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হয়নি, হবেও না। যে মদ খায় তার ক্ষমা আছে, কিন্তু যাকে মদে খায় তার ক্ষমাও নেই, নিস্তারও নেই।

বৈঠক বসল, এ অসমসাহসিক মাতালের কি শাস্তি দেওয়া দরকার! উজির ছাড়া সভাস্থ সকলেই বললে, 'এর আবার বিচার কি জাঁহাপনা? শূলে চড়ানো হোক।' মন্ত্রী উঠে বললেন, 'এ বান্দার গোস্তাখি মাফ করতে আজ্ঞা হয় হুজুর! আমার বিবেচনায় এর মতো পাপিষ্ঠ লোকের মৃত্যুদণ্ড উপযুক্ত শাস্তি নয়। সবচেয়ে বেশি শাস্তি দেওয়া হবে যদি তার পদ আর পদবি কেড়ে নেন, আর যা কিছু সম্পত্তি তা বাজেয়াপ্ত করে নেন। মৃত্যুদণ্ড হলে তো সব ল্যাঠা চুকেই গেল। কিন্তু এই যে তার জীবনব্যাপী লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা, তা তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করে মারবে।' বাদশা সমেত সভাস্থ সকলেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'তাই ভালো।'

পাশ দিয়ে উড়ো খইয়ের মতো একটা পাগলা যা তা বকে যাচ্ছিল, 'এইসব লাঞ্ছনা আর গঞ্জনাই তো চন্দন! আর ওতে কিছু দগ্ধ হয় না ভাই, স্নিগ্ধই হয়।'

[ঘ]

বাদশার দরবারে কাজি সাহেব যখন এই রকম লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে, সব হারিয়ে একটা অন্ধকার গলির বাঁকে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর দুর্দশা দেখে পথের কুকুরও কাঁদে ! 'হাতি আড় হলে চামচিকেও লাথি মারে।' তিনি যখন শহরের কাজি ছিলেন, তখন হয়তো ন্যায়ের জন্যেও যাদিগে শাস্তি দিয়েছিলেন, তারাই সময় পেয়ে উত্তম-মধ্যম প্রহারের সঙ্গে জানিয়ে দিলে যে, চিরদিন কারুর সমান যায় না। আর যাদিগে অবিচার করে শাস্তি দিয়েছিলেন, তার প্রতিশোধ নিলে তারা যে রকম নিষ্ঠুরভাবে, তার চেয়ে শূলে চড়ে মৃত্যুও ছিল শ্রেয়।

এত লাঞ্ছনা আর গঞ্জনার মধ্যেও সে কার স্নিগ্ধ সান্ত্বনা ছুঁয়ে গেল আচমকা এসে, ঠিক যেন জ্বরের কপালে বাঞ্ছিতা প্রেয়সীর গাঢ় করুণ পরশের মতো। কাজি সাহেব বুকের শুকনো হাড়গুলোকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠলেন, 'খোদা, এমনি করে আমার সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবিয়ে দিলে !'

'ওগো দরবেশ, কোথায় তুমি ? কোন সুদূরের পারে ?'

তারপর সেই সন্ধ্যায় সরীসৃপের মতো বুকের উপর ভর দিয়ে অতি কষ্টে কাজি সাহেব যখন তাঁর বাঞ্ছিত পথ বেয়ে দরবেশের আস্তানায় এসে পঁহুচ্‌লেন, তখন একটা শান্ত ঘুমের সোহাগ-ভরা ছোঁওয়ার আবেশে আঁখির পাতা জড়িয়ে আসছে ! তবুও একবার প্রাণপণে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'দরবেশ, দীক্ষিত করো !—আমি এসেছি, আর যে সময় নাই !'

পূরবীর মীড়ে, সন্ধ্যাগোধূলির সম্মিলনে যে একটা ব্যথার কাঁপুনি বয়ে গেল, তা কেউ লক্ষ্য করলে না !

কার শান্ত-শীতল ক্রোড় তাঁকে জানিয়ে দিলে, 'এই যে বাপ ! এস ! এখন তোমার মলিন বস্ত্র আর মলিন অহঙ্কার সব চোখের জলে ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে !'

দরবেশ সুরবাহারটায় ঝঙ্কার দিয়ে গেয়ে উঠলেন,

'বমে সাজ্জাদা রঙ্গিন কুন গরৎ পীরে মার্গা গোয়েদ !
কে সালেক বেখবর না বুদ জেরাহোরসমে মঞ্জেল হা !'

জায়নামাজে শারাব-রঙিন কর, মুর্শেদ বলেন যদি।
পথ দেখায় যে, জানে সে যে, পথের কোথায় অন্ত আদি।

সৎমা-তাড়ানো মাতৃহারা মেয়ের মতো অশ্রু আর অভিমান-আর্দ্র মুখে একটা ভারি কালো মেঘ সব ঝাপসা, ক্রমে অন্ধকার করে দিলে।

কাজি সাহেব প্রাণের বাকি সমস্ত শক্তিটুকু একত্র করে ভাঙা গলায় বললেন, 'কে ? ওগো পথের সাথী ! তুমি কে ?'

অনেকক্ষণ কিছু শোনা গেল না ! নদীর নিস্তব্ধ তীরে তীরে দুলে গেল আর্ত-গম্ভীর প্রতিধ্বনি, 'তু—মি—কে ?'

খেয়া পার হতে খুব মৃদু একটা আওয়াজ কাঁপতে কাঁপতে কয়ে গেল, মাতাল হাফিজ !

স্বামীহারা

[ক]

ওঃ ! কি বুক-ফাটা পিয়াস ! সলিমা ! একটু পানি খাওয়াতে পারিস বোন ? আমার কেন এমন হলো, আর কি করেই এ কপাল পুড়ল, তাই জিজ্ঞেস করছিস—না ? তা আমার সে 'দেরেগ'-মাথা 'রোনা' শুনে আর কি হবে বহিন। দোওয়া করি, তুই চির এয়োতি হ' ! এসব পোড়াকপালির কথা শুনলেও যে তোদের অমঙ্গল হবে ভাই ! খোদা যেন মেয়েদের বিধবা করবার আগে মরণ দেন, তা নইলে তাদের বে' হবার আগেই যেন তারা 'গোরে' যায় ! তোর যদি মেয়ে হয় সলিমা, তালে তখনি আঁতুড় ঘরেই নুন খাইয়ে মেরে দিস, বুঝলি ? নইলে চিরটা কাল আগুনের খাপরা বুকে নিয়ে কাল কাটাতে হবে।

তুই তো আজ দশ বছর এ গাঁ ছাড়া, তাই সব কথা জানিস না ! সেই ছোট্টটি গিয়েছিলি, আজ একেবারে খোকা কোলে করে বাপের বাড়ি এসেছিস ! ... আমি পাগল হয়ে গেছি ভেবে সবাই দূর হতে দেখেই পালায়। আচ্ছা তুইতো জানিস ভাই আমায়, আর এখনো তো দেখছিস সত্যি বলতো আমি কি পাগল হয়েছি ? হাঁ ঠিক বলেছিস, আমি পাগল হইনি,—নয় ?

সেবার—ঠিক মনে পড়ে না কতকাল আগে—বিধাতার অভিশাপ যেন কলেরা আর বসন্তের রূপ ধরে আমাদের ছোট্ট শান্ত গ্রামটির উপরে এসে পড়েছিল, আর ঐ অভিশাপে পড়ে কত মা, কত ভাই-বোন, কত ছেলেমেয়ে যে গাঁয়ের ভরাবক্ষে শুধু একটা খাঁ খাঁ মহাশূন্যতা রেখে কোন সে অচিন মুল্লুকে উধাও হয়ে গেল তা মনে পড়লে-মাগো মা—জানটা যেন সাতপাক খেয়ে মোচড় দিয়ে ওঠে। কত যে ঘর-কে-ঘর উজাড় হয়ে তাতে তালাচাবি পড়ল—আর গ্রামে যেমন এক একটি করে ভিটে নাশ হতে লাগল, তেমনি এই গোরস্থানে গোরের সংখ্যা এত বেশি বেড়ে উঠল যে, আর তার দিকে তাকানোই যেত না।

আচ্ছা ভাই, এই যে দীঘির গোরস্থান, আর এই যে হাজার হাজার কবর, এগুলো কি তবে আমাদেরই গাঁয়ের একটা নীরব মর্মন্তুদ বেদনা—অন্তঃসলিলা ফল্গুনিঃস্রাব—জমাট বেঁধে অমন গোর হয়ে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে ? না কি আমাদের মাটির মা তাঁর এই পাড়াগাঁয়ে চির-দরিদ্র জরাব্যাধি প্রপীড়িত ছেলেমেয়েগুলোর দুঃখে ব্যথিত হয়ে করুণ প্রগাঢ় স্নেহে বিরামদায়িনী জননীর মতো মাটির আঁচলে ঢেকে বুকের ভিতর

লুকিয়ে রেখেছেন? তাঁর এই মাটির রাজ্যে তো দুঃখ-ক্লেশ বা কারুর অত্যাচার আসতে পারে না! এখানে শুধু একটা বিরাট অনন্ত সুপ্ত শান্তি—কর্মক্লান্ত মানবের নিঃসাড় নিস্পন্দ সুষুপ্তি! এ একটা ঘুমের দেশ, নিঝুমের রাজ্যি! আহা, আজ সে কত যুগের কত লোকই যে এই গোরস্থানে ঘুমিয়ে আছে তা এখন গাঁয়ের কেউ বলতে পারবে না। আমি আর কতজনকেই বা মরতে দেখলুম? এরা যখন মরেছিল, আমি তখন হয়তো এমনি একটা অ-দেখার 'কোকাফ মুল্লুকে' ঘুরতে ছিলুম, তারপর যখন আমায় কে এই দুনিয়ায় এনে ফেলে দিলে—আর দুনিয়ার এই আলোকের জ্বালাময় স্পর্শে আমার চক্ষু ঝলসে গেল, তখন আমি নিশ্চয় অব্যক্ত অপরিচিত ভাষায় কেঁদে উঠেছিলুম, ওগো, এ মাটির—পাথরের দুনিয়ায় কেন আমায় আনলে? কেন, ওগো কেন?—তারপর মায়ের কোলে শুয়ে যখন তাঁর দুধ খেলুম, তখন প্রাণে কেমন একটা গভীর সান্ত্বনা নেমে এল! আমি আমার সমস্ত অতীত এক পলকে ভুলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

ঐ যে বাঁধানো কবরগুলো, ওগুলো অনেক কালের পুরানো। তখন ছিল বাদশাহি আমল, আর আমাদের এই ছোট্ট গ্রামটাই ছিল 'ওলিনগর' বলে একটা মাঝারি গোছের শহর। ঐ যে সামনে 'রাজার গড়' আর 'রানির গড়' বলে দুটো ছোট্ট পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, ওতেই থাকতেন তখনকার রাজা রানি—রাজকুমার আর রাজকুমারীরা। লোকে বলে, তাঁরা শুতেন হীরার পালঙ্কে, আর খেতেন 'লাল জওয়াহের'। আর, কবরস্থানের পশ্চিম দিকে ঐ যে পির সাহেবের 'দরগা' ওরই 'বর্দোয়ায়' নাকি এমন সোনার শহর পুড়ে ঝাও হয়ে যায়। সেই সঙ্গে রাজার ঘরগুষ্টি সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আজ তাঁর বংশে বাতি দিতে কেউ নেই। পশ্চিমে-হাওয়ায় তাঁদের সেই ছাই-হওয়া দেহ উড়ে উড়ে হয়তো এই গোরস্থানের উপরই এসে পড়েছে। আচ্ছা ভাই, খোদার কি আশ্চর্য মহিমা! রাজা--যার অত ধন, মালমাত্তা, অত প্রতাপ, সেও মরে মাটি হয়! আর যে ভিখারি খেতে না পেয়ে তালপাতার কুঁড়েতে কুঁকড়ে মরে পড়ে থাকে, সেও মরে মাটি হয়। কি সুন্দর জায়গা এ তবে বোন!

তুই ঠিক বলেছিস ভাই সলিমা, কেঁদে কি হবে, আর ভেবেই বা কি হবে! যা হবার নয় তা হবে না, যা পাবার নয় তা পাব না। তবু পোড়া মন তো মানতে চায় না। এই যে একা কবরস্থানে এসে কত রাত্তির ধরে শুধু কেঁদেছি, কিন্তু এত কান্না এত ব্যাকুল আহ্বানেও তো কই তাঁর একটুকু সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি কি এতই ঘুমুচ্ছেন? কি গভীর মহানিদ্রা সে? আমার এত বুকফাটা কান্নার এত আকাশচেরা চিৎকারের এতটুকু কি তাঁর কানে গেল না? সেই কোন মায়াবীর মায়াযষ্টিস্পর্শে মোহনিদ্রায় বিভোর তিনি? আমিও কেন অমনি জড়ের মতো নিঃসাড় নিস্পন্দ হয়ে পড়ি না? আমারও প্রাণে কেন মৃত্যুর ঐ রকম শান্ত-শীতল ছোঁওয়া লাগে না? আমিও কেন দুপুর রাতের গোরস্থানের মতোই নিথর নিঝুম হয়ে পড়ি না? তাহলে তো এ প্রাণপোড়ানো অতীতটা জগদ্দল শিলার মতো এসে বুকটা চেপে ধরে না! সেই সে কোন-ভুলে-যাওয়া দিনের কুলিশ-কঠোর স্মৃতিটা তপ্ত শলাকার মতো এসে এই ক্ষত বক্ষটায় ছ্যাঁকা দেয় না! 'জোবেদ'

করা জানোয়ারের মতো আর কতদিন নিদারুণ জ্বালায় ছটফট করে মরব? কেন মৃত্যুর মাধুরী মায়ের আশিসধারার মতো আমার উপর নেমে আসে না? এ হতভাগিনীকে জ্বালিয়ে কার মঙ্গল সাধন করছেন মঙ্গলময়? তাই ভাবি—আর ভাবি,—কোনো কূলকিনারা পাই না, এর যেন আগাও নেই, গোড়াও নেই। কি ছিল—কি হলো—এ শুধু একটা বিরাট গোলমাল!

সেদিন সকালে ঐ পাশের চারাধানের ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে কাঁচা আম খেতে খেতে একটি রাখাল বালক কোথা হতে শেখা একটা করুণ গান গেয়ে যাচ্ছিল। গানটা আমার মনে নেই, তবে তার ভাবার্থটা এই রকম, 'কত নিশিদিন সকাল সন্ধ্যা গিয়ে মিশল, আবার কত সাগর শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেল, কত নদী পথ ভুলে গেল, আর সে কত গিরিই না গলে গেল, তবু ওগো বাঞ্ছিত, তুমি তো এলে না!' গানটা শুনছিলুম আর ভাবছিলুম, কি করে আমার প্রাণের ব্যাকুল কান্না এমন করে ভাষায় মূর্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল? ওগো, ঠিক এই রকমই যে একটা মস্ত অসীম কাল আমার আঁখির পলকে পলকে যেন কোথা দিয়ে কোথায় চলেছে, আর আমি কাকে পাবার—কি পাবার জন্যে শুধু আকুলি-বিকুলি মিনতি করে ডাকছি, কিন্তু কই তিনি তো এলেন না—এতটুকু সাড়াও দিলেন না। তবে দুপুর রোদ্দুরে ঘুনঘুনে মাছির মুখে ঐ যে খুব মিহি করুণ 'গুন গুন' সুর শুনি এই গোরস্থানে, ওকি তাঁরই কান্না? দিনরাত ধরে সমস্ত গোরস্থান ব্যেপে প্রবল বায়ুর ঐ যে একটানা হু হু শব্দ, ওকি তাঁরই দীর্ঘশ্বাস? রাত্তিরে শিরীষ ফুলের পরাগমাখা ঐ যে ভেসে আসে ভারি গন্ধ, ওকি তাঁরই বর-অঙ্গের সুবাস? গোরস্থানের সমস্ত শিরীষ, শেফালি আর হেনার গাছগুলো ভিজিয়ে, সবুজ দুর্বা আর নীল ভুঁই-কদমের গাছগুলোকে আর্দ্র করে ঐ যে সন্ধে হতে সকাল পর্যন্ত শিশির ক্ষরে, ওকি তাঁরই গলিত বেদনা? বিজুলির চমকে ঐ যে তীব্র আলোকচ্ছটা চোখ ঝলসিয়ে দেয়, ওকি তাঁরই বিচ্ছেদ-উন্মাদ হাসি? সৌদামিনী-স্ফুরণের একটু পরেই ঐ যে মেঘের গম্ভীর গুরু গুরু ডাক শুনতে পাই, ওকি তার পাষাণ বক্ষে স্পন্দন? প্রবল ঝন্‌ঝার মতো এসে সময় সময় ঐ যে দমকা বাতাস আমাকে ঘিরে তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকে, ওকি তাঁরই অশরীরী ব্যাকুল আলিঙ্গন? গোরস্থানের পাশ দিয়ে ঐ যে 'কুনুর' নদী বয়ে যাচ্ছে, আর তার চরের উপর প্রস্ফুটিত শুভ্র কাশফুলের বনে বনে দোল-দোলা দিয়ে ঘন বাতাস শন শন করে ডেকে যাচ্ছে, ওকি তাঁরই কম্পিত কণ্ঠের আহ্বান? আমি কেন ওঁরই মতো অমনি অসীম, অমনি বিরাট ব্যাপ্ত হয়ে ওঁকে পাই না? আমি কেন অমনি সবারই মাঝে থেকে ঐ অ-পাওয়াকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করি না? এ সীমার মাঝে অসীমের সুর বেজে উঠবে সে আর কখন? এখন যেদিন শেষ হয়ে এল, ঐ শোনো নদীপারের বিদায়-গীত শোনা যাচ্ছে খেয়াপারের ক্লান্ত মাঝির মুখে—

'দিবস যদি সাঙ্গ হলো, না যদি গাহে পাখি,
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে,
এবার তবে গভীর করে ফেলোগো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘন তিমির তলে!'

[খ]

এই যে গোরস্থান, যেখানে আমার জীবনসর্বস্ব দেবতা শুয়ে রয়েছেন, শৈশব হ'তে এই জায়গাটাই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় স্থান। ঐ যে অদূরে ছোট ছোট তিনটি কবর দেখতে পাচ্ছ প্রায়ই মাটির সঙ্গে মিশে সমান হয়ে গেছে, আর উপরটা কচি দুর্বা ঘাসে ছেয়ে ফেলেছে, ওগুলি আমার ছোট ভাই-বোনদের কবর! ওরা খুব ছোটতেই মারা গিয়েছিল—আমের কচি বৌল ফাগুনের নিষ্ঠুর করকাস্পর্শে ঝরে পড়েছিল। ওই যে ওদের শিয়রে বকম ফুলের গাছগুলি দেখতে পাচ্ছ, ওগুলি আমিই লাগিয়েছিলুম, আমি তখন খুবই ছোট। এখন আয়তনে রোয়ানো ঝোঁপ আর আলগা লতায় ও জায়গাটা ভরে উঠেছে। আগে ওদের কবরের উপর ওদেরই মতো কোমল আর পবিত্র বকম ও শিরীষ ফুলের হলদে রেণু ঝরে পড়ত সারা বসন্ত আর শরৎকালটা ধরে, আর তার চেয়ে বেশি ঝরে পড়ত ঐ তিনটি ক্ষুদ্র সঙ্গীদের বিচ্ছেদ-ব্যথিত অন্তর-দরিয়া মথিত করে আকুল অশ্রুর পাগল-ঝোরা! বাবা আমার মাকে ধরে ধরে নিদাঘের বিষাদ গভীর সন্ধ্যায় এই সরু পথ বেয়ে নিয়ে যেতেন, আর আমাদের 'টুনু'র, 'তাহেরা'র আর 'আবুলে'র ঘাসে চাপা ছোট কবরগুলি দেখিয়ে বলতেন, 'এইখানে তারা ঘুমিয়ে আছে, তারা আর উঠে আসতে পারে না। অনেক দিন বাদে আমরাও সব এসে ওদেরই পাশে শোবো,—আমাদের অমনি মাটির ঘর তৈরি করে দেবে গাঁয়ের লোকে।' সেই সময় সেই বেদনাপ্লুত বিয়োগ-বিধুর সন্ধ্যায় কি একটা আবছায়া আবেশ করুণ সুরে যে আমার সারা বক্ষ ছেয়ে ফেলত, তা প্রকাশ করতে পারতুম না, তাই বাবার মুখের দিকে চেয়ে কি জানি কেন ডুকরে কেঁদে উঠতুম। বাবা অপ্রতিভ হয়ে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁর স্নিগ্ধ-কোমল স্পর্শে সান্ত্বনা দিতেন। সেই থেকে জায়গাটার উপর আমার এত মায়া জন্মে গেছিল যে, আমি রোজ মাকে লুকিয়ে এখানে পালিয়ে এসে আমার ভাই-বোনদের ঐ ছোট্ট তিনটি কবরের দিকে ব্যাকুল বেদনায় চেয়ে থাকতুম!—আচ্ছা ভাই, রক্তের টান কি এত বেশি? যেখানে আমার কচি ভাই-বোনগুলির ফুলের দেহ মাটির সঙ্গে মিশে মাটি হয়ে গেছে, সেই ভীষণ করুণ জায়গাটি দেখবার জন্যেও প্রাণে এমন ব্যাকুল আগ্রহ উপস্থিত হতো কেন? শুনেছি যে-জায়গাটার মাটি নিয়ে খোদা আমাদের 'পয়দা' করেন, নাকি ঠিক সেই জায়গাতেই আমাদের কবর হয়, আর তাই আমরা স্বতই কেমন একটা নিবিড় টান অন্তরের অন্তরে অনুভব করি। এখন 'তাহেরা'র কবরটি যেমন ধসে পড়েছে আর ওর মধ্যে একটি ধলা হাড় দেখা যাচ্ছে, হয়তো সে কত বছর বাদে আমারও কবর এরকম ধসে যাবে আর আমার বিশ্রী হাড়গুলো উলঙ্গ মূর্তিতে প্রকট হয়ে লোকের ভয়োৎপাদন করবে!—হায় রে মানুষের পরিণতি, তবু মানুষ এত অহঙ্কার করে কেন আমি তাই ভাবি—আর ভাবি। আবার দু-এক সময় মনে হয়, সুন্দর পৃথিবীটা ছেড়ে সে কোন অজানা দেশে চলে যেতে হবে। মনে হলে জানটা যেন গুরুবেদনায় টনটন করে ওঠে, পৃথিবীর প্রতি একি অন্ধ মূঢ় নাড়ির টান আমাদের? তারপর বাবাও 'আবুলে'র পাশে গিয়ে শয়ন করলেন, বড় ঝোপের পাশের ঐ বড় কবরটা বাবার। বাবা

মরে যাবার পর আমি আরো বেশি করে কবরস্থানে যেতুম, স্তব্ধ হয়ে বসে রইতুম আমার হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের মৌন সাদরের ভাষা শুনব বলে ; একটা নিবিড় বেদনায় চোখের পাতা ভরে উঠত।

এই সব বেদনা, অপমান, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মা আমার দিন দিন রুগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। উপর্যুপরি এত আঘাত তিনি আর সইতে পারছিলেন না। ক্রমে তাঁকে ভীষণ যক্ষ্মারোগে ধরল। আমি বুঝলুম আমার কপাল পুড়েছে, মাও আমায় ছেড়ে চলেছেন, তাঁর ডাক পড়েছে। আমি আমার ভবিষ্যতের দিকে তাকাতেও সাহস করলুম না,—উঃ সে কি সূচিভেদ্য অন্ধকার !

এমন সময় একদিন সন্ধ্যায় সই-মা আমাদের ঘরে এসে মার শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে নিয়ে বললেন, 'সই, আমার ছেলে গরমের ছুটিতে বাড়ি এসেছে। সে তোদের দোওয়াতে এবার খুব সম্মানের সঙ্গে বি.এ. পাশ করেছে। এবার ছেলের বিয়েটা দিয়ে বৌটিকে সংসার বুঝিয়ে দিয়ে সংসার হতে সরে পড়ি। আর তা ছাড়া একা ঘর, বৌ নেই, বেটি নেই, দিন রাত ঘরটা যেন পোড়াবাড়ির মতো খাঁ খাঁ করছে। খোদা তো দেননি আমায় যে, দুদিন জামাই-বেটি নিয়ে সাধ-আহ্লাদ করব। ছেলে এতদিন জেদ ধরেছিল বি.এ. পাশ করে বিয়ে। তা খোদা তার ইচ্ছা পূর্ণ করে দিয়েছেন। এতদিন আমার ছেলে বে' করলে দু-একটি খোকা খুকি হতো না কি তার ঘরে। আর আমারও ঘরটা তাহলে অনেক মানাতো, তা যখনকার তখন না হলে তোর আমার কথায় তো কিছু হয় না। আমার হাতের কাছে লক্ষ্মী শান্ত মা আমার—হীরের টুকরো বৌ থাকতে আবার কোন গরিবের বেটিকে আনতে যাব ঘরে,' বলেই আমার মাথাটা সস্নেহে তাঁর বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। মা আর আমি বোকার মতো শুধু অবাক বিস্ময়ে সইমার দিকে চেয়েছিলুম, একি পাগলের মতো তিনি বলে যাচ্ছিলেন। মার দুর্বল বক্ষ স্পন্দিত করে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল। সইমা মায়ের বুকে খানিকটা মালিশ নিয়ে মালিশ করে দিতে দিতে তেমনি সহজভাবে বলে যেতে লাগলেন, 'আমার ছেলের উপর বরাবরই বিশ্বাস আছে, সে কখনো যে আমার একটি কথা অমান্য করেনি। যেমন বললুম, ওরে আজিজ, তোর সইমা যে তোর শাশুড়ি হবে রে, 'বেগম'কে আমার বৌ করে ঘরে আনতে চাই, তোর বৌ পছন্দ হবে তো আবার ! আজকাল তো বাবা তোরা মা বাপের পছন্দে বে' করিস না কি না, তাই !'—আমাকে আর বেশি বলতে হলো না, সে খুব খুশি হয়েই বললে, 'বেশ তো মা-জান, তোমার কথার তো আর কখনো অবাধ্য হইনি, আর তুমি যে আমায় কোনো জমিদার বাড়িতে বে না দিয়ে একটি অনাথা গরিবের মেয়েকে উদ্ধার করতে যাচ্ছ, এতে আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে, দুনিয়ার লোককে জড়ো করে দেখাই আমার মায়ের মতো উঁচু মন আর কার আছে !' আজিজ আমার জনম-পাগলা মা-নেওটা ছেলে কি না, আর সে যে আবদার ধরেছে যখন, তখনই তাই পূর্ণ করেছি কিনা, তাই ওর চোখে আমার মতো মা নাকি আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পাওয়া যায় না ! সে যাক এখন বোন, আমি আজই বেগমকে দোওয়া করে যাব, কেননা হায়াত মউত জানি না, কখন কি

হয় বলা তো যায় না—তোর আবার এই রকম খাটে মাদুরে অবস্থা। আমি মনে করছি এই মাসের মধ্যেই ব্যাটার বৌকে বরণ করে ঘরে তুলি, শুভকাজে বিলম্ব করা ভালো নয়, আর তাতে গ্রামের অনেকে অনর্থক কতকগুলো বাধা বিপত্তি করবে, সই! মা বেগম আমার শূন্যপুরী পূর্ণ করুক যেয়ে।' সই-মা আর কি বলেছিলেন ঠিক মনে নাই, কেননা আমার মাথা তখন বন বন করে ঘুরছিল, মস্তিষ্কের ভিতর কি একটা তীব্র উত্তেজনা ঘুরপাক খাচ্ছিল,—একটা হঠাৎ পাওয়া নিবিড়-বেদনাময় আনন্দের আঘাতে কে যেন আমার সমস্ত শরীর নিশা করে দিচ্ছিল।

[গ]

খুব ধুমধামে আমাদের বে' হয়ে গেল। ধুমধাম মানে 'আতস-বাজি', 'বাজনা', 'বাইনাচ', 'থিয়েটার' প্রভৃতি যে-সকল অসাধু কলুষ আনন্দের কথা বোঝো তোমরা, তার কিছুই হয়নি। আর যদি ধুমধাম মানে নির্দোষ পবিত্র আনন্দের বিনিময় বোঝায়, তাহলে তার কোথাও এতটুকু ত্রুটি ছিল না। গ্রামের সমস্ত গরিব দুঃখীকে সাতদিন ধরে সুন্দররূপে ভালো ভালো খাবার খাওয়ানো হয়েছিল? অনেকের পুরানো ঘর নূতন করে দেওয়া হয়েছিল। যাদের হালের গরু না থাকায় সমস্ত জমিজমা পতিত হয়েছিল, তাদিগকে গরু কিনে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামের তাঁতি দু ঘরকে দুটি তাঁতের কল কিনে দিয়ে তাগিদকে গরু কিনে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামের তাঁতি দুঘরকে দুটি তাঁতের কল কিনে দিয়ে তাদিগকে দেশি কাপড় বোনায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। কলকাতার এতিমখানায় পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। সে-সব আরও কত জায়গায় কত টাকা দিয়েছিলেন যে মা, তা আমার এখন সব মনে নেই!

সই-মা আমায় বধূ করে যত খুশি হয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখিত হয়েছিল গ্রামের লোকেরা, আর ওঁর আত্মীয় কুটুম্বেরা। ওঁদের অনেক আত্মীয় ছোট ঘরে বে' দেওয়ার জন্যে বে'র নিমন্ত্রণে একেবারেই আসেনি। এমনকি এই নিয়ে অনেকের সঙ্গে চিরদিনের জন্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিল। অনেক হিতৈষী মিত্রও শত্রু হয়ে দাঁড়াল। তবে পয়সার খাতির সব জায়গাতেই, তাই অনেক চতুর মাতব্বর লোক এঁদের সঙ্গে মৌখিক সদ্ভাব রেখে ভিতরে ভিতরে অনিষ্ট করতে লাগল। সমাজে পতিত না হলেও বিশেষ কাজ বনাম স্বার্থ ছাড়া আর কেউ এ-বাড়ি আসত না। কিন্তু যে সব সহায়হীন গরিব বেচারারা জন্মাবধি এ বাড়ির সাহায্যে প্রতিপালিত হয়ে এসেছে, তারা সমাজের এ চোখ রাঙানি দেখে শুধু উপরে উপরে ভয় করে চলত। তারা জানত, সমাজ শুধু চোখ রাঙাতেই জানে। যে যত দুর্বল তার তত জোরে টুঁটি চেপে ধরতেই সমাজ ওস্তাদ। যেখানে উল্টো সমাজকেই চোখ রাঙিয়ে চলবার মতো শক্তিসামর্থ্যওয়ালা লোক বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে সমাজ নিতান্ত শান্তশিষ্টের মতোই তার সকল অনাচার আবদার বলে সয়ে নিয়ে থাকে। তাই উনি আর ওঁর মা বললেন, 'আমাদের

সমাজই নাই তো সমাজচ্যুত করবে কে?'—সমাজ তবুও সুবোধ শিশুর মতো কোনো সাড়াই দিলে না, কিন্তু ওঁদের বাড়িতে যেসব গরিব বেচারারা আসত তাদিগকে খুব কড়াভাবেই শাসন করা হলো, যেন কেউ ওঁদের বাড়ির ছায়াও না মাড়ায়।

লোকের এরূপ ব্যবহারে আদৌ দুঃখিত না হয়ে ওঁরা বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাছাড়া গ্রামের দরিদ্রের সেই আনন্দোদ্ভাসিত মুখে, অশ্রু ছলছল চোখে যে একটা মধুর স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠেছিল, তারই জ্যোতি ওদের হৃদয় আলোয় আলোময় করে দিয়েছিল; উল্টো দিকে পরশ্রীকাতর লোকদের চোখ মুখ ভয়ানকভাবে ঝলসে দিয়েছিল!

ওঃ, সে কি অমানুষিক শক্তি ছেয়ে ফেলেছিল মায়ের ঐ ঝাঁঝরা বুক আমার বিদায়ের দিনে! মায়ের আনন্দের আকুল ধারা যেন কোথাও ধরছিল না সেদিন! হাজার কাজের ভিতর হাসির মাঝে অকারণে অশ্রু উথলে পড়ছিল তাঁর।

আমার জীবন কিন্তু সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেইদিন—যেদিন বুঝলুম আমার হৃদয়-দেবতাও তাঁর মাতৃদত্ত আশীর্বাদ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছেন, আমার প্রাণের গোপন পূজা আরাধ্য দেবতার পায়ে বৃথা নিবেদিত হয় নাই!

আমার শুধু ইচ্ছা হতো আমি তাঁর পায়ে মাথা কুটি আর বলি, 'ওগো স্বামিন! ওগো দেবতা! এত আনন্দ দিয়ো না এ ক্ষুধিতাকে, প্রেমের এত আকাশ-ভাঙা ঘন বৃষ্টি ঢেলে দিও না এ চিরমরুময় হৃদয়ে,—সকল মন দেহ প্রাণ ছেয়ে ফেলো না তোমার ও ব্যাকুল ভালবাসার ব্যগ্র নিবিড় আলিঙ্গনে! আমার ছোট্ট বুক যে এত আনন্দ, এত ভালবাসা সইতে পারবে না!—কিন্তু হায়, তাঁর ও ভুজবন্ধনে ধরা দিয়ে আমার আর কিছুই থাকত না, আমি আমার বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ ভুলে যেতুম! এ যেন স্বপ্নে পরিস্থানে গিয়ে প্রিয়তমের অধীর বক্ষে মাথা রেখে সুপ্ত বধির হয়ে যাওয়া, প্রাণের সকল স্পন্দন, দেহের সমস্ত রুধির অবাক স্তব্ধ হয়ে থেমে যাওয়া,—শুধু তুমি আর আমি—অনুভব করা, সে-কোন অসীম সিন্ধুতে বিন্দুর মতো মিশে যাওয়া!

তাঁর ঐ বিশ্বগ্রাসী ভালবাসা যখন চোখের কালোয় জ্যোতির মতো হয়ে ফুটে উঠত, তখন শুধু ভাবতুম প্রেমে মানুষ কত উচ্চ হতে পারে! এর এতটুকু ছোঁয়ায় সে কি কোমলতার স্নিগ্ধ পূত সুরধুনী বয়ে যায় সারা বিশ্বের অন্তরের অন্তর দিয়ে। দেবতা বলে কি কোনো কথা আছে? কখখনো না। মানুষই যখন এই রকম উচ্চ হতে পারে, অতল ভালবাসায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তলিয়ে দিতে পারে, নিজের অস্তিত্ব বলে কোনো কিছু একটা মনে থাকে না—সে দেখে, সব সুন্দর আর আনন্দ, তখনই মানুষ দেবতা হয়! দেবতা বলে কোনো আলাদা জীব নাই।

* * *

যাক ও-সব কথা এখন—কি বলছিলুম?—হাঁ, আমার বিয়ের মতো এত বড় একটা অস্বাভাবিক কাণ্ডে গ্রামময় মহা হুলুস্থূল পড়ে গেল। বংশে নিকৃষ্ট, সহায়সম্বলহীন

আমাদের ঘরে সৈয়দ-বংশের বি.এ. পাশ করা সোনার চাঁদ ছেলের বিয়ে হওয়া ঠিক যেন রূপকথার ঘুঁটে-কুড়োনির বেটির সাথে বাদশাজাদার বিয়ের মতোই ভয়ানক আশ্চর্য ঠেকছিল সকলের চোখে! গ্রামের মেয়েরা তো অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়েছিল, 'বাপরে বাপ, মেয়েটার কি পাঁচপুয়া কপাল!' তারা এও বলতে কসুর করেনি যে, আমি আবাগি নাকি রূপের ফাঁদ পেতে অমন নিষ্কলঙ্ক চাঁদকে বেমালুম কয়েদ করে ফেলেছিলুম? এও বলেও যখন তারা একটুও ক্লান্ত হলো না, তখন সবাই একবাক্যে বলে বেড়াতে লাগল যে, বুনিয়াদি খান্দানে এমন একটা খটকা, এও কি কখনো সয়? এত বাড়াবাড়ি সইবে না, সইবে না। কখন আমাদের কপাল পুড়ে আর তাদের দশজনের ঐ মহাবাক্যটা দৈব-বাণীর মতো ফলে যায়, তাই আলোচনা করে করে তাদের আর পেটের ভাত হজম হতো না। আমার কিন্তু তখন কিছুই শুনবার আগ্রহ ছিল না—যে-দেবতা এমন করে তাঁর পরশমণির স্পর্শে আমার সকল ভুবন এমন সোনা করে দিয়েছিলেন, যাঁর মাঝে আমার সকল সত্তা, সব আকাঙ্ক্ষা চাওয়া-পাওয়া একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল, আমি সব ভুলে গিয়ে শুধু সেই দেবতাকেই নিত্য নূতন করে দেখছিলুম। তখন যে আমার ভাববার আর বলবার কিছুই ছিল না। তখন যে 'সব পেয়েছি'র আসরে আনন্দময় হয়ে যাবার মাহেন্দ্রক্ষণ! কিন্তু হায়, কালের অত্যাচারে সে মাহেন্দ্রক্ষণ আসবার আগেই এই সুন্দর বিশ্বের সে কি শক্ত দিকটা চোখে পড়ে গেল। প্রাণে বিরাট শান্তি নেমে আসবার আগেই সে কি গোলমাল হয়ে গেল সব। আগে হতেই আমার প্রাণের নিভৃততম দেশে সে কি এক আশঙ্কা যেন শিঁউরে শিউরে উঠত! মনে হতো যেন এত সুখের পিছনে সে কি বজ্র ওৎ পেতে রয়েছে। কখন আমার এ আকাশ-কুসুম ভেঙে যাবে!—মনে হতো এ ক্ষণিকের পাওয়া যেন একটি রজনীর স্বপ্নে পাওয়া ছোট্ট এক টুকরা আনন্দ, স্বপ্ন ভেঙে গেলেই তেমনি ঘুটঘুটে অন্ধকার!

মা আমায় সম্প্রদান করেই আবার শয্যা আশ্রয় করেছিলেন, তাঁর যে তখন আর চাইবার বা করবার কিছুই ছিল না, তখন যে মা মুক্ত! তাই তিনিও আমায় সইমার হাতে দিয়ে যে দেশের কেউ খবর দিতে পারে না সেই কোন অজানার দেশে চলে গেলেন। বোধ হয় সেখানে আমার বাবা খোকাখুকিদের নিয়ে অশ্রুসজল নয়নে পথের দিকে চেয়েছিলেন। যাবার সময় সে কি তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল মার পাণ্ডুর ওষ্ঠপুটে! আমি যখন মার বুকে আছাড় খেয়ে কেঁদে উঠলুম, 'মা গো যেয়ো না—আমার যে আর দুনিয়ায় কেউ নেই মা, তখন মা আমার মুখে হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'বলিসনে বলিসনে রে অমন কথা বেগম, তোর অভাব কিসের? এমন মায়ের চেয়েও স্নেহময়ী শাশুড়ি, দেবতার চেয়েও উচ্চ স্বামী, এত পেয়েও রাক্ষুসী বলছিস কিছু নেই তোর? ছি মা, বলিসনে অমন অপয়া কথা!

মাকে বাবার পাশেই গোর দেওয়া হলো। আজ তাহেরার আর আবুলের কবর যেমন ধুলার সঙ্গে মিশে গিয়েছে, দুদিন বাদে মারও কবর অমনি সমান হয়ে মিশে যাবে, কিন্তু আমার বুকে পুঞ্জীভূত বেদনার এই যে একটা শক্ত গেরো বেঁধে গেল, সে কি মিশাবে কখনো?

এরপর হতে এই সব উপর্যুপরি শোকের আঘাতে আমায় মারাত্মক মূর্ছারোগে ধরলে! প্রায়ই আমি অচেতন হয়ে পড়তুম, আর যখনই চেতন হতো তখনি দেখতুম আমার ধূলিধূসরিত শির রয়েছে তাঁর—আমার স্বামীর ঘনস্পন্দিত বিশাল বক্ষে,—তাঁর সব-ভুলানো ব্যাকুল বাহু-বন্ধনের মাঝে। ওঃ, সে কি ভীত করুণাঘন দৃষ্টি তাঁর চোখে ফুটে উঠত! সহানুভূতির সে কি কোমল স্নিগ্ধছায়া ছেয়ে ফেলত তাঁর স্বভাব-সুন্দর মুখখানি!—আমার তখন মনে হতো এর চেয়ে মেয়েদের কি আর সুখ থাকতে পারে? এর চেয়ে আকাঙ্ক্ষিত ঈপ্সিত কি সে অপার্থিব জিনিস চাইতে পারে আমাদের মন্দভাগিনী স্ত্রীজাতিরা? হায়, সে সময়ে স্বামীর কোলে অমনি করে মাথা রেখে কেন আমার শেষ নিশ্বাসটুকু বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়নি?

[ঘ]

এখন বলছি বোন তোকে আমার কাহিনীটা, এও যে একটা 'কেসসা'। কে আমার এ কথা বিশ্বাস করবে আর কেই বা শুনবে? তার উপর নাকি আমার মগজ বিগড়ে গিয়েছে, আর তাই মাঝে মাঝে আমি খুব শক্ত 'বক্তিমা ঝেড়ে আমার বিদ্যা জাহির করি। আমার এই বকরবকর করাটা কেউ পছন্দ করে না, তাই একটু শুনেই বিরক্ত হয়ে চলে যায়। আচ্ছা বোন বল তো মেয়েমানুষে আবার কবে কথা গুছিয়ে বলতে পেরেছে, আর খুব বেশি বলাই মেয়েদের স্বভাব কি না! আমি কম কথায় কি করে আমার সকল কথা জানাব? তাই হয়তো বলবি, কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়েছে তোর কথা বলবার জন্যে? তাও বটে, তবে পেটের কথা, বুকের ব্যথা লোককে না জানালেও যে জানটা কেমন শুধু আনচান করে, বুকটা ভারি হয়ে ওঠে, এও তো একটা মস্ত জইর 'গজব'।

*   *   *

সইমা এত বড় রাশভারি লোক ছিলেন যে সবাই তাঁকে ভয় করে চলত। তিনিই ছিলেন ঘরের মালিক। কেউ তার কথার 'টুঁটি করতে পারত না। তাই এত বড় একটা অঘটন,—আমার মতো পাতাকুড়ুনির বেটিকে রাজবধূ করা সত্ত্বেও মুখ ফুটে কেউ আর কিছু বলতে পারল না তেমন। মেয়েরা প্রকারান্তরে আমার নিচু ঘরের কথা জানতে এলে তিনি জোর গলায় বলতেন, 'জাত নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আর জাত লোকের গায়ে লেখা থাকে? যার চালচলন শরিফের মতো সেই তো আশরাফ। খোদা কিয়ামতের দিনে কখখনো এমন বলবেন না যে, তুমি সৈয়দ সাহেব, তোমার সব 'সওয়াব' (পুণ্য) বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে, কাজেই তোমার কপালে তো জাহান্নাম ধরাবাঁধা! আমি চাই শুধু গুণ, তা সে যে জাতই হোক না কেন। দেখুক তো এসে আমার বৌকে—ঘর আলো করা রূপ, আশরাফের চেয়েও আদব তমিজ, লেখাপড়া জানা, কাজকর্মে পাকা এমন লক্ষ্মী বৌ আর কার আছে! আর কি জন্যেই বা বড় ঘরের বেটিকে ঘরে আনব, সে যত না আনবে রূপ-গুণ,

তার চেয়ে বেশি আনবে বাপমায়ের গরব আর অশান্তি ! আমার এই সোনার চাঁদ ছেলে বেঁচে থাক, ওর ঘরে ছেলেপিলে দেখি, তাহলেই আমি হাসতে হাসতে মরব।' মায়ের সেই স্নেহভেজা কথায় যে কতই আনন্দে বুক ভরে উঠত ! আমার চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ত। কৃতজ্ঞতা আর ভক্তির ভাষা বুঝি মর্মের অশ্রু !

স্বামীর সত্যিকারের ভালবাসা আর সইমার মেয়ের চেয়েও নিবিড় স্নেহ আমার তো আর কিছুই অপূর্ণ রাখেনি। দুনিয়ায় যখন যা দেখতুম তাই সব যেন সুন্দর হয়ে ফুটে উঠত। কই, ওর আগে তো এই মাটির দুনিয়াকে এত সুন্দর করে দেখিনি। ভালবাসার অঞ্জন কি মহিমা জানে, যাতে সব অসুন্দর অত সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে !

এত সুখ, তবুও পোড়া মন কেন আপনাআপনিই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত। পাড়া-পড়শি লোকের ঐ একটা কথাই যেন শাখচিল্লির মতো কানের কাছে এসে বাজত, সইবে না, সবইবে না ! 'চোরের মন বোঁচকার দিকে, তাই আমার মত হতভাগীর মনে যে শুধুই অমঙ্গলের বাঁশি বাজবে, তাতে আর আশ্চর্য কি !—ঐ অত গভীর ভালবাসার আঘাতই যে আমাকে বিব্রত করে তুলেছিল ! মধু খুবই মিষ্টি, কিন্তু বেশি খাওয়ালেই গা জ্বালা করে। তাই আমার মনে হতো ওঁদের পায়ে মাথা কুটে বলি, 'ওগো দেবতা, ওগো স্বর্গের দেবী, তোমরা এত স্নেহ এত ভালবাসা দিয়ে ছেয়ে ফেলো না আমায়, আমি যে আর সইতে পারছি না ! স্নেহের ঘায়ে যে আমার হৃদয় ভেঙে পড়ল ! একটু ঘৃণা করো, খারাপ বলো, আমায় খুব ব্যথা দাও, তা নইলে আমার বক্ষ নুয়ে যাবে যে !' আর অমনি আবার সেই ভীষণ মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠত 'সইবে না'।

এমনি করে, দেখতে দেখতে দুটো বছর কোথায় দিয়ে যে কোথায় চলে গেল, তা জানতে পারলুম না। এমন সময় ঐ যে প্রথমে বলেছিলুম, কলেরা আর বসন্ত জোট করে রাক্ষসের মতো হাঁ করে আমাদের গ্রামটা গ্রাস করে ফেললে। ওদের উদর যেন আর কিছুতেই পুরতে চায় না। সে কি ভীষণ বুভুক্ষা নিয়ে এসেছিল তারা ! সমস্ত গ্রামটা যেন গোরস্থানেরই মতো খাঁ খাঁ করতে লাগল। গ্রামের সকলে যে যেদিক পারলে মৃত্যুকে এড়িয়ে ছুটল। ভেড়ার দলে যখন নেকড়ে বাঘ প্রবেশ করে তখন সমস্ত ভেড়া একসঙ্গে জুটে চারিদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে চক্ষু বুঁজে মাথা গুঁজে থাকে, মনে করে তাদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু মানুষ যারা, তারা তো আর মানুষকে এমন অবস্থায় ফেলে যেতে পারে না। তাঁদের একই রক্ত-মাংসের শরীর, তবে ভিতরে কোন কিছু একটা বোধ হয় বড় জিনিস থাকবে। সবারই সঙ্গে সমান দুঃখে দুঃখী, সবারই দুঃখ-ক্লেশের ভাগ নিজের ঘাড়ে খুব বেশি করে চাপানোতেই ওদের আনন্দ। ঐ বুঝি তাঁদের মুক্তি।

যখন সবাই চলে গেল গ্রাম ছেড়ে, তখন গেলুম না কেবল আমরা ; উনি বললেন, 'মৃত্যু নাই, এরূপ দেশ কোথা যে গিয়ে লুকুব ?' সবাই যখন মহামারির ভয়ে রাস্তায় চলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলে তখন কোমর বেঁধে উনি পথে বেরিয়ে পড়লেন, 'এই তো আমার কাজ আমায় ডাক দিয়েছে।' সে কি হাসি মুখে আর্তের সেবার ভার নিলেন তিনি। তখন তিনি এম. এ. পাশ করে আইন পড়ছিলেন। কলকাতায় খুব গরম পড়াতে দেশে এসেছিলেন। কি গরীয়সী শক্তির শ্রী ফুটে উঠেছিল তাঁর প্রতিভা-উজ্জ্বল মুখে সেদিন।

আবার সেই বাণী, 'সইবে না, সইবে না।'

দিন নেই, রাত নেই, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, আর্তের চেয়ে অধীর হয়ে তিনি ছুটে বেড়াতে লাগলেন কলেরা আর বসন্ত রোগী নিয়ে। আমি পায়ে ধরে বললুম, 'ওগো দেবতা! থামো থামো, তুমি অনেকের হতে পারো, কিন্তু আমার যে আর কেউ নেই। ওগো আমার অবলম্বন, থামো থামো।' হায়, যাঁকে চলায় পেয়েছে তাঁকে আর থামায় কে? বিশ্বের কল্যাণের জন্য ছুটছিল তাঁর প্রাণ। তাঁর সে দুনিয়াভরা বিছানো প্রাণে আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণের কান্নার স্পন্দন ধ্বনিত হতো কি? যদিও হতো তবে সে শুধু ছুঁয়ে যেত, নুয়ে যেত না।

যে অমঙ্গলের একটু আভাস আমার অন্তরের নিভৃততম কোণে লুকিয়ে থেকে আমার সারা বক্ষ শঙ্কাকুল করে তুলেছিল, সেই ছোট্ট ছায়া যেন সেদিন কায়া হয়ে আমার চোখের সামনে বিকট মূর্তিতে এসে দাঁড়াল। সে কি বিশ্রী চেহারা তার!

মা কখনো ওঁর কাজে বাধা দেননি। শুধু একদিন সাঁঝের নামাজ শেষে অশ্রু-ছলছল চোখে তাঁর শ্রেষ্ঠধন একমাত্র পুত্রকে খোদার রাহায় উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন। ওঃ, ত্যাগের মহিমায়, বিজয়ের ভাস্বর-জ্যোতিতে কি আলোময় হয়ে উঠেছিল তাঁর সেই অশ্রুস্নাত মুখ সেদিন! মনে হলো যেন শত ধারায় খোদার আশিস অযুত পাগলাঝোরার বেগে মায়ের শিরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমারও বক্ষ একটা মূঢ় বেদনা-মাখা গৌরবে যেন উথলে পড়ছিল।

এই রকম লোককেই দেবতা বলে,—না?

[৬]

সেদিন সকাল হতেই আমার ডান চোখটা নাচতে লাগল, বাড়ির পিছনে অশ্বত্থ গাছটায় একটা প্যাঁচা দিন দুপুরেই তিন তিন বার ডেকে উঠল, মাথার উপর একটা কালো টিকটিকি অনবরত টিক টিক করে আমার মনটাকে আরো অস্থির চঞ্চল করে তুলছিল। আমার অদৃষ্টের সঙ্গে ওদের কি সংযোগ ছিল?

উনি সেই যে ভোরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন একটা লাশ কাঁধে করে নিয়ে, সারাদিন আর ফেরেননি। আমি কেবল ঘর আর বার করেছিলুম।

বিকালবেলায় খুব ঘনঘটা করে মেঘ এল, সঙ্গে সঙ্গে তুমুল ঝড় আর বৃষ্টি সে যেন মস্ত দুটো শক্তির দ্বন্দ্বযুদ্ধ! ওঃ এত জল আর পাথরও ছিল সেদিনকার মেঘে! সামনে বিশ হাত দূরে বজ্র পড়ার মতো কি একটা মস্ত কঠোর আওয়াজ শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল, আমি অচেতন হয়ে পড়ে গেলুম।

* * *

যখন চেতন হলো, তখন বাড়িময় একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে হাহাকার, আর জল পড়ার শব্দ ঝম ঝম। একটা মস্ত বড় বজ্র ঠিক আমার কপাল লক্ষ্য করে ছুটে আসছে!

আমার স্বামীদেবতা তখন বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন, আর মা পাষাণ-প্রতিমার মতো তাঁর দিকে শুধু চেয়ে রয়েছেন। চোখে এক ফোঁটা অশ্রু জমাট বেঁধে গেছে। দৃষ্টিতে কি এক যেন অতীন্দ্রিয় ঔজ্জ্বল্য। সে কি বিরাট নির্ভয়তা।

শুনলুম সেদিন আমাদের পাশের গাঁয়ের দশ বারো জন কলেরা রোগীকে গোর দিয়ে কয়েক জনকে ঔষধ পথ্য দিয়ে উনি বাড়ি ফিরছিলেন। পথে তাঁকে ঐ রোগে আক্রমণ করলে। একটা পুরানো বটগাছের তলায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, একটু আগে উঠিয়ে আনা হয়েছে।—আবার বৃষ্টি এল, সমস্ত আকাশ ভেঙে ঝম ঝম ঝম ! ...

তাঁকে ধরে রাখবার ক্ষমতা আর কারুর ছিল না—তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছিল, আর থাকবেন কেন ? তিনি চলে গেলেন ! যার যতটা ইচ্ছে গেল, কাঁদলে। আমাদের ঘরের আঙিনার নিমগাছটার পাতা ঝরে পড়ল, ঝর ঝর ঝর ! গোয়ালের গরু দড়ি ছিঁড়ে গোঙাতে গোঙাতে ছুটল। দ্বারে কাকাতুয়াটি শুধু একবার একটা বিকট চিৎকার করে অসাড় হয়ে নিচের দিকে মুখ করে ঝুলে পড়ল। চারিদিকে মুমূর্ষুর তীক্ষ্ণ একটা আহা আহা শব্দ রহিয়ে রহিয়ে উঠতে লাগল। সব ব্যেপে উঠতে লাগল শুধু একটা বীভৎস কান্নার রব ! কান্নায় যেন সারা বিশ্বের বত্রিশ নাড়ি পাক দিয়ে অশ্রু ঝরছিল, ঝম ঝম ঝম।

শুধু তেমনি অচল অটল হয়ে একটা বিরাট পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়েছিলেন মা !'

শুধু তাঁর শেষ সময় বলেছিলেন, 'বাপ রে, আমাকে তো কাঁদতে নেই, তুই তো আর আমার নস, তোকে খোদার কাছে কোরবানি দিয়েছি ! খোদার নামে উৎসর্গীকৃত জিনিসে তো আমার অধিকার নেই !—তবে চল বাপ, তুই তো আমায় ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারিসনে, আমিও তোকে কখনো চোখের আড়াল করিনি। তোর কাজ ফুরিয়েছে, আমারও কাজ ফুরাল আজ।'

কতকগুলো লোকের মগজ নাকি এমনি খারাপ হয়ে যায় যে, তারা এক একটা ছোট্ট মুহূর্তকেই একটা অখণ্ড কাল বলে ভাবে। তবে কি আমারও মাথা সেই রকম খারাপ হয়ে গেছে, তা না হলে আমার বোধ হচ্ছে কেন যে, এসব ঘটনা যেন বাবা-আদমের কালে ঘটে গেছে, আর আমি এমনি করে গোরস্থানে বসেই আছি। তুই কিন্তু বলছিস, এই সে দিন তাঁরা মারা গেছেন। তবে তো আমি সত্যিই পাগল হয়ে গেছি !

কি বলছিস, এ গোরস্থানে এলুম কেন ?—আহা, কথার ছিরি দেখ ! এই গোরস্থানে যেখানে সব সত্যিকার মানুষ শুয়ে রয়েছেন, সেখানে না এসে, যাব কি তবে বন-জঙ্গলে যেখানে এক রকম জন্তু আছে, যাদের শুধু মানুষের মতো হাত পা আর অন্তরটা শয়তানের চেয়েও কুৎসিত কালো ?—আমার বেশ মনে পড়ে, যখন তাঁর লাশ কাঁধে করে বাইরে আনা হলো, তখন ওদের কে একজন আত্মীয় আমার চুল ধরে বললে 'যা শয়তানি, বেরো ঘর থেকে এখনি ! তখনি বলেছিলুম, বুনিয়াদি খানদানের উপর নাক চড়ানো, এ সইবে কেন ? তোকে ঘরে এনে শেষে বংশে বাতি দিতে পর্যন্ত রইল না কেউ ; বেরো রাক্ষুসী, আর গাঁয়ের লোকের সামনে মুখ দেখাস না ! আর ইচ্ছা হয় চল, তোর আর একটা নেকা দিয়ে দি !'—অত মার গাল কিছুই বাজে নাই আমার প্রাণে, যত

বেজেছিল ঐ একটা নেকার কথায়। ঐ বিশ্রী কথাটা একটা মস্ত আঘাতের মতো বেজেছিল আমার চূর্ণ বক্ষে।—ওগো নেকা কি? সে কি দুবার অন্যের গলায় মালা দেওয়া? শাস্ত্রে নেকার কথা আছে, সে কাদের জন্যে? আচ্ছা ভাই, যারা বাধ্য হয়ে অন্নবস্ত্রাভাবে বা আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে ওরকম করে ভালবাসার অপমান করে, তাদের কি হৃদয় বলে কোন একটা জিনিস নাই? তা হলেও তাদিগকে ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু যারা শুধু কামনার বশবর্তী হয়ে পবিত্রতাকে, নারীত্বকে ওরকম মাড়িয়ে চলে যায়, তাদের কোথাও ক্ষমা নাই। ভালবাসা—স্বর্গের এমন পবিত্র ফুলকে কামনার শ্বাসে যে কলঙ্কিত করে, তাঁর উপযুক্ত বোধ হয় এখনো কোন নরকের সৃষ্টি হয় নাই।

মৌলবী সাহেবরা হয়তো খুব চটে আমার 'জানাজা'র নামাজই পড়বেন না, কিন্তু মানুষ আর মৌলবিতে অনেক তফাৎ—শাস্ত্র আর হৃদয়, অনেকটা তফাৎ।

[চ]

যেখানে শুধু এই রকম অবমাননা, সেখান থেকে সরে এসে এই মরার দেশে থাকাই ভাল।

* * *

ওকি, তুমি এমন করে আঁতকে উঠলে কেন? আমি মূর্ছা গেছলুম বলে?—কি বলছ আমি বিষ খেয়েছি?—তাহলে তুমিও পাগল হয়েছে! আমার চেহারা এমন নীল হয়ে গেছে দেখে তুমি হয়তো মনে করেছ, আমি বিষ খেয়েছি। না গো না, আমি পাগল হই আর যা-ই হই ও-রকম দুর্বলতা আমার মধ্যে নেই। কেরাসিনে পোড়া, জলে ডোবা, গলায় দড়ি দেওয়া, বিষ খাওয়া মেয়েদের জাতটার যেন রোগের মধ্যে দাঁড়িয়েছে! আমার কপাল পুড়লেও আমি ও রকম 'হারামি মওত'কে প্রাণ থেকে ঘৃণা করি। এ মরায় যে এ-দুনিয়া ও আখের উভয়ের খারাবি, বোন!

কাল রাত্রে ভয় পেয়ে যখন তুই আমার কাছ হতে চলে গেলি, তার একটু পর থেকেই আমার ভেদবমি আরম্ভ হয়েছে! এই একটু আগে আমার জ্ঞান হলো।

আমি বুঝতে পেরেছি বোন, আমার আর সময় নাই। আর কারুর চোখের জলের বাধা আমায় বেঁধে রাখতে পারবে না। ওঃ এত দিনে ঐ নদীর পারের অলস-ঘুমে ভরা সুরটা আমার প্রাণে গভীর স্পর্শ করে গেল। সে কত গভীর দুঃখ ভরা! পানি আমার চোখের-কোল ছেয়ে ফেলেছে দিদি! তার কোমল স্পর্শ আমার চোখের পাতায় পাতায় অনুভব করছি। কি শিহরণ আমার প্রতি লোমকূপে খেলে বেড়াচ্ছে!

'কি পিপাসা, কি বুক-ফাটা তৃষ্ণা! একটু পানি দে তো বোন!—না না, আর চাই না। ঐ দেখতে পাচ্ছ 'শরাবান তহুরা'-ভরা পেয়ালা হাতে আমার স্বামী হৃদয়-সর্বস্ব দাঁড়িয়ে রয়েছেন! কি সহানুভূতি-আর্দ্র করুণ স্নেহময় গভীর দৃষ্টি তাঁর! আঃ মা গো! আঃ!

দুরন্ত পথিক

[কথিকা]

সে চলিতেছিল দুর্গম কাঁটা–ভরা পথ দিয়ে। চলিতে চলিতে সে একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল, লক্ষ আঁখি অনিমিখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে–দৃষ্টিতে আশা–উন্মাদনার ভাস্বর জ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। তাহাই ঐ দুরন্ত পথিকের বক্ষ এক মাদকতা–ভরা গৌরবে ভরপুর করিয়া দিল। সে প্রাণ–ভরা তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিল, 'হাঁ ভাই ! তোমাদের এমন শক্তি–ভরা দৃষ্টি পেলে কোথায় ?' অযুত আঁখির অযুত দীপ্ত চাউনি বলিয়া উঠিল,—'ওগো সাহসী পথিক, এ দৃষ্টি পেয়েছি তোমারই চলার পথ চেয়ে !' উহারই মধ্যে কাহারো স্নেহ–করুণ চাউনি বাণীতে ফুটিয়া উঠিল,—'হায় ! এ দুর্গম পথে তরুণ পথিকের মৃত্যু যে অনিবার্য !' অমনি লক্ষ কণ্ঠের আর্ত ঝঙ্কার গর্জন করিয়া উঠিল, 'চোপরাও ভীরু ! এই তো মানবাত্মার সত্য শাশ্বত পথ !' পথিক দুচোখ পুরিয়া এই কল্যাণ–দৃষ্টির শক্তি হরণ করিয়া লইল। তাহার সুপ্ত যত কিছু অন্তরের সত্য, এক অঙ্গুলি–পরশে সাধা বীণার বঞ্চনার মতো সাগ্রহে সাড়া দিয়া উঠিল,—'আগে চলো !' বনের সবুজ তাহার অবুঝ তারুণ্য দিয়া পথিকের প্রাণ ভরিয়া দিয়া বলিল—'এই তোমার যৌবনের রাজটিকা পরিয়ে দিলাম ; তুমি চির–যৌবন, চির অমর হলে।' দূরের আকাশ আনত হইয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া গেল। দূরের দিগ্বলয় তাহাকে মুক্তির সীমারেখার আবছায়া দেখাইতে লাগিল। দুই প্যাশে তাহার বনের শাখী শাখার পতাকা দুলাইয়া তাহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিল। স্বাধীন দেশের তোরণ–দ্বার পারাইয়া বোধন–বাঁশির অগ্নি–সুর হরিণের মতো তাহাকে মুগ্ধ মাতাল করিয়া ডাক দিতেছিল। বাঁশির টানে মুক্তির পথ লক্ষ্য করিয়া সে ছুটিতে লাগিল।—'ওগো কোথায় তোমার সিংহদ্বার ? দ্বার খোলো, দ্বার খোলো,—আলো দেখাও, পথ দেখাও !' ... বিশ্বের কল্যাণের মন্ত্র তাহাকে ঘিরিয়া বলিল, —'এখনো অনেক দেরি, পথ চলো !' পথিক চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—'ওগো আমি যে তোমাকেই চাই !' সে অচিন সাথী বলিয়া উঠিল,—'আমাকে পেতে হলে ঐ সামনের বুলন্দ–দরওয়াজা পার হতে হয় !' দুরন্ত পথিক তাহার চলার দুর্বার বেগের গতি আনিয়া বলিল—'হ্যাঁ ভাই, তাহাই আমার লক্ষ্য !' দূরের বনের ফাঁকে মুক্ত গগন একবার চমকাইয়া গেল, পেছন হইতে নিযুত তরুণ কণ্ঠের বিপুল বাণী শোর করিয়া বলিয়া উঠিল,—'আমাদেরও লক্ষ্য ঐ, চলো

ভাই, আগে চলো—তোমারই পায়ে-চলা পথ ধরে আমরা চলেছি।' পথিক আগে চলার গৌরবের তৃপ্তি তাহার কণ্ঠে ফুটাইয়া হাঁকিয়া উঠিল, 'এ পথে যে মরণের ভয় আছে!' বিক্ষুব্ধ তরুণ কণ্ঠে প্রদীপ্ত আগুন যেন গর্জিয়া উঠিল,—'কুছ পরওয়া নেই! ও তো মরণ নয়, ও যে জীবনের আরম্ভ!' ... অনেক পিছনে পাঁজর-ভাঙা বৃদ্ধেরা মরণের ভয়ে কাঁপিয়া মরিতেছিল! তাহাদের স্কন্ধদেশে চড়িয়া একজন মুখ-চোখ ভ্যাঙচাইয়া বলিতেছিল,—'এই দেখো মরণ!' একটু দূরে চন্দন-কুণ্ডলী ধোঁওয়া-ভরা আগুন জ্বালাইয়া বৃদ্ধের দৃষ্টি-চাহনি প্রতারিত করার চেষ্টা করা হইতেছিল। হাসি চাপিতে চাপিতে একজন ইহাদিগকে সম্মুখের ধুলায় আগুনের দিকে খেদাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল,—'ঐ তো সামনে তোমাদের নির্বাণ কুণ্ড; এ বৃদ্ধ বয়সে কেন বন্ধুর পথে ছুটতে গিয়ে প্রাণ হারাবে? ও দুরন্ত পথিকদল মল বলে!' বৃদ্ধের দল দুই হাত উপরে উঠাইয়া বলিল,—'হ্যাঁ হুজুর, আলবৎ!' তাহার আশেপাশে কাহার দুষ্ট কণ্ঠ বারেবারে সতর্ক করিতেছিল,—'ওহো বেকুবদল, ভিক্ষায়াৎ নৈব নৈব চ! তোদের এরা নির্বাণ-কুণ্ডে পুড়িয়ে তিল তিল করে মারবে!' তাদের রাখাল হাসি চাপিয়া বলিয়া উঠিল,—'না না, ওদের কথা শুনো না। ওদের পথ ভীতি-সঙ্কুল আর অনেক দূর, তাও আবার দুঃখ-কষ্ট-কাঁটা-পাথর-ভরা, তোমাদের মুক্তি ঐ সামনে।'

দুরন্ত পথিক চলিয়াছিল, সেই মুক্ত দেশের উদ্বোধন-বাঁশির সুর ধরিয়া। ... এইবার তাহার পথের বিভীষিকা জুলুম আরম্ভ করিল। পথিক দেখিল, ঐ পথ বাহিয়া যাওয়ায় এক-আধটুকু অস্ফুট পদচিহ্ন এখনো যেন জাগিয়া রহিয়াছে। পথের বিভীষিকা তাহাদেরই মাথার খুলি এই নতুন পথিকের সামনে ধরিয়া বলিল,—'এই দেখো এদের পরিণাম!' সেই খুলি মাথায় করিয়া নতুন পথিক আর্তনাদ করিয়া উঠিল,—'আহা, এরাই তো আমায় ডাক দিয়েছে! আমি এমনই পরিণাম চাই—আমার মৃত্যুতেই তো আমার শেষ নয়, আমার পশ্চাতে ঐ যে তরুণ যাত্রীর দল, ওদের মাঝখানেই আমি বেঁচে থাকব!' বিভীষিকা বললে,—'তুমি কে?' পথিক হেসে বললে,—'আমি চিরন্তন মুক্তিকামী। এই যাদের খুলি পড়ে রয়েছে তারা কেউ মরেনি, আমার মাঝেই তারা নূতন শক্তি, নূতন জীবন, নূতন আলোক নিয়ে এসেছে। এ মুক্তের দল অমর।' বিভীষিকা কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল,—'আমায় চেনো না? আমি শৃঙ্খল। তুমি যাই বলো, তোমাকে হত্যা করাই আমার ব্রত, মুক্তিতে বন্ধন দেওয়াই আমার লক্ষ্য। তোমাকে মরতে হবে!' দুরন্ত পথিক দাঁড়াইয়া বলিল,—'মারো,—বাঁধো, —কিন্তু আমাকে বাঁধতে পারবে না; আমার তো মৃত্যু নাই! আমি আবার আসব!' বিভীষিকা পথ আগুলিয়া বলিল,—'আমার যতক্ষণ শক্তি আছে, ততক্ষণ তুমি যতবারই আসো তোমাকে বধ করব। শক্তি থাকে আমায় মারো, নতুবা আমার মার সহ্য করতে হবে।'

অনেক দূরে মুক্ত দেশের অলিন্দে এই পথেরই বিগত শহীদের চিরতরুণ জ্যোতির্ময় দেহ লইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল! পথিক বলিল,—'কিন্তু এই জীবন দেওয়াটাই কি জীবনের সার্থকতা?' মুক্ত বাতায়ন হইতে মুক্ত আত্মা স্নিগ্ধ-আর্দ্র কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—'হাঁ ভাই! যুগ যুগ জীবন তো এই মৃত্যুরই বন্দনাগান গাইছে। সহস্র প্রাণের উদ্বোধনই তো তোমার মরণের সার্থকতা। নিজে মরিয়া জাগানোতেই তোমার মৃত্যু যে চিরজাগ্রত অমর!' নবীন পথিক তাহার তরুণ বিশাল বক্ষ উন্মোচন করিয়া অগ্রে বাড়াইয়া দিয়া কহিল,—'তবে চালাও খঞ্জর!' পিছন হইতে তরুণ যাত্রীর দল দুরন্ত পথিকের প্রাণশূন্য দেহ মাথায় তুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল—'তুমি আবার এসো।' অনেক দূরে দিগ্বলয়ের কোলে কাহাদের একতান-সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল,—

'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি!'

মৃত্যুক্ষুধা



এক

পুতুল-খেলার কৃষ্ণনগর।

যেন কোনো খেয়ালি শিশুর খেলাশেষের ভাঙা খেলাঘর।

খোকার চলে-যাওয়া পথের পানে জননীর মতো চেয়ে আছে—খোকার খেলার পুতুল সামনে নিয়ে।

এরই একটেরে চাঁদ-সড়ক। একটা গোপন ব্যথার মতো করে গাছ-পালার আড়াল টেনে রাখা।

তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমান আর 'ওমান কাত্‌লি' (রোম্যান্‌ ক্যাথলিক) সম্প্রদায়ের দেশি কন্‌ভার্ট ক্রিশ্চানে মিলে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে এই পাড়ায়।

এরা যে খুব সদ্ভাবে বসবাস করে এমন নয়। হিন্দুও দু-চার ঘর আছে—চানাচুর ভাজায় ঝালছিটের মতো। তবে তাদেরও আভিজাত্য-গৌরব ওখানকার মুসলমান-ক্রিশ্চান—কারুরই চাইতে কম নয়।

একই-প্রভুর-পোষা বেড়াল আর কুকুর যেমন দায়ে পড়ে এ ওকে সহ্য করে—এরাও যেন তেমনি। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে গোমরায় যথেষ্ট, অথচ বেশ মোটা রকমের ঝগড়া করার মতো উৎসাহ বা অবসর নেই বেচারাদের জীবনে।

জাতিধর্মনির্বিশেষে এদের পুরুষেরা জনমজুর খাটে—অর্থাৎ রাজমিস্ত্রি, খানসামা, বাবুর্চিগিরি বা ঐ রকমের কোনো-একটা-কিছু করে। আর, মেয়েরা ধান ভানে, ঘর-গেরস্তালির কাজকর্ম করে, রাঁধে, কাঁদে এবং নানান দুঃখধান্দা করে পুরুষদের দুঃখ লাঘব করবার চেষ্টা করে।

বিধাতা যেন দয়া করেই এদের জীবনে দুঃখকে বড় করে দেখবার অবকাশ দেননি। তাহলে হয়তো মস্ত বড় একটা অঘটন ঘটত।

এরা যেন মৃত্যুর মাল-গুদাম! অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গেই সাপ্লাই। আমদানি হতে যতক্ষণ, রফতানি হতেও ততক্ষণ!

মাথার ওপরে টেরির মতো এদের মাঝে দু-চারজন 'ভদ্দর-নুক'ও আছেন।

কিন্তু এতে তাদের সৌষ্ঠব বাড়লেও গৌরব বাড়েনি। ঐটেই যেন ওদের দুঃখকে বেশি উপহাস করে।

বিধাতার দেওয়া ছেলেমেয়ে এরা বিধাতার হাতেই সঁপে দিয়ে নিশ্চিত মনে পান্তা-ভাত খেয়ে মজুরিতে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে এসে বড় ছেলেটাকে বেশ করে দু-ঘা ঠেঙায়, মেজোটাকে সম্বন্ধের বাচবিচার না রেখে গালি দেয়, সেজোটাকে দেয় লজঞ্চুস, ছোটটাকে খায় চুমো, তারপর ভাত খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমায়।

ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—রোদে-পোড়া, ধূলিমলিন, ক্ষুধার্ত, গায়ে জামা নেই। অকারণ ঘুরে বেড়ায়, কাঠ কুড়োয়, সুতোকাটা ঘুড়ির পেছনে ছোটে এবং সেই সঙ্গে খাঁটি বাংলা ভাষার চর্চা করে।

এরাই থাকে চাঁদসড়কের চাঁদবাজার আলো করে। ... এই চাঁদসড়কেরই একটা কলতলায় জল-নেওয়া নিয়ে সেদিন মেয়েদের মধ্যে একটা ধুমখাত্তর ঝগড়া বেধে গেল।

কে একজন ক্রিশ্চান মেয়ে জল নিতে গিয়ে কোন এক মুসলমান মেয়ের কলসি ছুঁয়ে দিয়েছে। এদের দুই জাতই হয়তো একদিন এক জাতই ছিল—কেউ হয়েছে মুসলমান, কেউ ক্রিশ্চান। আর এক কালে এক জাত ছিল বলেই এরা আজ এ ওকে ঘৃণা করে। এই দুই জাতের দুইটি মেয়েই কম-বয়সী এবং তাদের বন্ধুত্বও পাকা রকমের। কাজেই ঝগড়া ঐ মেয়ে দুটি করেনি। করছে তারা—যারা এই অনাছিষ্টি দেখেছে।

গজালের মা-র পাড়াতে কুঁদুলি বলে বেশ নামডাক আছে। সে-ই 'অপোজিশন লীড' করছে মুসলমান-তরফ থেকে।

অপরপক্ষে হিড়িম্বাও হটবার পাত্রী নয়। তার ভাষা গজালের মা-র মতো ক্ষুরধার না হলেও তার শরীর এবং স্বর এ দুটোর তুলনা মেলে না!—একেবারে সেকালের ভীম-কান্তা হিড়িম্বা দেবীর মতোই!

গজালের মা গজালের মতোই সরু—হাড্ডি-চামড়া সার কিন্তু তার কথাগুলো বুকে বেঁধে গজালের মতোই নির্মম হয়ে। গজাল উঠিয়ে ফেললেও দেয়ালে তার দাগ যেমন অক্ষয় হয়ে যায়, ঝগড়া থেমে গেলেও গজালের মা-র কটূক্তির জ্বালা তেমনি কিছুতেই আর মিটতে চায় না।

ঝগড়া তখন অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং গজালের মা বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলচে, 'হারাম-খোর, খেরেস্তান কোথাকার! হারাম খেয়ে খেয়ে তোদের গায়ে বন-শুয়োরের মতো চর্বি হয়েছে, না লা?'

গজালের মাকে আর বলবার অবসর না দিয়ে হিড়িম্বা তার পেতলের কলসিটা খং করে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে, অঙ্গ দুলিয়ে, থ্যাবড়ানো গোবরের মতো মুখ বিকৃত করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তা বলবি বৈ কি লা সুঁটকি! ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়ির হারাম-রাঁধা পয়সা খেয়ে চেকনাই বেড়েছে কিনা!'

গজালের মা রাগের চোটে তার ভরা কলসির সবটা জল মাটিতে ঢেলে ফেলে আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে খিচিয়ে উঠল, 'ওলো আগ্-ধুম্সী (রাগধুম্সী)! ওলো ভাগলপুরে

গাই! ওলো, আমার ছেলে খেরেস্তানের ভাত রাঁধে নাই লো, আমার ছেলে জজ্জ সায়েবের খানসামা ছিল—জজ্জ সায়েবের লো, ইংরেজের!'

পুঁটের মাও খেরেস্তান, তার আর সইল না। সে তার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে বলে উঠল, 'আ-সইরন সইতে নারি, সিকেয় ইয়ে দিয়ে ঝুলে মরি! বলি, অ'গজালের মা! ঐ জজ্জ সায়েবও আমাদেরই জাত। আমরা 'আজার' (রাজার) জাত, জানিস্?'

দু-তিনটি ক্রিশ্চান মেয়ে পুঁটের মার এই মোক্ষম যুক্তিপূর্ণ জবাব শুনে খুশি হয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা বলেছিস মাসি!'

খাতুনের মা কাঁখে কলসি, পেটে পিলে আর কাঁধে ছেলে নিয়ে এতক্ষণ শোনার দলে দাঁড়িয়েছিল এবং মাঝে মাঝে মূলগায়েনের দোয়ারকি করার মতো গজালের মার সুরে মিলিয়ে দু-একটা টিপ্পনি কাটছিল। কিন্তু এইবার আর তার সইল না। ছেলে, পিলে আর কলসি-সমেত সে একেবারে মূলগায়েনের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ালো, এবং ক্রিশ্চানদের বৌদের লক্ষ করে যে ভাষা প্রয়োগ করল, তা লেখা তো যায়ই না, শোনাও যায় না।

এইবার হিড়িম্বা ফস করে তার চুল খুল দিয়ে একেবারে 'এলোকেশী বামা' হয়ে দাঁড়ালো, এবং কোমরে আঁচল জড়াতে জড়াতে খাতুনের মার মুখের সামনে হাত দুটো বারকয়েক বিচিত্র ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'তুই আবার কে লো উঝড়োখাগী! তবু যদি ভাতারের ধুম্‌সুনি না খেতিস দুবেলা!' তারপর তার অপ-ভাষাটার উত্তর তার চেয়েও অপ-ভাষায় দিয়ে সে গজালের মা-র পানে চেয়ে বলল, 'হ্যা লা ভাতার-পুত্‌খাগি! তিন বেটাখাগি। তোর ছেলে না হয় জজ সায়েবের বাবুর্চিগিরি করত, আর সে ছেলেকেও তো দিয়েছিস কবরে। আর তুই নিজে যে সেদিন আমফেসাদ বাবুর (রামপ্রসাদ বাবুর) হাঁড়ি ঠেলে রুনুন (উনুন) কেড়ে এলি! ঐ আমফেসাদ বাবু তোদের মৌলবী সায়েব নাকি লা? হাত শোঁক্, এখনো খেরেস্তানের গন্ধ পাবি!'

এর চরম উত্তর দিল গজালের মা, বেশ একটু ছুরির মতো ধারালো হাসি হেসে, 'বলি ওলো হুতমোচোখি, ঐ 'আমফেসাদ' বাবু তো আমার তলপেটে চালের পোটলা পেয়ে মাথায় চটি ঝাড়েনি! ছেলের বেয়ারাম হয়েলো (হয়েছিল), তাই ওর বাড়ি চাকরি করতে গিয়েলাম (গিয়েছিলাম), তাই বলে এক গেলাস পানি খেয়েছি ও বাড়িতে? বলুক দেখি কোন কড়ুই-রাঁড়ি বলবে!'

শেষের কথাগুলো হিড়িম্বার কানে যায়নি। সে 'ছিটেন পাড়ার' (প্রোটেস্টান্ট পাড়ার) পাদরি সায়েব মিস্টার রামপ্রসাদ হাতির বাড়ি চাকরি করতে গিয়ে সত্যিই একবার চাল চুরির জন্য মার খেয়েছিল। কিন্তু সে কেলেঙ্কারির কথাটা এতগুলো মেয়ের মধ্যে ঘোষণা করে দেওয়াতে সে এইবার যা কাণ্ড করতে লাগল—তা অবর্ণনীয়! চুল

ছিড়ে, আঙুল মটকে, চেঁচিয়ে, কেঁদে, নেচে, কুঁদে সে যেন একটা বিরাট ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে গালির বিগলিত ধারা—অনর্গল গৈরিকস্রাব !

যত গালি তার জানা ছিল ভব্য, অভব্য, শ্লীল, অশ্লীল, সবগুলো একবার, দুবার, বারবার আবৃত্তি করেও তার যেন আর খেদ মেটে না !

'লুইস্-গানার' যেন মিনিটে সাতশো করে গুলি ছুঁড়ছে !

ছেলেমেয়ের ভিড় জমে গেল ! ঝগড়া তো নয়, মোরগ-লড়াই !

ওরই মধ্যে একটা গয়লাদের ছেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে পচা রে, উই শালা পচা ! ছুটে আয় রে ছুটে আয় ! তোর দিদিমা 'মা-কালি' হয়ে গিয়েছে !'

এই কুড়ুম-তাল ঝগড়ার মধ্যেও কয়েকটা বৌ-ঝি হেসে ফেলল !

মুসলমান তরফের একটি বৌ আর থাকতে না পেরে ঘোমটার ভিতর থেকেই বলে উঠল, 'হাতে একখানা খাঁড়া দিলেই হয় !'

তার চেয়েও সুরসিকা একটি আধ-বয়েসী মেয়ে পিছন থেকে বলে উঠল, 'কাপড়টাও খুলে পড়তে আর বাকি নেই লো !'

মুসলমান ছেলেমেয়েরা যত না হাসে, তত চেঁচায় !

ক্রিশ্চান ছেলেরা ছোঁড়ে ধুলো।

বেঁধে যায় একটা কুরুক্ষেত্তর !...

কিন্তু দুঃখের ইন্দ্রপ্রস্থ নিয়ে এ কুরুক্ষেত্র ওখানকার নিত্যঘটনা—একেবারে 'মাছভাত' !

ঝগড়া হতেও যতক্ষণ-ভুলতেও ততক্ষণ।

দুঃখ অভাব হয়তো এদের মঙ্গলই করেছে। এত দুঃখ যদি এদের না থাকত তাহলে এমন প্রচণ্ড ঝগড়ার পরের দিনই আবার 'দিদি' 'বুবু' 'খালা' বলে হেসে কথা কইতে ওদের বাধতো !

এরা সব ভোলে—ভোলে না কেবল তাদের অনন্ত দুঃখ, অনন্ত অভাব !

এই না-ভোলা দুঃখের পাথারে এরা যেন চর-ভাঙা গাছের শাখা ধরে ভেসে চলছে। দুঃখের যন্ত্রণায় মন থাকে এদের তিক্ত হয়ে, ভাষাও বেরোয় তাই কটু হয়েই, কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখে—সে একা অসহায়, ভাসছে অকূলপাথারে, তখন সে তারই দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়—যাকে সে এতক্ষণ ধরে অতিবড় কটূক্তি করেছে।

তাদের এ জলের জীবন-যাত্রায় কি ডাঙার সুখী মানুষের মতো পরম নিশ্চিন্ত মনে বৎসরের পর বৎসর ধরে এ ওর পানে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবার উপায় আছে?

এ দুঃখের বোঝা যদি এদের এত বিপুল না হয়ে উঠতো, তাহলে এরাও এতদিন ভদ্রলোকের মতো মানুষ জাতির মহাশত্রু হয়ে দাঁড়াত—বড় বড় যুদ্ধ বাধিয়ে দিত।

দুই

গজালের মা-র ছোটছেলে প্যাঁকালে টাউনের থিয়েটারদলে নাচে, সখী সাজে, গান করে। কাজও করে—রাজমিস্তিরির কাজ।

বাবু-ঘেঁষা হয়ে সেও একটু বাবু-গোছ হয়ে গেছে। টেড়ি কাটে, 'ছিকরেট' টানে, পান খায়, চা খায়। পাড়ার মেয়ে মহলে তার মস্ত নাম। বলে,—'যেমন গলা, তেমনি গান, তেমনি সৌখিন! 'থিয়েটরে' লাচে—বাবুদের ঠিয়েটরে, ঐ খেরেস্তান পাড়ার যাত্তার গানে লয়। হুঁ হুঁ!'

সে যখন 'ফুট-গজ' 'কন্নিক' আর 'সুত' নিয়ে 'ছিকরেট' টানতে টানতে কাজে যায় আর যেতে যেতে গান ধরে, তখন পাড়ার বৌ-ঝিরা ঘোমটা বেশ একটু তুলেই তার দিকে চায়। 'ভাবী' (বৌদি) সম্পর্কের কেউ হয়তো একটু হাসেও। আর অবিবাহিতা মেয়ের মায়েরা আল্লা মিঞাকে জোড়া মোরগের গোশতের লোভ দেখিয়ে বলে, 'হেই আল্লাজি, আমার কুড়ুনির সাথেই ওর জোড়া লিখো।'

ঘরে সেদিন চা ছিল না। তাই প্যাঁকালে নেদের পাড়ার বাবুদের বৈঠকখানা হতে একটু চায়ের প্রসাদ পেয়ে এসে কাউকে কিছু না বলেই কন্নিক নিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়বার যোগাড় করছিল।

তার মা একটু অনুনয়ের স্বরেই বলল 'হ্যাঁ রে, তুই যে কাজে যাচ্ছিস বড়? এদিকে যে পাঁচি আমার মরে! দেখ্ না একটু কাঠুরে পাড়ার দাই মাগিকে। কাল আত্তির (রাত্তির) থেকে কষ্ট পাচ্ছে, এখনো তো কিছু হল না।'

প্যাঁকালে তখন কন্নিক ফুটগজ সামনে রেখে থালায় একথালা জল নিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার তেল-চিটে চুলে বেশ করে বাগিয়ে টেড়ি কাটছিল। আয়নার অভাব সে কিছুদিন থেকে থালার জলেই মিটিয়ে আসছে।

চার আনা দামের একটি আয়না সে কিনেও ফেলেছিল একবার, কিন্তু একদিন চা খাওয়ার পয়সা না থাকাতে সেটা দু-পয়সায় বিক্রি করে দোকানে চা খেয়ে এসেছে। এখন যা পায়, তাতে চালই জোটে না দু-বেলা, তা আয়না কিনবে কি!

কিছুদিন থেকে সে রোজই তার রোজের পয়সা থেকে চার আনা আলাদা করে রাখে, আর মনে করে আজ একটা আয়না কিনবেই। কিন্তু যেই বাড়িতে এসে বাজার করতে গিয়ে দেখে, ছ-আনায় সকলের উপযোগী চালই হয় না, তখন লুকানো সিকিটাও বের করতে হয় কোঁচড় থেকে।

বয়স তার এই আঠার-উনিশ। কাজেই চেয়ে না-পাওয়ার দুঃখটা ভুলতে আজো তার বেশ একটু সময় লাগে। কিন্তু তার আয়নার জন্য তার পিতৃহীন ছোট ছোট ভাইপো ভাইঝিগুলি ক্ষুধিত থাকবে—এ যখন মনে হয়, তখন তার নিজের অভাব আর অভাবই বোধ হয় না।

সেদিন ঝগড়ার ঝোঁকে হিড়িম্বা সবচেয়ে ব্যথা-দেওয়া গাল তার মা-কে যেটা দিয়েছিল, সে ঐ 'তিনবেটাখাগি'। সত্যিই তো পাহাড়ের মতো জোয়ান তিন ভাই-ই তার মার চোখের সামনে ধড়ফড়িয়ে মরে গেল ! তার ওপর আবার সবারই দু-চারটে করে ছেলেমেয়ে আছে ; এবং তারা সর্বসাকুল্যে প্রায় এক ডজন।

এই শিশুদের এবং তার বিধবা ভ্রাতৃজায়াদের বোঝা বইবার দায়িত্ব একা তারই। কিন্তু বোঝা তাকে একা বইতে হয় না। তার মা এবং ভ্রাতৃজায়ারা মিলে ও-বোঝা হালকা করবার জন্য দিবারাত্রি খেটে মরে। ওতে বোঝা হালকা হয়তো একটু হয়, কিন্তু ক্লান্তি কমে না। ওরা যেন মস্ত একটা খাড়া পাহাড়ের গড়ানে 'খাদ' বেয়ে চলেছে, মাথায় এঁটে-দেওয়া বিপুল বোঝা, একটু থামলেই বোঝা-সমেত হুড়মুড় করে পড়বে কোন এক অন্ধকার গর্তে !

গোদের ওপর বিষ-ফোঁড়া ! কিছুদিন থেকে আবার ওর ছোট বোনটাও এসে ওদের ঘাড়ে চড়েছে ! বিয়ে দিয়েছিল ওর ভালো বর-ঘর দেখেই ! কিন্তু কপালে সুখ লেখা না থাকলে সে কপাল পাথরে ঠুকেও লাভ নেই ! ওতে কপাল যথেষ্টই ফোলে, কিন্তু ভাগ্য একটুও ফোলে না—পাঁচির স্বামী নাকি কোন এক ক্যাওরার মেয়েকে মুসলমান করে নেকা করেছে ! কিন্তু তার স্বামীর অর্ধেক রাজত্বে পাঁচির মন উঠল না। একদিন তার অনাগত শিশুর শুভ সংবাদসহ অর্ধেক রাজত্বের সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে মায়ের দুঃখের কোলেই সে ফিরে এলো।

অভাবের দিনে প্রিয় অতিথি আসার মতো পীড়াদায়ক বুঝি আর কিছু নেই। শুধু হৃদয় দিয়ে দেবতার পূজা হয়তো করা যায়, কিন্তু শুধু-হাতে অতিথিকে বরণ করা চলে না। শুধু-হাতের লজ্জা সারা হৃদয় দিয়েও ঢাকা যায় না।

পাঁচি এলো চোখ-ভরা জল নিয়ে। দুঃখিনী মা তার চোখের জল মুছাবারও সাহস করলে না। বড় আদরের একটি মাত্র মেয়ে তার—তার সর্বকনিষ্ঠ কোল-পোঁছা সন্তান। বুকে সে তুলে নিল তাকে, কিন্তু তাতে শান্তি সে পেল না, বুক তার ফেটে যেতে লাগল কান্নায়, বেদনায় ! মা কেঁদে উঠল, 'ওরে হতভাগিনী মেয়ে, এ কাঁটার বুকে শুধু যে ব্যথাই পাবি মা আমার ! এখানে সুখ-শান্তি কোথায় ?'

মেয়ের প্রথম সন্তান পিত্রালয়েই হয়—এ-ই দেশের চিরচলিত প্রথা। অতি বড় দুঃখীও তার মেয়ে প্রথম সন্তান-সম্ভাবিতা হলে নিজে গিয়ে মেয়েকে আনে, সাধ-আরমান করে, মেয়েকে 'সাধ' খাওয়ায়। পাঁচি যখন প্রসব-বেদনায় আর্তনাদ করছিল

অথচ অর্থাভাবে ধাত্রীও ডাকতে পারা যাচ্ছিল না কাল রাত্রি থেকে, তখন তার মা-র যন্ত্রণা বুঝছিলেন—যদি বেদনার বোধশক্তি তাঁর থাকে—এক অন্তর্যামী!

নিজে থেকে এসেছে বলেই—এবং মেয়ের কপাল পুড়েছে বলেই কি তার যত্ন-আদরও হবে না একটু? কিন্তু হয় কিসে?—নিঃসম্বল জননী কাঁদে, ছুটে বেড়ায়, কিন্তু করতে কিছুই পারে না।

ছেলের ওপর অভিমান করে কিছুই বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু আর সে থাকতে পারল না। ছেলের কাছে এসে কেঁদে পড়ল, 'ওরে, পাঁচি যে আর বাঁচে না।'

চা খেয়ে এসেও প্যাঁকালের উষ্মা তখনও কাটেনি। সে টেড়ি কাটতে কাটতে মুখ না তুলেই বলল, 'মরুক! আমি তার কি করব? দাইয়ের টাকা দিতে পারবি?'

সত্যিই তো, সে কি করবে! টাকাই বা কোথায় পাওয়া যায়!

হঠাৎ পুত্র মুখ তুলে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, 'রোজ ঝগড়া করবি নুলোর মা-র সঙ্গে, নইলে সে-ই তো এতখন নিজে থেকে এসে সব করত!'

নুলোর মা আর কেউ নয়,—আমাদের সেই ভীমা প্রখর-দশনা শ্রীমতী হিড়িম্বা! সে শুধু ঝগড়া করতেই জানে না, একজন ভাল ধাত্রীও।

ইতিমধ্যেই পাঁচি চিৎকার করে মূর্ছিতা হয়ে পড়ল। মায়ের প্রাণ, আর থাকতে পারল না। বৌদের ডেকে মেয়েকে দেখতে বলে সে তাড়াতাড়ি হিড়িম্বাকে ডাকতে বেরিয়ে পড়ল।

হিড়িম্বা তখন তার বাড়ির কয়েকটা শশা হাতে নিয়ে বাবুদের বাড়ি বিক্রি করতে যাচ্ছিল। পথে গজালের মা-র সঙ্গে দেখা হতেই সে মুখটা কুঁচকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল। কিন্তু গজালের মার তখন তা লক্ষ করবার মতো চোখ ছিল না। সে দৌড়ে হিড়িম্বার হাত দুটো ধরে বলল, 'নূলোর মা, আমায় মাফ কর ভাই! একটু দৌড়ে আয়, আমার পাঁচি আর বাঁচে না!'

হিড়িম্বা কথা কয়টা ঠিক বুঝতে না পেরে একটু হতভম্ব হয়ে গেল। সে একটু জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'এ কি ন্যাকামি লা? তুই কি আবার কাজিয়া করবি নাকি পাড়ার মাঝে পেয়ে?'

গজালের মা কেঁদে ফেলে বলল, 'না বোন সত্য বলিছ, আল্লার কিরে! আমার পাঁচির কাল থেকে ব্যথা উঠেছে; ঝগড়া তোর গজালের মা-র সঙ্গেই হয়েছে, পাঁচির মার সঙ্গে তো হয়নি!'

হিড়িম্বা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল 'অ! তা তোর পাঁচির ছেলে হবে বুঝি? তা আত (রাত) থেকে কষ্ট পাচ্ছে—আর আমায় খবর পাঠাসনি? আচ্ছা মা যাহোক বাবা তুই! আমরা হলে ধন্না দিয়ে পড়তাম গিয়ে। চ দেখি গিয়ে!'

হিড়িম্বা যেতেই পাঁচি কেঁদে উঠল, 'মাসি গো, আমি আর বাঁচবে না।'

হিড়িম্বা হেসে বলল, 'ভয় কি তোর মা ; এই তো এখনি সোনার চাঁদ ছেলে কোলে পাবি !'

পাঁচি অনেকটা শান্ত হল। ধাত্রী আসার সান্ত্বনাই তার অর্ধেক যন্ত্রণা কমিয়ে দিল যেন।

একটু তদবির করতেই পাঁচির বেশ নাদুস-নুদুস একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। সকলে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওলো, ছেলে হয়েছে লো ! ছেলে হয়েছে যে !'

ওদের খুশি যেন আর ধরে না ! ওরা যেন ঈদের চাঁদ দেখেছে !

হিড়িম্বা মূর্ছিতাপ্রায় পাঁচির কোলে ছেলে তুলে দিয়ে বলল, 'নে, ছেলে কোলে কর ! সব কষ্ট জুড়িয়ে যাবে !

পাঁচি অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগল !

নবশিশুর ললাটে প্রথম চুম্বন পড়ল না কারুর, পড়ল দুঃখী মায়ের অশ্রুজল !

গজালের মা হিড়িম্বার হাত ধরে বলল, 'দিদি, আমায় মাফ কর !'

হিড়িম্বার চোখ ছলছল করে উঠল। সে কিছু না বলে সস্নেহে খোকার কপালে-পড়া তার মায়ের অশ্রুজল-লেখা মুছিয়ে দিলে।

বাইরে তখন ক্রিশ্চান ছেলেদের দেখাদেখি মুসলমান ছেলেরাও গাচ্ছে—

'আমরা যিশুর গুণ গাই।'

তিন

এইসব ব্যাপারে কাজে যেতে সেদিন প্যাঁকালের বেশ একটু দেরি হয়ে গেল। তারি জুড়িদার আরও জন তিন-চার রাজমিস্তিরি এসে তাকে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিল।

প্যাঁকালে না খেয়েই তার যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে এলো। সে জানত, কাল থেকে চালের হাঁড়িতে ইঁদুরদের দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা বসেছে। তাদের কিচিরমিচির বক্তৃতায় আর নেংটে ভলান্টিয়ারদের হুটোপুটির চোটে সারারাত তার ঘুম হয়নি।

কিন্তু চাল যদি-বা চারটে জোগাড় করা যেত ধারধুর করে, আজ আবার চুলোও নেই। উনুন-শালেই পাঁচির ছেলে হয়েছে। ও-ঘর নিকুতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

ঘরে তাদের চালের হাঁড়িগুলো যেমন ফুটো, চালও তেমনি সমান ফুটো। সেখানে বাসা বাঁধবার খড় না পেয়ে চড়াই পাখিগুলো অনেকদিন হল উঠে চলে গেছে। কিন্তু অর্থের চেয়েও বেশি টানাটানি ছিল তাদের জায়গার।

যেটা উনুন-শাল, সেইটেই ঢেঁকিশাল, সেইটেই রান্নাঘর এবং সেইটেই রাত্রে জনসাতেকের শোবার ঘর। তারই একপাশে দরমা বেঁধে গোটা বিশেক মুরগি এবং ছাগলের ডাক-বাংলো তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

প্যাঁকালে না খেয়েই কাজে গেল, তার মা-ও তা দেখলে। কিন্তু ঐ শুধু দেখল মাত্র, মনের কথা অন্তর্যামীই জানেন, চোখে কিন্তু তার জল দেখা গেল না। বরং দেখা গেল সে তার মেয়ের আঁতুড়-ঘরে ঢুকে তার খোকাকে কোলে নিয়ে দোলা দিতে কী সব ছড়া-গান গাচ্ছে।

একটি ছোট্ট শিশু তার জোয়ান রোজগেরে ছেলেদের অকালমৃত্যু ভুলিয়েছে। একটা দিনের জন্যও সে তার দুঃখ ভুলেছে। তার অনাহারী ছেলের কথা ভুলেছে!

প্যাঁকালে যেতে যেতে তার মা-র খুশিমুখ দেখল, বোনের ছেলেকে নিয়ে গানও শুনল। চোখ তার জলে ভরে এলো। তাড়াতাড়ি কাঁধের গামছাটা দিয়ে চোখ দুটো মুছে সে হাসতে হাসতে বার হয়ে পড়ল!

রাজমিস্ত্রিদলের মোনা প্যাঁকালের সুরকি-লাল কোটটার পকেটে ফস করে হাত ঢুকিয়ে বলল, 'লে ভাই, একটা 'ছিকরেট' বের কর! বড্ডো দেরি হয়ে গেল আজ, শালা হয়তো এতক্ষণ দাঁত খিচুচ্ছে।'

প্যাঁকালে পথ চলতে চলতে বলল, 'ও গুড়ে বালি রে মনা, ছিকরেট ফুরিয়ে গেছে।'

আল্লারাখা তার কাছা খুলে কাছায়-বাঁধা বিড়ির বান্ডিলটা সাবধানে বের করে বলল, 'এই নে, খাকি ছিকরেট আছে, খাবি?'

কুড়চে বান্ডিল থেকে ফস করে একটি বিড়ি টেনে নিয়ে সায়েবদের মতো করে বাম ওষ্ঠপার্শ্বে চেপে ধরে ঠোঁট-চাপা স্বরে বলল, জিয়াশলাই আছে রে গুয়ে, জিয়াশলাই?'

গুয়ে তার 'নিমার' ভেতর-পকেট থেকে বারুদ-ক্ষয়ে-যাওয়া ছুরিমার্কা দেশলাইয়ের বাক্সটা বের করে কুড়চের হাতে দিয়ে বলল, 'দেখিস, একটার বেশি কাঠি পোড়াসনে যেন। মাত্তর আড়াইটি কাঠি আছে।'

কুড়চে কাঠির ও খোলের দুরবস্থা দেখে বলল, 'তুই-ই জ্বালিয়ে দে ভাই, শেষে বলবি, শালা একটা কাঠি নষ্ট করে ফেলল।'

গুয়ের ওদিক দিয়ে মস্ত নাম। ঝড়ের মধ্যেও সে এমনি কায়দা করে দেশলাই ধরাতে পারে যে, কাঠিটা শেষ হয়ে না পোড়া পর্যন্ত নিবে না!

দেশলাইয়ের খোলার ঘষা-বারুদে গুয়ে কৌশলের সঙ্গে আধখানা কাঠিটি নিয়ে একটি ছোট্ট টোকা মেরে জ্বালিয়ে ফেলেই দুই হাতের তালু দিয়ে তার শিখাকে বাতাসের আক্রমণ হতে রক্ষা করে এমন করে কুড়চের মুখের সামনে ধরল যে, তা দেখবার জিনিস।

বিড়িটা যতক্ষণ না আঙুল পুড়িয়ে ফেলল, ততক্ষণ এ-মুখ ও-মুখ হয়ে ফিরতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সর্দার মিস্তিরির, আর যার বাড়িতে কাজ করছে তার চৌদ্দ-পুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধও হতে লাগল।

'ওমান কাত্‌লি' পাড়ার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল তারা। একটা বিশিষ্ট ঘরের সামনে গিয়েই প্যাঁকালে গান ধরে দিলে :

'কালো শশী রে, বিরহ-জ্বালায় মরি !'

তাকে কিন্তু বেশিক্ষণ বিরহ-জ্বালায় মরতে হল না ! বাড়ির ভিতর থেকে কলসি-কাঁখে একটি কালোকুলো গোলগাল মেয়ে বেরিয়ে এল।

মেয়েটি যেন একখানা চার পয়সা দামের চৌকো পাউরুটি ! কিন্তু মোটা সে একটু বেশি রকমের হলেও চোখে-মুখে তার লাবণ্য ছিল অপরিমিত, চোখ দুটি যেন লাবণ্যের কালো জলে ক্রীড়া-রত চটুল সফরি—সদাই ভেসে বেড়াচ্ছে ভুরু জোড়া যেন গাঙ্‌-চিলের ডানা—ঐ সফরির লোভে, চোখের লোভে উড়ে বেড়াচ্ছে।

না-বলা কথার আবেশে পাতলা ঠোঁট দুটি কাঁপছে কচি নিমপাতার মতো।

নাকটি যেন মোহনবাঁশি। চিবুকের মাঝখানটিতে নাশপাতির মতো ছোট্ট টোল।

শ্রাবণ-রাতের মেঘের মতো চুল।

কিন্তু মুখের ওর এত লাবণ্যকে যেন বিদ্রূপ করছে ওর বাকি শরীরের স্থূল চৌকো গড়ন।

মেয়েটি মধু ঘরামির। মধু আগে মুসলমান ছিল, এখন 'ওমান কাত্‌লি' হয়েছে।

মেয়েটির নাম কুর্শি। বয়স চৌদ্দর কাছাকাছি। দেখে কিন্তু ষোলো-সতের বলে ভ্রম হয়। একটু বেশি বাড়ন্ত।

সর্দার মিস্তিরির মিষ্টি আলোচনা তখন দলের মধ্যে এমনি জোরের সঙ্গে চলছিল যে, তারা দেখতেই পেলে না, কখন কুর্শি তাদের কচার বেড়ার ধারে চোখ-ভরা ইঙ্গিত নিয়ে এসে দাঁড়াল এবং প্যাঁকালেও হঠাৎ পিছিয়ে পড়ল।

কিন্তু কথা বলবার তারা সুযোগ পেল না। পিছনে একটা গরুর গাড়ি আসছিল—প্যাঁকালে তা খেয়াল করেনি। গাড়ির গাড়োয়ান কিন্তু মেয়েটার গতিবিধি লক্ষ করছিল। কচাগাছের কাছে কলসি নিয়ে সাতজন্ম দাঁড়িয়ে থাকলেও যে জল পাওয়া যায় না, এ তো জানা কথা। গাড়োয়ানটা তার উৎসাহ থামিয়ে রাখতে পারল না। হঠাৎ গেয়ে উঠলো :

'ছোঁড়ার মাথায় বাবরি-কাটা চুল,
হায় ছুঁড়িরা মজাইল কুল !'

গান তো নয়, ঋষভ চিৎকার ! সে চিৎকারে ছোঁড়া-ছুঁড়ির প্রেম ততক্ষণে হৃদয়দেশ ত্যাগ করে বহু ঊর্ধ্বে উধাও হয়ে গেছে !

প্যাঁকালে অকারণে পাশের রেতো কামারের দোকানে ঢুকে পড়ে। গাড়োয়ান শুনতে পায় এমনি চেঁচিয়েই বলল, 'এই! আমার বড়শিটা কখন দিবি?' বলা বাহুল্য, কামারকে সে বঁড়শি গড়তে কোনদিনই দেয়নি।

ওদিকে কুর্শি হঠাৎ কলসি নামিয়ে একটা কচার ডাল ভেঙে পাশের ছাগলটাকে অকারণে দু ঘা কষিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'পোড়ারমুখির ছাগল রোজ রোজ এসে বেগুন গাছ খেয়ে যাবে!'

এখানেও বেগুন গাছের উল্লেখটা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক।

রসিক গাড়োয়ান গান গাওয়ার মাঝে ডাইনের বলদটার ঠেশে ল্যাজ মুষড়ে দিয়ে এবং বামের বলদটার তলপেটে বাম পা'টার সাহায্যে বেশ করে কাতুকুতু দিয়ে,—জিহ্বা ও তালু সংযোগে জোরে দুটো টোকর মেরে শেষের কলিটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগল—'ও ছুঁড়িরা মজাইল, হায় ছুঁড়িরা মজাইল কুল।'

যন্ত্রণায় ও কাতুকুতুর ঠেলায় বলীবর্দ যুগল উর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে ছুট দিল।

প্যাঁকালে একবার হতাশ নয়নে ছাগল-তাড়না-রত কুর্শির দিকে তাকিয়ে দৌড়ে জুড়িদের সঙ্গ নিল। তখনো গাড়ি ছুটছে, কিন্তু গাড়োয়ানের মুখ ফিরে গেছে পিছন দিকে।

গাড়ির ধুলোর ভয়ে দলের ওরা পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল। জনাব বলে উঠল 'উঃ শালার গলা তো নয়, যেন হাঁড়োল! ও শালা কে রে?'

প্যাঁকালে কটু কণ্ঠে বলে উঠল, 'ঐ শালা ন্যাড়া গয়লা—শালা গান করছে না তো, যেন হামলাচ্ছে।'

সকলেই হেসে উঠল।

হঠাৎ ওদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'খড়গ্ পাচে।'

অমনি সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। যে ঐ ইঙ্গিত-বাণী উচ্চারণ করলে তার গা টিপে আর একজন আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় রে?'

অদূরে সাইকেল রেখে এক ভদ্রলোক রাস্তার ধারেই একটা অপকর্ম করতে বসে গেছিলেন। সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্যাঁকালে বলল, 'উ-ই যে, নীল চোঁয়ায়।'

এতক্ষণে ঐ অপকর্মরত ভদ্রলোকটিও দেখে ফেলেছিলেন, এবং এরাও তাঁকে দেখতে পেয়েছিল।

ঐ ভদ্রলোকটির বাড়িতেই এরা রাজমিস্তিরির কাজ করে।

এদের রাজমিস্তিরিদের অনেকগুলো 'কোডওয়ার্ড—সাঙ্কেতিক বাণী আছে—যার মানে এরা ছাড়া অন্য কেউ বোঝে না। 'খড়গ্ প্যাঁচে' বাবু বা সায়েব আসছে বা দেখছে, আর 'নীল চোঁয়ায়' ব্যবহৃত হয় ঐ অপকর্মটির গূঢ় অর্থে।

এর পরেই দলকে দল হঠাৎ এমন সব বিষয়ে আলোচনা জুড়ে দিলে যা শুনে তাদের অতি নিরীহ চির-দুঃখী জন-মজুর ছাড়া কিছু ভাবা যায় না।

চার

প্যাঁকালে চলে যাবার পরই তার দ্বাদশটি ক্ষুধার্ত ভাইপো-ভাইঝি মিলে যে বিচিত্র সুরে 'ফরিয়াদ' করতে লাগল ক্ষুধার তাড়নায়, তাতে অন্নের মালিক যিনি, তিনি এবং পাষাণ ব্যতীত বুঝি আর সব-কিছুই বিচলিত হয়।

সেজো-বৌ হপ্তাখানিক হল টাইফয়েড থেকে কোনো রকমে বেঁচে উঠেছে। কিন্তু ঐ বেঁচে উঠেছে মাত্র। বেঁচে থাকার চিহ্ন শ্বাস-প্রশ্বাসটুকু ছাড়া তার আর কিছু নেই। দেহের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা কবরে দেয়া ছাড়া আর কোন কাজে লাগে না। যেন কুমিরে চিবিয়ে গিলে আবার উগলে দিয়ে গেছে।

কসাই যেমন করে মাংস থেঁতলায়, রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য এই চারটিতে মিলে তেমনি করে যেন থেঁতলেছে ওকে।

ওরই কোলে খোকা—স্বামীর শেষ স্মৃতিটুকু। মাত্র দুমাসের ! জন্মে অবধি মায়ের দুধ না পেয়ে শুকিয়ে চামচিকের মতো হয়ে গেছে।

শুষ্ক ক্ষীণকণ্ঠে অসহায় শিশু কাঁদে, আর একবার করে তার কণ্ঠের চেয়েও শুষ্ক মায়ের বুকে একবিন্দু দুধের আশায় বৃথা কান্না থামায়। আবার কাঁদে। কান্না তো নয়, যেন বেঁচে থাকার প্রতিবাদ। যেন ওকে কে গলা টিপে মেরে ফেলছে।

ওর মা-ই তখন চেঁচিয়ে বলে, 'আল্লা গো, আর দেখতে পারিনে, তুলে নাও বাছাকে তোমার কাছে। ও মরে বাঁচুক।'

চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

খোকা কান্না থামিয়ে সেই নোনাজল চাটে, আবার কাঁদে।

মেয়েদের ঘর থেকে শাশুড়ি তার নবাগত নাতিকে মেয়ের কোলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসে কান্নাকটু কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, 'মর্ মর্ মর্ তোরা ! এত লোককে নেয়, আর তোদেরই ভুলেছে যম।' তারপর বৌদের উদ্দেশ্যে করে বলে, 'নে লা বেটাখাগীরা, তোদের এই হারামদের মাথা চিবিয়ে খা। মাগিরা শুয়োরের মতো ছেলে বিইয়েছে সব। বাপরে বাপ ! জান যেন তেতবিরক্ত হয়ে গেল !' বলেই সে উচ্চৈঃস্বরে তার মৃত পুত্রদের নাম করে কাঁদে। ততক্ষণে বড়-বৌ জলের ঘড়াটা নামিয়ে বড় ছেলেমেয়ে দুটোকে ধরতে না পেরে এক বছরের ছোট মেয়েটার পিঠেই মনের সাধে ঝাল মেটাতে থাকে।

মেজো-বৌ ছাড়াতে যায়, পারে না। মেয়েটাকে ছাড়াতে গিয়ে তারও পিঠে পড়ে দু-এক ঘা ! মেজো-বৌ হাসে, আর বাকি ছেলেগুলোকে পালাবার ইঙ্গিত করে।

তার নিজের ছেলেমেয়ে দুটির দিকে চেয়েও দেখে না। ওরা যেন ওদের মায়ের গুণ পেয়েছে। বাড়ির মধ্যে ঐ ছেলেমেয়ে কয়টাই যা শান্ত। খিদে পেলে চুপি চুপি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'মা, বড্ডো খিদে পেয়েছে।'

আজও মেজো-বৌ যখন বড় বৌ-এর ক্রন্দনরত ছোট মেয়েটাকে বুকে করে দোলা দিতে দিতে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তখন তার ছেলেমেয়েরা স্থির শান্তভাবে একটা কাঁচা কৎবেল ভেঙে সেইটে দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করছিল। কেবল ছোট ছেলেটি তার মায়ের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল।

হঠাৎ সে বলে উঠল, 'বুবু। অ-বু-উ ! মা আবার মেনিকে নেমিয়ে দেবে কোল থেকে ?'

কাঁচা কৎবেলের কষায় রসে তার বুবুর জিহ্বা তখন তালুতে ঠেকেছে গিয়ে। সে কোনো-রকমে বলল, 'হু'।

মেজো-বৌ তার ছেলেমেয়ের দিকে ফিরে বলল, 'পট্‌লি, যা দেখি চারটে কাঠ কুড়িয়ে আন্ গিয়ে, আমি তোদের তরে ক্ষীর রেঁধে দিচ্ছি।'

মায়ের ভয়ে যে ছেলেমেয়ে কয়টির এতক্ষণ উদ্দেশ ছিল না, ক্ষীরের উল্লেখে তারা এইবার যেন মন্ত্রবলে পাতাল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল।

মেজো-বৌকে ঘিরে নেচে-কুঁদে তার কাপড় টেনে চেঁচিয়ে চিল্লিয়ে ওরা যেন একটা পেল্লায় কাণ্ড বাঁধিয়ে দিলে। যেন মেজো-বৌকেই ছিঁড়ে খাবে।

এক পাল ছাতার পাখি যেন একটা পোকা দেখতে পেয়েছে।

মেজো-বৌয়ের ছোট ছেলেটি এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এইবার সে আস্তে আস্তে তার ক্রন্দন-রত দাদীর কোলে এসে বসে কী ভাবতে লাগল ; তারপর তার গায়ের ছেঁড়া ময়লা জামাটা খুলে দাদীর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'দাদী, চুপ কর, মা ক্ষীর রাঁধছে, তুই খাবি, আমি খাব, বু খাবে।'

তার দাদীর কান্না থামে। ঐ ক্ষুদ্র শিশু। তার বাবাও ছিল ছেলেবেলায় ঠিক এমনটি দেখতে। কার জন্য কাঁদছে সে? এই তো তার সোভান। ঐ যাদের এত করে গালি দিচ্ছিল যে, তারাই তো তার বারিক গজালে। খিদে পেলে এমনি করে কাঁদত তারা। কাঁদলে সোভান এমনি করে কোলে বসে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলত, 'মা, তুই কাঁদিসনে, আমি বড় হয়ে তোকে তিন কুড়ি টাকা এনে দেব।' কে বলে সোভান মরেছে ? এত তো সে-ই এসেছে আবার তেমনি খোকাটি হয়ে। এই তো রয়েছে তার গলা জড়িয়ে ধরে। চুমায় চোখের জলে শিশুর মুখ অভিষিক্ত করে দেয়।

শিশুর ক্ষুদ্র মুখ ঝলমল করে চিরদুঃখিনীর কোলে—যেন বর্ষা রাতের ম্লান চাঁদ।

শিশু হঠাৎ দাদীর কোল থেকে উঠে দৌড়ে মায়ের গায়ে মাথা হেলান দিয়ে বসে। আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে কি ভাবে। চোখের সামনে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুঘু উড়ে যায়। নীল স্বচ্ছ আকাশ–রোদ লেগে যেন আরো করুণ হয়ে ওঠে। কত দূর ঐ আকাশ !

হঠাৎ সে মার আঁচল টেনে বলে, 'মা, তুই যে বলেছিলি, ক্ষীর–পরবের দিন বা–জান আসবে। আজ আমরা ক্ষীর রাঁধছি যে, বা–জান আসবে ও–ই মেঘ ফুঁড়ে ! লয় !'

মা শুকনো পাতার উপর লুটিয়ে পড়ে। মুখের গান তার চোখের জলে ভেসে যায় !—শুকনো আমপাতা আপন মনে পুড়তে পুড়তে তার দিকে এগোয়।

শাশুড়ি ছুটে এসে লুটিয়ে–পড়া বৌকে তুলবার চেষ্টা করতেই মেজো–বৌ অমনি ধড়মড়িয়ে ওঠে, তারপর কাঠি দিয়ে উনুনে পাতা ঠেলে।

এইবার খোকা কিছু না বলে চুপ করে বসে থাকে।

তার দাদী বলে, 'দেখ বৌ, সোভান দিনরাত এমনি মন–মরা হয়ে থাকত ছেলেবেলা থেকেই।'

মেজো–বৌ আবার গুন গুন করে গান করে।

শাশুড়ি বলে, 'আ মলো যা ! ছুঁড়ি যেন দিনকের দিন কচি খুকি হয়ে উঠেছে। যখনি কান্না, তখনই হাসি।' বলেই খোকাকে টেনে কোলে তুলে অকারণে সারা উঠান ঘুরে বেড়ায়।

খোকা অনর্গল প্রশ্ন করে, 'দাদী গো, বা–জান এখন খু–ব বড় হয়ে গেয়েছে—লয় ? সেই যে কয়েছিল, আমার জন্যে বিস্কুট আনবে—। হু–ই গোয়াড়ির বাজার—সে অনেক দূর ! লয় দাদী ? এনেক দিন লাগে যেতে আসতে। লয় দাদী ? আমার লাল জামাটা লালুকে দিয়ে দিব, বা–জান আর একটা লাল জামা আনবে। লয় দাদী ?

দাদী কতক শোনে, কতক শোনে না। উঠোনময় ঘুরে বেড়ায়।

সেজো–বৌ শুয়ে শুয়ে ক্ষীর–রান্না দেখে। কচি ছেলেটা ততক্ষণে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে মায়ের বুকের হাড়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

ক্ষীর–রান্না হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা যে যেখানে যা পায়—থালা, বাটি, ঘটি, বদনা—তাই নিয়ে উনুন ঘিরে বসে যায়।

অপূর্ব সেই ক্ষীর ! অদূরে দারোগা মির্জা সাহেবের বাড়ি। তাঁরই বাড়ির দুধ বেড়ালে খেতে না পেরে যে–টুকু ফেলে গিয়েছিল, তাই দারোগা–গিন্নি পাঠিয়ে দিয়েছেন এদের বাড়ি। তাঁর অপার করুণা, তাই সে স্বল্প দুধে জল মিশিয়ে আধ–পোয়া দুধকে আধ সের করে ঝি'র হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই না–চাইতেই জল পেয়ে এদের সকলের চোখ দিয়ে যে কৃতজ্ঞতার জল পড়েছে, তা ঐ আধ–সের জলের অনেক বেশি।

বাড়িতে চাল ছিল সেদিন বাড়ন্ত। মুরগির সদস্য খোলা হতে ওঠা বাচ্চাগুলির জন্য যে খুদগুঁড়ার রিজার্ভ স্টোর ছিল ছটাক তিনেক, দারোগা-বাড়ির দুগ্ধ সংযোগে তাই সিদ্ধ হয়ে হল এই উপাদেয় ক্ষীর। এই ক্ষুধিত শিশুদের এই আজকের সারাদিনের আহার।

এই তাদের ক্ষীর-পরব—ঈদ্।

লবণ-সংযোগে শিশুদের সেই অপূর্ব পরমান্ন খাওয়া দেখে চক্ষে জল এল শুধু মেজো-বৌয়ের।

সে তাড়াতাড়ি কচার বেড়ার কাছে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কয়েকটা কচাপাতা নিয়ে কাঠি দিয়ে সিইয়ে তাই বাটির মতো করে তাতে খানিকটা ক্ষীর ঢেলে সেজো-বৌয়ের কাছে এনে ধরল।

সেজো বৌ উঠে বসে করুণ কণ্ঠে বলল, 'মেজো-বু, তুমি?'

মেজো-বৌ একটু হাসলে। রাহুগ্রস্ত চাঁদের কিরণের মতো ম্লান পাণ্ডুর সে হাসি।

সেজো-বৌ মেজো-বৌকে জানত। সে আর কিছু না বলে খেতে খেতে হঠাৎ থেমে বলে উঠল, 'খোকা কি এই ক্ষীর খাবে মেজো-বু?'

মেজো-বৌ জলের ঘড়াটা নামিয়ে রেখে হাটতা আগুনের তাতে ধরে বলে উঠল, 'উঃ কোমর কাঁকাল ধরে গেল মেজো-বৌ, কাল থেকে তুই জল আনিস আমি বরং ধান ভানব।' বলেই হাতটা সেকতে সেকতে বলতে লাগল, 'আমার হাত ফুলে গেল, গতরখাগীকে মারতে মারতে। হারামজাদীর পিঠ ত নয়, পাথর।'

ছেলেমেয়েরা ততক্ষণে ক্ষীর খেয়ে মহানন্দে 'বৌ পালালো' খেলছে। ওদেরই একজন পলায়নপরায়ণা বধূ হয়ে তার না-জানা বাপের বাড়ির পানে দৌড়েছে এবং তার পিছনে বাকি সবাই গাইতে গাইতে ছুটছে—

'বৌ পালালো বৌ পালালো ক্ষুদের হাঁড়ি নিয়ে,
সে বৌকে আনতে যাব মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে।'

পাঁচ

সন্ধ্যে হব-হব সময় প্যাঁকালে হাতে চাল-ডাল, বগলতলায় ফুটগজ, পকেটে কন্নিক-সূত, আর মুখে পান ও বিড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

ছেলেমেয়ে তাকে যেন ছেঁকে ধরল।

চাল-ডালের মধ্যে একটা বোয়াল মাছ দেখে তারা একযোগে চিৎকার করে উঠল। যেন সাপের মাথায় মানিক দেখেছে।

প্যাঁকালে তার কোটের হাতায় হাত দুটো মুছে তিনটে ছোট কাগজের পুরিয়া বের করে বলল, 'আজ নলিত ডাক্তারের বাড়ির খানিকটা পলস্তারা করে দিয়ে এই ঔষুধ নিয়ে এসেছি সেজো-ভাবীর তরে। দাঁড়া, এক পুড়িয়া খাইয়ে দিই আগে।'

সেজো-বৌ ওষুধ দেখে খুশি হয়ে বলে উঠল, 'ই কোন্ ওষুধ ছোট-মিয়ে? এলোপাতাড়ি না হৈমুবাতিক?'

প্যাঁকালে বিজ্ঞতার হাসি হেসে বলল, 'ই এলিওপাতি নয় সেজো-ভাবী, হোমিওবাতি। গুড়ের মত মিষ্টি। খেয়েই দেখ।'

ওষুধ খেয়ে সেজো-বৌয়ের মনে হতে লাগল, সে যেন ক্রমেই চাঙ্গা হয়ে উঠছে। সে তার খুশি আর চেপে না রাখতে পেরে বলতে লাগল, 'আর দুটো দিন যদি ওষুধ পাই মেজোবুবু, তা হলে আসছে-মাস থেকেই আমি একা একরাশ ধান ভান্‌তে পারব।'

মেজো-বৌ চাল-ডাল তুলতে তুলতে বলল, 'তাই ভালো হয়ে ওঠ্ ভাই আল্লা করে, আমি আর পারি না ঢেঁকিতে পাড় দিতে। আমার কাপড় সেলাই-ই ভালো, ওতে দু-পয়সা কম পেলেও সোয়াস্তি আছে।'

বড়-বৌ বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়ে তার ঘুঁটে-দেওয়া হাতের গোবর চেঁছে তুলতে তুলতে বলল, 'ঐ সেলাইটা আমায় শিখিয়ে দিতে পারিস্‌নে মেজো-বৌ! তবে রীপু করাটা কিন্তু আমায় দিয়ে হবে না।'

মেজো-বৌ হাসে, আর গুন্ গুন্ করে গান করতে করতে মাছ কোটে। ছেলেমেয়েদের দল মেজো-বৌকে ঘিরে হাঁ করে মাছ কোটা দেখে আর কে মাছের কোন অংশটা খাবে, এই নিয়ে কলহ করে। যেন কাঁচাই খেয়ে ফেলবে ওরা।

বড় ছেলে-মেয়ে দুটোতে মিলে ইদারায় জল তুলে দিতে বলে, 'আচ্ছা ছোট চাচা, আজ মাছের মুড়োটা ত তুমিই খাবে? পট্‌লি বলছিল, ছোট-চা আজ আমায় দেবে মুড়োটা!'

প্যাঁকালে স্নান করতে করতে কী ভাবে! শুধু বলে, 'হুঁ'!

তার এই 'হুঁ' শুনে ছেলেটি আতঙ্কিত হয়ে উঠে বলে, 'আচ্ছা ছোট্-চা, আমাকে কাল থেকে 'যোগাড়' দিতে নিয়ে যাবে? উ-ই ও পাড়ার ভুলো ত আমার চেয়ে অনেক ছোট, সে রোজ দু আনা করে আনে 'যোগাড়' দিয়ে।—আচ্ছা ছোট্-চা, দু আনায় একটা মাছ পাওয়া যায় না?'—তারপর তার বোনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কাল থেকে আমার একটা একটা মাছ! দেখাবো আর খাব! ঐ পট্‌লিকে যদি একটা আঁশ ঠেকাই তবে আমার নাম গোরাই নয়, হুঁ হুঁ।'

তার বোন মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে কি একটা মতলব ঠাওরায়। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমিও কাল থেকে দারোগা সায়েবের খুকির গাড়ি ঠেলব—হুঁ হুঁ। আমায় সায়েব তিন ট্যাকা করে মাইনে দেবে বলেছে! দু'আনা লয়—তিন ট্যাকা। আমিও তখন ছোট্-চা'কে দিয়ে জিলিবি আর মেঠাই আনাব!'

প্যাঁকালে স্নান সেরে তার বোনের আঁতুড়-ঘরে ঢুকে বলল, 'কই রে পাঁচি, তোর ছেলে দেখা!'

পাঁচি কিছু বলবার আগেই ওর মা ছুটে এসে বলল, 'হ্যাঁরে প্যাঁকালে, শুধু হাতে দেখবি কি করে!'

প্যাঁকালে নিজের রিক্ততায় সঙ্কুচিত হয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা, কাল কিংবা আর একদিন দেখব এসে। আমার—শালার-মনেই ছিল না যে, শুধু হাতে দেখতে নেই।' বলেই সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে মেজো-বৌয়ের কাছে গিয়ে বসলো।

মাছটা চড়িয়ে দিয়ে তখন মেজো-বৌ ভাতের ফেন গালছিল। এধার ওধার একটু চেয়ে নিয়ে সে বলল, 'সেজো-বৌ কিন্তু বাঁচবে না ছোট-মিঁয়ে!' বলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে লাগলো, 'ওরা মায়েপোয়েই যাবে এবার। আজ সারাদিন যা করেছে ছেলেটা! মায়ের বুকে এক ফোঁটা দুধ নাই, আজ এই সব হেঙ্গামে আবার ছাগলটাও ছেড়ে ফেলেছিলাম। ঐ ছাগলের দুধই তো বাছার জান! একটুকু দুধের জন্য ছেলেটা যেন ডেঙ্গার মাছের মতন তড়পেছে! তবু ভাগ্যিস, দারোগা সায়েবের বিবি একটুকু দুধ দিয়েছিল। তারই একটুকু রেখেছিলাম, কিন্তু ছেলে তার দু-চামচের বেশি খেলে না। কেঁদে কেঁদে এই একটু ঘুমিয়েছে।' বলেই ভাতের হাঁড়িতে ঝাঁকানি দিয়ে ভাতগুলো উল্টে নিয়ে মুখের সরাটা একটু ফাঁক করে পাশে রেখে দিল।

প্যাঁকালে কিছু না বলে আস্তে আস্তে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ছয়

হঠাৎ সেদিন সেজোবৌয়ের অবস্থা একেবারে যায়-যায় হয়ে উঠল। 'ছিটেন' পাড়ার নকড়ি ডাক্তার তাঁর বৈঠকখানাটা বিনি পয়সায় চুনকাম করে দেবার চুক্তিতে দেখতে এলেন। বললেন, 'গরিব লোক তোরা, বিজিট আমি নেব না বাপু—আমার বৈঠকখানাটায় একটু গোলা দিয়ে দিবি, তা দিনতিনেক খাটলেই চলে যাবে, কি বলিস?'

প্যাঁকালে চোখের জল মুছে কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে ডাক্তার বাবুর দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

নকড়ি ডাক্তার নাড়ি দেখে বললেন, 'অবস্থা বড় ভালো ঠেকছে না রে, হার্টফেল করার বড্ডো ভয়।'

মেজো-বৌ ইশারায় প্যাঁকালেকে ডেকে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'আচ্ছা বেঁহুশ ডাক্তার তো, রোগীর কাছে তার অবস্থা এমনি করে বলে নাকি?'

নকড়ি ডাক্তার বোধ হয় ততক্ষণে মেজো-বৌয়ের ইশারার মানে বুঝে নিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সে প্যাঁকালেকে ডেকে বলল, 'ওরে, তোদের বাড়ি মুরগির বাচ্চা আছে তো? একটু ঝোল করে খাওয়া দেখি। এখ্খুনি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। ভাবিস্নে কিছু, ও ভালো হয়ে যাবে 'খন।' বলেই হাই তুলে দুটো তুড়ি মেরে মেজো-বৌয়ের মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। যেন গিলে খাবে! মেজো-বৌ একটু হেসে হেঁসেল ঘরে সরে গেল। বড়-বৌ বলে উঠল, 'কি লা হাসছিস যে বড়!'

মেজো-বৌ ডাক্তার শুনতে পায় এমনি জোরেই বলে উঠল, 'আখার বাসি ছাইগুলোর কিনারা হল দেখে।' বলেই একটু হেসে আবার বলে উঠল, 'যেমন উনুন-মুখো দেবতা, তেমনি ছাই-পাশ নৈবেদ্যি।'

ডাক্তার ততক্ষণে উঠে পড়েছে। তখন রোগীর চেয়ে তার নিজের নাড়িই বেশি চঞ্চল।...

মেজো-বৌয়ের রূপ পাড়ার নিত্যকার আলোচনার বস্তু। দুঃখের আগুনে পুড়েও ও সোনা যেন একটুকু মলিন হয়নি। বর্ষা-ধোয়া চাঁদনির মতো আজও ঠিক্‌রে পড়ছে রূপ। পাড়ার মেয়েরা বলে, 'মাগি রাড় হয়ে যেন ষাঁড় হচ্চে দিনকে-দিন।'

ওর সবচেয়ে বদ-অভ্যাস, কারণে-অকারণে ও হাসে। অপরূপ সে হাসি।—যেন ফুটে-ওঠা ফুল, হঠাৎ চন্দ্রোদয়।

ডাক্তার মেজো-বৌয়ের শূন্য নিটোল হাত দুটি, এক জোড়া সাদা পায়রার মতো পা আর ঘোমটার অবকাশে সোনার বলয়ের মতো ঠোঁটসহ আধখানি চিবুক ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়নি। কিন্তু এতেই তার নাড়ি একশ পাঁচ ডিগ্রি জ্বরের রোগীর মতোই দ্রুত চলছিল।

দোরের কাছে হঠাৎ একটু থেমে ডাক্তার বলল, 'হ্যাঁরে মুরগির ডিম আছে তোদের বাড়ি? একটু ওষুধের জন্য বড্ডো দরকার ছিল আমার।'

ডাক্তারবাবু চেয়েছেন, এতেই যেন প্যাঁকালে বাধিত হয়ে গেল। সে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'এজ্ঞে, তা আছে বৈ-কি—এই এনে দিচিছ।' বলেই সে ঘরে ঢুকতেই মেজো-বৌ একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলল, 'আণ্ডা-টাণ্ডা পাবে না ছোট-মিয়ে! বলে দাও গিয়ে, বাড়িতে আণ্ডা নেই। অ মলো, মিন্‌সে যেন কি-বেলে-না-তাই। ও আণ্ডা কটা বিক্রি করে একবেলার দু'মুঠো ভাত উঠবে বাছাদের মুখে।'

প্যাঁকালে ততক্ষণে গোটা আটেক ডিম নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। ডাক্তার স্টেথিস্‌কোপ্‌টা তার ঝোলা-পকেট থেকে বের করে দিব্যি খুশি হয়ে ডিমগুলি পকেটস্থ করলেন।

মেজো-বৌ একটু চেঁচিয়েই বলল, 'ডাক্তারের গলায় ওটা কি ঝুলছে ছোট মিয়ে? মিন্‌সে কি গলায় দড়ি দিলে?'

প্যাঁকালে এবার একটু রেগেই বলে উঠল, 'তুমি থাম মেজো-ভাবী, সব সময় ইয়ে ভাল লাগে না, হেঁ।'

মেজো-বৌ সে-কথায় কান না দিয়ে গুন গুন করে গান ধরে—

'কত আশা করে সাগর সেঁচিলাম
মানিক পাবার আশে,
শেষে সাগর শুকাল মানিক লুকাল
অভাগিনীর কপাল-দোষে।'

গান তো নয়—যেন বুক-ফাটা কান্না!

বড়-বৌ তন্ময় হয়ে শোনে আর বলে, 'সত্যি মেজো-বৌ, বড় ঘরে জন্মালে তুই জজসাহেবের বিবি হতিস্‌।' বলেই খুব বড় করে নিশ্বাস ফেলে।

মেজো-বৌ সে-কথায় কান না দিয়ে উনুন নিকুতে নিকুতে আপন মনে গেয়ে চলে। যেন তার শ্রোতা এ-জগতে কেউ নয়।

'নিঠুর কালার নাম করো না,
কালার নাম করিলে প্রাণ কাঁদিবে
কালায় পড়িবে মনে গো!
নিঠুর কালার নাম করো না!'

গানের সুর তার অতিরিক্ত কাঁপে—নিশীথ রাতের বাদলা-হাওয়া যেমন করে কাঁপে বেণুবনে।

বড়-বৌ সব বোঝে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে যেতে যেতে মেজো-বৌয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'আজ তুই চোখের পানিতে আখা নিকুবি নাকি?'

সেজো-বৌয়ের খোকা কেবল কাঁদে—দিবারাত্তি সে কান্নার আর বিরাম নেই। যেন পাট পচিয়ে তার ছাল-মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে—বাকি আছে শুধু হাড়-পাঁকাটি।

মেজো-বৌ এসে কোলে তুলে নেয়। বলে, 'আহা! বাছার পিঠে ঘা হয়ে গেল শুয়ে শুয়ে।' তারপর মনে মনে বলে, 'হায় আল্লা, এই দুধের বাচ্চা কী অপরাধ করেছিল তোমার কাছে? মারতেই যদি হয়, এমন কাঁদিয়ে না মেরে তুলে নাও বাছাকে।' তারপর বুকে জড়িয়ে চুমো খেতে থাকে।

সেজো-বৌ দেখে আর কাঁদে। বলে 'মেজোবু, তুমিই ওর মা। আমি তো চললাম, তুমিই ওকে দেখো। আর যদি ও-ও যায়—'

আর বলতে পারে না, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। পশ্চিমের দিকে মুখ করে সকল অন্তর দিয়ে প্রার্থনা করে, 'আল্লা গো, অনেক অনেক দুষ্‌কুই দিলে, আর দিও না। বাছাকে যদি নিতেই হয়, আমার দুদিন পরেই নিলে।'

মেজো-বৌ খোকাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বলে, 'তুই চুপ কর্ সেজো! মরতে চাইলেই তোকে মরতে দেবো নাকি লা? এই বেটার রোজগার খাবি, বেটার বিয়েতে নাচবি, তারপর নাতিপুতি দেখে তোর ছুটি।'—বলেই ঘুমন্ত খোকার চোখে চুমু খেয়ে বলে, 'খোকার বিয়ে দিব কাজিবাড়িতে।'

আবার অকারণ হাসি! হাসিতে মুখ-চোখ যেন রাঙ্গা টুকটুকে হয়ে ওঠে! খোকাকে তার মায়ের পাশে শোয়াতে শোয়াতে গায়—

'যাদু আমার লাঙল চষে, দুধারে তার কাল গরু,
যাদুর বেছে বেছে বিয়ে দিব পেট মোটা মাজা সরু।'

সেজো-বৌও হাসে—বালুচরে অস্ত-চাঁদের ক্ষীণ রশ্মিরেখাটুকুর মতো।

সাত

দিন যায়, দিন আসে, আবার দিন যায়।

এরই মধ্যে একদিন গজালের মা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকে একেবারে মেজো-বৌয়ের পায়ের ওপর পড়ে মাথামুড় খুঁড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গালি, উপরোধ, অনুরোধ, অনুনয়, বিনয়—তার কতক বোঝা গেল, কতক গেল না।

মেজো-বৌ তাড়াতাড়ি তার শাশুড়ির মাথাটা জোর করে পায়ের ওপর হতে সরিয়ে দুহাত পেছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। সে এর কারণও বুঝেছিল। তবু কটু কণ্ঠেই বলে উঠল, 'একি মা, তুমি আমার পা ছুঁয়ে আমায় 'গুনায়' (পাপে) ফেলতে চাও নাকি? কেন, কি করেছি আমি?'

তার শাশুড়ি কান্না-বিদীর্ণ-কণ্ঠে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'তা বল্‌বি বৈ কি লা, আমার জোয়ান-পুত-খাগি। আমার বেটার মাথা খেয়ে এখন চল্‌লি নিকে করতে!— ভাল হবে না লো, ভাল হবে না। এই আমি বলে রাখছি, বিয়ের রাতেই জাত-সাপে খাবে তোদের দুই জনকেই।'—আবার চিৎকার!

তখন ভর-দুপুর ! প্যাঁকালে কাজে চলে গেছে। ছেলেমেয়েরা বেরিয়েছে—কেউ কাঠ কুড়োতে, কেউ বা গোবর কুড়োতে।

সেজো-বৌ শুয়ে শুয়ে ধুঁক্‌ছে। তার পাশে খোকা, যেন গোরস্থানের নিবু-নিবু মৃৎ-প্রদীপের শেষ রশ্মিটুকু। শুধু একটু ফুঁয়ের অপেক্ষায় আছে।

বড়-বৌ উঠোন নিকোনো ফেলে স্তম্ভিত হয়ে দেখছিল, শুনছিল সব। এইবার সে ভয় ও বিষাদ-জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল, 'সত্যি নাকি মেজো-বৌ?'

মেজো-বৌ আস্তে বলল, 'সত্যি নয়।'

এই দুটি কথার আশ্বাসেই শাশুড়ি যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। সে হঠাৎ কান্না থামিয়ে মেজো-বৌয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, 'সত্যি বলছিস্ মা আমার? সত্যি তুই নিকে করবিনে? তবে যে ভোলাদের ঘরে শুনে এলাম, তোকে নিকে করতে তোর বোনাই কলকেতা থেকে এয়েছে? তাই তো বলি, ঐ বুড়ো মিনসে—থাক্ না ওর টাকা—ওকে কি তুই নিকে করতে পারিস? তাছাড়া মা, তোর এই ছেলেমেয়ে দুটোর মায়াই বা কাটাবি কি করে বল তো? নিকে করলে ছেলেমেয়ে দুটোকে ছেড়ে দিচ্ছিনে।'

মেজো-বৌ বড় বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে অন্য কাজে গেল।

বড়-বৌ-মেজো-বৌকে ভালো করেই জানত। সে জানে, মেজো-বৌ মিথ্যা বলে না এবং যা বলে, তা চিরকালের জন্যই সত্য হয়ে যায়। সে মেজো-বৌর হাসির মানে বুঝে উঠোন নিকোতে চলে গেল। যেতে যেতে সেও একটু হেসে বলে গেল, 'পাড়ার গতর-খাগিদের যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তোমারও মা তেমনি যত সব কি-বলে-না-ইয়ে—'

শাশুড়ি একটু লজ্জিত হয়েই চোখ মুছে বড়-বৌ যেখানে উঠোন নিকুচ্ছিল, সেখানে এসে চুপ করে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ লা বড়-বৌ, সত্যিই ছুঁড়ি নিকে করবে না তো? ছুঁড়ির যা রূপ ঠিকরে পড়ছে এখনো, তার ওপর পাড়ার মাগনেড়ে হতচ্ছাড়ারা দিনরাত আছে ছুঁড়ির পানে হা-পিত্যেশ করে তাকিয়ে। আ মলো যা! ড্যাকরারা যেন হুলো বেড়াল! ইচ্ছে করে, দিই চোখে 'লগা' ঠেলে। আর ঐ বুড়ো মিন্‌সে—ওর বোনের সোয়ামী—মিনসে যে ওর সানি-বাপ! মিনসের লজ্জা করল না কলকেতা থেকে কেষ্টনগর ছুটে আসতে ঐ মেয়ের বয়েসী বৌটাকে নিকে করতে!—ঝ্যাঁটা মার। ঝ্যাঁটা মার!'

আরো কত কি বকে যায় আপন মনে।

বড়-বৌ আজ থাকতে না পেরে একটু রেগেই বলে উঠল, 'আচ্ছা মা, তোমার কি কিছুই আক্কেল হুঁশ নেই? 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।' যা নয় তাই। মেজো-বৌকে যদি তুমি চিনতে, তা হলে এ-কথা বলতে না।' বলেই জোরে জোরে উঠান নিকোয়।

শাশুড়ি বড়-বৌয়ের রাগ বুঝতে পারে। অন্যদিন বৌ এইরকম করে কথা বললে সে হয়তো লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে তুলত। কিন্তু আজ সে সব সয়ে যেতে লাগল। তার বৌ পর হয়ে যাবে না, এই খুশি আজ যেন তার ধরছিল না। তাই আজ বৌ-এর বকুনিও অদ্ভুত মিষ্টি শোনাতে লাগল তার কানে।

কিন্তু আজ অনেক কিছু শুনেও যে এসেছে সে পাড়াতে—তা সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক, পরিপূর্ণ সোয়াস্তি সে পাচ্ছিল না। এও জানতো সে যে, মেজো-বৌকে এর বেশি জিজ্ঞেস করতে গেলে সে হয়তো এখ্‌খুনি বাপের বাড়ি চলে যাবে। রায়-বাঘিনী শাশুড়ি সে, বৌদেরে কথায় কথায় 'নাকের জলে চোখের জলে' করে। কিন্তু মেজো-বৌকে কেন যে তার এত ভয়, কেন যে ওকে আর বৌদের মতো করে গাল-মন্দ দিতে পারে না, তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

মেজো-বৌর দু-দুটো ছেলেমেয়ে হলেও তার শরীরের বাঁধুনি দেখে আজও আইবুড়ো মেয়ে বলেই ভ্রম হয়। বিধবা সে, তবু পান তো খায়ই, দু-একদিন চুড়িও পরে—রঙিন রেশমি চুড়ি। আবার তার পরের দিনই ভেঙে দেয়। কাপড়টাও তার পরবার ঢং একটু খেরেস্তানি ধরনের। সিঁথিটা সে সোজাই কাটে হয়তো ; মেয়েরা কিন্তু বলে, ও বাঁকা সিঁথি কাটে। খোঁপায় তার মাঝে মাঝে গাঁদা ও দোপাটি ফুলের গুচ্ছ দেখা যায়। হাসি তো লেগেই আছে ঠোঁটে, তার ওপর দিনরাত গুন গুন করে গান।

তবু পাড়ার কেউ ওর বদনাম দিতে সাহস করেনি আজও। ও যেন পাড়ার ছেলেমেয়ে সব্বারই আদরের দুলালি মেয়ে।

শাশুড়ি যখন-তখন যার-তার কাছে বলে, 'মা গো, আমি যেন আগুনের খাপরা বুকে নিয়ে আছি !'

মেজো-বৌ সত্যিই যেন আগুনের খাপরা। রূপ ওর আগুনের শিখার মতোই লক্‌লক্ করে ! কিন্তু ধরতে গেলে হাতও পোড়ে। ঐ হাত পোড়ার ভয়েই হয়তো পাড়ার মুখপোড়ারা ওদিকে হাত বাড়াতে সাহস করে না।

ও যেন বসরা-গোলাবের লতা। শাখা-ভরা ফুল, পাতা-ভরা কাঁটা।

ও যেন বোবা টাকা। শুধু রূপো, খাদ নেই। বাজাতে গেলে বাজে না। লোকে জানে, ও টাকা দিয়ে সংসার চলে না। খুব জোর, গলায় তাবিজ করে রাখা যায় ! ...

কিন্তু এ নেকার জনরবটা নিছক মিথ্যা নয়।

মেজো-বৌয়ের বোনের সোয়ামি সত্যি বড়লোক—কলকাতার চামড়াওয়ালা। আগে তার নাম ছিল ঘাসু মিঞা, এখন সে ঘিয়াসুদ্দিন আহমদ। পূর্বে সে ঘোড়ার গাড়ি চালাত, এখন ঘোড়ার গাড়িই তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

'ঘিয়াসুদ্দিন' নামে প্রমোশন পেয়ে যাওয়ার পর থেকে সে আর শ্বশুরবাড়ি মাড়ায় নি। স্ত্রী তার চির-রোগী। কাজেই বিয়ে তাকে আরো দুটো করতে হয়েছে। সে বলে,

এক বিয়েতে ইজ্জত থাকে না লোকের কাছে। তার শালী—অর্থাৎ মেজো-বৌকে সে আগেই দেখেছিল। কাজেই মেজো-বৌ বিধবা হবার পর থেকেই তার শ্বশুর-বাড়ির দিকে টানটা আবার নতুন করে আরম্ভ হয়েছে।

বড়লোক জামাইকে দেখে শ্বশুর-শাশুড়ি খুশির চেয়ে সন্ত্রস্তই হয়ে ওঠে বেশি। নিজেদের দারিদ্র্যের লজ্জায় সর্বদা যেন এতটুকু হয়ে যায় জামাইয়ের কাছে। অবশ্য বাইরে এ নিয়ে বারফট্টাই করতেও ছাড়ে না।

মেজো-বৌয়ের বাপের বাড়ি শ্বশুর-বাড়ির একটু দূরেই কুড়চিপোতায়। কাজেই সে যখন ইচ্ছা বাপের বাড়ি চলে যায়। শাশুড়ি এতে মনঃক্ষুণ্ণ হলেও জোর করে কিছু বলতে পারে না। ওর সর্বদা ভয়, বেশি টান দিলেই বুঝি এই ক্ষীণ সুতোটুকু ছিঁড়ে যাবে !

শাশুড়ি-মেজোবৌয়ে যেন ঘুড়ি খেলা চলেছে। মেজো-বৌ খেলে বেড়ায় মুক্ত আকাশে মুক্ত বাতাসে। শাশুড়ি মনে করে, হাতের বন্ধন এড়িয়ে ও চলে যেতে চায় সুতো ছিঁড়ে। তাই বাতাস যত জোর বয়, ও তত সুতো চেপে না ধরে সুতো ছেড়েই দিতে থাকে। কিন্তু ও সুতোরও শেষ আছে ! তাছাড়া ঐ পচা সুতোর জোরই বা কতটুকু—তাও তো অজানা নেই ওর। তাই তার অস্বোয়াস্তির আর অন্ত নেই।

অন্য বউদের নিয়ে সে ভয় নেই বলেই সে ওদের ওপর অত নির্মম হতে পারে।

রূপের একটা মোহ আছে। ওতে যে শুধু পুরুষই মুগ্ধ হয় তা নয়, দজ্জাল মেয়েও রূপের আঁচে না গলুক, নরম হয়ে পড়ে অনেকটা।

বাড়ির পশুপক্ষীগুলো পর্যন্ত যেন ওর আকর্ষণ অনুভব করে। ওদের একটা গাই ছিল, দুঃখে পড়ে তাকে বিক্রি করে দিতে হয়েছে,—সে মেজো-বৌ ছাড়া আর কারুর হাতে সহজে খেতে চাইত না।

গরুরও বোধশক্তি আছে কিনা জানি না, কিন্তু যেদিন ধলী গাইটাকে কিনে নিয়ে গেল ও পাড়ার রেমো, সেদিন মেজো-বৌ আর ধলী দু'জনার চোখের জল দেখা গেছিল। আজও প্রায়ই পালিয়ে আসে গাইটা। সারা রাস্তাটা যে রকম ছুটতে ছুটতে আর ডাকতে ডাকতে আসে সে, তা দেখে ও-বাড়ির সবারই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে! এসেই মেজো-বৌকে দেখে সে কি আকুলি-বিকুলি ঐ অবলা পশুর ! গা-হাত চেটে চারপাশে ঘুরে তার যেন আর সাধ মেটে না।

বড়-বৌ বলে, 'মেজো-বৌ, তুই যাদু জানিস্।'

যেদিন ঘিয়াসুদ্দিন কুড়চিপোতা আসত, সেই দিনই মেজো-বৌকে নিয়ে যাবার জন্য তার মা ধন্না দিয়ে বসত এসে। বেয়ানে-বেয়ানে খুব একচোট ঝগড়া হয়ে যেত। মায়ের কান্নায় মেজো-বৌ না গিয়ে পারত না। এই নিয়ে আসার উদ্দেশ্যও সে বুঝত। কিন্তু ওর ঐ রহস্যভরা স্বভাবটুকুর জন্যই সে হয়তো বা ইচ্ছা করেই যেত।

বড়-বৌ হেসে বলত, 'আবার আসবি ও মেজো? মেজো-বৌ হেসে বলত, 'জোড়ে ফিরব বুবু।'

আট

সেদিন ঘিয়াসুদ্দিন শ্বশুর-বাড়ি এসেছে। মেজো-বৌও বোনাইকে দেখতে এসেছে। ও-ই এসেছে কিংবা ওর বোনাই-ই আনিয়েছে—এই দুটোর একটা-কিছু হবে।

আগুন আর সাপ নিয়ে খেলা করতেই যেন ওর সাধ। ঘিয়াসুদ্দিন ওকে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না বলেই এত ঘন ঘন আসে। মেজো-বৌও তা বোঝে, তাই তাকে ঘন ঘন আসায় অর্থাৎ আসতে বাধ্য করে।

সে বলে, 'দুলাভাই, তুমি তোমার গাড়িতে চড়ালে না আমায়?'

ঘিয়াসুদ্দিন যেন হাতে চাঁদ পেয়ে বলে, 'এ নসিবে কি তা আর হবে বিবি? আমার গাড়ি তো তৈরিই, তুমি চড়লে না বলেই তো তা রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রইল।'

মেজো-বৌ মুচকি হাসে। হাসি তো নয়, যেন দুফলা চাকু। বুকে আর চোখে দুই জায়গায় গিয়ে বেঁধে। বলে, 'অর্থাৎ আমি গাড়িতে উঠলেই গাড়ি তুলবে আস্তাবলে। বুবুকে যেমন তুলেছ!'

ঘিয়াসুদ্দিন হঠাৎ থ বনে যায়। বে-বাগ ঘোড়া হঠাৎ মুখের উপর চাবুক খেয়ে যেমন থতমত খেয়ে যায় তেমনি!

একটু সামলে নিয়ে বলে, 'আরে তৌবা, তৌবা! ও কি বদরসিকের মতো কথা বল ভাই! আস্তাবলে কেন, গাড়িশুদ্ধ মাথার ওপরে তুলব তোমায়। তোমার বুবু তো বুকে আছেনই।'

মেজো-বৌ বোনাই-এর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে 'আমায় রাখবে একেবারে মাথায়! এই তো? কিন্তু দুলাভাই, তোমাদের মাথা কি সব সময় ঠিক থাকে যে, ওখানে চিরদিন থাকব? আরো দুজনকে তো মাথায় তুলে শেষে পায়ের তলায় নামিয়ে রেখেছ!'

ঘিয়াসুদ্দিনও হটবার পাত্র নয়। সে মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু ভাই, ওরা হল নূনের বস্তা, বেশিদিন কি মাথায় রাখা যায়? তুমি হলে মাথার তাজ, তোমাকে কি তাই বলে মাথা থেকে নামানো যাবে?'

মেজো-বৌ একটু তেড়ছা হাসি হেসে কণ্ঠস্বরে মধু-বিষ দু-ই মিশিয়ে বলে উঠল, 'জ্বি হ্যাঁ, যা বলেছেন! কিন্তু ও পাকা চুলে আর তাজ মানাবে না দুলাভাই! রং সাদা নয়ানসুকের কিসতি-নামা টুপি পর, খাসা মানাবে!' বলেই হি হি করে হাসে।

ঘিয়াসুদ্দিন ঘেমে উঠতে থাকে। কিসের যেন অসহ্য উত্তাপ অনুভব করে সারা দেহ-মনে।

মেজো-বৌ তখনো বাণ ছুঁড়তে থাকে। শিকারী যেমন করে আহত শিকার না মরা পর্যন্ত বাণ ছুঁড়তে বিরত হয় না।

সে বলে, 'পুরুষগুলো যেন আমাদের হাতের গালার চুড়ি। ভাঙতেও যতক্ষণ, গড়তেও ততক্ষণ!'

ঘিয়াসুদ্দিন কী বলতে কী বলে ফেলে। খেই হারিয়ে যায় কথার। বলে, 'আচ্ছা ভাই, তুমি মাথায় না-ই চড়লে, পিঠে চড়তে রাজি তো?'

মেজো-বৌ এইবার হেসে লুটিয়ে পড়ে। বলে, 'হাঁ, তাতে রাজি আছি। যদি চাবুক পাই হাতে!' বলেই বলে, 'সেদিন বাবুদের বাড়িতে কলের গানে একটা গান শুনেছিলাম দুলাভাই,' বলেই সুর করে গায়—

'আমার বুকে পিঠে সেঁটে ধরেছে রে!'

তারপর গান থামিয়ে বলে, 'বুবু আছেন বুকে, এরপর আমি চড়ব পিঠে, তাহলে তোমার অবস্থা ঐ সেঁটে ধরার মতোই হবে যে! তাছাড়া, জান তো, একজন বুকে বসে থাকলে আর একজন পিঠে চড়তে পারে না!'

গান শুনে মেজো-বৌয়ের বড় ভাবী এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে এইবার বলে উঠল, 'কি লো, বোনই এর সাথে যে হাবুডুবু খাচ্ছিস রসে?'

ঘিয়াসুদ্দিন এতক্ষণে যেন কূলের দেখা পেলে বড় শালাজকে পেয়ে। এইবার সে অনেক সপ্রতিভ হয়ে বলল, 'বাবা, নদের মেয়ে ডাকসাইটে মেয়ে এদেশে রসিকতা করে পার পাবার যো আছে? ভাগ্যিস এসে পড়েছ ভাবী, নইলে, এখুনি ডুবে মরেছিলাম আর কি!'

মেজো-বৌ তার ভাবীর দিকে একটু চেয়ে নিয়ে বলল, 'কোথায় ডুবেছিলে, খানায় না সার-কুঁড়ে?—কিন্তু অত ভরসা করো না দুলাভাই, ও কলার ভেলা! ডুবোতে বেশি দেরি লাগবে না।'

ঘিয়াসুদ্দিন হতাশ হয়ে তক্তা পোশে চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, 'না ভাবী, কোনো আশা নেই!'

ভাবী হাসতে হাসতে বলে চলে গেল, 'অত অল্পে হতাশ হতে নেই ভাই পুরুষ মানুষের। যেখানে শক্ত মাটি, সেখানে একটু বেশি না খুঁড়লে পানি পাওয়া যায় না।

মেজো-বৌ কিছু না বলে তামাক সেজে ঘিয়াসুদ্দিনের হাতে হুঁকো দিয়ে বলল, 'এইবার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দাও দেখি একটুকু, সব পরিষ্কার দেখতে পাবে।'

ঘিয়াসুদ্দিন হুঁকোটা হাতে নিয়ে একবার করুণ নয়নে মেজো-বৌয়ের পানে চেয়ে বলল, 'যথেষ্ট পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি ভাই। ধোঁওয়া হয়ে রইলে কিন্তু তুমিই।'

বলেই জোর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হুঁকোয় মন দিলে।

মেজো-বৌ কৌতুক-ভরা চোখে একবার বোনাই-এর পানে চেয়ে উঠবার উপক্রম করতেই ঘিয়াসুদ্দিন হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, 'একটু দাঁড়াও ভাই, একটা কাজ আছে।' বলেই তার হাতের কাছের বাক্সটা হতে একখানি সুন্দর ঢাকাই শাড়ি বের করে বললে, 'এইটে তোমায় নিতে হবে ভাই!'

মেজো-বৌ শাড়িটার দিকে কটাক্ষে চেয়ে হেসে বলল, 'আগে থেকেই কাপড়ের পর্দা ফেলে দিলে বুঝি? কিন্তু এ যে ঢাকাই কাপড় দুলাভাই, বড্ডো পাতলা। আমি যে বিধবা, সে গা তো এ পাতলা কাপড়ে ঢাকা পড়বে না।

বলেই মুখ ফিরিয়ে চোখের জল মুছে চলে গেল। ঘিয়াসুদ্দিনের হাতের কাপড় হাতেই রয়ে গেল।

একটু পরেই মেজো-বৌ হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বলল, 'ওকি দুলাভাই, তুমি এখনও কাপড় হাতে করে বসে আছ? দাও দাও, মন খারাপ করতে হবে না।' বলেই কাপড়খানি হাতে নিয়ে গুন গুন করে গান করতে করতে বেরিয়ে গেল,—'তোর হাতের ফাঁসি রইল হাতে, আমায় ধরতে পারলি না!'

একটু পরেই উঠানে মেজো-বৌয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'না ভাবী, আজ আসি। শাশুড়ি বোধ হয় এতক্ষণ তাঁর মরা ছেলেকে নালিশ করছেন আমার নামে? ও কাপড়টা তোমায় দিলাম। এ পোড়া গায়ে কি অত রঙ চড়াতে আছে? চটে যাবে।—বিনি রঙেই কত বুড়োর চোখ গেল ঝলসে, রঙ চড়ালে না জানি কী হবে!' বলেই বোনাই-এর পানে তাকায়। তারপর ছেলে-মেয়ে দুটির হাত ধরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

সারা পথ তার পায়ের তলায় কাঁদতে থাকে!

নয়

সেদিন বড়-বৌ, প্যাঁকালে, তার মা আর পাঁচিতে মিলে একটা গোপন পরামর্শসভা বসেছিল।

প্যাঁকালে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আমি তা কখনো পারব না। আমি কালই চললাম রানাঘাট। যেখানে রোজ চোদ্দ আনা করে পয়সা পাব।'

তার মা অনুনয়ের স্বরে বলল, 'রাগ করিস কেন বাবা? এমন তো সব গরিব ঘরেই হচ্ছে আমাদের। তাছাড়া ওর চাঁদপনা মুখ যে কিছুতেই ভুলতে পারিনে। অমন বউ পর হয়ে যাবে! আমার কপালই যদি না পুড়বে তাহলে সোভানই বা মরবে কেন, আর তোকেই বা এ উপরোধ করতে যাব কেন?'

পাঁচি মায়ের কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল, 'তা ভাই, তোমার এক আশ্চয্যি লজ্জা। অমন তো কতই হচ্ছে ! একদিন ভাবী বলেছ বলে বুঝি আর ইয়ে করতে নেই ! দুদিন বাধবে, তারপর আপনি সরগড় হয়ে যাবে, দেখে নিও।'

প্যাকালে দাঁত খিচিয়ে বলে উঠল, 'তুই থাম পাঁচি। য লয় তাই ! তুই তবে কেনে নিকে করলিনে তোর ভাসুরকে?'

পাঁচি ছেলের মা হলেও তার ছেলেমানুষি করার বয়স আজো যায়নি। তার ভাসুরকে নিকে করার ইঙ্গিত শুনে সে একেবারে তেলে-বেগুনে হয়ে বলে উঠল, 'তা ইখেনে নিকে করবে কেনে, কুর্শিকে যে বিয়ে করবে খেরেস্তান হয়ে !'

প্যাকালে রেগে উঠে যেতে যেতে বলল, 'রইল তোর নিকে, আমি চললুম !' বলেই বেরিয়ে গেল !

বড়-বৌ বলল, 'তখনি বলেছিলাম মা, যে, এ হয় না। তাছাড়া, তোমার ছেলে রাজি হলেও সে যা মেয়ে—সে কিছুতেই রাজি হত না।'

শাশুড়ি মস্ত বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'কপাল মা, কপাল ! কি করবি বল্ ! ঐ বুড়ো মিনসেই ছিল ছুঁড়ির কপালে !' বলেই তার সোভানকে উদ্দেশ করে কান্না জুড়ে দিল।

বড়-বৌ একটু রেগেই বলল, 'তোমারি মা বাড়াবাড়ি ! জান যে মেজো-বৌ ও নিকেতে রাজি নয়, তবু ঐ নিয়ে দিনরাত কান্নাকাটি। তুমিই তাড়াবে এমনি করে মেজো-বৌকে।'

এমন সময় মেজো-বৌ তার বাপের বাড়ি থেকে এসে পৌছল। বড়-বৌ হেসে বলল, 'কি লো, জোড়ে ফিরলি, না বিজোড়ে?'

মেজো-বৌ বড়-বৌয়ের রহস্যের উত্তর না দিয়ে তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'তা তোমরা যে রকম করে তুলছ অবস্থা, তাতে জোড়াই খুঁজে নিতে হবে দেখছি আমায়।' বলেই শাশুড়ির দিকে চেয়ে বলল, 'মাগো মা ! পাড়ায় টি-টিক্কার পড়ে গেল এই নিয়ে ! কেলেঙ্কারির আর বাকি রইল না ! আচ্ছা মা, এমনি করে তুমি আমায় দেশ-ছাড়া করতে চাও নাকি? তুমি জান, আমার বোন বেঁচে রয়েছে আজো। এক বোন বেঁচে থাকতে আর এক বোনকে নিকে করা যায় কি-না, যাও মৌলবি সায়েবকে জিজ্ঞেস করে এসো?' বলেই দাওয়ায় বসে পড়ে পা দুলোতে লাগলো। ছোট মেয়ে রাগলে যেমন করে।

বড়-বৌ খুশি হয়ে বলে উঠল, 'ঠিক বলেছিস মেজো-বৌ। দেখ ও কথাটা আমাদের কারুর মনেই ছিল না যে, এক বোন থাকতে আর এক বোনকে নিকে করা যায় না। সত্যিই মেজো-বৌ, তোর না-জানা কিছু নেই দেখছি। আমাদের হাফেজ সায়েব হার মেনে যায় তোর কাছে।' বলেই মেজো-বৌ কোনো দিন কোনো বিষয়ে কি ফতোয়া দিয়েছিল, তারই সালঙ্কার বর্ণনা শুরু করে দিল।

তার শাশুড়ির কিন্তু সন্দেহ আর ঘোচে না। সে কান্না থামিয়ে বলে উঠল, 'তুই থাম বড়-বৌ, অমন অনেক দেখেছি। কত জনা আমাদের চোখের সামনে এক বোনকে তালাক দিয়ে আর এক বোনকে নিকে করল। ও মুখপোড়া মিনসের মেজো-বৌয়ের বড় বোনকে তালাক দিতে কতক্ষণ?' বলেই কান্নার জের চালায়।

মেজো-বৌয়ের খোকাটি রোজকার মতো কান্না থামাতে যায়, 'দাদী গো, ছেপ কর।' মেজো-বৌ ছেলেকে হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়। বলে, 'তোর বাবা-কেলে দাদী! পোড়ারমুখো! সব তাতেই ফফর-দালি!'

খোকা ছেলেবেলা থেকেই দাদী-ন্যাওটা! যত মার খায়, তত বলে, 'ও দাদী গো, আমায় মেরে ফেললে।'

বৃদ্ধা বৌ-এর কাছ থেকে ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে মেজো-বৌয়ের বাপ-মাকে গাল দিতে থাকে! তারপর আঁচল দিয়ে খোকার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, 'দেখ বড়-বৌ, সোভান ঠিক এমনটি দেখতে ছিল, ছেলেবেলায় ঠিক এমনি করে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতো! ঠিক তেমনি আওয়াজ।' বড়-বৌ বলে, 'ওর কপালের ঐখেনটা কিন্তু ওর বড় চাচার মত লয় মেজো-বৌ?'

মেজো-বৌ কথা কয় না। দাওয়ায় বসে আনমনে পা দোলায় আর চাপাসুরে গান করে।

সেজো-বৌ পাশ ফিরে কাশতে থাকে। মনে হয়, ওর প্রাণ গলায় ঠেকেছে এসে। কবর দেবার জন্য বাঁশ কাটার শব্দটা যেমন ভীষণ করুণ শোনায়, তেমনি তার কাশির শব্দ।

তার পাশে শিশু আর কাঁদতে পারে না, কেবল ধুঁকতে থাকে; যেন মৃত্যুর পাখার শব্দ।

এরি মধ্যে হঠাৎ একদিন একপাল ছেলেমেয়ে চিৎকার করতে করতে ঘরে এসে বলল, 'ওগো, তোমাদের বাড়িতে পাদরি সায়েব আর মেম আসছে!' বাড়িশুদ্ধ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল! সত্যি-সত্যিই একজন পাদরি সায়েব, সঙ্গে একজন নার্স নিয়ে ঘরে ঢুকলো এসে। বৌ-ঝিরা ঘরে ঢুকে পড়ল। শুধু প্যাকালের মা হতভম্বের মতো চেয়ে রইল সায়েবের মুখের দিকে।

সায়েব বাংলা ভালোই বলতে পারে। বলল, 'টোমরা ভয় করবে না। হামি টোমাদিগের কষ্ট শুনিয়া আসিয়াছে। টোমাডের কে পিরিটো আছে, টাহাকে ঔষুড ডিবে!'

প্যাকালের মা একটু মুশকিলেই পড়ল প্রথমে। পরে আমতা আমতা করে বলল, 'খোদা তোমার ভালো করবেন সায়েব। ঐ আমার বৌ আর তার খোকা শুয়ে। দেখ, যদি ভালো করতে পার। কেনা হয়ে থাকব তাহলে?'

সায়েব খুশি হয়ে বলল, কোনো চিনটা নাই। যিশু বালো করিয়া ডেবে। যিশুকে প্রারঠনা করো।' তারপর এগিয়ে মাটিতেই বসে পড়ে শিশুকে পরীক্ষা করতে লাগল। সায়েব একজন ভালো ডাক্তার।

নার্সকে ইংরেজিতে কী ইঙ্গিত করে সায়েব বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। মুখ তার বিষণ্ণ গম্ভীর।

নার্স সেজো-বৌকে পরীক্ষা করতে লাগল। নার্সের পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর দুজনে বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ বলা-কওয়া করলে কী সব। তারপর প্যাঁকালের মাকে ডেকে কতকগুলো ওষুধ দিয়ে খাওয়াবার সময় ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে চলে গেল। বলে গেল, আবার এসে দেখে যাবে বিকেলে।

প্যাঁকালের মা খুশিতে প্রায় কেঁদে ফেলল, বলল, 'ছুঁড়ির কপাল ভালো মেজো-বৌ, এত ওষুধ খেয়ে ও কি আর মরে? হেদে দেখ, কতগুলোন ওষুধ দিয়েছে।'

মেজো-বৌ বলল, 'মেম সায়েব যাবার বেলায় এক টাকা দিয়ে গেছে সেজো-বৌয়ের পথ্যি কিনতে। বলছে, বেদানার রস খাওয়াতে। বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগল। মেজো-বৌ কাঁদতে লাগল, 'কপালে এত দুক্ষুও লিখেছিলেন আল্লা। সেজো-বৌয়ের যাবার সময়ও ঘরের পয়সায় কিনে দুটো আঙুর কি একটা বেদানা দিতে পারলুম না! শুকিয়ে মরলেও কেউ শুধোয় না এসে। ঝ্যাঁটা মার নিজের জাতের মুখে, গেঁয়াতকুটুমের মুখে! সাধে সব খেরেস্তান হয়ে যায়!'

শাশুড়ি কেঁদে বলে, 'যা বলেছিস মা।'

দশ

সেদিন রবিবার। ছুটি।

প্যাঁকালে গোটা দুয়েকের সময় স্নান করতে বেরুল।

বেরুবার আগে তেলের শূন্য শিশিটা অনেকক্ষণ ধরে উল্টে রাখলে হাতের তালুর উপর। মিনিট পাঁচেকে ফোঁটা পাঁচেক তেল পড়ল। তেল ঠিক নয়, তেলের কাই। শিশিটার পিছন দিকে গোটা দু-তিন থাপ্‌ফর মেরেও যখন আর এক ফোঁটার বেশি তেল গড়াল না, তখন তাই কোনো রকমে মুখে হাতে মাখতে মাখতে সে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

ঐ তেলটুকু মাথায় সে দিল না,—নিজের মাথাকে তেলামাথা মনে করেই কিনা—বিশ্ব-সংসারে তেলামাথায় তেল দেওয়ার সবচেয়ে বড় মালিক যিনি তিনিই জানেন।

গামছা তাকে বলা যায় না—একটা তেলচিটে ন্যাকড়া, তাই সে মাথায় জড়িয়ে নিলে শৌখিন বাবুদের মাথার রুমাল বাঁধার মতো করে। তাতে তার কপালের দুঃখটুকু ছাড়া মাথায় বাকি সবটুকুই কোন রকমে ঢাকা পড়ল !

এই সৌভাগ্যের জয়ধ্বজা মাথায় বেঁধে প্যাঁকালে স্নান করতে চলল ক্রিশ্চান পাড়ার ভিতর দিয়ে। মোংলা পুকুরই তার কাছে হয়, কিন্তু কেন যে সে অতটা ঘুরে গোলপুকুরে নাইতে যায়, তা আর লুকা-ছাপা নেই—ও পুকুরে নাইতে যারা যায় তাদের কাছে। প্রেমের পথ সোজা নয় বলেই হয়তো সোজা পথে যায় না।

লোকে বলে মাথার জয়ধ্বজা তার মধু ঘরামির অর্ধেক রাজত্বের ওপর দাবি বসাবার জন্য নয়, তার 'রাজকন্যা' কুর্শিকে জয় করার জন্যই। কিন্তু ঐ জয়ধ্বজার অসম্মানে সে নিজেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে—যখন কুর্শির সামনেই ঐ জয়ধ্বজা দিয়ে গা রগড়াতে হয়।

নাইতে গেলে সে কুর্শিদের ঘরের সামনে দিয়েই যায়। আজো যাচ্ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে ঘরে আগড়-দেওয়া দেখে বসে পড়ল—রাস্তায় নয়—রোতো কামারের দোকানে।

রোতো তার হাঁপর ঠেলতে ঠেলতে তাকে একবার আড় নয়নে দেখে নিল। মনে হল, লোহা পেটার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন হাসি গোপন করছে।

প্যাঁকালে রোতোর চেয়েও বেশি ঘামাতে লাগল, আগুন হতে অনেক দূরে থেকেও।

রোতো নেহাই-এর উপর একটা জলন্ত লোহার ফাল রেখে প্যাঁকালের দিকে চেয়ে বলল, 'দেখেছিস মাইরি, আগুন নিয়ে খেলার ঠেলা ! হাতের কতটা পুড়ে গিয়েছে দ্যাখ্ !' বলেই প্রাণপণে হাতুড়ি দিয়ে লোহা পেটায় আর হাসে। প্যাঁকালে বুঝতে না পেরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে।

রোতো ফলাটা আবার আগুনে সেঁক দিয়ে হাঁপর ঠেলতে ঠেলতে বলে, 'মেয়েমানুষ আর আগুন—এই দু-ই সমান বুঝলি, দুটাতেই হাত পোড়ে।'

এতক্ষণ কুর্শি কোথায় দাঁড়িয়েছিল, সে-ই জানে ; হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মুখও পোড়ে রে মুখপোড়া।'

প্যাঁকালে তাড়াতাড়ি উঠে পুকুরের দিকে চলে গেল। তখনও রোতের স্বর শোনা যাচ্ছিল, 'উ-ই প্যাঁকালে রে ! তুই একটু আমার হাপরটটা ঠেল্ ভাই, আমি একটু জলে ডুবে ঠাণ্ডা হয়ে আসি !'

কুর্শি কতকগুলো সাজি-মাটি-সেদ্ধ কাপড়ের বোঝা নিয়ে পুকুরের দিকে যেতে যেতে একবার টেরা চাউনি দিয়ে অভ্যর্থনা করে গেল রোতোকে। যাবার সময় বলেও গেল, 'যাস্‌নে মিন্‌সে একেকবারে ঠাণ্ডা মেরে যাবি। জলে ডুবলে আর উঠতে হবে না।'

রোতো হয়তো তখন মনে মনে বলছিল, এ আগুনের তাতে মরার চেয়েও শীতল জলে ডুবে মরা ঢের আরাম।

রোতোর কিন্তু হাতই পুড়েছে, কপাল পোড়েনি। কুর্শি তাকে দেখতে না পাড়লেও ঘেন্না করে না।

গোলপুকুরে অন্য যারা চান করে, তাদের কেউই এ অসময়ে—বেলা দুটোয় চান করতে আসে না। কাজেই এই সময়টাই তাদের পক্ষে প্রশস্ত, যারা শুধু গা ধুতেই আসে না, প্রাণ জুড়াতেও আসে।

কুর্শি এসে দেখে, প্যাঁকালে তখন ঘাটের বটগাছটার শিকড়ের উপর বসে সিগারেট টানছে। প্যাঁকালে মাঝে মাঝে থিয়েটারের ইয়ার বাবুদের কাছে দু-একটা সিগারেট চেয়ে রাখে এবং সেটা কুর্শির কাছ ছাড়া আর কারুর কাছেই খায় না। আজো স্নান করতে আসার সময় কালকের চাওয়া সিগারেটটা কোঁচড়ে গুঁজে আনতে ভোলেনি।

কুর্শি প্যাঁকালের দিকে না চেয়েই ঘাটে ধপাস করে কাপড়ের রাশ আর পিঁড়িটা ফেলে বেশ করে কোমরে আঁচলটা জড়িয়ে নিলে। তারপর কারুর দিকে না চেয়ে জোরে জোরেই বলতে লাগল, 'ঘাটের মড়া ! রোজ রোজ আমার পেছনে লাগবে। দেবো একদিন মুখে বাসি চুলোর ছাই ঢেলে, তখন বুঝবে মজাটা !'

প্যাঁকালে আর চুপ করে থাকতে পারল না। এ উত্তরে হাওয়া তার দিকে না রোতোর দিকে বইছে, তাও সে বুঝতে পারল না। সে ফস করে নেমে এসে পাশের ঘাটের পচা খেজুর গুঁড়িটাতে বসে একটা খোলামকুঁচি নিয়ে পায়ের মরা মাস ঘষতে ঘষতে বলল, 'তুই আজ রাগ করেছিস না কি কুর্শি? দেখছিসই তো শালারা কী রকমে চোখ লাগাতে শুরু করেছে !'

কুর্শি একটা কাপড় একটু ভিজিয়ে কাচবার জন্য দাঁড়িয়ে বলে, 'বয়ে গেছে আমার ! এখন তোর কুর্শিকে না হলেও চলবে। তোর ঐ মেজো-ভাবী তো আমার মতন কালো নয়। তা হোক না ছেলের মা।'

এইবার প্যাঁকালে হাওয়ার কতকটা দিক নির্ণয় করতে পারলে। সে পা ঘষা থামিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আল্লার কিরে কুর্শি, খোদার কসম, আমি ও নিকে করছিনে। আমাকে কয়েছিল মা, তা আমি আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছি মুখের মতন। আমি বলেছি, এ শালার গোয়াড়িতেই থাকব না। রানাঘাট চলে যাব কাজ করতে।'

কুর্শির হাতের কাপড় জলে পড়ে গেল। সে মুখ ম্লান করে বলল, 'সত্যি চলে যাবি নাকি?'

ওষুধ ধরেছে দেখে প্যাঁকালে খুশি হয়ে বলে উঠল, 'যাবই তো ! তা না হলে যদি মেজো-ভাবীর সঙ্গে নিকে দিয়ে দেয় ধরে?'

কুর্শি কাপড়টা তুলে অনেকক্ষণ ধরে কাচে। প্যাঁকালে তার কাপড় কাচার বিচিত্র গতিভঙ্গি চোখ পুরে দেখে। চোখে তার ক্ষুধা আর মোহ নেশার মতো করে জমাট বেঁধে ওঠে ! বুকের স্পন্দন দ্রুত হতে দ্রুততর হতে থাকে। তার যেন নিজেরই নিজেকে ভয় করে। অকারণে পুকুরের চারপাশে ভীত-ত্রস্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখে—সে যেন কী চুরি করছে। মাথায় তার খুন চড়ে যায়। সে উঠে গিয়ে কুর্শির হাত চেপে ধরে। পা তার ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে। চোখে কিসের শিখা লকলক করে ওঠে। সে শুষ্ককণ্ঠে ডাকে, 'কুর্শি !'

কুর্শি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'যা মাইরি, এখুনি কেউ দেখে ফেলবে। একটু হুঁশ নেই !— আগে বল, তুই রানাঘাটে চলে যাবিনে।'

প্যাঁকালে সাহস পেয়ে বলে, 'এই দেখ্ মজিদের দিকে মুখ করে বলছি, আল্লার কিরে কুর্শি, আমি যাব না কোথাও তুই না বললে।'

কুর্শি খুশি হয়ে বলে, 'উঁহু ! আমার গা ছুঁয়ে বল্।'

প্যাঁকালে গা ছুঁয়ে বলে 'মজিদের চেয়েও বুঝি তুই বড় হলি ?'

কুর্শি খুব মিষ্টি করে হাসে। বলে, 'হলুমই তো।' সে হাসিতে রাজাবাদশা বিকিয়ে যায়। প্যাঁকালে থাকতে না পেরে একটা অতি বড় দুঃসাহসের কাজ করে বসে।

কুর্শি খুশি হয়, রাগও করে। মুখটা সরিয়ে দিয়ে বলে, 'যা, ভালো লাগে না, কেউ দেখে ফেলবে এখনি।'

প্যাঁকালেও জানে, যে-কোনো লোক যে-কোন সময়ে দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু ঐ হাসি ! ঐ চোখ ! ঐ ঠোঁট ! ঐ দেহের দোলান। দেখুকই না লোকেরা ! প্যাঁকালে যেন মাতাল হয়ে পড়ে। হুঁশ থাকে না।

স্নান করে সে বাড়ি ফেরে। সারা শরীর তার ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে। যেন তাড়ি খেয়েছে। মাথার-দুপাশের রগ টিপটিপ করে। বিশ্ব-সংসার মুছে যায় তার চোখের সামনে থেকে। সে কেবল ভীত মিষ্টি কণ্ঠের আকুলতা শোনে আর শোনে, 'কেউ দেখে ফেলবে, দেখে ফেলবে !'—তার তাতে লজ্জা নাই, লজ্জা শুধু দেখে ফেলার লোককে।

ওদের লজ্জা যেন ওদের জন্য নয়, অন্যের জন্য।

তারা দুজনে চলে—চির-চলা রক্ত-রাঙা পথে। যে-পথ ফরহাদ-মজনু, লায়লি-শিরি, গোলে-বকৌলী, মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীক, আরো কতজনের বুকের রক্তে রাঙা হয়ে আছে। চির-যৌবনের চির-কণ্টকাকীর্ণ পথ। চিরকালের রোমিও-জুলিয়েট দুষ্মন্ত-শকুন্তলা যেন ওরা !

এগারো

'ঝড় আসে নিমেষের ভুলে।'

জীবনের কোন পথ দিয়ে কখন বিপর্যয় আসে, মুহূর্তের জন্য—নিমেষে সব ওলট-পালট করে দিয়ে যায়—বন্ধনের দড়াদড়ি কখন যায় টুটে,—কেউ জানে না।

একদিঘি ফোটা পদ্মবনের উপর দিয়ে—ঝড় নয়—শুধু একটা ঘূর্ণি হাওয়ার চলে যাওয়া দেখেছিলাম। সেই অসহায় পদ্ম-দিঘির স্মৃতি আজো ভুলিনি। হয়তো কখনো

ভুলবও না। জলের ঢেউ তার তেমনি রইল—কিন্তু পদ্মবন গেল আগাগোড়া ওলট-পালট হয়ে! কোথায় গেল রাঙা শতদলের সে শোভা, কোথায় উড়ে গেল তার পাশের মরাল-মরালী! শুধু কাঁটা-ভরা মৃণাল আর পদ্মের ছিন্নপত্র। ছিন্নদল পদ্মের পাঁপড়িতে দিঘির মুখ আর দেখাই যায় না।

ও যেন মূর্ছিতা ত্রস্তকুন্তলা বিস্রস্ত-বসনা অভিমানিনী! ওকে কে যেন দুপায়ে দলে পিষে চলে গেছে।

নিমেষের ঝড়।...

ঘরে কাঁদে মেজো-বৌ, বাইরে কাঁদে কুর্শি। একজন ঘৃণায়, রাগে—আর একজন অভিমানে, বেদনার অসহায় পীড়নে।

প্যাঁকালে কোথায় চলে গেছে।

মেজো-বৌ রাগে নিজের হাত নিজে কামড়ে মরে নিষ্ফল আক্রোশে। এই আবার পুরুষ, বেটাছেলে! এত বড় মিথ্যার ভয়কে সে উপেক্ষা করে চলতে পারলো না। যে মিথ্যা-কলঙ্কের ঢিল লোকে তাদের ছুঁড়ে মারলে, সেই ঢিল কুড়িয়ে সে তাদের ছুঁড়ে মারতে পারলে না। অন্তত অবহেলার হাসি হেসে বুক চিতিয়ে তাদেরি সামনে দিয়ে পথ চলতে পারলো না। শেষে কিনা পালিয়ে গেল! হার মেনে! কাপুরুষ! মেজো-বৌ ভাবে, আর কি একটা সঙ্কল্প করে। অমন সুন্দর মুখ পাথরের মূর্তির মতো কঠিন হয়ে ওঠে।

পুরুষ যেখানে হার মেনে পালিয়ে গেল, সেইখানে দাঁড়িয়ে সে যুদ্ধ করবে তবু হটবে না।

শাশুড়ি কাঁদে, বড়-বৌ হা-হুতাশ করে, ছেলেমেয়েরা রোজ সাঁজে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। এমনি সন্ধে হব-হব সময় সে আসত ঐ শিশুগুলির জন্যে একটা-না একটা কিছু নিয়ে! কোনদিন 'লেবেঞ্চুস', কোনোদিন বা বোয়াল মাছ।

মেজো-বৌয়ের আনমনা ছেলেটি আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। তারপর আপন মনেই বলে, 'তোমায় কিছু আনতে হবে না ছোট কাকা, তুমি অমনি এস।' মাকে বলে, 'আচ্ছা মা, ছোট-চা বুঝি বা-জানের কাছে চলে গিয়েছে? উখেনে থেকে বুঝি আর ছেড়ে দেয় না?'

মা ছেলেকে বুকে চেপে ধরে। বলে, 'বালাই! ষাট! উখেনে যাবে কেন? হুই রানাঘাট চলে গেছে টাকা রোজগার করতে।'

শিশু থামে না। বলে, 'রান্যাঘাট বুঝি বা-জান যেখেনে থাকে, তার চেয়েও দূরে? না মা?'

মা ছেলেকে ধুলোয় বসিয়ে দিয়ে উঠে যায়।

মসজিদে সন্ধ্যার আজানের শব্দ কান্নার মতো এসে কানে বাজে। ও যেন কেবলি স্মরণ করিয়ে দেয়—বেলা শেষ হয়ে এল, আর সময় নাই!... পথ-মঞ্জিলের যাত্রী সশঙ্কিত হয়ে ওঠে!

সন্ধ্যার নামাজ—যেন মৃত দিবসের জানাজা সামনে রেখে তার আত্মার শেষ কল্যাণ-কামনা !

মেজো-বৌ পাগলের মতো ছুটে গিয়ে মসজিদের সিঁড়ির ওপর—'সেজদা তো নয়—উপুড় হয়ে পড়ে মাথা কুটতে থাকে। চোখের জলে সিঁড়ির ধুলো পঙ্কিল হয়ে ওঠে—তার ললাটে তারই ছাপ এঁকে দেয়।

কী প্রার্থনা করে সে-ই জানে। ভিতর থেকে মৌলবি সাহেবের 'তকবির' ধ্বনি ভেসে আসে, 'আল্লাহো আকবার !' মেজো-বৌ সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে, বলে, 'আল্লাহো আকবার !' কান্নায় গলার কাছে আটকে যায় স্বর।

তারপর ঘরে এসে সব ছেলেমেয়েদের চুমু খায়, আদর করে—অভিভূতের মতো। নিবিড় সান্ত্বনায় বুক ভরে ওঠে। মন কেবলি বলে, এবার আল্লা মুখ তুলে চাইবেন।

শাশুড়িকে ডেকে বলে, 'মা আমি কাল থেকে নামাজ পড়ব।'

শাশুড়ি খুশি হয়ে বলে, 'লক্ষ্মী মা আমার, পড়বি তো ? আর কেউ নয় মা, শুধু তুই যদি খোদার কাছে হাত পেতে চাস খোদা আমাদের এ দুক্ষু রাখবে না—আমার প্যাঁকালে ফিরে আসবে। কই, এতদিন তো পড়ছি নামাজ, এত ডাকলাম, সে শুনল কই মা ! কিন্তু তুই ডাকলে শুনবে !'

মেজো-বৌ খুশি হয়ে গান করে—অস্ফুট স্বরে।

শাশুড়ি ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, 'মা, তুই ঐ গান ছেড়ে দে দিকিন ! ওতে আল্লা ব্যাজার হন। গান করলে 'গুনা' হয়, শুনিসনি সেদিন মৌলবি সায়েবের কাছ থেকে ?'

মেজো-বৌ হেসে বলে, 'কিন্তু আমি যে ওতে খুশি হই মা। আমি খুশি হলে কি তিনি খুশি হন না ? আচ্ছা মা, তুমি মৌলবি সায়েবকে জিজ্ঞেস করো তো, গান করে তাকে ডাকলে, তাঁর কাছে কাঁদলে কি তিনি তা শোনেন না ?

বড়-বৌ মুখ গম্ভীর করে বলে, 'কোরান পড়ে না ডাকলে কি আল্লা শোনে রে মেজো-বৌ ?'

মেজো-বৌ হেসে ফেলে। তারপর আপন মনে আবার গুন গুন করে গান ধরে।

প্যাঁকালে যেদিন গভীর রাত্তিরে কাউকে কিছু না বলে চলে যায়—সেদিন বিকেল পর্যন্তও সে জানতনা যে সে চলে যাবে।

সন্ধ্যায় সে ফিরছিল কাজ করে। সারাদিনের ক্লান্ত চরণ তার কখন যে তাকে টেনে কুর্শির বাড়ির সামনে নিয়ে এসেছিল, তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি। হঠাৎ কার কণ্ঠস্বরে সে সচকিত হয়ে দেখলে বেড়ার ওধারে কুর্শি, এধারে রোতো কামার। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল পাশের আমগাছটার আড়ালে। রোতোর কি একটা কথার উত্তরে কুর্শি কচার একটা ছোট কচি শাখা ভেঙে রোতোকে ছুঁড়ে মারলে, রোতোও হেসে হাতের একটা পান ছুঁড়ে মারলে কুর্শির বুক লক্ষ করে।

রোতোর হাত-যশ আছে বলতে হবে। পানটা কুর্শির বুকেই গিয়ে পড়ল। কুর্শি নিমেষে সেটাকে লুফে নিয়ে মুখে পুরে দিলে।

কিন্তু এরই মধ্যে চক্ষের পলকে কী যেন বিপর্যয় হয়ে গেল।

হঠাৎ কোত্থেকে একটা কন্নিক এসে লাগল কুর্শির বাম কানের ওপরে, ঠিক কপালের পাশে। কুর্শি 'মাগো' বলে মাটিতে পড়ল। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

এরপর রোতোর আর কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

কুর্শি তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। প্যাঁকালে কুর্শিকে পাথালি কোলে করে—যেমন করে বর তার রাঙা নববধূকে বাসি-বিয়ের দিন একঘর হতে আর এক ঘরে নিয়ে যায় তেমনি করে—বুকে জড়িয়ে তাদের বারান্দায় নিয়ে এল। বাড়ির সকলে তখন বেরিয়ে গেছে কোথায় যেন।

বহুক্ষণ শুশ্রূষার পর কুর্শি চোখ মেলে চাইলে। চেয়েই প্যাঁকালেকে দেখে আবার চক্ষু বুজে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেঁদে উঠল, 'মাগো!'

প্যাঁকালে তার কোল থেকে কুর্শির মাথাটা একটা বালিশের ওপর রেখে উঠতে উঠতে বলল, 'তোর বাবাকে বলিস আমি মেরেছি তোকে!' বলেই বেরিয়ে গেল—কুর্শির ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তার পশ্চাতে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল।

পরের দিন ঘুম হতে উঠেই কুর্শি শুনল, প্যাঁকালে চলে গেছে—ওদের বাড়িতে মরাকান্না পড়ে গেছে! শুনেই সে আবার মূর্ছিতা হয়ে পড়ল!

কোথায় কী করে লাগল হাজার চেষ্টা করেও কুর্শির বাবা-মা জানতে পারল না। কুর্শি কিছু বলে না, কেবল কাঁদে আর মূর্ছা যায়। কিন্তু সেরে উঠতে তার খুব বেশি দিন লাগল না।

মাথার আঘাত তার যত শুকাতে লাগল, ততই তার মনে হতে লাগল, যেন ঐ কন্নিকের ঘা বুকে গিয়ে বেজেছে। সে রোজ দিন গোনে আর ভাবে, আজ সে আসবেই। তার গা ছুঁয়ে দিব্যি করল যে দু'দিন আগে রাগের মাথায় সে চলেই যদি যায়, তাহলেও তার ফিরতে দেরি হবে না। এ অহঙ্কার তার আছে। আর রোতোর কথা? অমন বাজে ইয়ার্কি জোয়ান বয়সের ছেলে-মেয়ের দেখাশোনা হলেই দুটো হয়। আ মরণ! এ মিনসেকে বুঝি সে ভালবাসতে গেল?

তারপরেই লুটিয়ে পড়ে কাঁদে। বলে, 'ফিরে আয় তুই, ফিরে আয়! তোরি দিব্যি করে বলছি, ওর সঙ্গে দুটো ইয়ার্কি দেওয়া ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ নাই আমার! ওকে আমি এতটুকুও ভালবাসিনে!' আরো কত কি! ছেলেমানুষের মতো যা মুখে আসে, তাই বলে যায় আর কাঁদে।

কিন্তু বেশি দিন এমন করে যায় না। ফুল ফোটে, শুকায়, ঝরে পড়ে। হৃদয়ও ফোটে, শুকায়, তারপর দলিত হয় তারি পায়ে—যাকে সে কোনো দিনই চায়নি।

এক মাস—দু মাস—তিন মাস যায়, প্যাঁকালে আর আসে না। তবে, খবর পাওয়া গেছে যে, সে কলকাতা কাজ করছে—রাজমিস্ত্রিরই কাজ। দুবার টাকাও পাঠিয়েছে বাড়িতে।

কুর্শি একদিন মরিয়া হয়ে প্যাঁকালের বড় ভাবীকে জিজ্ঞেস করল—সে কখন আসবে এবং চিঠিপত্তর দেয় কি-না। বড়-বৌ মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'কে জানে কখন আসবে !' কিন্তু এ খবরটা জানা গেল যে, চিঠিপত্তর মাঝে মাঝে দেয় বাড়িতে।

কুর্শি আর শুনতে পারল না, মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

কিন্তু কিসের জন্য তার এত ক্ষোভ, তা সে নিজেই বোঝে না। কেবল অসহায়ের মতো ছটফট করে মরে। চিঠি সে কেমন করে দেবে তাকে, সে তো নিজেই ভেবে উঠতে পারে না। তবু রোজ মনে করে, বুঝি তার নামে আজ চিঠি আসবে। ক্রিশ্চান মেয়ে সে, মোটামুটি লেখাপড়া জানে, একটা চিঠিও হাতে কোনোরকমে লিখতে পারে। মাঝে মাঝে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসেও লিখত। কিন্তু লিখেই তার সমস্ত মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে, মন যেন কেন বিষিয়ে ওঠে নিবিড় অভিমানে। লেখা কাগজ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে !

মাঝে মাঝে ভাবে, খুব কঠিন হয়ে থাকলে বুঝি সে না এসে পারবে না। তারপর দু-দিন তিনদিন মুখ ভার করে থাকে, রাস্তায় বেরোয়, গোলপুকুরে নাইতে যায় মুখ ভার করেই—সেখানে তিনটে বেজে যায়, কেউ আসে না। প্যাঁকালের ঘরের সামনে দিয়ে আসে যায়, এবং আর কেউ ফিরেও দেখে না। শুধু মেজো-বৌ তাকে দেখতে পেলে মুখ টিপে হাসে আর গান করে। কুর্শির শরীর-মন যেন রি-রি-রি-রি করতে থাকে রাগে।

এতদিন তার সয়েছিল এই ভেবে যে, হাজার হোক সে-ই তো অপরাধী। অমন করে পর-পুরুষের সঙ্গে আলাপ করতে দেখলে কার না রাগ হয় ! ভাবতেই জিভ কেটে লজ্জায় সে যেন মরে যায় ! সেও তো পর-পুরুষ ! রোতো যেমন সেও তো তেমনি ! বিয়ে তাদের হয়নি, হতেও পারে না। তবু, মন তার এমনি অবুঝ যে, সে কেবলি কী সব অসম্ভব দাবি করে বসে তারই ওপর—বাইরের দিক থেকে যার ওপর কোনো দাবিই সে করতে পারে না।

কিন্তু যত বড়ই অপরাধ সে করুক, তারই গা ছুঁয়ে তো সে দিব্যি করে বলেছিল যে, তাকে না বলে সে কোথাও যাবে না। সে নাহয় কিছু না-ই হল, মজিদের দিকে মুখ করে দিব্যি করেছিল ! এত বড় কী অপরাধ করেছে সে যে, প্যাঁকালে মজিদেরও অপমান করতে সাহস করে সেই অপরাধের জ্বালায় !

মন তার বেদনায় নিষ্ফল ক্রন্দনে ফেনিয়ে ফেনিয়ে ওঠে। যত মন জ্বালা করে, তত বুক ব্যথা করে। সে বুঝি আর পারে না ! রবিবার গির্জায় গিয়ে কাতরস্বরে প্রার্থনা করে, 'য়িশু, তুমি আমায় খুব বড় একটা অসুখ দাও, যেন শুনেই সে ছুটে আসতে রাস্তা পায় না।'

সে শুকিয়ে যেতে লাগল দিন দিন, কিন্তু বড় কিছু অসুখও হল না। প্যাঁকালেও এল না!

কুর্শি এইবার যেন মরিয়া হয়ে উঠল। এইবার সে যা-হোক একটা-কিছু করবে। এইবার সে দেখিয়ে দেবে যে, খেরেস্তান হলেও সে মানুষ। তাকে ছুঁয়ে দিব্যি করে যে সেই দিব্যির অপমান করে, তাকে সেও অপমান করতে জানে।

সে ইচ্ছা করেই রোতো কামারের দোকানের সামনে দিয়ে একটু বেশি করে যাওয়া-আসা করতে লাগল। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে রোতো কিন্তু অতিমাত্রায় কাজের লোক হয়ে উঠেছে। এখন দিনরাত দোকানে বসে লোহা পেটে আর হাপর ঠেলে। কুর্শিকে দেখলে সে যেন এতটুকু হয়ে যায়—লজ্জায়, ভয়ে। কিসের এত লজ্জা, এত ভয় ঐটুকু মেয়েকে সে খুব ভালো করে যে বোঝে, তা নয়। কী যেন মস্ত বড় অপরাধের বোঝা জোর করে তার মাথাটা ধরে নিচু করে দেয়। কুর্শি তার পাশ দিয়ে হাঁটে, আর অমনি সে প্রাণপণ জোরে হাঁপর ঠেলতে থাকে। যেন সমস্ত বিশ্বটাকে সে-ই চালাচ্ছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে জ্বলন্ত লোহাটাকে নেহাই-এর ওপর রেখে পিটতে থাকে। আগুনের ফুলকিতে তার মুখ আর দেখা যায় না।

সেদিন হঠাৎ কুর্শি তার একেবারে চোখের সামনে এসে পড়ল। সে কিন্তু হেসে উঠল, 'আ মর্ ড্যাকরা! যেন চেনেনই না আমায়! তোর হল কি বল তো!

রোতো ঘেমে উঠে ভীত চোখের দৃষ্টিতে চারিদিকে চায়, তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'না ভাই, আর কাজ নেই। সেদিনের কথা মনে পড়লে আমার বুক আজো দুরুদুরু করে ওঠে! ... শালা ডাকাত! ... সে আবার আসছে কখন?'

কুর্শি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, 'আর সে আসছে না। এলে টের পাইয়ে দেব মজাটা এইবার!'

রোতো কিন্তু কথা খুঁজে পায় না। আমতা আমতা করে বলে, 'আমি ইচ্ছে করলে শালাকে সেদিন গুঁড়িয়ে দিতে পারতুম, শুধু তোর জন্যেই দিইনি।'

কুর্শি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে, 'মাইরি বলছিস, তুই ওকে মারতে পারবি এবার এলে? ঐ কচার বেড়ার ধারে—যেখেনে সে আমায় কন্নিক ছুঁড়ে মেরেছিল, ঐখেনে ওকে মেরে শুইয়ে দিতে পারবি?' উত্তেজনায় তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। সে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকে।

তার আন্দোলিত বুকের পানে তাকিয়ে রোতোর রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সে হঠাৎ কুর্শির হাত চেপে ধরে এসে। বলে, 'এই তোকে ছুঁয়ে বলে রাখলাম কুর্শি, ওকে যদি ঐখেনে মেরে শুইয়ে না দিই, তবে আমি বাপের বেটা নই! একবার এলে হল শালা!'

কুর্শি ঝাকানি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'মর হতচ্ছাড়া! বড় যে আস্পর্ধা তোর দেখছি! আমার হাত ধরেন এসে! একবার মেরেই দেখিস, পিঠের ওপর খ্যাংড়ার বাড়ি

কেমন মিষ্টি লাগে!' সে আর বলতে পারে না; কান্নায় তার বুক যেন ভেঙে যায়! তারপর, দৌড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে।

সন্ধ্যা নেমে আসে—তাদের গির্জার কালো পোশাক-পরা মিস্‌বাবাদের মতো!

বারো

একদিকে মৃত্যু, একদিকে ক্ষুধা।

সেজো-বৌ আর তার ছেলেকে বাঁচাতে পারা গেল না। ওর শুশ্রূষা যেটুকু করেছিল সে শুধু ঐ মেজো-বৌ, আর ওষুধ দিয়েছিল মেমসায়েব—রোমান ক্যাথলিক মিশনারি।

মেজো-বৌ সেজোর রোগ-শিয়রে সারারাত জেগে বসে থাকে। কেরোসিনের ডিবে ধোঁয়া উদগীরণ করে করে ক্লান্ত হয়ে নিবে যায়। অন্ধকারে বন্ধুর মতো জাগে একা মেজো-বৌ। আর পাথরের মতো স্থির হয়ে দেখে, কেমন করে একজন মানুষ আর একজন অসহায় মানুষের চোখের সামনে ফুরিয়ে আসে।

সেজো-বৌ তার ললাটে মেজো-বৌয়ের তপ্ত হাতের স্পর্শ-ছোঁয়ায় চকিত হয়ে চোখ খোলে। বলে, 'এসেছ তুমি?' তারপর শিয়রে মেজো-বৌকে দেখে ক্ষীণ হাসি হেসে বলে, 'মেজো-বু, তুমি বুঝি? তোমার সব ঘুম বুঝি আমার চোখে ঢেলে দিয়েছ?'

মেজো-বৌ নত হয়ে সেজোর চোখে চুমু খায়। সেজো মেজো-বৌয়ের হাতটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলে, 'মেজো-বু, তুমি কাঁদছ?'— তারপর গভীর নিশ্বাস ফেলে বলে, 'কাঁদো মেজো-বু, মরার সময়েও তবু একটু দেখে যাই, এই পোড়ামুখীর জন্যেও কেউ কাঁদছে। দেখো মেজো-বু, তুমি আমার জন্যে কাঁদছ, আর তাই দেখে আমার এত ভালো লাগছে—সে আর কী বলব। ইচ্ছে করছে বাড়ির সবাই যদি আমার কাছে বসে এমনি করে কাঁদে, আমি তাহলে হেসে মরতে পারি। হয়তো বা বেঁচেও যেতে পারি। কিন্তু মেজো-বু, আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। এই ছেলের ভাবনা? ওর মায়া কাটিয়েছি! কাল ওর বাবাকে দেখেছিলুম 'খোয়াবে', বলল, 'খোকাকে নিতে এসেছি।' আমি বললুম, 'আর আমায়?' সে হেসে বলল, 'তোকে নয়।' আমি কেঁদে বললুম, 'যম তো নেবে, তুমি না নাও!'

মেজো-বৌ কান্নাদীর্ণ কণ্ঠে বলে, 'চুপ করে ঘুমো সেজো, তোর পায়ে পড়ি বোনটি!'

সেজো মেজো-বৌয়ের হাতটা গালের নিচে রেখে পাশ ফিরে শোয়। বলে, 'কাল তো আর আসব না মেজো-বু কথা বলতে। ঘুমোব বলেই তো কথা কয়ে নিচ্ছি। এমন ঘুমুব যে, হু—ই 'গোদা ডাঙায়' গিয়ে রেকে আসবে তিনগাড়ি মাটি চাপা দিয়ে। যেন

ভূত হয়েও আর ফিরে আসতে না পারি ! ... দেখো মেজো-বু, কাল সে যদি শুধু খোকাকে নিতে আসত, তাহলে কি হাসতে পারত অমন করে? আমায়ও নিয়ে যাবে, ও চিরকাল আমার সঙ্গে অমনি দুষ্টুমি করে কথা কয়েছে ! ... তোমার মনে আছে মেজো-বু, মরার আধঘণ্টা আগেও আমায় কেমন করে বললে? আমি বললাম, 'খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?' সে বলল, 'আমার সামনে তুই যদি এখখুনি মরিস, তাহলে আমার মরতে এত কষ্ট হয় না ! ...'

শিয়রে প্রদীপ নিবু-নিবু হয়ে আসে। শুধু মেজো-বৌয়ের চোখভরা আকাশের তারার মতো চোখের জল চিকচিক করে। বলে, 'সেজো, তোর কিছু ইচ্ছে করছে এখন?'

সেজো ধীরে শান্তস্বরে বলে, 'কিছু না। আর এখন কোনো কিছু পেতে ইচ্ছে করে না মেজো-বু ! কাল পর্যন্ত আমার মনে হয়েছে, যদি একটু ভালো খাবার-পথ্যি পেতুম— তাহলে হয়তো বেঁচে যেতুম। খোকার মুখে তার মায়ের দু-ফোঁটা দুধ পড়ত। আর তো পাবে না বাছা আমার !' বলেই ছেলের গালে চুমু খায়।

একটা আঁধার রাত যেন ডাইনির মতো শিস দিয়ে ফেরে। গাছপালা ঘরবাড়ি—সব যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুতে থাকে। তারাগুলোকে দেখে মনে হয় সহস্র হতভাগিনীর শিয়রে নিবু-নিবু পিদিম।

এরি মাঝে মাটির ঘরের মাটির শেজে শুয়ে একটি মানুষ নিবতে থাকে রিক্ত-তৈল মৃৎ-প্রদীপের মতো। তেল ওর ফুরিয়ে গেছে, এখন সলতেতে আগুন ধরেছে। ওটুকুও ছাই হতে আর দেরি নেই।

সেজো মেজো-বৌয়ের হাতটা বাঁ-বুকে জোরে চেপে বলে, 'দেখছ, মেজো-বু, বুকটা কি রকম ধড়ফড় করছে। একটা পাখিকে ধরে খাঁচায় পুরলে সে যেমন ছটফট করে বেরোবার জন্যে, তেমনি, না? উঃ ! আমার যেন দম আটকে আসছে ! মেজো-বু ! বাইরে কি এতটুকু বাতাস নেই?'

মেজো-বৌ জোরে জোরে পাখা করে।

সেজো মেজো-বৌয়ের পাখা-সমেত হাতটা চেপে ধরে বলে, 'থাক, থাক ! ও বাতাসে কি আর কুলোয় মেজো-বু? সব সইত আমার, সে যদি পাশে বসে থাকত ! আমি চলে যাচ্ছি দেখে সে খুব করে কাঁদত, তার চোখের পানিতে আমার মুখ যেত ভেসে !' আর বলতে পারে না। কথা আটকে যায়। মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেয়।

খোকা কেঁদে ওঠে। মেজো-বৌ কোলে নিয়ে দোলা দেয়, ছড়া গায়—'ঘুম আয়রে নাইলোতলা দিয়া, ছাগল-চোরায় যুক্তি করে খোকনের ঘুম নিয়া।'

ভোরের দিকে সেজো-বৌ ঢুলে পড়তে লাগল মরণের কোলে। মেজো-বৌ কাউকে জাগালে না। সেজোর কানে মুখ রেখে কেঁদে বলল, 'সেজো ! বোনটি আমার ! তুই একলাই যা চুপটি করে। তোর যাবার সময় আর মিথ্যে কান্নার দুক্ষু নিয়ে যাসনে !'

সেজো শুনতে পেলে কিনা, সে-ই জানে। সে শুধু অস্ফুটস্বরে বলল, 'খোকা, ... তুমি ...'

মেজো-বৌ সেজোর দুই ভুরুর মাঝখানটিতে চুমু খেয়ে বলল, 'ওকে আমি নিলাম সেজো, তুই যা তোর বরের কাছে। আর পারিস তো আমায় ডেকে নিস !'

মেজো-বৌ আর থাকতে পারল না—ডুকরে কেঁদে উঠল।

দূরে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ভোরের নামাজের আহ্বান শোনা যাচ্ছিল—'আস্‌সালাতু খায়রুম মিনান্নৌম।—ওগো জাগো ! নিদ্রার চেয়ে উপাসনা ঢের ভালো। জাগো !'

মেজো-বৌ দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'অনেক ডেকেছি আল্লা, আজ আর তোমায় ডাকব না।'

সেজোর মুখ কিন্তু কী এক অভিনব আলোকোচ্ছ্বাসে আলোকিত হয়ে উঠল। সে প্রাণপণ বলে দুই হাত তুলে মাথায় ঠেকাল—মুনাজাত করার মতো করে উর্ধ্বে তুলে ধরতে গেল—কিন্তু তা তখ্‌খুনি ছিন্নলতার মতো এলিয়ে পড়ল তার বুকে।

মেজো-বৌ মুগ্ধের মতো তার মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের শেষ জ্যোতি দেখল—তারপর আস্তে আস্তে তার চোখের পাতা বন্ধ করে দিলে।

প্রভাতের ফুল দুপুরের আগেই ঝরে পড়ল।

মেজো-বৌ আর চুপ করে থাকতে পারল না। চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'মাগো, তোমরা ওঠো, সেজো নেই...'

প্রভাতের আকাশ-বাতাস হাহাকার করে উঠল—নেই—নেই—নেই !

তেরো

সেজো-বৌর খোকাকেও আর বাঁচানো গেল না।

মাতৃহারা নীড়-ত্যক্ত বিহগ-শিশু যেমন করে বিশুষ্ক চঞ্চু হাঁ করে ধুঁকতে থাকে, তেমনি করে ধুঁকে—মাতৃস্তন্যে চিরবঞ্চিত শিশু !

মেজো-বৌর দুচোখে শ্রাবণ রাতের মেঘের মতো বর্ষাধারা নামে। বলে, 'সেজো বৌ, তুই যেখানেই থাক, নিয়ে যা তোর খোকাকে ! আর এ-যন্ত্রণা দেখতে পারিনে !'

খোকা অস্ফুট দীর্ণ কণ্ঠে কেঁদে ওঠে, 'মা !'

মেজো-বৌ চুমোয় খোকার মুখ অভিষিক্ত করে দিয়ে বলে, 'এই যে জাদু, এই যে সোনা, এই যে আমি !'

বাড়ির মেয়েরা ভিড় করে এসে কাঁদে। শাবককে সাপে ধরলে বিহগ-মাতা ও তার স্বজাতীয় পাখির দল যেমন অসহায়ের মতো চিৎকার করে, তেমনি।

সাপের মুখের মুমূর্ষু বিহগ-শিশুর মতোই মেজো-বৌয়ের কোলে মৃত্যুমুখী খোকা কাৎরায়।

ভোর না হতেই সেজো-বৌয়ের খোকা সেজো-বৌয়ের কাছে চলে গেল। শবেবরাত রজনীতে গোরস্থানের মৃৎ-প্রদীপ যেমন ক্ষণেকের তরে ক্ষীণ আলো দিয়ে নিবে যায়, তেমনি।

দুপুর পর্যন্ত একজন-না-একজন কেঁদে বাড়িটাকে উত্যক্ত করে তোলে, তারপর গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ে। শোকের বাড়ির ক্লান্ত প্রশান্তি, অতল গভীর।

ঘুমায় না শুধু মেজো-বৌ। তার ছেলেমেয়ে দুটিকে বুকে চেপে দূর আকাশে চেয়ে থাকে। গ্রীষ্মের তামাটে আকাশ, যেন কোন সর্বগ্রাসী রাক্ষসের প্রতপ্ত আঁখি। বাঁশ গাছগুলো তন্দ্রাবেশে ঢুলে ঢুলে পড়ছে। ডোবার ধারে গাছের ছায়ায় পাতি-হাঁসগুলো ডানায় মুখ গুঁজে একপায়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। একপাল মুরগি আতা-কাঁঠালের ঝোপে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

অদূরে বাবুদের শখের বাড়ির বিলিতি তালগাছগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে। তারই সামনে দীর্ঘ দেবদারু গাছ—যেন ইমামের পেছনে অনেকগুলো লোক সারি সারি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছে—সামনের শুকনো বাগানটায় জানাজার নামাজ।

এমনি সময় উত্তরের আম বাগানের ছায়া-শীতল পথ দিয়ে খ্রিস্টান মিশনারির মিস জোন্স প্যাঁকালের ঘরে এসে হাজির হল। মিস জোন্স ওদের বিলিতি দেশে যুবতী, আমাদের দেশে 'আধ-বয়েসী।' পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কাছাকাছি বয়েস। শ্বেতবসনা সুন্দরী। এই মেয়েটিই সেজো-বৌ আর তার খোকাকে ওষুধ-পথ্য দিয়ে যেত।

সেজো-বৌ আর তার ছেলেকে যে বাঁচানো যাবে না তা সে আগেই জানত এবং তা মেজো-বৌকে আড়ালে ডেকে বলেওছিল। তবু তার যতটুকু সাধ্য, তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল।

সকালে এসে মেজো-বৌকে একবার সে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে। এই সময়টা বেশ নিরিবিলি বলেই হোক বা মেজো-বৌয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি-গুণেই হোক সে আবার এসে মেজো-বৌয়ের সঙ্গে গল্প শুরু করে দিলে।

এ কয়দিনে মেজো-বৌও আর তাকে 'মেম সায়েব' বলে অতিরিক্ত স-সঙ্কোচ শ্রদ্ধার ভাব দেখায় না। তাদের সম্বন্ধ বন্ধুত্বে পরিণত না হলেও অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে।

মিস জোন্স বাংলা ভাল বলতে পারলেও সায়েবি টানটা এখনো ভুলতে পারেনি। তবে তার কথা বুঝতে বেশি বেগ পেতে হয় না কারুর।

এ-কথা সে-কথার পর মিস জোন্স হঠাৎ বলে উঠল, 'ডেখো, টোমার মটো বুডটিমটি মেয়ে লেখাপড়া সিখলে অনেক কাজ করটে পারে। টোমাকে ডেখে এট লোব হয় লেখাপড়া শেখাবার!'

মেজো-বৌ হঠাৎ মেমের মুখের থেকে যেন কথা কেড়ে নিয়েই বলে উঠল, 'আজই রাজি। বুরো ডুখখু পাচ্ছো টুমি, মনও খুব খারাপ আছে টোমার এখান ; এখন লেখাপড়া শিখলে টোমার মন এসব ভুলে ঠাকবে।'

মেজো-বৌ কী যেন ভাবলে খানিক। তারপর ম্লানমুখে বলে উঠল, 'আমার ছেলেমেয়েদের কী করব?'

মিস জোন্স হেসে বলল, 'আরে, ওডেরেও সঙ্গে নিয়ে যাবে যাবার সময়। ওখানে ওরাও পড়ালেখা করবে, ওদের আমি বিস্কুট ডেবে, খাবার ডেবে, ওরা খুশি হয়ে ঠাকবে।'

মেজো-বৌ আবার কী ভাবতে লাগল যেন। ভাবতে ভাবতে তার বেদনাম্লান চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। এই বাড়িতে যেন তার নাড়ি পোঁতা আছে। দুটো ছেলেমেয়ের বন্ধন, তারাও সাথে যাবে, আর সে চিরকালের জন্যও যাচ্ছে না—তবু কি এক অহেতুক আশঙ্কায় বেদনায় তার প্রাণ যেন টনটন করতে লাগল।

মিস জোন্স সুচতুরা ইংরেজ মেয়ে। সে বলে উঠল, 'আমি টোমার মনের কঠা বুজেছে। টোমাকে একেবার যেটে হবে না সেখানে। ক্রিশ্চানও হটে হবে না। টুমি শুধু রোজ সকালে একবার করে যাবে। আবার ডুপুরে চলে আসবে।'

মেজো-বৌ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তা আমি যেতে পারব মিস-বাবা! পাড়ায় দুদিন একটা গোলমাল হবে হয়তো। তবে তা সয়েও যেতে পারে দু-এক দিনে।'

মেজো-বৌর ছেলেমেয়ে দুটি বিস্কুটের লোভে উসখুস করছিল এবং মনে মনে রাগছিলও এই ভেবে যে, কেন তাদের মা তখনি যাচ্ছে না মিস-বাবার সাথে! কিন্তু মায়ের শিক্ষাগুণে তারা মুখ ফুটে একটি কথাও বলল না। খোকাটি শুধু একবার তার ডাগর চোখ মেলে করুণ নয়নে মিস-বাবার দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল লজ্জায়।

মিস জোন্স খোকাকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে তার হাতব্যাগ থেকে চারটে পয়সা বের করে তাদের ভাইবোনের হাতে দুটো করে দিয়ে বলল, 'যাও, বিস্কুট কিনে খাবে।'

মেয়েটি পয়সা হাতে করে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে যেন অনুমতি চাইলে। মেজো-বৌ হেসে বলল, 'যা, বিস্কুট কিনে খা গিয়ে!'

মিস জোন্স উঠে পড়ে বলল, 'আজ টবে আসি! কাল ঠেকে টুমি সকালেই যাবে কিন্টু!'

মেজো-বৌ অন্যমনস্কভাবে শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

সমস্ত আকাশ তখন তার চোখে ঝাপসা ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে।

পাশের আমগাছে দুটো কোকিল যেন আড়ি করে ডাকতে শুরু করেছে—কু-কুক-কুক! সে ডাকে সারা পল্লি বিরহ-বিধুরা বধূর মতো আলসে এলিয়ে পড়েছে।

মেজো-বৌ মাটিতে এলিয়ে পড়ল, নিরাশ্রয় নিরবলম্বন ছিন্ন স্বর্ণহার যেমন করে ধুলায় পড়ে যায়, তেমনি করে।

চৌদ্দ

পরদিন সকালে কেউ উঠবার আগেই মেজো-বৌ তার ছেলেমেয়েকে নিয়ে মিস জোন্সের কাছে চলে গেল। যাবার আগে শুধু বড় বৌকে চুপি চুপি বলে গেল, 'শাশুড়ি বিশেষ পীড়াপীড়ি করলে বাপের বাড়ি গেছি বলো।' বড় বৌ ক্ষুণ্ণ হয়ে চুপ করে রইল। মেজো বৌয়ের এতটা বাড়াবাড়ি তার ভালো লাগছিল না। তবু সে মেজো বৌকে একটু বেশি রকম ভালোবাসে বলেই কিছু না বলে অভিমানে গুম হয়ে রইল। কত বড় দুঃখে পড়ে মেজো বৌ আজ মিস-বাবাদের কাছে সরে যাচ্ছে, তাও তার অজানা ছিল না। তাই আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েই রইল।

দিনকয়েক আগে থেকে তার শাশুড়িও কাঠুরে-পাড়ার সাব-ডেপুটি সাহেবের বাড়িতে চাকুরি নিয়েছিল, তাই সকালে উঠেই সেও চলে গেল, কারুর খোঁজখবর নেবার আর গরজ করল না। নইলে সকালেই হয়তো একটা কাণ্ড বেধে যেত!

পাড়ার অল্প দূরেই রোম্যান ক্যাথলিক গির্জা-ঘর। মেজো-বৌ গির্জার দ্বারে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তখন গির্জার ভিতরে খ্রিস্টের স্তব-গান গীত হচ্ছিল সমবেত নারী-কণ্ঠে। গানের কথা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছিল না, তার কাছে অপূর্ব মিষ্টি লাগছিল শুধু তার সুর আর প্রকাণ্ড হলে প্রতিধ্বনিত অর্গ্যানের গম্ভীর মধুর আওয়াজ। তার মন শ্রদ্ধায়, খুশিতে ভরে উঠছিল।

হঠাৎ তার মনে পড়ল তারই বাড়ির পাশের মসজিদের আজান-ধ্বনি। তার মন কী এক অব্যক্ত বেদনায় কেবলি আলোড়িত হয়ে উঠতে লাগল। তার মন যেন কেবলই শাসাতে লাগল, সে পাপ করছে—অতি বড় অন্যায় করছে, এর ক্ষমা নাই, এর ফল ভীষণ, তাকে অনন্তকালের জন্য অনুতাপ করতে হবে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কার ছোঁয়ায় চমকে উঠে দেখল, মিস জোন্স মধুর হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে পিছনে দাঁড়িয়ে। মেজো-বৌকে ইঙ্গিতে পিছনে আসতে বলে মিস জোন্স গির্জার পাশের বাড়ির একটা কামরায় গিয়ে ঢুকল। মেজো-বৌ কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল দেখে মিস জোন্স ভিতর হতে বলল, 'ভিতরে এসো।' মেজ-বৌ স-

সঙ্কোচে ভিতরে গিয়ে দেখল, সামনের টেবিলে চা-বিস্কুট প্রভৃতি খাবার। মিস জোন্স মেজো-বৌকে তার বিছানায় জোর করে বসিয়ে বলল, 'একটু চা খাও আমার সাটে, টারপর কঠা হবে।'

মেজো-বৌ কিছুতেই রাজি হয় না খেতে। অনেক পীড়াপীড়ির পর বলল, 'মিস-বাবা, আমাদের জাত যায় তোমাদের সাথে খেলে।' মিস জোন্স চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে বলল, 'ও গড! আমিও টা টো জানটুম।' বলে মুখ ম্লান করে কী যেন ভাবতে লাগল। তারপর বলল, 'কিন্টু টোমাদের মুসলমান ধর্মের অনেক কিছু আমি জানি, টাটে কারুর সঙ্গে খেতে টো নিষেড নেই।' মেজো-বৌ হেসে বলল, 'তা তো আমি জানি না, আমাদের মৌলবি সাহেব আর মোড়ল তো অনেক জরিমানা করেছে খেরেস্তানদের ছোঁওয়া খাওয়ার জন্যে!'

মেম সায়েব আর কিছু না বলে মেজো-বৌয়ের ছেলেমেয়ে দুটিকে কাছে টেনে নিয়ে বিস্কুট হাতে দিয়ে বলল, 'এডের আমি চা খাওয়ালে ডোষ হবে না টো?' মেজো-বৌ হেসে বলল, 'হবে।' মেম সাহেব এইবার একটু জোরের সঙ্গে বলল, 'নিশ্চয় হবে না। ওরা এখনো মুসলমান-খ্রিশ্চান কিছু নয়—ওরা শিশু।'

মেজো-বৌ চুপ করে রইল। সে তখন অন্য কথা ভাবছিল।

ক্ষুধার্ত শিশু বিস্কুট হাতে করে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মেজো-বৌ অস্ফুটস্বরে বলল, 'খা।'

ছেলেমেয়েদের চা খাওয়া হলে মিস জোন্স নিজে চা খেয়ে বলল, 'টোমায় জোর করে খাওয়াব না। টবে টুমি কিছু না খেয়ে অমনি রইলে। যাক, টোমাকে ডাকব কী বলে? টোমার নাম টো একটা আছে।'

মেজো-বৌ হেসে বলল, 'নাম একটা ছিল হয়তো বিয়ের আগে। তা এখন ভুলে গিয়েছি। এখন আমি 'মেজো-বৌ'।'

মিস জোন্স হেসে বলল, 'আচ্ছা, আমি টোমায় মেজো-বৌই বলব।' বলেই মিস সোন্স কী ভাবল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'ডেখ মেজো-বৌ, আমি টোমায় ভালোবেসেছি। কেন টোমায় এত ভালো লাগে জানি না। আমি টোমাকে আপন সিস্টারের মটো করে লেখাপড়া শেখাব।

মেজো-বৌয়ের চোখ জলে টলমল করে উঠল।

প্রায় এগারটার সময় যখন সে ছেলেমেয়ের হাত ধরে বাড়ি ঢুকল আবার এসে, তখন তার শাশুড়ি শিলাবৃষ্টির মেঘের মতো মুখ করে রান্নাঘরের সামনে বসে বোধহয় মেজো-বৌয়েরই প্রতীক্ষা করছিল।

মেজো-বৌ কিছু না বলে সোজা ঘরে ঢুকল গিয়ে। শুধু তার খোকা দৌড়ে তার দাদীর কোলে উঠে বলল, 'বল তো দাদি, কোথায় গিয়েছিলুম।' ভিতর থেকে মেজো-বৌ

চিৎকার করে উঠল, 'খোকা, এদিকে আয়!' ছেলে ভয়ে ভয়ে মায়ের কাছে চলে গেল। শাশুড়িও এইবার শতধারে ফেটে পড়ল। ঝড়, বজ্র ও শিলাবৃষ্টির মতোই বেগে চিৎকার, কান্না ও গালি চলতে লাগল। মেজো-বৌ চুপ করে শুনে যেতে লাগল।

পনেরো

চাঁদ-সড়কে সেদিন বেশ একটু চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। লক্ষ্মীছাড়া-মতো চেহারার লম্বা-চওড়া একজন মুসলমান যুবক কোত্থেকে এসে সোজা নাজির সাহেবের বাসায় উঠল। নাজির সাহেব কৃষ্ণনগরে সবে বদলি হয়ে এসে চাঁদ-সড়কেই বাসা নিয়েছেন।

যুবকের গায়ে খেলাফতি ভলান্টিয়ারের পোশাক। কিন্তু এত ময়লা যে চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে। খদ্দরেরই জামা-কাপড়, কিন্তু এত মোটা যে, বস্তা বলে ভ্রম হয়। মাথায় সৈনিকদের 'ফেটিগ-ক্যাপের' মতো টুপি, তাতে কিন্তু অর্ধচন্দ্রের বদলে পিতলের ক্ষুদ্র তরবারি-ক্রস। তরবারি-ক্রসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনাত্মক একটা লোহার ছোট্ট ত্রিশূল। হাতে দরবেশি ধরনের অষ্টাবক্রীয় দীর্ঘ যষ্টি। সৈনিকদের ইউনিফর্মের মতো কোট-প্যান্ট। পায়ে নৌকোর মতো এক জোড়া বিরাট বুট, চড়ে অনায়াসে নদী পার হওয়া যায়। পিঠে একটা বোম্বাই কিটব্যাগ। শরীরের রং যেমন ফরসা তেমনি নাক-চোখের গড়ন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন মাপ করে করে তৈরি—গ্রিক-ভাস্করের এ্যাপোলো মূর্তির মতো—নিখুঁত সুন্দর।

কিন্তু এমন চেহারাকে লোকটা অবহেলা করে করে পরিত্যক্ত প্রাসাদের মর্মর-মূর্তির মতো কেমন ম্লান করে ফেলেছে। সর্বাঙ্গে ইচ্ছাকৃত অবহেলার, অযত্নের ছাপ। গায়ে মুখে এত ময়লা যে, মনে হয় এইমাত্র ইনজিন চালিয়ে এল। দাড়ি সে রাখে না, কিন্তু বোধহয় হপ্তাখানেক ক্ষৌরী না করার দরুন খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়ে মুখটা বৈঁচিকণ্টকাকীর্ণ বাগিচার মত বিশ্রী দেখাচ্ছে।

কিন্তু এসবে ওর নিজের কোনোরূপ অসোয়াস্তি হচ্ছে বলে মনে হয় না। সে স্টেশন থেকে পায়দলে হেঁটে এসে পিঠের কিটব্যাগটা সশব্দে মাটিতে ফেলে দিয়ে নাজির সাহেবের ঘরের ইজি-চেয়ারটাতে এমন আরামের সঙ্গে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল, যেন এ তার নিজেরই বাড়ি এবং সে এইমাত্র বাথ-রুম থেকে 'ফ্রেশ' হয়ে বেরিয়ে আসছে।

তখন সবেমাত্র সকাল হয়েছে এবং নাজির সাহেব তখনো ওঠেননি।

ইজিচেয়ারে শোওয়ার একটু পরেই যুবকের নাক ডাকতে লাগল।

গোটা-আটেকের সময় নাজির সাহেব দহলিজে এসে যুবককে দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেন। মনে করলেন, কোনো কাবুলিওয়ালা কাপড়ের গাঁটরি রেখে ক্লান্ত

হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। নাজির সাহেব অতিমাত্রায় ভালো মানুষ। কাজেই একজন কাবুলিওয়ালা তাঁর ইজিচেয়ারে ঘুমোচ্ছে মনে করেও তিনি কিছু না বলে বাড়ির ভিতর চলে গেলন ; এবং যাতে বেচারার ঘুমের ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য দুরন্ত ছেলেমেয়ে কটিকে বাইরের ঘরে যেতে নিষেধ করলেন।

ছেলেরা এ খবর জানত না। তারা মনে করল, মানা যখন করছে, তখন নিশ্চয়ই কোনো একটা মজার জিনিস এসে থাকবে সেখানে। ওদের দলের সর্দার আমিরের বয়স খুব জোর বছর আটেক হবে, বাকি সব তার জুনিয়র। সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্কের মতো এক-এক ধাপ করে নিচে।

আমির তার 'গ্যাং'কে চুপিচুপি কি বললে। সকলের চোখে-মুখে খুশির একটা তীব্র হিল্লোল বয়ে গেল—হঠাৎ বিদ্যুৎ-ঝলসানির মতো। চুনীবিল্লির মতো মুখ করে সকলে বেরিয়ে গেল। তারপর বাইরের দিক থেকে এসে ঈষৎ দরজা ফাঁক করে দেখতে লাগল। কিন্তু লোকটার চেহারা দেখে অনেকটা উৎসাহ কমে গেল। ওর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদে যেটি, সে প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, 'ওঁ বাঁবাঁ ! জুঁ জুঁ !' তার একধাপ উঁচু সিনিয়র ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বলল, 'উঁহু, ছেলে-ধরা, ঐ দেখ ঝুলি !' বলেই কিট্‌ব্যাগটা দেখিয়ে দিলে। বাস্‌ আর যায় কোথা ! সঙ্গে সঙ্গে আমির ছাড়া আর সকলে 'মার মার না পগার পার' করে দৌড় দিলে।

আমির কিন্তু হটবার ছেলে নয়। তার উপর সে দলপতি। ভয় যতই করুক, পালিয়ে গেলে তার প্রেস্টিজ থাকে না। কাজেই সে কিছুই না বলে গম্ভীরভাবে একটা লম্বা খড় এনে সোজা নিদ্রিত যুবকটির নাকের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিল ; যুবকটি একেবারে লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল। আমিরের স্ফূর্তি দেখে কে। সে তখন হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়েছে !

যুবকটি কিছু না বলে হেসে পকেট থেকে একটি রিভলবার বের করে আমিরের দিকে লক্ষ করে শট করলে। ভীষণ শব্দে নাজির সাহেব মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটে এলেন। আরো অনেকে ছুটে এল। আমির ভয়ে জড়পিণ্ডবৎ হয়ে গেছে, কান্না পর্যন্ত যেন আসছে না ! তার বাবাকে আসতে দেখে সে একেবারে চিৎকার করে তাঁকে জড়িয়ে ধরল গিয়ে। তিনি কিছু বলবার আগেই যুবকটি হাসতে হাসতে তার রিভলবারটা নিয়ে আমিরের হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলতে লাগল, 'এটা তোমায় দিলাম।' নাজির সাহেবের দিকে ফিরে বলল, 'এটা নকল রিভলবার। এটা দিয়ে অনেক পুলিশকে অনেকবার ঠকিয়েছি।'

নাজির সাহেব ও উপস্থিত সকলে যুবককে উন্মাদ মনে করে হতভম্ব হয়ে তার কার্যকলাপ দেখছিলেন। এইবার অনেকেই হেসে ফেললে। কিন্তু কারুর কিছু বলবার আগেই আমির তার বাবার কোল থেকে নেমে যুবকটির দিকে রিভলবার লক্ষ করে বলে উঠল, 'এইবার হাম তোমাকে গুলি করেগা।'

নাজির সাহেব যুবকটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলেন। একে কোথায় দেখেছেন যেন। অথচ ঠিক স্মরণও করতে পারছিলেন না। হঠাৎ পেছন থেকে 'কড়াফোন' হল, অর্থাৎ অন্দর মহলের দিককার কড়ার দরজাটার শব্দ হল। নাজির সাহেব দোরের ফাঁকে মুখ দিয়ে জিজ্ঞেস করবার আগেই ভিতর থেকে মৃদু শব্দ এল, 'চিনতে পারছ না? ও যে আমাদের আনসার ভাই।'

নাজির সাহেব দৌড়ে এসে যুবকটিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আরে তৌবা! তুমি আনসার! আচ্ছা ভেক ধরেছ যা-হোক। এ কি কাবুলিওয়ালা সেজেছ, বল তো! আরে, ভিতরে এস, ভিতরে এস।' বলতে বলতে তাকে টেনে একেবারে অন্দরে নিয়ে গেলেন।

অন্দরে যেতেই নাজির সাহেবের স্ত্রী এসে তাকে সালাম করল। যুবক হেসে বললে, 'কি রে বুঁচি, তোর চোখের তো খুব তারিফ করতে হয়। আচ্ছা, এই দশ বছর পরে দেখে চিনতে পারলি কী করে?'—এইখানে বলে রাখা ভালো, শ্রীমতি বুঁচি—ওরফে লতিফা বেগম—আনসারের 'খালেরা বহিন্' বা মাসতুত বোন। আনসারের চেয়ে বয়সে সে বছর পাঁচেকের ছোট। কুড়ি বছরেই সে বুড়ি না হলেও চারটি ছেলের মা হয়েছে।'

লতিফা আঁচলে চোখ মুছে বলল, 'মেয়েরা দশ হাজার বছর পরে দেখা হলেও আপনার জনকে চিনতে পারে ভাই, ওরা তো আর পুরুষ নয়!' বলেই নাজির সাহেবের দিকে বক্রদৃষ্টি দিয়ে তাকালে।

নাজির সাহেব মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'দেখ, স্ত্রীর ভাইকে দশজন ভদ্রলোকের সামনে চিনে ফেলে সম্বন্ধটা ফাঁস করে দিলে তুমি হয়তো খুশি হতে, কিন্তু আনসার হত না।'

আনসার নাজির সাহেবের কবজিটা ধরে রাম-টেপা দিয়ে বললেন, 'চোপ, শালা!'

তার টেপায় তাড়নে নাজির সাহেব উহু উহু করে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'দোহাই ভাই! ছেড়ে দে! আমিই তোর শালা!'

আনসার হেসে হাত ছেড়ে দিলে।

নাজির সাহেব কবজিতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'উঃ! আর একটু হলেই হাতটা পাউডার হয়ে গেছিল আর কি! তুমি তেমনি গোঁয়ার আছ দেখছি!'

লতিফা হেসে বলল, 'এখন তোমার এই ঝুলঝোপপুর পোশাকগুলো খুলে ফেল দেখি! তৌবা, তৌবা! কী চেহারাই করেছে! কাপড়-চোপড় আছে সঙ্গে, না এনে দেবো? আগে নেয়ে নেবে, না চা আনব?'

আনসার মেঝেতেই হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ে বলে উঠল, 'আঃ! কী নাম শুনালি রে বুঁচি! চা! চা! আঃ! আগে চা নিয়ে আয় তো, তারপর সব হবে!' বলেই গুন গুন করে গাইতে লাগল—

কাপ-কেট্‌লিবাসিনী সিদ্ধিবিধায়িনী
মানস-তামসমোহিণী হে!

দুগ্ধ ও শর্করা-মিশ্র শ্বেতাম্বরা
চীনা-ট্রেবাহিনী জাড্য হরে।

লতিফা চা আনতে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, 'পাগল!'

একটি ছোট্ট কথা! ওতেই মনে হল, যেন লতিফা তার প্রাণের সমস্ত সুধা দিয়ে উচ্চারণ করলে ঐ কথাটি। ঘর-ছাড়া ভাইকে বহুকাল পরে কাছে পেয়ে বোনের প্রাণ বুঝি এমনি করেই তোলপাড় করে ওঠে।

চা করতে গিয়ে সেদিন একটু অতিরিক্তই দেরি হল। সেদিন উনুনের সকল ধোঁয়া বুঝি লতিফার চোখে ভিড় করে জমেছিল এসে। সেদিন চায়ের জলের অর্ধেকটা ছিল কেটলির, আর অর্ধেকটা চোখের।

ষোল

চা খাওয়া হলে পর লতিফা বলে, 'দাদু, তুমি তোমার ঐ কাবলিওয়ালার পোশাক খুলে ফেল দেখি। কী বিশ্রী দেখাচ্ছে! মাগো! ঐ ময়লা গদ্দর পরে থাক কি করে তাই ভাবছি!

আনসার হেসে বলল, 'গদ্দর নয় রে বুঁচি, এর নাম খদ্দর। একটু থাম না তুই, তারপর দেখবি, কি রকম রাজপুত্তুরের মতো চেহারা করে ফেলি।'

বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হাসতে লাগল।

ঘণ্টা দুই পরে শেভ করে স্নান সেরে পরিষ্কার কাপড় পরে যখন আনসার বেরুল, তখন তাকে সত্যিসত্যিই রাজপুত্তুরের মতো দেখাচ্ছিল।

নাজির সাহেব ও লতিফা মুগ্ধদৃষ্টি দিয়ে আনসারকে বারে বারে দেখতে লাগল।

লতিফার ছেলেগুলি ততক্ষণে এসে বেশ করে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। এবং আমিরের রিভলবারের আওয়াজে চাঁদ-সড়ক প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। সে বারে বারে আসে আর তার মাকে বলে, 'বুঝলে মা, আমি এইটে নিয়ে যুদ্ধ করতে যাব। মামা আর আমি ইংরেজকে একেবারে এই গুড়ুম!' বলেই তার এবং মামার শত্রুর উদ্দেশে রিভলবারে আওয়াজ করে।

আনসার বলল, 'বুঝলিরে বুঁচি, ঐ রিভলবারটা নিয়ে আজ যা করেছি ট্রেনে। এক বেটা টিকটিকি আমার পিছু নিয়েছিল আজ। শুধু আজ নয়, ওরা আছেই আমার পিছনে। রাস্তায় আমার একটি বন্ধু ছিল সাথে। মাথায় একটা হঠাৎ খেয়াল চেপে গেল।

আমি বন্ধুটিকে চুপ করে বললাম, চুপি চুপি ঐ টিকটিকি বাবাজিকে খবর দিতে; আমার কাছে রিভলবার আছে। সে গিয়ে খবর দিতেই, আর যায় কোথায় ! দেখি, শ্রীমান রানাঘাট স্টেশনে এক ডজন কনস্টেবল নিয়ে হাজির। আমি নামতেই আমাকে বলল, 'আপনি থানায় আসুন, আপনাকে আমাদের দরকার আছে।' আমি বললাম, 'আমায় সেখানে চা খেতে দিবেন তো?' রেলওয়ে–পুলিশের দারোগাবাবু বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'আজ্ঞে, চা–জলখাবার সব প্রস্তুত রেখেই আপনাকে নিতে এসেছি।' আমি হেসে বললাম, 'ধন্যবাদ ! চলুন !' তারপর থানায় নিয়ে গিয়ে সার্চ করে যখন পেলে এই খেলনার রিভলবারটা, তখন তাদের মুখের অবস্থা যা হয়েছিল রে বুঁচি, তা ঠিক বলে বুঝাতে পারব না। গোবর থাকলে ছাঁচ তুলে নিতাম !' বলেই গগনবিদারী হাসি।

লতিফা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, 'আচ্ছা দাদু, তুমি এখনো ছেলেবেলাকার মতোই দুষ্টু আছ দেখছি। সে যাক তুমি এতদিন ছিলে কোথায়, বল তো?'

আনসার হেসে বলল, 'আরে, এত বড় খবরটাই রাখিসনে তুই? আজ আসছি ময়মনসিংহ থেকে। সেখানে এসেছিলাম সিলেট থেকে। সিলেট গেছিলাম ত্রিপুরা থেকে। কুমিল্লা গেছিলাম চাটিগাঁ থেকে।'

নাজির সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, 'আরে থাম থাম, আর বলতে হবে না। বুঝেছি, টোঁ টোঁ কোম্পানির দলে নাম লিখেয়েছ তুমি, এই তো?'

আনসার বলল, 'কতকটা তাই ! তবে একেবারে বিনা উদ্দেশ্যে নয়। ঘুরি, সাথে সাথে একটু কাজও করি।' বলেই হঠাৎ বলে উঠল, 'বুঝলি রে বুঁচি, তোমাদের এখানে কিন্তু একদিনের বেশি থাকছিনে।'

লতিফা ব্যথিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'এই তিন ঘণ্টার মধ্যে আমাদের এখানটা তোমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল নাকি দাদু?'

আনসার দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলল, 'অভিমান করিসনে ভাই, সব কথা শুনলে তোরাই বাড়িতে জায়গা দিতে সাহস করবিনে।'

নাজির সাহেব বললেন, 'জানি ভাই, তুমি দেশের কাজ নিয়ে পাগল। তা' হলেও এত অল্পে আমার চাকরি যাবে না—সে ভয় তোমার করতে হবে না।'

আনসার বলল, 'দাঁড়াও না একটু, এখনি থানা থেকে খবর নিতে আসবে। আমার আসবার আগেই এখানে 'সাইফার টেলিগ্রাম' এসে গেছে যে, ১০৯ নম্বর যাত্রা করলে !'

লতিফা বলে উঠল, '১০৯ নম্বর কি দাদু?'

আনসার বলল, 'ওসব বুঝবিনে তোরা। আমাদের রাজনৈতিক অপরাধীদের একটা করে নম্বর আছে—সমস্ত সি.আই.ডি. পুলিশ অফিসারের কাছে একটা করে লিস্ট থাকে। পাছে অন্য কেউ জানতে পারে তাই আমাদের নাম না নিয়ে নম্বরটার উল্লেখ করে চিঠিপত্র লেখে বা তার করে।'—বলেই আনসার হেসে বলল, 'আমাদের কি কম

সম্মানরে বুঁচি ! সর্বদা সাথে দুজন সশস্ত্র পুলিশ-প্রহরী। কোথাও গেলে-এলে আগেই পুলিশের অফিসার অভিনন্দিত করে স্টেশনে ! তারপর দুবেলা আমাদের দিন কেমনভাবে কাটছে তার খবর নেওয়া ! একেবারে দ্বিতীয় লাট সাহেব আর কি !'

লতিফার কিন্তু কেন চোখ ছল ছল করে উঠল। আনসারের দিকে তার অশ্রুসিক্ত চোখ তুলে বলল, 'তোমায় ছেলেবেলা থেকেই তো আমি জানি দাদু, তুমি চিরটাদিন এমনি পরের দুঃখে পাগল। তবু আজ কেমন ইচ্ছে করছে, আমার যদি শক্তি থাকত। তোমাকে এমন করে মরণের পথে এগুতে দিতাম না। কিছুতেই না। আচ্ছা দাদু, তোমার কিসের দুঃখ, বলত ? বাড়ি-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি, বাপ-মা, ভাই-বোন—কিছুরই তো অভাব নেই তোমার ; কিন্তু তোমায় দেখে কে বলবে, তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে—তোমার ঘরবাড়ি বলতে কিছু আছে !'

আনসার বিষাদ-জড়িত কণ্ঠে বলল, 'আমি তো কোনো দিন কারুর কাছে বলিনে ভাই; যে, আমার কোনো-কিছু নেই—কেউ কোথাও নেই। দুনিয়ার সব মানুষ একই ছাঁচে ঢালা নয় রে, বুঁচি। এখানে কেউ ছোটে সুখের সন্ধানে, কেউ ছোটে দুঃখের সন্ধানে। আমি দুঃখের সন্ধানী। মনে হয় যেন আমার আত্মীয়-পরিজনের কেউ নেই। আমার আত্মীয় যারা; তাদের সুখের নীড়ে আমার মন বসল না ! অনাত্মীয়ের অপরিচয়ের দলের নীড়হারাদের সাথী আমি ! ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে আমি যেন আমাকে পরিপূর্ণ রূপে দেখতে পাই। তাই ঘুরে বেড়াই এই ঘর-ছাড়াদের মাঝে।'

সতেরো

শেষের দিকটায় আনসার যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল। তারপর একটু সামলে নিয়ে বলতে লাগল, 'আমি এখানে কেন এসেছি জানিস ? জেল থেকে ফিরে এসে অবধি আমার রাজনৈতিক মত বদলে গেছে। আমি এখন ...' বলেই কী বলতে গিয়ে অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠল, 'বুঁচি, এখনো চরকা কাটিস ?'

লতিফা হেসে বলল, 'না দাদু, এখন আপনার চরকাতে তেল দিবার ফুরসৎ পাইনে, তা দেশের চরকা ঘুরাব কখন।'

আনসার হেসে বলল, 'হুঁ, এখন তা হলে চরকার সুতো ছেড়ে কোলের সুতদের নিয়েই তোর সংসারের তাঁত চালাচ্ছিস। দেখ, ও ল্যাঠা ছেড়ে দিয়ে ভালোই করেছিস ভাই। আমি এখনই বলছিলাম না যে, আমার মত বদলে গেছে। এখন আমার মত শুনলে তুই হয়তো আকাশ থেকে পড়বি। যাঁকে বোঝাই করে করে চরকা বয়ে বয়ে যার

কাঁধে ঘাটা পড়ে গেছে, তোর সেই চরকা-দাদু আনসারের মতো কি শুনবি? সে বলে, সুতোয় কাপড় হয়, দেশ স্বাধীন হয় না।'

লতিফা সত্যি সত্যি এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল। সে বলল, 'বল কি দাদু! ওরে বাবা, চরকা নিয়ে ঠাট্টা করার জন্য তুমি নাকি মাহমুদকে একদিন কান ধরে সারা ঘর নাক ঘেঁষড়ে নিয়ে গিয়েছিলে! ওমা, কী হবে! শেষে কিনা তুমি চরকায় অবিশ্বাসী হলে?'

আনসার এক গাল পান মুখে দিয়ে বলল, 'সত্যি তাই। আমি আজ মনে করি যে, আর সব দেশ মাথা কেটে স্বাধীন হতে পারছে না, আর এ দেশ কি সুতো কেটে স্বাধীন হবে?'

নাজির সাহেব বললেন, 'দোহাই দাদা, ও মাথা কাটার কথাটা যেখানে-সেখানে বলে নিজের কাঁচা মাথাটাকে আর বিপদে ফেলো না!'

আনসার হেসে বলল, 'তার মানে, কোনো এক শুভ প্রভাতে মাথাটা দেহের সঙ্গে নন-কোঅপারেশন করে বসবে—এই তো? তা ভাই, যে দেশের মাথাগুলো নোয়াতে নোয়াতে একেবারে পায়ের কাছে এসে ঠেকেছে, সে দেশের দু-একটি মাথা যদি খাড়া হয়ে থেকে তার ঔদ্ধত্যের শাস্তিস্বরূপ খাঁড়ার ঘা-ই লাভ করে তা হলে হেঁট মাথাগুলোর অনেকখানি লজ্জা কমে যাবে মনে করি।'

লতিফা বলল, 'চুলোয় যাক তোমাদের রাজনীতি! এখন আমি বলি দাদু, তুমি চিরকালটা এমনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েই কাটাবে?'

আনসার হেসে বলল, 'চুলোয় আমার চরকাকে দিয়েছি—রাজনীতিটা দিতে পারব না বোধ হয়। তুই ভুল বললি বুঁচি, আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াইনি। বনের খেয়েই বনের বাঘ তাড়াচ্ছি! ঘরের খাওয়া আমার রুচল না, কি করবি, কপাল!'

লতিফা হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'যাক তুমি কারুর কথাই কোনোদিন শোননি, আজো শুনবে না। তাই ভাবছি, কি করে আমাদের মনে করে এখানে এলে!'

আনসার বলল, 'আমি চিরকালই ঠিক আছি। একেবারে বিনা কাজে আসিনি আগেই বলেছি। এখানে একটা শ্রমিক সঙ্ঘ গড়ে তুলতে এসেছি। প্রত্যেক জেলায় আমাদের শ্রমিকসঙ্ঘের একটা করে শাখা থাকবে। আপাতত সেই মতলবেই ঘুরে বেড়াচ্ছি সব জায়গায়। এখানে হয়তো মাসখানেক বা তারও বেশি থাকতে হবে। এই তো ময়মনসিংহ-এ দুমাস থেকে এলাম।'

লতিফা ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে নেচে উঠে বলল, 'সত্যিই দাদু! তুমি এখানে অতদিন থাকবে? বাঃ বাঃ! কি মজাটা না হবে তাহলে। আমি আজই চিঠি দিচ্ছি খালাআম্মাকে—তাঁরা সব এসে আমাদের এখানে থাকবেন এখন কিছুদিন। দাদু, লক্ষ্মীটি, এক মাস না দুমাস, কেমন?

আনসার হেসে ফেলে বলল, 'তুইও তো খোকার মা হয়েও আজো খুকিই আছিস দেখছি রে। চিঠি লেখ, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমি আমার কাজ নিয়ে এত

ব্যস্ত থাকব যে, তোদের সঙ্গে হয়তো সারাদিনে একবার দেখা করতেই পারব না ! আমি এখানে থাকলেও তো তোদের এখানে থাকতে পারব না ! নাজির সাহেবের পিছনে টিকটিকি লেগে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে।'

লতিফার হাস্যোজ্জ্বল মুখ এক নিমিষে ম্লান হয়ে গেল,—শিশুর হাতের রংমশাল জ্বলে নিবে যাবার পর তার দীপ্ত মুখ যেমন নিরুজ্জ্বল হয়ে উঠে—তেমনি !

আঠারো

এরপর দু-তিনদিন কেটে গেছে। এবং এই দু-তিন দিন আনসার গরুর গাড়ির গাড়োয়ান, ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান, রাজমিস্ত্রী, কুলি-মজুর, মেথর প্রভৃতিদের নিয়ে টাউনে একটা রীতিমত হুলুস্থুল বাধিয়ে তুলেছে। শহরময় গুজব রটে গেছে যে, রাশিয়ার বলশেভিকদের গুপ্তচর এসেছে লোক খ্যাপাতে। সরকারি কর্তাদের মধ্যেও এ নিয়ে কানাঘুষা চলেছে। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, মিউনিসিপ্যালিটি, এমনকি কংগ্রেসওয়ালারা পর্যন্ত আনসারকে কেমন বাঁকা চোখে বাঁকা মন দিয়ে দেখতে শুরু করেছে। সেদিকে আনসারের ভ্রূক্ষেপও নাই। সে সমান উদ্যমে মোটরের চাকার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বসে চা খেতে খেতে আনসার কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। গল্প সেদিন কিছুতেই জমছে না দেখে নাজির সাহেবও কেমন বিমনা হয়ে যাচ্ছিলেন। আনসার এ-কয়দিন ঝড়ের মতো এসে নাকে-মুখে যা পেয়েছে দুটো গুঁজে দিয়ে আবার তার কুলি-মজুর, মেথর-চাঁড়ালদের বস্তিতে ঘুরেছে। লতিফা রাগ করে অভিমান করে কেঁদেও কিছু করতে পারেনি। আনসার হেসে শুধু বলেছে, 'পাগলি !' সে হাসি এমন করুণ, এমন বেদনামাখা, আর এ একটি কথা এমন স্নেহ-সিঞ্চিত সুরে বিজড়িত যে, তারপর লতিফা আর একটি কথাও বলতে পারেনি। বেদনা সে যতই পাক, তার বুক সঙ্গে সঙ্গে গর্বেও ভরে উঠেছে যে, তার এই ছন্নছাড়া ভাইটি সর্বহারা ভিখারিদের জন্যই আজ পথের ভিখারি। তাকে কাঙ্গাল করেছে এই কাঙ্গালদের বেদনা। গর্বে কান্নায় তার বুকের তলা দোল খেয়ে উঠল।

আজ সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিতভাবে আনসার এসে চা চেয়ে যখন ইজি চেয়ারটায় ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়ল, তখন লতিফা খুশি যেমন হল, তেমনি আনসারের ঐ ক্লান্তস্বরে কেমন একটু অবাকও হয়ে গেল। এমন বিষাদের সুর তার কণ্ঠে সে কোনদিন শুনেনি।

চা এনে যখন সে পায়ের কাছটিতে বসে পড়ল, তখন নাজির সাহেব আপনার মনেই রাজ্যের মাথামুণ্ডুহীন কীসব বকে চলেছেন, আর আনসার মাঝে মাঝে আনমনে হুঁ দিয়ে যাচ্ছে।

লতিফা হেসে বলল, 'আচ্ছা বেহুঁশ লোক যাহোক তুমি। কাকে বলছ আর কে শুনছে তোমার কথা, বল তো। কী ভাবছ দাদু, এমন করে?'

নাজির সাহেব বেচারা মাথা চুলকে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন, 'অ! উনি আমাদের হবু ভাবী সাহেবার কথা ভাবছেন! আরে, আগে থেকে বলতে হয়? তাহলে কি আর এমন সময় এ বদরসিকতা করি! কিন্তু ভাই, তোমার এই মেথর-মুর্দাফরাশ-ভরা মনে যে কোনো সুন্দর মুখ উঁকি দিতে পারবে—সে ভরসা করতে কেমন যেন ভরসা পাচ্ছিনে।'

আনসারের মুখে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিল, কি দিল না। সে একমনে চা খেয়ে যেতে লাগল। চায়ের প্রসাদে ততক্ষণে তার বিষণ্নতা অনেকটা কেটে গেছে।

লতিফা নাজির সাহেবকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'তুমি থাম তো একটু! সত্যি দাদু, লক্ষ্মীটি, বল না—আজ তুমি এমন চুপচাপ কেন?'

নাজির সাহেব অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেপথ্যে বলার মতো করে বলে উঠলেন, 'বাঁদরকে কে পুয়াল-চাপা দিলে! ইয়া আল্লাহ! আল্লাহু আকবর!'

লতিফা ভুরু বাঁকিয়ে খর চোখে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আবার!'

এইবার আনসার হেসে ফেলে বলল, 'নাঃ, আর আমায় গম্ভীর হয়ে থাকতে দিলিনে দেখছি, বুঁচি!'

মেঘ অনেকটা কেটেছে দেখে লতিফা খুশি হয়ে আবদারের সুরে বলে উঠল, 'কী ভাবছিলে এতক্ষণ, বল না, দাদু!'

আনসার চায়ের প্রথম কাপটা শেষ করে দ্বিতীয় কাপটায় চুমুক দিয়ে বলল, 'যাঃ! ও কিছু না! এমনি কী যেন একটু ভাবছিলাম। দেখ্ বুঁচি এ-দেশের কিছু হবে না।'

লতিফা চালাক মেয়ে। আনসার এড়িয়ে চলতে চাইছে দেখে সে-ও বাঁকা পথ অবলম্বন করলে। আনসারের ও-কথার উত্তর না দিয়ে সে সোজা প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা দাদু, রুবির খবর জান কিছু?'

আনসার চমকে উঠল। সে এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। দু-তিন চুমুকে চা খেয়ে অন্য দিকে চেয়ে সে আস্তে আস্তে বলল, 'এইবার তার সাথে দেখা হয়েছিল রে বুঁচি।'

লতিফা আরো সরে এসে বলল, 'কোথায় দাদু? তোমায় দেখে সে নিশ্চয়ই চিনতে পারলে! কী বললে দেখে? তুমি কি করে চিনলে তাকে?'

আনসার ম্লান হাসি হেসে বলল, 'দেখা হল ময়মনসিংহে। চিনতে দেরি না হলেও বিশ্বাস করতে দেরি হয়েছিল আমার। বেশ একটু দেরি ...' বলেই আনসার দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার দু-চুমুক চা খেয়ে শান্তস্বরে বলল, 'আমি ছাত্রদের একটা মিটিং-এ বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। বহু মহিলাও উপস্থিত ছিলেন সে মিটিং-এ। ওরি মধ্যে দেখি একটি বিধবা মেয়ে দু-হাতে চিক সরিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি চোখ

ফিরিয়ে নিলাম। ভালো বক্তৃতা দিতে পারি বলে শহরময় হয়ে গেছিল, কিন্তু সেদিন স্পষ্টই বুঝলাম, আমার বক্তৃতা শুনে কেউ খুশি হয়ে উঠছেন না। আমার ছাত্র-বন্ধুরা হতাশ হয়ে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আমার কথা তখন কেবলি জড়িয়ে যাচ্ছে।'

লতিফা রুদ্ধনিশ্বাসে শুনছিল বলল ঠিক বলা হয় না—গিলছিল যেন সব কথা। সে কান্না-দীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'রুবি বিধবা হয়েছে, দাদু ?'

আনসার চায়ের কাপটায় ঝুঁকে পড়ে মুখটা আড়াল করে বললে, 'হু !'

মনে হল, সে বুঝি আর কিছু বলতে পারবে না। কেউ একটি কথাও বলল না, কেমন একটা বেদনাময় বিষণ্ণতায় সকলের মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। মেঘলা দিনের সন্ধ্যা যেমন নামে বন্ধুহীনের বিজন ঘরে।

চা তখন ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে। তারই সবটা ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলে আনসার একটু অধিক সহজ সুরে বলল, 'তারপর দেখা হল—অনেক কথাও হল রুবির সাথে—রুবির বাবা-মার সাথেও—রুবির বাবা যে এখন ময়মনসিংহের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট রে বুঁচি !'

কিন্তু বুঁচি কিছু বলবার আগেই সে বলে যেতে লাগল, 'রুবির বাবা অবশ্য ভয়ে ভয়েই আমার সঙ্গে কথাবার্তা কইলেন। ওর মা কিন্তু তেমনি আদর-যত্ন করলেন আমায়। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ বারে বারে জলে ভরে উঠছিল।

লতিফা অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, 'রুবি কী বললে, বল না দাদু !'

আনসার হেসে ফেলে বলল, 'বলছি থাম। রুবির বিয়ে হয়েছিল একটি আই.সি. এস. পরীক্ষার্থী ছেলের সাথে। ছেলেটি আমারই সহপাঠী ছিল—অবশ্য আমার বন্ধু ছিল না—নাম তার মোয়াজ্জম। বিলেতে যাবার আগেই বিয়ের এক মাসের মধ্যেই সে মারা যায়। সে আজ এক বছরেরও বেশি হল ! বিয়ের আগেই রুবি ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। এইবার প্রাইভেট আই.এ. দেবে। মনে হল ওর বাপ-মায়ের ইচ্ছা, ওকে এই লেখাপড়ার মধ্যেই ডুবিয়ে ভুলিয়ে রাখেন। এর জন্য যথেষ্ট খরচও করছেন তাঁরা। রুবিও খুব মন দিয়ে পড়ছে শুনলাম।'

বলে খানিক চুপ করে থেকে আনসার বলল, 'রুবির অন্তরের কথা অন্তর্যামী জানেন, তবে এই বৈধব্য তাকে বড় বেদনা দিতে পারেনি—এটা বেশ বোঝা গেল। স্বামীকে সে চেনেনি—আমার যেন মনে হল, তাকে সে চিনবার চেষ্টাও করেনি। তার পড়বার ঘরে তার স্বামীর একটা ফটো পর্যন্ত নেই। অথবা সে যে বিধবা, একটু চেষ্টা করে সে একথা যেন জানাতে চায় তার আচার-ব্যবহার পোশাক-পরিচ্ছদে, তার মা-বাবা কিছুতেই তাকে পাড়ওয়ালা কাপড় বা গয়না পরাতে পারেননি। পরে সাদা থান, জুতা পরে না, পান খায় না,—যাকে বলে সর্বপ্রকারে নিরাভরণা, কিন্তু এই নিরাভরণা

রুক্ষবেশে তাকে যে কী সুন্দর দেখায় রে বুঁচি, তা যদি একবার দেখতিস! বৈধব্যের এত রূপ আর আমি দেখিনি!'

বলেই নিজের এই প্রশংসা-উক্তিতে লজ্জিত হয়ে সে নিম্নস্বরে বলল, 'কিন্তু বুঁচি, ও রূপকে ভক্তি করা যায়, ভালবাসা যায় না!'

নাজির সাহেব ফোঁস করে একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁর ক্লিনশেভ্‌ড, গালের চিবুকের কল্পিত দাড়িতে বামহাত বুলোতে বুলোতে বলে উঠলেন, 'সোবহান-আল্লাহ! সোবহান-আল্লাহ!'

লতিফা ও আনসার দুজনেই এক সঙ্গে হেসে উঠল। আনসার নাজির সাহেবের ঘাড়ে এক রদ্দা মেরে বলে উঠল, 'আরে বেওকুফ! এর মধ্যে লভটভের কিছু গন্ধ নেই!'

নাজির সাহেব ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'দেখ ভাই, তারকেশ্বরের ষাঁড়! এ ঘাড়ে এমন করে ধাক্কা মেরো না! এই ঘাড়ই হচ্ছে তোমার বোনের সিংহাসন। এঘাড়ই যদি ভাঙে তাঁহলে উনি চড়বেন কোথায়?'

লতিফা হেসে বলল, 'শ্যাওড়া গাছে! বেশ, আমি পেত্নীই হলাম। এখন গোলমাল যদি কর, সত্যিই ভেঙে দেব! বল ভাই দাদু, তারপর কী হল?'

আনসার বলল, 'জানিস, একদিন আমি সোজা রুবিকে বললাম যে, এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও সে যে বিধবা, তা বুঝবার কষ্ট হত না কারুর। সে বলল, কি, জানিস? সে বলল, যে, সে তার বাপ-মাকে শাস্তি দেবার জন্যই অমন করে থাকে। তার ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও নাকি তার বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা, এবং আবারও বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন তলে তলে—তার মতামতের অপেক্ষা না রেখেই। সে একদিন তার মায়ের সামনেই আমায় বলল 'দেখ আনু ভাই, যাকে কোনোদিনই জীবনে স্বীকার করিনি কোনো-কিছু দিয়ে, সেই হতভাগ্যেরই মৃত্যু-স্মৃতি আমায় বয়ে বেড়াতে হবে সারাটা জিন্দেগি ভরে—নিজেকে এই অপমান করার দায় থেকে কী করে মুক্তি পাই, বলতে পার?'

আমি শিউড়ে উঠলাম। বললাম, 'তাই যদি সত্যি হয় রুবি, তবে এ-অপমান শুধু তোমাকে নয়—সেই মৃত হতভাগ্যকেও গিয়ে লাগছে। এ-নিষ্ঠুরতা করে কারুর কোনো মঙ্গল হবে না রুবি।'

রুবি তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'একে শুধু তুমিই নিষ্ঠুরতা বলতে পারলে। কিছু মনে করো না আনু ভাই—অতি বড় নিষ্ঠুর ছাড়া আর কেউ এত বড় কথা আমায় বলতে পারত না। তুমি শুধু এর নিষ্ঠুর দিকটাই দেখলে? যে নিষ্ঠুর করে তুলেছে আমায় তাকে দেখলে না!'

বলেই সে চলে যেতে যেতে বলে গেল, 'ফুল শুকিয়ে গেছে, কিন্তু কাঁটা তো আছে! ফুল থাকলে বুকে মালা হয়ে থাকত, এখন কাঁটা—কেবল পায়ের তলায় বিঁধবে!'

'এর পরেও কত দিন দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে—কিন্তু আমি আর সাপের ন্যাজে পা দিতে সাহস করিনি। একেবারে কাল-কেউটে!'

লতিফা একটু উত্তেজিত স্বরেই বলে উঠল, 'কিন্তু তুমি চিনবে না দাদু, তুমি সত্যিই লক্ষ্মীছাড়া! ছোবল মারলেও ওর মাথায় মণি আছে। সাপের মাথার মণি সাতরাজার ধন, তা কি যে-সে পায়?'

বলেই সে চোখ মুছল! আনসার কেমন যেন নেতিয়ে পড়ল।

আজ কেন যেন তার প্রথম মনে হল সে সত্যিই দুঃখী। মানুষের শুধু পরাধীনতারই দুঃখ নাই, অন্য রকম দুঃখও আছে—যা অতি গভীর, অতলস্পর্শী। নিখিল-মানবের দুঃখ কেবলই মনকে পীড়িত, বিদ্রোহী করে তোলে, কিন্তু নিজের বেদনা—সে যেন মানুষকে ধেয়ানী সুস্থ করে তোলে। বড় মধুর, বড় প্রিয় সে দুঃখ!

সে হঠাৎ বলে উঠল, 'সেদিন আমি চলে আসি, বুঁচি, সেদিন সে স্টেশনে এসেছিল। ট্রেন যখন ছাড়ে, তখন আমার হাতে একটা জিনিস দিয়ে বলল, 'এইটে বিয়ের রাতে—তোমায় মনে করে গেঁথেছিলাম। আজ শুকিয়ে গেছে, তবু তোমায় দিলাম।'—বলেই সে টলতে টলতে চলে গেল!

'ট্রেন ছাড়লে দেখলাম, একটি শুকনো মালা!'

নাজির সাহেব বলে উঠলেন, 'কী করলি ভাই, সে মালাটা?'

আনসার ধরা গলায় বলে উঠল, 'পদ্মার জলে ফেলে দিয়েছি।'

লতিফা একটি কথাও না বলে আস্তে আস্তে উঠে গেল।

উনিশ

চাঁদসড়কে সেদিন ভীষণ একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল, মেজো-বৌ তার ছেলেমেয়ে নিয়ে খ্রিস্টান হয়ে গেছে।

সত্যি-সত্যিই সে খ্রিস্টান হয়ে গেছে। তবে তার একটু ইতিহাসও আছে।

মেজো-বৌ কিছুদিন থেকে খ্রিস্টান মিশনারি মিস জোন্সের কাছে গিয়ে একটু সেলাই ও লেখাপড়া শিখছিল। মিশনারিরা ওদের ধর্মপ্রচারের জন্যে হয়তো একটু গায়ে পড়েই দরিদ্র মুসলমান ও হিন্দুদের অসুখ-বিসুখে ওষুধ-পত্তর দিয়ে সাহায্য করে এবং তারা অনেককে তাদের ধর্মে দীক্ষিতও করতে পেরেছে। কিন্তু মেজো-বৌয়ের ব্যাপার একটু অন্য রকম।

মিস জোন্সের কি জন্য জানি না, প্রথম দেখাতেই মেজো-বৌকে চোখে ধরে গেছিল। শুধু চোখে নয়, হয়তো মনেও। মেজো-বৌয়ের নামে পাড়ায় একটা বদনামও আছে যে, ওকে একবার দেখলে ভালো না বেসে পারা যায় না।

মেজো-বৌ সুন্দরী। কিন্তু ওই সৌন্দর্যটুকুই ওর সব নয়। এক একজন মানুষের চোখে-মুখে এক একটা জিনিস থাকে, যার জন্য তাকে দেখামাত্রই মনটা খুশি হয়ে ওঠে, 'তুমি বলে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। শ্রী, লাবণ্য, সুষমা—এর কোনো-একটা নাম দিয়ে ওর মানে করা যায় না। অমনি মায়ামাখানো চোখ-মুখ মেজো-বৌয়ের।...

পাড়ার পুরুষ-মেয়ে সবাই বলতে লাগল, এইবার মাগিরা মেজো-বৌকে 'আড়কাঠি' করে সব বৌ-ঝিকে 'খেরেস্তান' করে তুলবে।

প্যাঁকালের মা-র চিৎকার ও কান্নায় সমস্ত পাড়া সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সে কান্না-চিৎকারের দিবারাত্রির মধ্যে বিরাম ছিল না। কখনো তা অচল হয়ে তাদের ঘরের আঙিনা থেকেই দিগ-দিগন্তরে পরিব্যাপ্ত হতে লাগল, কখনো বা সচল হয়ে চাঁদসড়ক থেকে কুর্শিপাড়া—কুর্শিপাড়া থেকে হাটবাজার ঘুরে—গির্জা-মসজিদ প্রদক্ষিণ করে ফিরতে লাগল।

মেম-সাহেবদের সে যে ভাষায় আপ্যায়িত করতে লাগল তার তুলনা মেলা ভার। ভাগ্যিস্ মেম-সাহেবরা আমাদের বাংলা ভাষার সব মোক্ষম-মোক্ষম গালির অর্থ বোঝে না, বুঝলে তারা মেজো-বৌকে কাঁধে করে তার বাড়ি বয়ে রেখে যেত।

কলকাতায় প্যাঁকালেকে খবর দেওয়া হল। কুর্শি বিশেষ করে তাগিদ ও পরামর্শ দিতে লাগল ওদের বাড়ি এসে যে, এ সময় প্যাঁকালে এসে একটা 'ধুমখাত্তর' কাণ্ড বাঁধিয়ে দেবে ! চাই কি—সে যা পুরুষ মর্দ, মেম-সায়েবকেও ধরে নিয়ে আসতে পারে ইচ্ছে করলে।

পাড়ার মসজিদের মোল্লা সাহেব সেদিন মগরেবের নামাজের পর নিজে যেচে প্যাঁকালেদের বাড়ি মৌলুদের ও তৎসঙ্গে বেইমান নাসারাদের বজ্জাতি সম্বন্ধে ওয়াজের জলসা বসালেন। পুরুষ-মেয়েতে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠল। মৌলুদ ও ওয়াজের পর স্থির হল যে, কালই মওলানা হজরত পির গজনফর সাহেব কেবলা ও মওলানা রুহানি সাহেবকে এই গোমরাহ্ বেদিনদের নসিহত ও দরকার হলে বহস করার উদ্দেশ্যে আনবার জন্য লোক পাঠাতে হবে এবং তার সমস্ত খরচ বহন করবে পাড়ার লোকেরা। প্যাঁকালের মা আপাতত তার বাড়ির ছাগল কয়টা বিক্রি করে পনর টাকা জোগাড় করে দেবে। নইলে সে সমাজে পতিত থাকবে।

আনসার সব শুনেছিল তার বোনের কাছে। কাজেই সে বেশ একটু উৎসাহ নিয়েই এ নিয়ে পাড়ায় কী হয় শুনতে এসেছিল মৌলুদের জলসাতে। সব শোনার পর একটি কথাও না বলে নাজির সাহেবের বাসায় ফিরে গেল।

বাসায় গিয়েই ইজিচেয়ারটাতে শুয়ে বলল, 'ওরে বুঁচি, বড্ডো মাথা ধরেছে, একটু চা দিতে পারবি ?'

লতিফা হেসে বলল, 'না, পারব না ! কী হল দাদু ওদের সভায়, বললে না যে !'

আনসার তিক্তস্বরে বলে উঠল, 'ঘোড়ার ডিম ! মেজো-বৌ হল খ্রিস্টান, লাভ হল পির আর মওলানা সাহেবদের। আর মরার ওপর খাঁড়ার ঘা—বেচারি প্যাঁকালের মা-র কপাল তো এমনিই পুড়েছে, যেটুকু বাকি ছিল—মোল্লাজি তা শেষ করে গেলেন। এরপরে যদি কাল শুনি যে, প্যাঁকালের ঘরগোষ্ঠী মিলে খ্রিস্টান হয়ে গেছে বুঁচি, তাহলে আমি কিছু বলব না।'—একটু থেমে আনসার বিষাদঘন কণ্ঠে বলে উঠল, 'বুঝলি বুঁচি, প্যাঁকালের মা এত কেঁদে বেড়িয়েছে কিন্তু আজ মৌলুদ শরিফ হয়ে যাবার পর এবং পাড়ার মোল্লা-মোড়লদের সিদ্ধান্ত শোনার পর থেকে তার কান্না একেবারে থেমে গেছে ! আহা বেচারি ! ঐ ছাগল কটাই তো ওর সম্বল—তাই তাকে কাল বিক্রি করতে হবে। নইলে ওর জাত যাবে পাড়ার লোকের কাছে !'

আনসার উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। লতিফার চোখ-মুখের দুষ্টুমির দীপ্তি কখন ম্লান হয়ে কান্না-সজল হয়ে উঠেছিল, তা সে নিজেও টের পায়নি। হঠাৎ সে আকুল কণ্ঠে বলে উঠল, 'দাদু লক্ষ্মীটি, তুমি একবার কাল মেজো-বৌয়ের আর মেম সাহেবের সাথে দেখা করতে পার ? তোমার ভরসা পেলে ও খ্রিস্টান থাকবে না—এ আমি জোর করে বলতে পারি। আমরা অল্পদিন হল কৃষ্ণনগর এসেছি, এর মধ্যেই ওর সাথে যে কয়টা দিন আলাপ হয়েছে, তাতে বুঝেছি—ও আর যাই হোক, খারাপ নয়। ও বড্ডো অভিমানিনী। পাড়ার লোকের যন্ত্রণাতেই সে খ্রিস্টান হল। জান দাদু, ও মেম-সাহেবের কাছে একটু যাওয়া-আসা করত বলে পাড়ার লোকে ওদের একঘরে করবে বলে কেবলি ভয় দেখাচ্ছিল। শেষে এমন বদনাম দিতে লাগল, যে-বদনাম ওর ওপর দেওয়ার মতো মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। মানুষ দুঃখে-অভাবে পড়লে তার কি এমনি অধঃপতন হয় দাদু সকল দিক দিয়ে ?...'

আনসার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাত্রির তারা-খচিত আকাশের দিকে চেয়ে রইল। তার কেবলই মনে হতে লাগল—ঐ রাত্রির আকাশের মতোই অসীম দুর্জ্ঞেয় রহস্য-ভরা এই পৃথিবীর মানুষ।

লতিফা চা করবার জন্য উঠে যাচ্ছিল, হঠাৎ আনসার বলে উঠল, 'সত্যিই রে বুঁচি, ক্ষুধিত মানুষ—অভাব-পীড়িত মানুষের মতো সকল-দিক দিয়ে অধঃপতিত আর কেউ নয়। ক্ষুধা আছে বলেই ওরা কেবলই পরস্পরের সর্বনাশ করে। দু-মুঠো অন্নের অভাবে ওদের আত্মা আজ সকল রকমে মলিন। তুই বুঝবিনে বুঁচি, ওদের অভাব কত অতল অসীম, ওদের দুঃখ কত অপরিমেয়। আমি দেখেছি, ঐ হতভাগ্যদের দুর্দশার নিত্যকার ঘটনা—তাই তো আমার মুখের অন্ন এমন তেতো হয়ে উঠেছে। এক মুঠো ডাল-মাখা ভাত যখন খাই, তখন গলার ও-ধারে যেন ও আর পেরোতে চায় না, আটকে যায় ! মনে হয় আকাশের ঐ তারার মতোই ক্ষুধিত চোখ মেলে কোটি কোটি নিরন্ন নর-নারী আমার

ঐ এক গ্রাস ভাতের দিকে চেয়ে আছে ! ওদের দুঃখ তুই বুঝবিনে বুঁচি। দু-মুঠো অন্নের জন্য ওরা মেথর হয়ে তোদের ঘরে-বাইরের সকল রকম ময়লা-নোংরা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায়। ধাঙ্গড় হয়ে—ভোর না হতেই তোদের গায়ের ধুলো দু-হাত দিয়ে পরিষ্কার করে পথে পথে। তাদের কথা বলিসনে বুঁচি—অন্তত ওদের দোষ দিসনে আমার কাছে কখনো ! তুই তো মা, তুই কি বিশ্বাস করবি, যে, ক্ষুধার জ্বালায় মা তার ছেলের হাত থেকে কেড়ে খাচ্ছে ? নিজের ছেলেমেয়েকে নরবলির জন্য বিক্রি করছে দু-মুঠো ভাতের জন্য ? খোদা তোকে সুখে রাখুন, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা যে কী জ্বালা, তা যদি একটা দিনের জন্যও বুঝতিস, তাহলে পৃথিবীর কোনো পাপীকেই ঘৃণা করতে পারতিসনে। শুনবি একটা সত্যি ঘটনার কথা ?'

লতিফা চোখে হাত দিয়ে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'দোহাই দাদু, তোমার দু-পায়ে পড়ি, আর বলো না। এতেই আমার দম ফেটে যাচ্ছে।'

সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে টলতে টলতে উঠে গেল।

আনসার হেসে বলল, 'তোর সুখের অন্নকে এমন বিধিয়ে তোলা ভালো হয়নি রে বুঁচি ! যাক, কাল আমি সত্যিই মেজো বৌ আর মিস জোন্সের সাথে দেখা করব গিয়ে... !'

পরদিন সকালে চা খেতে খেতে নাজির সাহেব আনসারকে বলে উঠলেন, 'কি হে ! আজ নাকি শিকারে বেরুচ্ছ ? দেখ দাদা, বাঘিনীর কাছে যাচ্ছ মনে রেখ !'

আনসার হেসে বলল, 'আমি শিকার করতে যাচ্ছিনে বেকুফ, আমি যাচ্ছি সুন্দরবনের বাঘকে—সুন্দরবনে ফিরিয়ে আনতে, সভ্য শিকারীর ফাঁদ থেকে রক্ষা করতে।'

নাজির সাহেবও হেসে বললেন, 'অন্য শিকারীর হাত থেকে বাঁচিয়ে শেষে নিজেরই বাণ হেনে বসো না। দেখো, ও বড় শক্ত বাঘিনী হে, শেষে বাঘিনীই তোমায় শিকার করে না ফেলে।'

আনসার লতিফার দিকে আড়-চোখে চেয়ে একটু গলা খাটো করে বলল, 'রক্ষে কর ভাই, বাঘের বাচ্চা পুষবার সখ হয়নি এখনো আমার, এ আমার বাঘ শিকার নয়, এ শুধু কষ্ট স্বীকার !'

নাজির সাহেব একটু জোরেই হেসে বললেন, 'তোফা ! তোফা ! ওগো, আর এক কাপ চা দাও তোমার রসরাজ ভাইটিকে ! কিন্তু দাদা, বাঘিনীর না হয় বাচ্চা আছে, কিন্তু ঐ সিংহী—যে ঘরে নিয়ে গেছে ?'

আনসার হেসে উঠে বলে, 'ওকে সিংহী বলো না মূর্খ, ও হচ্ছে নীলবর্ণ শৃগালিনী। হাঁ, ওর কাছে আমার একটু সাবধানেই যেতে হবে ! ওদের নখ-দন্তকে ভয় করিনে, ভয় করি ওদের ধূর্তামিকে। মিশনারির মেম !'

নাজির সাহেব ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাপ রে ! মিশনারি ! একে মিস, তাহোরি ! উঃ ! একটা মিস ফর্চুন না হয়ে যায় আজ ! আই মীন ফর্চুন ফর মিস্ !'

লতিফা ধমক দিয়ে বলে, 'দোহাই! তোমার আর রসিকতা করতে হবে না! বুড়োকালে ওঁর রস উথলে উঠল! তোমার আজ হল কি বল তো!'

আনসার হেসে বলল, 'বুঝলিনে বুঁচি, ওঁর হিংসে হচ্ছে। একটুখানি মেম-সাহেবের সঙ্গে আলাপ করব গিয়ে, এ আর ওঁর সহ্য হচ্ছে না! তুই থাকতে তো ওঁর আর ওদিক পানে যাবার ভরসা নেই!'

লতিফা উঠে যেতে যেতে বলল, 'আমি আজই দিগদড়ি দিয়ে ছেড়ে দিতে রাজি আছি দাদা-ভাই, কিন্তু ভয় নেই, ওঁকে কেউ ছোঁবে না!'

নাজির সাহেবও উঠে যেতে যেতে বলল, 'পেত্নীকে পেলে আর কেউ ছুঁতে সাহস করে!'

আনসার উঠে পড়ে বলল, 'তোমরা এখন কলহ কর, আমি চললাম।..'

* * *

গির্জায় গিয়ে আনসার শুনলে, মিসবাবাদের সঙ্গে দেখা করবার নিয়ম নেই। কিন্তু সে হাল ছাড়বার পাত্র নয়। পাদরি সাহেবের সঙ্গে ঘণ্টা-খানিক তর্কের পর সে এই শর্তে রাজি হল যে, হেলেন ওরফে মেজো-বৌকে আনসার শুধু জিজ্ঞেস করবে, সে স্বেচ্ছায় ক্রিশ্চান হয়েছে কি-না। তাকে প্রলোভন দেখিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে যে মিশনারিরা ক্রিশ্চান করে নাই, এ-সম্বন্ধেও আনসার যথেচ্ছা প্রশ্ন করতে পারে। অবশ্য আনসারের খদ্দরের বহর ও তার 'এজিটেটর' নামের জন্যই সে এই সুযোগটুকু পেল। আনসারও সাহেবকে স্পষ্টই বলল, 'দেখ পাদরি সাহেব, আমি গেঁয়ো মোল্লা-মৌলবি নই, যে, ধমকে তাড়িয়ে দেবে! মেজো-বৌ যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের ধর্ম নিয়ে থাকে, আমি কিচ্ছু বলব না। আর যদি অন্য কোনো উপায়ে ওর সর্বনাশ করে থাক, তাহলে এই নিয়ে দেশময় একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দেব।'

সাহেব একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'নো মিস্টার! আপনে যথেচ্ছ প্রশ্ন করেন আমাদের ভোগ্নি হেলেনকে, আঠাট ভূটপূর্ব মেজো-বৌকে। ডেখিবেন, টাহাকে স্বয়ং ঈশ্বর সট্‌পঠে ডাকিয়েছেন! আমরা কেহ নয়!'

আনসার মনে মনে সাহেবের 'সট্‌পঠের' নিকুচি করে বলল, 'সাহেব, এখন একটু ডাকতে পার শ্রীমতি হেলেনকে?'

সাহেব নিজে উঠে গিয়ে একটু পরেই মিস জোন্স ও মেজো-বৌকে নিয়ে ঘরে ঢুকল!

আনসার চেয়ার ছেড়ে হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, 'গুডমর্নিং মিস জোন্স! গুডমর্নিং মিস—আই মিন মিসেস হেলেন!'

মিস জোন্স স্মিতহাস্যে আনসারের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল, কিন্তু মেজো-বৌ বেচারি লজ্জায় এতটুকু হয়ে আধাবদনে দাঁড়িয়ে রইল! মিস জোন্সের সরোষ ইঙ্গিতেও সে কোনো-রকমেই একটা নমস্কারও করতে পারল না।

মেজো-বৌ আনসারকে চিনত এবং একটু ভালো করেই চিনত। কতদিন দূর হতে তার দৃপ্ত চরণে তারই বাড়ির পাশে দিয়ে যাওয়া-আসা করবার সময় বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখেছে। এমনি কেন যেন ওর ভালো লেগেছিল এই অদ্ভুত লোকটিকে! কতদিন সে বিনা কাজে লতিফার কাছে গিয়ে বসে থাকত এই লোকটিকে দেখবার জন্য—ওর জীবনের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প সব শুনবার জন্য। ও যেন আলেফ-লায়লার ক্যাহিনীর বাদশাজাদা, যেন পুঁথির হরমুজ, মনু-মেহের! আজ তাকেই সামনে দেখে মর্মাহত সাপিনীর মতো সে কেবলি মুখ লুকাবার চেষ্টা করতে লাগল!

আনসার মেজো বৌকে আবছা এক-আধটু দেখে থাকবে হয়তো! আর দেখে থাকলেও তার মনে নেই। তার কর্মময় জীবনে নারীমুখ চিন্তা তো দূরের কথা, দেখবারও ফুরসৎ নেই। সে জানে শুধু কার্ল মার্ক্স, লেনিন, ট্রটস্‌কি, স্টালিন, কৃষক, শ্রমিক পরাধীনতা, অর্থনীতি। পীড়িত মানবাত্মার জন্য বেদনাবোধ ছাড়াও যে অন্যরকম মন-বেদনাবোধ থাকতে পারে—এ প্রশ্ন তার মনে জেগেছে এই সেদিন। নারীকে সে অশ্রদ্ধাও করে না, নারীর প্রতি তার কোনো আকর্ষণও নেই। নারী সম্বন্ধে সে উদাসীন মাত্র।

আজ সে মুক্তাবগুণ্ঠিতা মেজো বৌকে প্রথম চোখ মেলে চেয়ে দেখল। তাকে দেখামাত্র তার হঠাৎ যেন মনে হল, এর যেন কোথায় রুবির সঙ্গে মিল আছে। রুবির কথা মনে হতেই বুকের কোনো এক কোমল পর্দায় যেন চিড় খেয়ে উঠল। আনসার কেমন যেন অসোয়াস্তি অনুভব করতে লাগল।

মিস জোন্স ইংরেজিতে বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি একে চেনেন না। চিনলে অন্যের কথা শুনে এর কাছে আসতেন না।'

আনসারও ইংরেজিতে বলল, 'ওকে জানি, তবে চিনিনে সত্য। ভয় নেই, আমি ওকে ফিরিয়ে নিতে আসিনি, শুধু জানতে এসেছি, ও স্বেচ্ছায় ক্রিশ্চান হয়েছে কি-না। আশা করি, এ প্রশ্ন করলে, আপনারা ক্ষুব্ধ হবেন না।'

মিস জোন্স তারাগ্রামের 'জি' সুরের মতো মিহিন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, 'কখনই নহে! আপনি অনায়াসে জিজ্ঞাসা করিটে পারেন।'

ধন্যবাদ দিয়ে আনসার প্রায়-প্রকম্পিতা মেজো বৌয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা বলুন তো, আপনার হঠাৎ খ্রিস্টান হবার কারণ কি?

মেজো-বৌ তার আনতনয়ন আনসারের মুখে তুলে ধরেই আবার নামিয়ে ফেলে বলল, 'আমি তো হঠাৎ খ্রিস্টান হইনি।'

আনসার হেসে ফেলে বলল, 'তার মানে, আপনি একটু একটু করে খ্রিস্টান হয়েছেন, এই বলতে চান বুঝি?'

মেজো বৌ তার সেই যাদুভরা হাসি হেসে বলল, 'জি না। আপনারা একটু একটু করে আমায় খ্রিস্টান করেছেন !'

আনসার তার বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু মেলে এই রহস্যময়ী নারীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখল। তারপর সহানুভূতি-মাখা কণ্ঠে বলে উঠল, 'বুঝেছি, আমাদের ধর্মান্ধ সমাজ কত বেশি অত্যাচার করে আপনার মতো মেয়েকেও খ্রিস্টান হতে বাধ্য করেছে !'

দুঃখিনী মেজো-বৌয়ের দুই চক্ষু এই দুটি দরদভরা কথাতেই অশ্রুতে পুরে উঠল। একটু পরেই টসটস করে তার গাল বেয়ে অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মিস জোন্স এবং পাদরি সাহেবের নিমেষে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। তা আনসারের নজর এড়াল না।

মিস জোন্স কিছু বলার আগেই আনসার বলে উঠল, 'ভয় করবেন না, আমি আমার হৃদয়হীন সমাজে এই ফুলের প্রাণকে নিয়ে গিয়ে শুকিয়ে মারতে চাইনে। আমার শুধু একটি অনুরোধ, একে আপনারা মানুষ করে তুলবেন, তাহলে বহু মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে এর দ্বারা।'

মিস জোন্স ও পাদরি সাহেব দু-জনেই অতিমাত্রায় খুশি হয়ে বলল, 'ডেখুন বাবু, ইহারি জন্যে—এই মানুষেরই মুকটির জন্যেই তো আমাদের যিশু প্রেরণ করেচেন। আপনায় ডেন্যবাড, আমরা খ্রিস্টান হবার আগে ঠেকেই হেলেনকে বালো বালো কাজ শেখাচ্ছে !'

মেজো-বৌ হঠাৎ অশ্রু-সিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমি কি আপনার সাথে দেখা করতে পারি—যদি কোনদিন ইচ্ছে হয়?'—বলেই সে তার অশ্রুসিক্ত আঁখি দুটি পূজারিণীর ফুলের মতো আনসারের পানে তুলে ধরল।

আনসারের বুক কেন যেন দোল খেয়ে উঠল ! এ কোন মায়াবিনী? সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই, যখন ইচ্ছা দেখা করবেন। আমাকে আপনার কোনো ভয় নেই। আপনার এই ধর্ম-পরিবর্তনে আমি অন্তত এতটুকু দুঃখিত নই। আপনার মতো মেয়েকে তার যোগ্যস্থান দেবার মতো জায়গা আমাদের এই অবরোধ ঘেরা সমাজে নেই। ... এ আমি আপনাকে দেখে এবং দুটি কথা শুনেই বুঝেছি !' বলেই একটু থেমে আবার বলল, 'আপনি যে ধর্মে থেকে শান্তিলাভ করেন করুন, আমার শুধু একটি প্রার্থনা, আপনারই চারপাশের এই হতভাগ্যদের ভুলবেন না—আপনার হাত দিয়ে যদি ওদের একজনেরও একদিনের দুঃখও দূর হয়—তবে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না। আপনার মতো সাহসী মেয়ে পেলে যে কত কাজই করা যায়?'

মেজো বৌ তার চোখমুখ মুছে ভরা কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমায় দিয়ে আপনার কোনো কাজের সাহায্য যদি হয় জানাবেন, আমি সব করতে পারব আপনার জন্য !' কিন্তু ঐ 'আপনার জন্য' কথাটা বুঝি তার অগোচরেই বেরিয়ে এসেছে। ঐ কথাটা বলবার পরই তার চোখমুখ লজ্জায় রাঙা টকটকে হয়ে উঠল।

আনসারের মনে হল, সে যেন কোনো নদী আর সাগরের মোহনার উত্তাল তরঙ্গ-মধ্যে এসে পড়েছে! সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলল, 'আমায় হয়তো আপনি ভালো করে চেনেন না, লতিফা আমারই বোন। যদি ওখানে কোনোদিন যান, আমার সব কথা শুনবেন। আর দেখাও ওখানেই করতে পারেন—ইচ্ছা করলে।'

মেজো-বৌ ঠোটে হাসি চেপে বলে উঠল, 'আপনাকে আমি ভালো করেই চিনি। আমি ওখানেই দেখা করব গিয়ে। কিন্তু যেতে দিবেন তো ওখানে খ্রিস্টাননিকে?'

আনসার কিছু উত্তর দেবার আগেই মেজো-বৌয়ের ছেলেমেয়ে দুটি কোথা থেকে দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'মা, তুই ইখেনে এয়েছিস আর আমরা খুঁজে খুঁজে মরছি!'

মেজো-বৌ তাদের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ভারি গলায় বলে উঠল, 'এই দুটোই আমার শত্রু। এখানে এসে তবু দু-বেলা দুটো খেতে পাচ্ছি! ওদের উপোস করা সহ্য করতে না পেরেই আমি এখানে এসেছি।'

আনসার তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে মেজো-বৌয়ের ছেলেমেয়েকে একেবারে তার বুকে তুলে চুমো খেয়ে বলল, 'তোরা কি খেতে ভালোবাসিস বলতো!' দুই শিশুতে মিলে অরস্বরে যেসব ভালো জিনিসের লিস্ট দিলে, তা শুনে ঘরের সকলেই হেসে উঠল। কিন্তু হাসলেও আনসারের এই ব্যবহারে সকলের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। অতি সামান্য ঘরের ছেলেমেয়েদের কোলে তুলে সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত যুবকের এই এত সহজভাবে চুমো খাওয়া তারা যেন দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না।

যাদুকরী মেজো-বৌয়ের মনে হতে লাগল, তার এতদিনের এত অহঙ্কার আজ ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। তাকে শ্রদ্ধা করবার মতো মানুষও আছে জগতে! সে তার চেয়েও বড় যাদুকর। তার কেবলি ইচ্ছা করতে লাগল, দুহাত দিয়ে এই পাগলের ধুলো নিয়ে চোখেমুখে মেখে ধন্য হয়, কিন্তু লজ্জায় পারল না। আর কেউ না থাকলে হয়তো সে সত্যি-সত্যিই তা করে ফেলত।

শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং তারো অতিরিক্ত কিছু তার সুন্দর চক্ষুকে সুন্দরতর করে তুলেছিল। তার সারা মুখে যেন কিসের আভা ঝলমল করছিল।

আনসার দুই চক্ষুর পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে মাধুরী যেন বুভুক্ষুর মতো পান করতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই সে সচকিত হয়ে মেজো-বৌয়ের ছেলেমেয়েদের হাতে দুটো টাকা গুঁজে বলল, 'এখন আসি।' বলে সকলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে এল।

আশ্চর্য, এবার মেজো-বৌও সলজ্জ হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে দিল! আনসারের উষ্ণ করস্পর্শে তার সমস্ত শরীরে যেন তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল। মনে হল, এই নিমিষের স্পর্শ বিনিময়ে সে আজ ভিখারিনী হয়ে গেল! সে তার সর্বস্ব লুটিয়ে দিল।

মিস জোন্স এবং পাদরি সাহেব এ সবই লক্ষ করছিল। এইবার পাদরি সাহেব একটু অসহিষ্ণু হয়েই মেজো-বৌয়ের ছেলেমেয়েকে আদেশের স্বরে বলে উঠল, 'এই! টোমরা ও টাকা এখনি ফিরিয়ে ডিয়ে এস।'

সঙ্গে সঙ্গে মেজো-বৌ বলে উঠল, 'না, তোরা চলে আয়। তোদের ফিরিয়ে দিতে হবে না।'—বলেই ছেলেমেয়েদের হাত ধরে সেও বেরিয়ে গেল।

পাদরি সাহেব বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মিস জোন্সকে ইঙ্গিতে ডেকে বহু পরামর্শের পর স্থির হল, মেজো-বৌকে শিগগিরই অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে।

মেজো-বৌ রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই দেখল, একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে আনসার বিস্কুট কিনছে সামনের দোকান থেকে। সে একটু হাসল, সেই যাদুভরা হাসি। তারপর যেতে যেতে বলল, 'কাল সন্ধ্যায় বাড়ি থাকবেন, আমি যেমন করে পারি যাব।'

আনসার হেসে বলল, 'ধন্যবাদ, মিসেস হেলেন !'

মেজো-বৌ তিরস্কার-ভরা চাউনি হেনে চলে গেল।

আনসারের আজ পথ চলতে চলতে মনে হল, এই ধরণীর দুঃখ-বেদনা-অভাব—সব যেন সুন্দর সুমধুর ! এই পৃথিবীতে দুঃখ বলে কিছুই নেই, ও যেন আনন্দেরই আর একটা দিক। সুরার মতো এর আনন্দ তিক্ত জ্বালাময়। এ সুরা যারা পান করেছে, তাদের আনন্দ সুখী মানব কল্পনাও করতে পারে না। তার পকেট উজাড় করে সে আজ রাস্তার ছেলেমেয়েদের বিস্কুট বিলাতে বিলাতে এল। ঐ ময়লা কৃষ্ণকায় ছেলেমেয়ে—ওরা ওদের সুন্দর মায়ের সন্তান। ঐ যে মেয়েটি তাকে দেখে ঘোমটা দিয়ে চলে গেল, কি অপরূপ সুন্দরী সে। এই পৃথিবী যেন সুন্দরের মেলা ! মনে পড়ল অমনি সুন্দর—তারো চেয়ে সুন্দর রুবিকে—মেজো-বৌকে।

তার দু-চোখের দুই তারা—প্রভাতী তারা, সন্ধ্যাতারা—রুবি আর হেলেন, হেলেন আর রুবি !..

সে মানুষের জন্য সর্বত্যাগী হবে, সকল দুঃখ মাথা পেতে সহ্য করবে, তারা দুঃখী, তারা পীড়িত বলে নয়, তারা সুন্দর বলে। এ-বেদনাবোধ শুধু ভাবের নয়, আইডিয়ার নয়, এ বোধ প্রেমের, ভালোবাসার।

কুড়ি

পরদিন যখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে তখন মেজো-বৌ গায়ে বেশ করে চাদর জড়িয়ে নাজির সাহেবের বাড়ির দিকে চলতে লাগল। কিসের যেন ভয়, কিসের যেন লজ্জা তার পা দুটোকে কিছুতেই মাটি ছাড়িয়ে উঠতে দিচ্ছিল না। গাঢ় অন্ধকারের পুরু আবরণও যেন তার লজ্জাকে ঢেকে রাখতে পারছিল না।

নাজির সাহেবের দ্বারে এসে হঠাৎ আনসারের স্বরে চমকিত হয়ে তার মনে হল, এখনি সে ছুটে পালিয়ে যেতে পারলে বুঝি বেঁচে যায়! তার আজকার এই পরিপাটি করে কেশবিন্যাস যেন তার নিজের চোখেই সবচেয়ে বিসদৃশ—লজ্জার বলে ঠেকল। কিন্তু তখন আর ফিরবার উপায় ছিল না।

আনসারের দৃষ্টি অনুসরণ করে লতিফা মেজো-বৌকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে তার হাত ধরে ভিতর নিয়ে গেল। লতিফা কিছু বলতে পারলে না, কেবল তার চোখ কেন যেন ছলছল করে উঠল। মেজো-বৌও তার অশ্রু আর গোপন রাখতে পারছে না।

আনসার উদাসভাবে বুঝি-বা অন্ধকার আকাশের লিপিতে তারার লেখা পড়বার চেষ্টা করছিল।

নাজির সাহেবকে লতিফার হুকুমে প্রয়োজন না থাকলেও বাইরে যেতে হয়েছিল।

বহুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। কেবল লতিফার করতলগত হয়ে মেজো-বৌয়ের উষ্ণ করতল পীড়িত হতে লাগল। সে যেন হাতে-হাতে কথা কওয়া।

লতিফা ধরা-গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ছেলেদের আনলে না?' মেজো-বৌ সেই পুরানো মধুর হাসি হেসে বলল, 'না। তাহলে কি আর বসতে দিত? এতক্ষণ তার দাদির কাছে যাবার জন্য কান্নাকাটি লাগিয়ে দিত।' বলেই একটু থেমে আবার বলল, 'কি ভয়ে ভয়েই না এসেছি ভাই। বাড়ির কাছটাতে এসে পা যেন আর চলতে চায় না।'

এইবার আনসার কথা বলল, 'যাক, আপনার খুব সাহস আছে বলতে হবে। আমি তো মনে করেছিলাম, আপনি আসতেই পারবেন না।'

লতিফা হেসে বলল, 'দোহাই দাদু, ওকে আর 'আপনি' বলে লজ্জা দিও না।' তারপর মেজো-বৌর দিকে ফিরে বলল, 'কি ভাই, তুমি বোধ হয় আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোট হবে, না?'

মেজো-বৌ হেসে ফেলে বলল, 'আমি তোমার বড় দিদির চেয়েও হয়তো বড় হব।'

আনসার হেসে বলল, 'তোমাদের বয়সের হিসেবটা পরেই না হয় করো দাঁত-টাত দেখে। এখন কাজের কথা হোক।'

মেজো-বৌ একটু নিম্নস্বরে বলে উঠল, 'কিন্তু কাজের কথা বলতে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে কারুর যদি বয়স ধরা পড়ে যায়?'

আনসার হেসে ফেলে বলল, 'ঘাট হয়েছে আমার। এখন বল তো তোমার মতলব কি? তুমি কি করবে?'

মেজো-বৌ নখ দিয়ে খানিকক্ষণ মাটি খুঁটে মুখ নিচু করেই বলল, 'করব আর কি! আমার যা করবার, তা তো এখন ঠিক করে দেবে ঐ সাহেব-মেমগুলোই। তারা আমায় কালই বোধহয় বরিশাল বদলি করবে।'

লতিফা হয়তো একটু বেশি জোরেই মেজ-বৌয়ের হাত টিপে ফেলেছিল ; মেজ-বৌ উঃ করে উঠল। লতিফা হেসে বলল, 'এত অল্পতে তোমার বেশি লাগে, তবু তুমি আমাদের—তোমার এই চিরুকেলে ভিটে ছেড়ে যেতে পারবে? তাছাড়া, তুমি কি দারোগা-মুন্সেফ যে তোমায় বদলি করবে?'

মেজো-বৌ কেমন একরকম স্বরে বলে উঠল, 'দারোগা-মুন্সেফ নই ভাই, চোরাই মাল। বদলি কথাটা ভুল বলেছিলাম, সাবধানের মার নেই, তাই একটু সামলে রাখছে আগে থেকেই।'

লতিফা হো হো করে হেসে বলল, 'এরি মধ্যে চোরে-মেরে ঘরের বেড়া কাটতে আরম্ভ করেছে নাকি?' বলেই লজ্জা পেয়ে সপ্রতিভ হবার ভান করে উঠে যেতে যেতে বলল, 'একটু বস, আমি একটু চা করে আনি। নইলে ঐ লোকটির মেজাজকে তিনদিন ধরে জলে চুবিয়ে রাখলেও আর নরম হবে না।'

লতিফা চলে গেল। মেজো-বৌ গেল না, বা উঠে যাবার চেষ্টাও করল না। তার সবচেয়ে বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল তার সেদিনকার সুন্দর করে কাপড় পরার ঢঙটা। সে বুঝতে পারছিল, তার যত্ন করে আঁকা বে-তিল গালে কাজলের তিলটুকুও যেন আনসার লক্ষ করছে।

আনসার হঠাৎ বলে উঠল, 'তুমি আমার কথা রাখবে?'

মেজো বৌ প্রথমে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে। কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জিত স্বরে বলে উঠল, 'কিন্তু আমার ইচ্ছা থাকলেও তো রাখতে পারব না।'

আনসার মেজো-বৌয়ের মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, 'সত্যিই কি তুমি এদেশ ছেড়ে গিয়ে থাকতে পারবে?'

মেজো-বৌ আনসারের দিকে বড় বড় চোখ তুলে বলল, 'আর দুদিন আগে গেলে হয়তো এত কষ্ট হত না! কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তো আমি আর ঘরে ফিরতে পারব না। আমি আবার মুসলমান হয়ে ফিরে আসি—আপনি হয়তো এই বলতে চাচ্ছেন, কিন্তু আমায় জায়গা দেবে কে?'

আনসার নির্বাক হয়ে বসে রইল। সত্যই তো, সে স্বধর্মে ফিরে এলে আরো অসহায় অবস্থায় পড়বে। তার শ্বশুর-বাড়ির কুটিরে তার আর স্থান হবে না। দুদিনের জন্য হলেও কথার জ্বালায় গঞ্জনার চোটে টিকতে পারবে না।

হঠাৎ আনসার যেন অকূলে কূল পেল। সে সোজা হয়ে বসে উৎফুল্লকণ্ঠে বলে উঠল, 'তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তুমি এইখানেই আলাদা ঘর বেঁধে থাক—আমি ব্যবস্থা করে দেব যাতে তোমার দিন নিশ্চিন্তে চলে যায়।'

মেজো-বৌ হেসে বলল, 'আমায় আপনি আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন জানাজানি হলে আমাদের কি অবস্থা হবে—বুঝেছেন? আমি নাহয় সইলাম সেসব, কিন্তু আপনি—'

আনসার মেজো-বৌয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'সে ভয় আমি করিনে। তাছাড়া আমি তো এখানে চিরকাল থাকছিনে। বৎসরে-দুবৎসরে হয়তো একবার করে আসব। অবশ্য এমন ব্যবস্থা করে যাব, যাতে করে আমি যেখানেই থাকি তোমায় যেন কোনো কষ্টে না পড়তে হয়।'

মেজো-বৌয়ের চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠল। এ তার দুঃখের অবসানের আনন্দে, না আনসারের অনাগত বিদায়-দিনের আভাসে—সে-ই জানে।

হঠাৎ মেজো-বৌ যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কান্না-কাতরকণ্ঠে সে বলে উঠল, 'যাবেই যদি তবে এ ঋণের বোঝা চাপিয়ে যেয়ো না। আমিও কাল চলে যাই, তুমিও চলে যাও !'

বলেই সে বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল। আনসার একটা কথাও বলতে পারল না। প্রস্তরমূর্তির মতো বসে রইল। তার কেবলই মনে হতে লাগল, ঐ দূর ছায়াপথের নীহারিকালোকের মতোই নারীর মন রহস্যময়।

একুশ

পরদিন সকাল না হতেই কৃষ্ণনগরে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল ! দলে দলে পুলিশ এসে কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন বাড়িতে খানাতল্লাশ করতে লাগল। বহু ছাত্র ও তরুণকে হাজতে পুরল।

আনসারকে ধরবার জন্যে সশস্ত্র রিজার্ভ পুলিশ সারা রাত ধরে বাগানের গাছে, নাজির সাহেবের বাড়ির আনাচে-কানাচে পাহারা দিচ্ছিল, ভোর না হতেই তারা ঘুমন্ত আনসারকে বন্দি করল।

শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল, নাজির সাহেবের শালা আনসার রাশিয়ার বলশেভিক চর ও বিপ্লবী নেতা। সে ছেলেমেয়ের মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করছিল এবং তাদের বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করছিল।

সবচেয়ে বেশি ঘামতে লাগলেন সেসব ভদ্রলোক, যাঁরা নিজে বা তাঁদের কোনো আত্মীয় ধরা পড়ে নাই। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, 'বাবা ! খুব বাঁচা গেছে ! যে রকম জাল ফেলেছিল পুলিশ ! মনে হচ্ছিল, গুগলি শামুক পর্যন্ত বাদ দেবে না।'

ওরি মধ্যে একজন বলে উঠলেন, 'আমরা চুনোপুঁটি ভায়া, চুনোপুঁটি, ওরা রুই-কাতলাই ধরতে এসেছিল !'

আর একজন আর একটু মাত্রা চড়িয়ে বললেন, 'হাঁ দাদা, সরকার খলিফা ছেলে, ও ছুঁচা মেরে হাত গন্ধ করে না ! মশা মারতে কামান দাগে না !'

স্বদেশব্রতী বীরের দল গালি খেতে লাগল, তাদের তথাকথিত হঠকারিতার জন্য তাদেরই কাছে বেশি, যাদের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করবার জন্য তাদের সুখের গৃহ ও আত্মীয়-স্বজন হতে হয়তো চিরকালের জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আনসারের ধৃত হওয়ার সংবাদ শহরময় রাষ্ট্র হয়ে পড়ল এবং সবাই জানতে পারল যে, আনসার এখনো বাড়িতে বন্দি অবস্থায় আছে। দলে দলে মেথর কুলি, গাড়োয়ান-কোচোয়ান, কৃষক-শ্রমিকের দল নাজির সাহেবের বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। পুলিশের মার-গুঁতো-চাবুক-লাথিতে ভ্রূক্ষেপ না করে তারা নাজির সাহেবের ঘর ঘিরে ফেললে। পুলিশ উপায়ান্তর না দেখে দু-একটা ফাঁকা আওয়াজও করলে বন্দুকের। কিন্তু কেউ এক পাও পিছুল না। এরি মধ্যে একটা বৃদ্ধ মেথর চিৎকার করে বলে উঠল, 'হুজুর, আমাদের বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ওর চেয়ে মার আর কি আছে? আমাদের বুকে বরং গুলি মার, আমাদের বাবাকে ছেড়ে দিয়ে যাও।'

ওর ক্রন্দন শুনে কেউ অশ্রু সংবরণ করতে পারল না!

বাইরে জনসঙ্ঘ ক্রন্দন-কাতর কণ্ঠে আকাশ-ফাটা জয়ধ্বনি করে উঠল! ও যেন বিক্ষুব্ধ গণ-দেবতার, পীড়িত মানবাত্মার হুঙ্কার!

আনসারের চোখের কানায় কানায় অশ্রু টলমল করে উঠল। সে তার শৃঙ্খলাবদ্ধ কর ললাটে ঠেকিয়ে জনসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে নমস্কার করে বলে উঠল, 'আমি জানি, তোমাদের জয় হবে! তোমাদের কণ্ঠে স্বাধীন মানবাত্মার শঙ্খধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।'

প্রমত্ত জনসঙ্ঘকে কিছুতেই টলাতে না পেরে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট আনসারের কাছে এসে বলল, 'আপনি যদি কিছু বলেন ওদের, তাহলে বোধ হয় ওরা যাবে। নইলে বাধ্য হয়ে আমাদের গুলি চালাতে হবে।'

আনসার হেসে বলল, 'আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু গুলির ভয়ে আমি যাচ্ছি না। গুলি যদি সত্যিই চালাবেন মনস্থ করে থাকেন, তাহলে গুলি চালান।' বলেই হেসে বলল, 'আমরা গুলিখোরের জাত। ওটা ধাতে সয়ে গেছে।'

সাহেব একটু হেসে বলল, 'তাহলে আপনারাও আপনাদের কর্তব্য করবেন। কিন্তু তা বোধ হয় করতে হবে না। চলুন।'

শৃঙ্খলাবদ্ধ আনসারকে দেখেই উন্মত্ত জনতা বিপুল জয়ধ্বনি করে উঠল। আনসার তাদের হাসিমুখে নমস্কার করে বলল, 'তোমরা ফিরে যাও। ভয় নেই, আমার ফাঁসি হবে না। আবার আমি ফিরে আসব তোমাদের মাঝে।' একটু থেমে উদগত অশ্রু কষ্টে নিরোধ করে বলল; 'আমার নিজের জন্য কোনো দুঃখ নেই ভাই, কারণ আমার জন্য দুঃখ করবার কেউ নেই—'

অমনি সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল, 'আছে, আছে! আমরা আছি!'

আনসার হেসে বলল, 'জানি, তোমরা আছ। কিন্তু তোমরা তো আমার জন্য কাঁদবার বন্ধু নও! আমি যদি পরাজিতই হয়ে থাকি, তোমরা জয়ী হয়ে আমার সে পরাজয়ের লজ্জা মুছে দেবে।'

অমনি সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

পুলিশ সাহের অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেই আনসার বলল, 'ভয় পাবেন না, আমি ওদের ক্ষেপিয়ে তুলব না, শান্তই করব।'

তারপর জনগণের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, 'বন্ধুগণ! আমার বিদায়কালে তোমাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, তোমরা তোমাদের অধিকারের দাবি কিছুতেই ছেড়ো না! তোমাদেরও হয়তো আমার মতো করেই শিকল পরে জেলে যেতে হবে, গুলি খেয়ে মরতে হবে, তোমারই দেশের লোক তোমার পথ আগলে দাঁড়াবে, সকল রকমে কষ্ট দেবে, তবু তোমরা তোমাদের পথ ছেড়ো না, এগিয়ে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ো না। আগের দল মরবে বা পথ ছাড়বে, পিছনের দল তাদের শূন্যস্থানে গিয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের মৃতদেহের ওপর দিয়েই আসবে তোমাদের মুক্তি। অস্ত্র তোমাদের নেই, তার জন্য দুঃখ করো না। যে বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে সৈনিকেরা যুদ্ধ করে, সেই প্রাণশক্তির অভাব যদি না হয় তোমাদের, তোমরাও জয়ী হবে। আর অস্ত্রই বা নাই বলব কেন? কোচোয়ান! তোমার হাতে চাবুক আছে? বুনো ঘোড়াকে—পশুকে তুমি চাবুক মেরে শায়েস্তা কর, আর, মানুষকে শায়েস্তা করতে পারবে না! রাজমিস্ত্রী! তোমার হাতের কন্নিক দিয়ে ফুটগজ দিয়ে এত বাড়ি-ইমারত তৈরি করতে পারলে, বুনো প্রকৃতিকে রাজলক্ষ্মীর সাজে সাজালে—পীড়িত মানুষের নিশ্চিন্তে বাস করার স্বর্গ তোমরাই রচে তুলতে পারবে। আমার ঝাড়ুদার, মেথর ভাইরা, তোমরাই তো নিজেদের অশুচি অস্পৃশ্য করে পৃথিবীর শুচিতা রক্ষা করছ, নিজে সমস্ত দূষিত বাষ্প গ্রহণ করে, আয়ুক্ষয় করে, আমাদের পরমায়ু বাড়িয়ে দিয়েছ, আমাদের চারপাশের বাতাসকে নিষ্কলুষ করে রেখেছ। তোমরা এত ময়লাই যদি পরিষ্কার করতে পারলে—তাহলে এই ময়লা-মনের ময়লা মানুষগুলোকে কি শুচি করতে পারবে না? তোমাদের মতো ত্যাগী করতে পারবে না? তোমাদের ঐ ঝাড়ু দিয়ে ওদের বিষ-ময়লা ঝেড়ে ফেলতে পারবে না?—তুমি চাষা? তুমি যে হাল দিয়ে মাটির বুকে ফুলের ফসলের মেলা বসাও, সেই হাল দিয়ে কি এই অনুর্বর-হৃদয়, মানুষের মনে মনুষ্যত্বের ফসল ফলাতে পারবে না?

জনসঙ্ঘ মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি করতে লাগল। সে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পুলিশ সাহেব বাধা দিল।

আনসার হেসে বলল, 'ভয় নেই সাহেব। এ-রকম বক্তৃতা অনেক দিয়েছি, কিন্তু ঐ জয়ধ্বনি ছাড়া ওদেরকে খেপিয়ে তুলতে পারিনি। আজো পারব না। খেপানোর মানুষ আমার পিছনে আসছে! আমার মুখ তো বহুদিনের জন্যই এখন বন্ধ করে দেবে, যাবার বেলায় নাহয় একটু আলগাই করলুম। যাক, আমি আর কিছু বলব না। এবার ওদের ফিরে যেতেই বলব।'

বলেই জনসঙ্ঘের দিকে ফিরে বলল, 'আমার অনুরোধ, তোমরা ফিরে যাও। আমার পিছনে যদি যেতে হয়, তো সে পথ শুধু ঐ থানাটুকু বা তারো বেশি জেল পর্যন্ত,

কিন্তু তোমাদের দেশ-লক্ষ্মীকে খুঁজতে হলে স্বর্ণ-লঙ্কা পর্যন্ত যেতে হবে। স্বর্গে উঠে যেতে হবে, পাতালে নেমে যেতে হবে।'

তারপর পুলিশের দিকে তাকিয়ে বললে :

'এই বেচারারা তোমাদের আমাদের মতোই হতভাগ্য, দুঃখী। পেটের দায়ে পাপ করে, দেশদ্রোহী হয়। ওদের ক্ষমা করো, দুদিন পরে ওরাও আসবে তোমাদের কমরেড হয়ে। যে মৃত্যু-ক্ষুধার জ্বালায় এই পৃথিবী টলমল করছে, ঘুরপাক খাচ্ছে তার গ্রাস থেকে বাঁচবার সাধ্য কারুরই নেই। তোমরা মনে রেখো, তোমরা আমার উদ্ধারের জন্য এখানে আসোনি, তোমাদের সে মন্ত্র আমি কোনোদিনই শিখাইনি, তোমরা তোমাদের উদ্ধার করো—সেই হবে আমারও বড় উদ্ধার। তোমাদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি হব মুক্ত। এসেছ, নমস্কার নাও, আমার দোষ-ত্রুটি অপরাধ ক্ষমা করো, তারপর যদি আসতেই হয় আমার পথে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এসো আমার পিছনে। বিপুল বন্যার বেগে এসো, এক মুহূর্তের জোয়ারের রূপে এসো না। আমি ভেসে চললুম দুঃখ নেই, কিন্তু তোমরা এসো। নমস্কার !'

উপস্থিত সকলেই জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ললাটে কর ঠেকিয়ে সালাম ও নমস্কার করল।

পুলিশ আনসারকে নিয়ে গেল। আশ্চর্য ! কেউ আর বাধা দিল না। থানাতেও গেল না। বজ্রগর্ভ মেঘের মতো ধীর-শান্ত গতিতে নিজ পথে চলে গেল।

যাবার সময় সবচেয়ে মুশকিল হয়েছিল—লতিফাকে নিয়ে। সে কেবলি ঘন ঘন মূর্ছা যাচ্ছিল। আনসার যখন গেল তখনো সে মূর্ছিতা। আনসার নীরবে ধুলায় লুণ্ঠিতা তার ললাটে, শিরে বারবার হাত বুলিয়ে বলতে লাগল, 'বুঁচি, ওঠ ওঠ। তুই অমন করিসনে। আমি আবার আসব।' আনসারের অশ্রু-সাগরে যেন অমাবস্যার রাতের জোয়ার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ...

পরদিন প্রত্যুষে রানাঘাট স্টেশনে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায় আনসার যখন গাড়ি বদল করছিল, তখন হঠাৎ চোখ পড়ল অদূরের কয়েকটি যাত্রীর প্রতি ! তারা আর কেউ নয়, মিস জোন্স, মেজো-বৌ, প্যাঁকালে এবং কুর্শি।

মিস জোন্স এগিয়ে এসে হাসি চেপে বলল, 'আপনার এ অবস্টা ডেখে দুঃখিট, মিস্টার আনসার।'

আনসার হেসে বলল, 'ধন্যবাদ ! তারপর, ওদের নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন ?'

মিস জোন্স বলল, 'বরিশালে ! আপনাদের মেজো-বৌ তো কাল বেঁকে বসেছিল সে আর গির্জায় থাকবে না। আবার মুসলমান হবে, ঘরে ফিরে যাবে। সে কি কান্না, মিস্টার আনসার ! কিন্তু আজ সকালে দেখি, এসে বললে,—সে এদেশে থাকতে চায় না ! আজ কিন্তু সারাদিন কেঁদেছে ও ! ওর মাথায় বোধ হয় ছিট আছো, মিস্টার আনসার ! হাঁ, আর আপনি শুনে বোধহয় খুশি হবেন, কাল প্যাঁকালেও আমাদের পবিত্র

ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। কুর্শির সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। যিশুখ্রিস্ট ওদের সুখী করুন। গুড বাঈ!'

ট্রেন এসে পড়ল। আনসার দেখতে পেল, ইনজিনের অগ্নিচক্ষুর মতোই অদূরে দুটি চক্ষু জ্বলছে। মৃত্যু-ক্ষুধার মতো সে চাউনি জ্বালাময়, বুভূক্ষু, লেলিহান। সে চোখে অশ্রু নাই, শুধু রক্ত।

ট্রেন ছেড়ে দিল। আনসার তার চোখের জলের ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেল, প্লাটফর্মে, কাকে যেন অনেকগুলো লোক আর মিস জোন্স ধরাধরি করে তুলছে।

রেলগাড়ির ধোঁয়ায় আনসারের চোখ এবং প্লাটফর্ম সব আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

বাইশ

সেই মাটির পুতুলের কৃষ্ণনগর! সেই ধুলা-কাদার চাঁদ-সড়ক! শুধু সড়কই আছে, চাঁদ নেই! সবাই বলে, দুদিনের জন্য চাঁদ উঠেছিল, রাহুতে গ্রাস করেছে! বলেই আশেপাশে তাকায়। বিশ্বাসং নৈব কর্তব্য রাজকুলেষু!

সেই 'ওমানকাৎলি' পাড়া, সেই বাগান, পুকুর, পথ-ঘাট, কোঁদল-কাজিয়া সব আছে আগেকার মতোই। শুধ যারা কিছুতেই ভুলতে পারে না তারা ছাড়া আর সকলেই মেজো-বৌ, কূর্শি, প্যাঁকালে, আনসার—সবাইকে, সব কিছুকে ভুলে গেছে। স্মরণ রাখার অবকাশ কোথায় এই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের মাঝে!

অগাধ স্রোতের বিপুল আবর্তে পড়ে যে হাবুডুবু খেয়েছে, সে-ই জানে কেমন করে আবর্তের মানুষ এক মিনিট আগে হারিয়ে-যাওয়া তারই কোলের শিশু-সন্তানের মৃত্যু-কথা ভুলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে!

নিত্যকার একটানা দুঃখ-অভাব-বেদনা-মৃতপীড়া-অপমানের পঙ্কিল স্রোতে, মরণাবর্তে যারা ডুবে মরছে, তাদের অবকাশ কোথায় ক্ষণপূর্বের দুঃখ মনে করে রাখার? ওরা কেবলি হাত-পা ছুঁড়ে অসহায়ের মতো আত্মরক্ষা করতেই ব্যস্ত।

কিন্তু জীবনের সকল আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে যে মৃত্যুর মুখে নিশ্চিন্তে আত্মসমর্পণ করে, এই শেষ নির্ভরতার চরম মুহূর্তে বুঝি-বা তারও স্মরণ-পথে ভিড় করে আসে—সেই চলে-যাওয়ার দল—যারা সারা জীবন তারই আগেপিছে তার প্রিয়তম সহযাত্রী ছিল।

শোকে জরায়-অনাহারে দুঃখে প্যাঁকালের মা শয্যা নিয়েছে। সে কেবল বলে, 'দেখো বড় বৌ, জন্মে অবধি এমন শুয়ে থাকার সুযোগ আর আরাম পাইনি ... কাল থেকে এই

একপাশেই শুয়ে আছি, মনে হচ্ছে এ ধারটা পাথর হয়ে গিয়েছে, তবু কি আরামই লাগছে ! ... আর কারুর জন্যই ভাবি না, তোদের জন্যেও না, আমার জন্যেও না, কারুর জন্যেও না ! ... খোদা যা করবার করবেন ! পানিতে লাঠি মেরে তাকে কেউ ফিরাতে পারে না ! যা হবার, তা হবেই !' —বলেই সে নিশ্চিন্তে-নির্বিকার চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে ! হঠাৎ সে দার্শনিক হয়ে ওঠে, দুঃখ ভোলার বড় বড় কথা তার মুখ দিয়ে বেরোয়—যা জীবনে তার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। বলেই সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায়। প্রশান্ত হাসিতে মুখ-চোখ ছলছল করে ওঠে। ও যেন সারা রাত্রি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পোড়া তৈলহীন প্রদীপের সলতের মতো নিববার আগে হঠাৎ জ্বলে ওঠা !

বড়-বৌ চোখ মোছে। জল এলেও মোছে, না এলে লজ্জায় চোখ ঢাকার ছলনায় মোছে।

এটুকু তো দুটো চোখ, কত জলই বা ওতে ধরে ! যে রক্ত চুঁয়ে ঐ চোখের জল ঝরে, সেই রক্তই যে ফুরিয়ে গেছে।

মেজো-বৌয়ের পতিত্যক্ত সন্তান দুটি আঙিনায় খেলা করে ; কেন যেন নির্লিপ্তভাব ওদের কথায়-বার্তায় চলাফেরায় চোখেমুখে ফুটে ওঠে।

মাতৃহারা বিহগ-শাবক যেন অন্য পাখিদের সঙ্গে থেকেও দলছাড়া হয়ে ঘুরে ফেরে, কি যেন চায়, কাকে যেন খোঁজে—তেমনি !

খানিক খেলা করে, খানিকক্ষণ কাঠ কুড়োয়, খানিক অলসভাবে গাছের তলায় পড়ে ঘুমোয়, ঘুমিয়ে উঠে, আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে, তারপর বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘরে ফিরে। ঘরে এসেই কাকে যেন খোঁজে, কি যেন প্রত্যাশা করে, পায় না। বড়-বৌয়ের ছেলেমেয়েরা ভাব করতে আসে, ভালো লাগে না। বড়-বৌ আদর করতে আসে, কেঁদে ওরা হাত ছাড়িয়ে নেয়। অকারণ আখোট করে।

সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গে ওরা আস্তে আস্তে রুগ্না শয্যাশায়ী দাদির কাছে এসে বসে। ছেলেটি গম্ভীরভাবে বলে, 'দাদিমা, আজ ভালো আছিস ?' বৃদ্ধা হেসে বলে, 'আর দাদু, ভালো ! এখন চোখ দুটো বুঁজলেই সব ভালো-মন্দ যায়।' তারপর দার্শনিকের মতো শান্তস্বরে বলে, 'দেখ্ দাদু, আমি চলে গেলে তোরা কেউ কাঁদিস না যেন। মানুষ জন্মালে মরে। ছেলেমেয়ে, মা-বাপ কারুর কি চিরদিন থাকে ?'

শ্রীমান দাদু এসবের এক বর্ণও বোঝে না, হা করে চেয়ে থাকে।

মা-বাপের নাম শুনতেই ঢুলতে ঢুলতে খুকি বলে ওঠে, 'দাদি, তুই আব্বার কাছে যাবি ? আচ্ছা দাদি, আব্বা যেখানে থাকে সেই বেশিদূর, না, মা যেখানে থাকে সেই বরিশাল বেশি দূর ?'

শান্ত বৃদ্ধা ছটফট করে ওঠে। একটা ভীষণ যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে পাশ ফিরে শুয়ে বলে, 'ঐ বরিশালই বেশি দূর, ঐ বরিশালই বেশি দূর !'

খুকি বুঝতে পারে না। তবু ক্লান্ত-কণ্ঠে বলে, 'তাহলে আমি আব্বার কাছে যাব। আচ্ছা দাদি, আব্বার কাছে যেতে হলে কদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয় ! তুই তো

বিছানায় শুয়ে অসুখ করেছিস, তারপর সেখানে যাচ্ছিস! আমারও এইবার অসুখ করবে, তারপরে আব্বার কাছে চলে যাব! মা ভালোবাসে না, খেরেস্তান হয়ে গিয়েছে! হারাম খায়! থুঃ! ওর কাছে আর যাচ্ছি না, হুঁ হুঁ!'

বৃদ্ধা শুয়ে শুয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে। মনে হয়, কামারশালে বুঝি পোড়া কয়লা জ্বালাতে হাপরের শব্দ হচ্ছে!

দাওয়ার মাটিতে শুয়ে পড়ে জড়িতকণ্ঠে খুকি আবার জিজ্ঞাসা করে, 'হেঁ দাদি, আব্বা যেখানে থাকে সেখানে সন্ধ্যাবেলায় কী খেতে দেয়? আমি বলি দুধ-ভাত, হানপে বলে গোশত-রুটি!' ... কিন্তু দাদির উত্তর শোনার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ে!

ছেলেটি জেগেই থাকে। কি সব ভাবে, মাঝে মাঝে রান্নাঘরের দিকে চায়। সেখানে অন্ধকার দেখে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে না।

কিন্তু থাকতেও পারে না। আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায়! দাদি চেঁচিয়ে ওঠে, 'অ হানপে, কোথায় যাচ্ছিস রে এই অন্ধকারে?' অন্ধকারের ওপার থেকে উত্তর আসে, 'মজিদে শিন্নিআছে, আনতে যাচ্ছি।'

বড়-বৌ মসজিদের দ্বার থেকে কোলে করে আনতে চায়, সে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে। বলে, 'যাব না, আমি শিন্নি খাব, আমার বড্ডো খিদে পেয়েছে গো! আমি যাব না।'

মসজিদের ভিতর থেকে মৌলবি সাহেবের কণ্ঠ ভেসে আসে। কোরানের সেই অংশ—যার মানে—'আমি তাহাদের নামাজ কবুল করি না, যাহারা পিতৃহীনকে হাঁকাইয়া দেয়!' মৌলবি সাহেব জোরে জোরে পাঠ করেন, ভক্তরা চক্ষু বুজিয়া শোনে।

অন্ধকার ঘরে ক্ষুধাতুর শিশুর মাথার ওপর দিয়ে বাদুড় উড়ে যায়—আসন্ন মৃত্যুর ছায়ার মতো।

ঘুমের মাঝে খুকি কেঁদে ওঠে, 'মাগো আমি আব্বার কাছে যাব না! আমি তোর কাছে যাব, বরিশাল যাব।'

খণ্ড অন্ধকারের মতো বাদুড় দল তেমনি পাখা ঝাপটে উড়ে যায় মাথার ওপর—রাত্রি শিউরে ওঠে।

তেইশ

বহুদিন পরে লতিফার মুখে হাসি দেখা দিল। নাজির সাহেব অফিস থেকে এসেই ঘুমন্ত লতিফাকে তুলে বললেন, 'ওগো, শুনেছ? রুবির বাবা যে নদীয়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন!'

এক নিমেষে লতিফার ঘুম যেন কোথায় উঠে গেল ! সে ধড়মড়িয়ে উঠে বলল, 'সত্যি বলছ ? মিস্টার হামিদ একা এলেন, না, রুবিও সঙ্গে আছে ?'

ধড়া-চূড়া খুলতে খুলতে নাজির সাহেব বললেন, 'তা তো ঠিক জানিনে। তবে কে যেন বলল, হামিদ সাহেবের ছেলেমেয়েরাও এসেছে সঙ্গে।'

লতিফার চোখ কার কথা ভেবে বাষ্পাকুল হয়ে উঠল ! মনে মনে বলল, 'সেই তো এলি হতভাগী, দু-দিন আগে এলে হয়তো একবার দেখতে পেতিস !'

পরদিন বিকালে লতিফার দোরে একটা প্রকাণ্ড মোটর এসে দাঁড়াল। লতিফা দোরে এসে দাঁড়াতেই মোটর হতে এক শ্বেতবসনা সুন্দরী হাস্যোজ্জ্বল মুখে নেমে এল।

লতিফা তাকে একেবারে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলল, 'রুবি, তুই ! তুই এমন হয়েছিস ?' বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রুবি ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ ! কাঁদবি তো এখনি চলে যাব বলে দিচ্ছি ! মাগো ! তোদের চোখের জল যেন সাধা ; কোথায় এতদিন পরে দেখা, একটু আনন্দ করবি, তা না, কেঁদেই ভাসিয়ে দিচ্ছিস।'

লতিফা চোখ মুছে বলল, 'সেই রুবি, তুই এই হয়েছিস ! তখন যে তোর মতন কাঁদুনে কেউ ছিল না লো আমাদের দলে, আর এখন এমনি পাথর হয়ে গেছিস ?'

রুবি লতিফার গাল টিপে দিয়ে বলল, 'পাথর নয় লো, বরফ ! আবার গ্রীষ্মকাল এলেই গলে জল হয়ে যাব !' বলেই তার ছেলেমেয়েদের আদর করে, চুমু খেয়ে, কোলে নিয়ে চিমটি কেটে কাঁদিয়ে, তারপর মিষ্টি, কাপড় দিয়ে ভুলিয়ে—বাড়িটাকে যেন সরগরম করে তুললে !

পাড়ার অনেক মেয়ে জুটেছিল, কিন্তু রুবির এক হুমকিতে সব যে যেখানে পারল সরে পড়ল ! বাপ ! ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে !

রুবি হেসে বলল, 'জানিস বুঁচি, আমি বেশি লোক দেখতে পারিনে ! একপাল লোক মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে, ভাবতেও যেন অসোয়াস্তি লাগে। ওদের তাড়িয়ে দিতে কষ্ট হয়, কিন্তু না তাড়িয়ে যে পারিনে ভাই।'

বুঁচি ওরফে লতিফা হেসে বলল, 'তুই ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে, তাই ওরা অমন চুপ করে সরে গেল, নইলে এমন ভাষায় তোর তাড়নার উত্তর দিয়ে যেত যে, কানে সীল-মোহর করতে ইচ্ছে করত।'

রুবি দুষ্টু হাসি হেসে বলল, 'তাহলে তুই বেশ খাঁটি বাংলা শিখে ফেলেছিস এতদিনে ?'

লতিফা হেসে বলল, 'হাঁ, তা আমি কেন, আমার ছেলেমেয়েরাও শিখে ফেলেছে। এমন বিশ্রী পাড়ায় আছি ভাই, সে আর বলিসনে। ছেলেমেয়েগুলোর পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল। কিন্তু ও কথা যাক, ছেলেমেয়েগুলোকে ছেড়ে একটু স্থির হয়ে বসো দেখি, কত কথা আছে জানবার, জানাবার। যেতে কিন্তু বেশ দেরি হবে তোর, মোটর ফিরে যেতে বলো, রাত্রে খেয়ে দেয়ে যাবি।'

রুবি আনন্দে ছেলে-মানুষের মতো নেচে উঠে সোফারকে গাড়ি দিয়ে যেতে বলল এবং ঝিকে ঐ সঙ্গে বাড়ি পাঠিয়ে তার মাকে ভাবতে মানা করে রাত্রি দশটায় গাড়ি আনতে বলে দিল।

রুবি ছুটে এসে লতিফার পালঙ্কের উপর সশব্দে শুয়ে পড়ে লতিফাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'বাস, এইবার আর কোনো কথা নয়। তুই তোর সব কথা বল, আমি আমার সব কথা বলি।' বলেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ও বাবা, এখুনি আবার তোর নাজির সাহেব আসবে বুঝি? ওকে কিন্তু আজ তাড়াতাড়ি খাইয়ে-দাইয়ে বাইরে ভাগিয়ে দিবি।'

তার কথা বলার ধরনে লতিফা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, 'দাঁড়া, মিনসে আসুক, তখন তোকে ধরিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ছি। কিন্তু ভয় নেই তোর, আজ উনি শিকারে বেরিয়েছেন! ফিরতে রাত বারোটার কম হবে না।'

রুবি লতিফার পিঠ চাপড়ে বলল, 'ব্রাভো! তবে আজ আমাদের পায় কে! গ্র্যাণ্ড গল্প করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।'

লতিফা হেসে বলল, 'গল্প করলে তো পেট ভরবে না। তার চেয়ে বরং চলো রান্নাঘরে আমি পরোটা করব, আর তুই গল্প করবি।'

রুবি হেসে বলল, 'তাই চল ভাই, কতদিন তোর হাতের রান্না খাইনি।'

পরোটার নেচি করতে করতে রুবি বলল, 'আমি কি করে তোর খবর পেলুম জানিস?' বলেই একটু থেমে বলতে লাগল, 'একদিন কাগজে পড়লুম, তোদের বাড়িতে মিঃ আনসারকে পুলিশ এ্যারেস্ট করেছে!' বলেই রুবি হঠাৎ চুপ করে গেল।

লতিফার হাসিমুখ হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলল, 'আমিও তোর কথা প্রথম শুনি দাদা-ভাইয়ের কাছে। দাদু এখন স্টেট-প্রিজনার হয়ে বন্দি আছেন, শুনেছিস বোধ হয়।'

রুবি তার ডাগর চোখের করুণ দৃষ্টি দিয়ে লতিফার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, 'হাঁ জানি। খবরের কাগজে সব পড়েছি। আচ্ছা ভাই বুঁচি, ভাই তোকে কিছু বলেছিল আমার সম্বন্ধে?'

লতিফা শান্তকণ্ঠে বলল, 'হাঁ, বলেছিল! আচ্ছা রুবি আমার কাছে লুকোবিনে, বল?'

রুবি স্থিরকণ্ঠে বলে উঠল, 'দেখ ভাই বুঁচি, আমি আমার মনের কথা কারুর কাছেই গোপন রাখিনে। এর জন্য আমায় চরম দুঃখ পেতে হয়েছে, তবু মনকে চোখ ঠারতে পারিনি। তুই যা জিজ্ঞাসা করবি তা জানি!'

লতিফা রুবির দিকে খানিক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুই তোর স্বামীকে ভালোবাসতিস?'

রুবি সহজ শান্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'না। সে তো আমার ভালোবাসা চায়নি, আমিও চাইনি। সে চেয়েছিল আমাকে বিয়ে করে ধন্য করার দাবিতে বিলেত যাওয়ার পথ-খরচা। তা সে পেয়েছিল। কিন্তু কপাল খারাপ, সইল না, বেচারার জন্য বড় দুঃখ হয় বুঁচি !' একটু থেমে আবার বলতে লাগল, 'মৃত্যুর দিন-কতক আগে সে তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। এই ভুলই হয়তো তার কাল হলো। আমি সেবা-শুশ্রূষা সবই করেছি, অবশ্য আমাকে খুশি করতে নয়, তাকে আর আমার বাপ-মাকে খুশি করতে। কিন্তু একদিন সে ধরে ফেলল আমার ফাঁকি ! সে স্পষ্টই বলল, 'তুমি আমায় ভালোবাস না, এর চেয়ে বড় দুঃখ আমার আর নেই রুবি। আমার সবচেয়ে কাছের লোকটিই সবচেয়ে অনাত্মীয়, এ ভাবতেও আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। হয়তো আমি বাঁচতুম, কিন্তু এর পরে আমার বাঁচবার আর কোনো সাধ নেই।'

লতিফার যেন শ্বাস রোধ হয়ে আসছিল। সে আর বলতে না দিয়েই প্রশ্ন করল, 'এ শুনেও তুই চুপ করে রইলি ?'

রুবি তেমনি, সহজভাবে নেচি করতে করতে বলল, 'তাছাড়া আর কি করব বল ? একজন ভদ্রলোককে চোখের সামনে মরতে দেখলে কার না কষ্ট হয় ! কিন্তু সে কষ্ট কোনোদিনই আত্মীয়-বিয়োগের মতো পীড়াদায়ক মনে হয়নি আমার কাছে।'

লতিফা চমকে উঠল। যেন হঠাৎ সে গোখরো সাপের গায়ে পা দিয়ে ফেলেছে ! কিন্তু ইচ্ছা করেই সে এর পরেও আর কোনো প্রশ্ন করল না। তার মনে হতে লাগল, সে যেন ক্রমেই পাষাণ-মূর্তিতে পরিণত হতে চলেছে। যা শুনল, যা দেখল, তা যেন কল্পনারও অতীত। এমন নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি কোনো মেয়ে করতে পারে, ভাবতেও তার যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসতে লাগল।

রুবি অদ্ভুত রকমের হাসি হেসে বলে উঠল, 'শুনে তোর খুব ঘেন্না হচ্ছে আমার ওপর, না ? তা আমার বাপ-মাই ঘেন্না করেন, তুই তো তুই। কিন্তু বুঁচি, তুই শুনে আরও আশ্চর্য হয়ে যাবি যে, যেদিন আনু ভাইকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশে কাগজে পড়লুম, সেইদিনই মনে হলো, আমার সুন্দর পৃথিবীকে কে যেন তার স্থূল হাত দিয়ে তার সমস্ত সৌন্দর্য লেপে-মুছে দিয়ে গেল ! ঐ একটি ছাড়া, পৃথিবীতে আর কারুর জন্যই আমার কোনো দুঃখ-বোধ নেই।'

বলতে বলতে তার স্থির তীব্র চক্ষু অশ্রুভারে টলমল করে উঠল।

লতিফা একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই বলে উঠল, 'কিন্তু ভাই, এ কি মস্ত বড় অন্যায় নয় ?'

রুবি চোখের জল মুছবার কোনো চেষ্টা না করে ততোধিক শ্লেষের সঙ্গে বলে উঠল, 'আমার হৃদয়-মনকে উপবাসী রেখে অন্যের সুখের বলি হতে না পারাটাই বুঝি খুব বড় অন্যায় হয় তোদের কাছে, বুঁচি ? হয়তো তোদের কাছে হয়, আমার কাছে হয় না। আমার ন্যায়-অন্যায় আমার কাছে। অন্যকে খুশি করতে গিয়ে সব কিছু উপদ্রব নীরবে সইতে পারাটাই কিছু মহত্ত্ব নয় ! আমার বাপ-মার স্নেহ-ভালোবাসার ঋণ শোধ করতে

গিয়েই তো আমি আজ এমন দেউলিয়া ! আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, জীবনের আনন্দের পথ বেছে নেবার আমারই কোনো অধিকার থাকবে না?' বলেই নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলল, 'আমার স্বামী মহৎ, ভাগ্যবান এবং বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি মরে গিয়ে সারা জীবন দুঃখ পাওয়ার দায় থেকে বেঁচে গেলেন !'

লতিফার মনে হতে লাগল পৃথিবী যেন টলছে। তার মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল ! কোনো রকমে কষ্টে সে বলতে পারল, 'মেয়েমানুষ কী করে এমন নিষ্ঠুর হয়, আমি যে তা ভাবতে পারছিনে রুবি ! কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে !'

রুবি এইবার হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু সে হাসিতে কোনো রসকষ নেই। ততক্ষণে নেচি তৈরি করা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে হাত ধুতে ধুতে বলল, 'দেখ বুঁচি, পানি চমৎকার শীতল পানীয় দ্রব্য, কিন্তু সেই পানি যখন আগুনের আঁচে টগবগ করে ফুটতে থাকে, তখন তা গায়ে পড়লে ফোসকা তো পড়বেই !—কিন্তু তোর তাওয়ায় যে ধোঁয়া উঠে গেল, নে, এখন পরোটা কটা ভেজে নে !'

লতিফা যন্ত্র-চালিতের মতো পরোটা হালুয়া চা তৈরি করে রুবির সামনে ধরল।

রুবি হেসে বলল, 'এসব কিছু আমি বাড়িতে খাইনে, আজ তোর কাছে খাব।'

লতিফা বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু মেলে রুবির দিকে তাকিয়ে রইল। সে যেন কিছু বুঝতে পারছিল না।

রুবি হেসে বলল, 'নে, খা এখন। এ সবের মানে তুই বুঝবিনে। দেখছিস তো, আমি থাকি হিন্দু-বিধবাদের মতো। একবেলা খাই, তাও আবার নিরামিষ। ঘি খাইনে, চা, পান তো নয়ই। শাদা থান পরি, তেল দিইনে চুলে। এই সব আর কি ! এখন বুঝলি তো?'

খেতে খেতে হেসে ফেলে বলল, 'যে স্বামীকে স্বীকার করল না, তার আবার বৈধব্য। আমারই তো হাসি পায় সময় সময় !'

লতিফা একটু ক্রুদ্ধস্বরেই বলে উঠল, 'বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে রুবি।'

রুবি সে কথার উত্তর না দিয়ে চা খেতে খেতে বলল, 'আঃ, এই একটু চা পেলে আনু ভাই কেমন লাফিয়ে উঠত আনন্দে, দেখেছিস !'

লতিফা এইবার হাঁফ ছেড়ে বেঁচে বলে উঠল, 'সত্যি ভাই রুবি, দাদু বোধ হয় তোর চেয়েও চায়ের কাপকে বেশি ভালবাসে !'

রুবি গম্ভীর হবার ভান করে বলে উঠল, 'তার কারণ জানিস, বুঁচি? চায়ের কাপটা যত সহজে মুখের কাছে তুলে ধরা যায়, আমায় যদি অমনি করে হাতে পেয়ে মুখের কাছে তুলে ধরে পান করতে পেত তোর দাদু, তাহলে আমিও ঐ চায়ের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে উঠতুম !' বলেই হেসে ফেললে।

লতিফা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বলল, 'ওমা, তুই কি বেহায়াই না হয়েছিস রুবি ! একেবারে গেছিস !'

রুবি সায় দিয়ে বলে উঠল, 'হাঁ, একেবারেই গেছি, আর ফিরব না।'

চা খাওয়া শেষ হলে রুবি বলে উঠল, 'শুধু একজনের জন্য ঐ চা-টার ওপর লোভ হয়!'

রুবির অতিরিক্ত প্রগলভতায় ক্ষুব্ধ হয়ে লতিফা বলে উঠল, এতই যদি তোর লোভ, তাহলে চা-খোর লোকটাকে বেঁধে রাখলিনে কেন? তাহলে সেও বাঁচত, তুইও বাঁচতিস। আমরাও বাঁচতাম।'

রুবি বিনা-দ্বিধায় বলে উঠল, 'একটা ভুল বললি ভাই বুঁচি। আমরা হয়তো বেঁচে যেতুম সত্যি, কিন্তু তোর দাদু বাঁচত না।'

লতিফা বোকার মতো খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, 'তার মানে?'

রুবি লতিফার হাতে কটাস করে চিমটি কেটে দিয়ে বলল, 'মর নেকি! তাও বুঝলিনে!' তারপর একটু থেমে বলল, 'যে মরেনি তার আবার বাঁচা কি! তোর দাদু তো আমার মতো মরেনি। দিব্যি জ্বল-জ্যান্ত বেঁচে থেকে কুলিমজুর নিয়ে মাঠে-ঘাটে চরে খাচ্ছে। আমার একটা বড় দুঃখ রইল ভাই, যার জন্যে মরলুম, তাকে মেরে যেতে পারলুম না।'

লতিফা কতটা কূল পেয়ে হেসে বলল, 'বাপ রে! কি দস্যি মেয়ে তুই! শোধ না নিয়ে যাবিনে! তা তোকে একটা খোশ-খবর দিচ্ছি ভাই। সে হয়তো মরেনি তোর মতো, কিন্তু ঘা খেয়েছে।'

রুবি একেবারে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'না, না, এ হতেই পারে না! ও শুধু মানুষেরই বাইরের দুঃখকে দেখেছে, ভিতরের দুঃখ দেখবার ওর ক্ষমতা নেই, হৃদয় বলেই কোনো কিছুর বালাই নেই ওর! ও শুধু তাদেরই দুঃখ বোঝে, যারা ওর কাছে কেবলি পেতে চায়। যে তাকে তার সর্বস্ব দিয়ে—চেয়ে নয়, সুখী হতে চায়, তার দুঃখ ও বোঝে না, বোঝে না।'

খুলে-পড়া এলোচুলের মাঝে রুবির চোখ আঁধার বনে সাপের মানিকের মতো জ্বলতে লাগল।

লতিফার চোখ দুঃখে, আনন্দে, গর্বে ছলছল করে উঠল। তার দাদুকে এমন করে ভালোবাসবারও কেউ আছে। সে রুবিকে একেবারে বুকে চেপে ধরে শান্তস্বরে বলল, 'তোর অভিমানের কুয়াশায় কিছু দেখতে পাচ্ছিসনে রুবি, আমিও তো মেয়েমানুষ। আমি সত্যি বলছি, সে তোকে ভালোবাসে।'

রুবির চোখের বাঁধ ছাপিয়ে জল ঝরতে লাগল। জ্যৈষ্ঠ মাসের দগ্ধ দুপুরে বর্ষা নামার মতো।

লতিফা তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'আমার দুঃখ হচ্ছে রুবি, ভালোবাসার এই অতলতার সন্ধান পেয়ে তার কারাবাসও বেহেশতের চেয়ে মধুর হয়ে

উঠত। তুই ভালোবাসিস শুধু এইটুকুই সে জানে। তার তল যে এত গভীর, তা বোধহয় জানে না।' বলেই রুবির গাল টিপে হেসে বলল, 'জানলে দেশসেবা ছেড়ে দিয়ে কোনোদিন তোর পদসেবা শুরু করত।'

রুবি কিন্তু এর পরে একটি কথাও কইল না। অতল পাথরের ঝিনুক যেমন দিনের পর দিন ভেসে বেড়ায় ঢেউ-এ ঢেউ-এ, একবিন্দু শিশিরের আশায়, স্বাতী নক্ষত্রের শিশিরের আশায়, তারপর সেই শিশিরটুকুও বুকে পেয়েই সে জলের অতল তলে ডুবে যায় মুক্ত ফলাবার সাধনায়—এও তেমনি।

'সেও ভালোবাসে' শুধু এইটুকু সান্ত্বনাতেই যেন রুবির বুক ভরে উঠল। শুধু এই একবিন্দু শিশিরের প্রতীক্ষাতেই যেন সে তার তৃষ্ণার্ত মুখ তুলে অনির্দেশ শূন্যের পানে তাকিয়ে ছিল। তার বুক ভরে উঠেছে। তার মুখের বাণী মূক হয়ে গেছে। সে আর কিছু চায় না। এইবার সে মুক্তা ফলাবে। সে অতল তলে ডুবে গেল।

ঝিনুকের মুখে একবিন্দু শিশির ! নারীর বুকে একবিন্দু প্রেম !

আকাশের এক কোণে এক ফালি চাঁদ ! কোন মাসের চাঁদ জানে না, তবু রুবির মনে হতে লাগল, ও যেন ঈদের চাঁদ ! ওর রোজার মাস বুঝি শেষ হল আজ।

আকাশের কোলে একটুকু চাঁদ, শিশু-শশী। ও যেন আকাশের খুকি। শাদা মেঘের তোয়ালে জড়িয়ে আকাশ-মাতা যেন ওকে কোলে করে আঙিনায় দাঁড়িয়েছে।

অমনি খুকি ...

লজ্জায় রুবির মুখ রুবির মতোই লাল হয়ে উঠল। এ কি স্বপ্ন ! এ কি সুখ !

চব্বিশ

বরিশাল। বাংলার ভিনিস।

আঁকাবাঁকা লাল রাস্তা। শহরটিকে জড়িয়ে ধরে আছে ভুজ-বন্ধের মতো করে।

রাস্তার দু-ধারে ঝাউগাছের সারি। তারই পাশে নদী। টলমল টলমল করছে—বোম্বাই শাড়ি-পড়া ভরা-যৌবন বধূর পথ-চলার মতো। যত না চলে, অঙ্গ দোলে তার চেয়ে অনেক বেশি।

নদীর ওপারে ধানের ক্ষেত ! তারও ওপারে নারিকেল-সুপারি কুঞ্জঘেরা সবুজ গ্রাম, শান্ত নিশ্চুপ। সবুজ শাড়ি-পরা বাসর-ঘরের ভয়-পাওয়া ছোট্ট কনে-বৌটির মতো।

এক আকাশ হতে আর-আকাশে কার অনুনয় সঞ্চরণ করে ফিরছে, 'বৌ কথা কও। বৌ কথা কও।'

আঁধারের চাদর মুড়ি দিয়ে তখনো রাত্রি অভিসারে বেরোয়নি। তখনো বুঝি তার সান্ধ্য প্রসাধন শেষ হয়নি। শঙ্কায় হাতের আলতার শিশি সাঁঝের আকাশে গড়িয়ে পড়েছে। পায়ের চেয়ে আকাশটাই রেঙে উঠেছে বেশি। মেঘের কালো খোঁপায় তৃতীয়া চাঁদের গেড়ে মালাটা জড়াতে গিয়ে বেঁকে গেছে। উঠোনময় তারার ফুল ছড়ানো।

তিন-চারটি বাঙালি মেয়ে, কালোপেড়ে শাড়ি পরা, বাঁকা সিঁথি, 'হিল্-শু' পায়ে দেওয়া,—ঐ রাস্তারই একটা ভগ্নপ্রায় পুলের উপর এসে বসল। মাথার ওপর ঝাউ শাখাগুলো প্রাণপণে বীজন করতে লাগল।

মাঝে মাঝে স্থানীয় জমিদারদের দু-একটি মোটর ফিটন যেতে যেতে মেয়েগুলির কাছে এসে গতি শ্লথ করে আবার চলে যেতে লাগল !

একটি মেয়ে ছাড়া আর সকলে মশগুল হয়ে গল্প জুড়ে দিল। একটা মেয়ে একটু দূরে নেমে ঘাসের ওপর বসে একদৃষ্টে নদীর দিকে তাকিয়ে কি দেখছিল, জিজ্ঞাসা করলে হয়তো সে নিজেই বলতে পারত না।

অনেকক্ষণ গল্প-গুজবের পর দলের একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'মেজো-বৌ, ওখানে একলাটি বসে কার কথা ভাবছ ভাই ?'

মেজো-বৌ উত্তর দিল না।

মেয়েটি তখন উঠে গিয়ে তাকে একটু জোর করেই নিজেদের কাছে এনে বসিয়ে হেসে বলল, 'জান, মেম-সায়েবের হুকুম তোমাকে চোখে চোখে রাখার ! সরে পড়ো না যেন ভাই, তা হলেই গেছি !'

মেজো-বৌ ম্লান হাসি হেসে বলল, 'না, সে ভয় নেই। আর সরে পড়লেও তো ঐ নদীর জল ছাড়িয়ে বেশি দূর যাব না !'

অস্তমান তৃতীয়া চাঁদের মুখ ম্লান হয়ে উঠল তার হাসিতে। ঝাউগাছগুলো জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল।

যে মেয়েটি কথা বলছিল, তার নাম মিনতি।

মেজো-বৌয়ের প্রায় সমবয়সী। হিন্দুঘরের বৌ ছিল সে। স্বামীর অত্যাচার সইতে না পেরে খ্রিস্টান হয়ে ডাইভোর্স নিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে বেড়াচ্ছে।

লেখাপড়া-জানা মেয়েদের শিক্ষয়িত্রীরও কাজ করে।

এই মেয়েটিই মেজো-বৌয়ের একমাত্র বন্ধু। চোখের জল বদল-করা সই।

অন্য দুটি মেয়ের একজন বলে উঠল, 'আচ্ছা ভাই, ওর মেজো-বৌ নাম কি আর ঘুচবে না ?'

মেজো-বৌ হেসে বলল, 'তালগাছ না থাকলেও তালপুকুর নামটা কি বদলে যায় ?'

তেমনি জোর-করা হাসি ! বুকের সলতে জ্বালিয়ে প্রদীপের আলো দেওয়ার মতো।

মিনতি মেজো-বৌকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে বলে উঠল, 'তা ভাই, ওকে ঐ নামে ডাকতেই আমার তো বেশ মিষ্টি লাগে। মনে হয় বেশ ঘরসংসার করে জা-ননদ মিলে সব আছি।'

অন্য মেয়েটি কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুর করে গেয়ে উঠল, 'হায় গৃহহীন, হায় গতিহারা !' তারপর কথায় একটু নুন-লঙ্কা মিশিয়ে বলল, 'তা ভাই, তোমাদের ঘরের সাধ এখনো মেটেনি। তা দুধ খাওয়ার সাধই যদি জেগে থাকে, এ ঘোল খেয়ে খামকা সর্দি করছ কেন?'

মেজো-বৌ ঝালটুকু সয়ে নিয়ে বলল, 'তা ভাই, মাথায় ঘোল ঢালার চেয়ে পেটে ঘোল ঢালা বরং সইবে !'

মেয়েটির গোপন দুর্বলতায় ঘা দিল গিয়ে এই ওস্তাদি মারটুকু। সে মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠল, 'মেজো-বৌও কথা শিখেছে দেখছি।'

মেজো-বৌ হেসে বলল, 'তার চেয়ে বল মানুষ হয়ে উঠলাম। আমরা কৃষ্ণনগরের মেয়ে ভাই, আমাদের কথা শিখতে হয় না ! মায়ের পেট থেকেই কথা শিখে আসে আমাদের দেশের মেয়ে ! কিন্তু তুমি রেগো না ভাই, আমি সত্যিই তোমাদের সঙ্গে মিশতে পারবার মতো হইনি। এই তো জোর করে ফ্যাশন করে শাড়ি পরাচ্ছ, বাঁকা সিঁথি কেটে দিচ্ছ, জুতোও মিলল কপালে, কিন্তু ও জুতো-শাড়ি দিয়েও কি তোমাদের মতো করে তুলতে পারলে। মেম-সায়েবদের জুতো মেম-সায়েবদের মাথায় থাক ভাই, আমি সাদা কাপড় পরে থাকতে পারলেই নিশ্বাস ফেলে বাঁচি !'

মেয়েটি একটু তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল, 'তাহলে এখানে এলে কেন?' তার এই খাপছাড়া প্রশ্নে সে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে উঠল এবং সেই কারণেই ততোধিক রেগে গেল।

মেজো-বৌ তেমনি হাসিমুখে বলল, 'আমি তো মেম-সায়েব হতে আসিনি ভাই, মানুষ হতে এসেছিলুম। আলো-বাতাস প্রাণের বড় অভাব আমাদের সমাজে, তাই খাঁচার পাখির মতো শিকলি কেটে বেরিয়ে পড়েছিলুম। কিছু যে ভালো হয়নি আমার, তা বলব না। এখন যা শিখেছি, তাতে করে যেখানেই থাকি দুটো পেটের ভাত যোগাড় করবার অসুবিধে হবে না। কিন্তু কি করি, চিরজন্মের অভ্যেস, ঐ জুতাটুতোগুলো পরলে মনে হয় পায়ে এ এক নতুন রকমের শিকলি পড়ল !'

মিনতি উঠে পড়ে বলল, 'আচ্ছা, এইবার থেকে তুমি লুঙ্গি পরে থেকো, আমি বলে দেব গিয়ে ! জুতো টুতো তোমার পোড়া কপালে সইবে না ! এখন চল, রাত্তির হয়ে যাচ্ছে।'

সকলেই উঠে পড়ল। ...

একটু না যেতেই প্যাঁকালের সঙ্গে দেখা হল। সে পাদরি সাহেবের সুপারিশের জোরে এখানে এসেই ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের পিওনের পদ লাভ করেছে। এখন আর সে

প্যাঁকালে নয়, তার নাম এখন জোসেফ ! ম্যাজিস্ট্রেট ডাকে, 'জোসেফ !' আনন্দে প্যাঁকালে প্রায় কেঁদে ফেলে ! 'হুজুর' বলে 'পড়ি কি মরি' বলে ছুটে এসে আড়াই হাত লম্বা এক কুর্নিশ ঠোকে। শ্রীমতি কুর্শি ওরফে মিসেস প্যাঁকালে মিশনারি মেমদের ফাই-ফরমাশ খেটে দেয়, তার জন্য কুড়ি টাকা করে পায়। প্যাঁকালে পনের আর কুর্শি কুড়ি, মোট পঁয়ত্রিশ। দিব্যি হেসে খেলে সংসার চলে। কুর্শি প্যাঁকালেকে বড় একটা কেয়ার করে না, সে পাঁচ টাকা বেশি রোজগার করে। প্যাঁকালে কিছু বলল, বলে, 'আমি তোর খাই নাকি রে মিনসে? বেশি টকখাই টকখাই করিসনে।' বলে গরব করে চলে যায়।

প্যাঁকালে না খেয়েই অফিসে চলে যেতে চায়। বলে, 'আমি ম্যাজিস্টরের পিয়ন। তোর মতো কত বিশ টাকা আমার কাছার তলায় ঝোলে। তোর মেমসায়েবকে শুধোয় কে !'

ঘরের বাইরে পা দিতেই কুর্শি কোমরে কাপড় জড়াতে জড়াতে বলে, 'যা দিকিন দেখি !' বলেই খপ করে কোঁচটা ধরে ফেলে। বলে, 'আর এক পা এগুবি তো কেলেঙ্কারি বাধিয়ে দেবো ! কাপড় কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেবো !' বলেই কোঁচায় হেঁচকা টান দেয়।

প্যাঁকালে অসহায় অবস্থায় সেখানে বসে পড়ে, বলে, 'ছেড়ে দে বলছি শালি ! নইলে দিলুম ধুমাধুম। ... হেই কুর্শি, তোর পায়ে পড়ি। কেউ দেখতে পাবে এখুনি ! আল্লার কিরে ! যিশুখ্রিস্টের কিরে ! মাইরি বলছি, আর কখ্খনো কিছু বলব না।' বলেই নাকে কানে হাত দেয়।

কুর্শি কোঁচা ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বসে পড়ে। বলে, 'চল, খাবি ! খেয়ে তোর ম্যাজিস্টর খসমের কাছে গিয়ে রাগ দেখাস।'

বারো-আনা দিগম্বর প্যাঁকালে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে ! তারপর খেয়ে-দেয়ে গুড়-গুড় করে অফিসে যায়। যাবার সময় বলে যায়, 'শালার মেয়ে-মানুষকে বিয়ে করার মতন গুখুরি কাজ আর নেই ! তোকে যদি আর কখনো বিয়ে করি, আমার বাপের—'

কুর্শি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। বলে, 'আসতে যদি পাঁচ মিনিট দেরি করবি, তাহলে আজ মেম-সায়েবরে কাছে গিয়ে শুয়ে থাকব।'

সেদিন রাস্তায় মেজো-বৌকে দেখে পূর্ব অভ্যাসমত বলে উঠল, 'মেজো-ভাবি, তোমাকেই খুঁজছি আমি।'

মেজো-বৌ হেসে বলল, 'কেন, কুর্শি কি আজো তাড়িয়ে দিয়েছে? আচ্ছা কুকুরে-ভালোবাসা তোমাদের যা-হোক !' বলেই পুরানো দিনের মত মিষ্টি করে হাসে। অন্ধকার মেঘে বিজলির ক্ষণিক ছটা !

ঐ হাসির মানে আগে প্যাঁকালে বুঝত না। কিন্তু এখন সে ঝানু হয়ে না গেলেও ডাঁশিয়ে উঠেছে, কাজেই ও হাসিতে বেশ একটু যেন চমকে ওঠে। আঁধার রাতে বিজলি আর সাপ দুটোই চমকে দেয়।

প্যাঁকালে একটু থেমে তার পাশের মেয়েগুলোর দিকে আধা-কটাক্ষে চেয়ে নিয়ে বললে, 'বাড়ি থেকে একটা চিঠি এসেছে, বিকেলে তুমি যদি একটু পড়ে দিয়ে আস।'

মেজো-বৌকে কে যেন হঠাৎ চাবুক মারলে, চমকে উঠল সে! মুখ কেমন হয়ে গেল, আবছা আঁধারে ভালো দেখা গেল না। কিন্তু গলার স্বর শুনে মনে হল, কে যেন তার টুটি টিপে ধরেছে।

মেজো-বৌ শক্ত মেয়ে। তবু সে আজ সামলাতে পারল না। কম্পিত দীর্ঘ কণ্ঠে বলে উঠল, 'চল, এখনি তোমার বাড়ি চল।'

প্যাঁকালে বলতে যাচ্ছিল, 'আজ আর না-ই গেলে, কাল—'

মেজো-বৌ বলল, 'না, না, এখ্খনি চল!' বলেই সে প্রায় ছুটে প্যাঁকালের বাড়ির দিকে চলতে লাগল। তার সঙ্গে যে আর কেউ ছিল, বা তাদের কোন কিছু বলবার দরকার, সে সব ভাববারও যেন অবসর ছিল না তার।

মিনতি প্যাঁকালেকে বলে দিল, সে যেন মেজো-বৌয়ের চিঠি পড়া হলেই তাকে সঙ্গে করে রেখে দিয়ে যায়।

দূরে থেকে দেখা গেল, মেজো-বৌ তেমনি বেগে ছুটেছে ঘরের পথে।

হাউই যেমন বেগে আকাশে ওঠে, তেমনি বেগেই মাটির পৃথিবীতে ফিরে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে।

পঁচিশ

মেজো-বৌ ঝড়ের মতো প্যাঁকালের ঘরে এসে ডেকে উঠল, 'কুর্শি!'

মেজো-বৌয়ের এমনতর স্বর কুর্শি কখনো শুনে নাই। সে ভয় পেয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতেই মেজো-বৌ বললে, 'কি চিঠি এসেছে দেখি!'

কুর্শি নিঃশব্দে চিঠি এনে দিল। তারও তখন পা কাঁপছে! তারা আসা অবধি এই এক বছরের মধ্যে কারুর কোনো চিঠি পায়নি। হঠাৎ আজ বিয়ারিং চিঠি দেখে সকলেই মনে করছিল, না জানি কার কোন দুঃসংবাদ আছে এতে!

মেজো-বৌ হেরিকেনের কাছে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিঠি খুলে খানিকটা পরেই একেবারে মাটিতে পড়ে চিৎকার করে উঠল, 'খোকা! খোকা! বাপ আমার!'

ততক্ষণ প্যাঁকালে এসে পড়েছিল। সে আসতেই মেজো-বৌ একেবার তার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে বলে উঠল, 'আমার খোকা বুঝি আর বাঁচে না ভাই! সে তার এই

পোড়াকপালি মাকে দেখতে চায়। আমায় নিয়ে চল, তোমার পায়ে পড়ি ভাই, আমায় নিয়ে চল !' বলেই সে মূর্ছিতা হয়ে পড়ল।

প্যাঁকালে, কুর্শি বহু কষ্টে মূর্ছা ভাঙালে।

আজ এক বৎসর বরিশাল এসেছে ওরা। এর মধ্যে কেউ কোনো চিঠি দেয়নি। মেজো-বৌ কিসের যেন আতঙ্কে কৃষ্ণনগরের নাম পর্যন্ত শুনলে পালিয়ে যেত। তার কেবলি মনে হত, এই বুঝি তার খোকা-খুকির অসুখের খবর এসে পড়ল। সে দিনরাত প্রার্থনা করত, ওরা ভালো থাক, কিন্তু কোনো চিঠি যেন কোনো দিন না আসে। কিন্তু সোয়াস্তিও ছিল না তার, সে ঘুমে-জাগরণে—সব সময় যেন তার ক্ষুধাতুর শিশুদের কান্না শুনতে পেত। সে রাক্ষুসী ! ইচ্ছা করেই ছেলেমেয়েদের ফেলে এসেছিল। চলে আসার দিন তাকে যেন ভূতে পেয়েছিল। তাকে এদেশ ছেড়ে যেতে হবে, শুধু এই কথাই তার মনে হয়েছিল। সে যে মা, সে কথা সেদিন সে ভুলে গিয়েছিল।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে মেজো-বৌ আবার সমস্ত চিঠিটা পড়ল। প্যাঁকালের মা চিঠি লিখেছে—লিখেছে মানে কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে। খোকার অর্থাৎ মেজো-বৌয়ের ছেলের ভয়ানক অসুখ, টাইফয়েড। বোধ হয় বাঁচবে না। যে ছেলে এক বছর ধরে ভুলেও তার মায়ের নাম মুখে আনেনি, সে আজ বিকারের ঘোরে কেবলি বলছে, 'আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চল !' প্যাঁকালের মাও মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু মরবার আগে সে যেন যার ছেলে তার হাতেই দিয়ে যেতে পারে। ছেলের কান্না শুনে গাছের পাতা ঝরে পড়ে, আর ওর রাক্ষুসী মার মন গলবে না !

* * *

সেইদিন রাত্রেই মেজো-বৌ, প্যাঁকালে, কুর্শি কৃষ্ণনগর যাত্রা করল। যাবার আদেশ পেতে তাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় মিশনারি কর্তারা মেজো-বৌকে ভালো করেই চিনতেন। কাজেই তাঁরা আপত্তি করলেও যাওয়া বন্ধ করতে সাহস করলেন না।

পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকার যখন গাঢ়তর হয়ে আসছে, সেই সময় তারা কৃষ্ণনগরে স্টেশন এসে পৌঁছল। এই একটা বছরের মধ্যে কত পরিবর্তনই না হয়ে গেছে এর ! মেজো-বৌয়ের শোকাচ্ছন্ন চোখের মলিন দৃষ্টির ম্লানিমা লেগে স্টেশনের কয়লা-রঞ্জিত পথ যেন আরো কালো হয়ে উঠল। তার মনে হল, কে যেন তার স্থূল হাতের কর্কশ পরশ বুলিয়ে সেই পূবের কৃষ্ণনগরের সব সৌন্দর্য মুছে দিয়ে গেছে।

একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে উঠেই মেজো-বৌ বললে, 'খুব জোরে হাঁকাও।' এতক্ষণ এত দূর পথে আসতে যে হৃদস্পন্দনের চঞ্চলতা তাকে অধীর করে তোলে নি, স্টেশনে নেমেই তার সেই চঞ্চলতা যেন শতগুণে বেড়ে উঠল। একবার মনে হল, এ রাস্তার যেন শেষ না হয়। এই গাড়ি যেন এইরকম করে অনন্তকাল ধরে ছুটতে থাকে। ... হয়তো এতক্ষণ তার খোকার মুখে 'মা' ডাক নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

কোচোয়ানের চাবুক খেয়ে ঘৃত-পক্ক অশ্বিনী-কুমারদ্বয় যেটুকু স্পিড বাড়ালে, তাকে ঘোড়া-দৌড় ঠিক বলা চলে না, সে কতকটা খোঁড়া-দৌড় ! তাতে যেমনি হাসি পায়, তেমনি অসহায় জীবগুলির প্রতি করুণায় মন ভরে ওঠে। কিন্তু ঘোড়ার চেয়েও আর্তনাদ করতে লাগল গাড়ির চাকাগুলো। তারা যেন আর গড়াতে পারে না। পথের বুকে মুখ ঘষে ঘষে যেন তাদের প্রতিবাদ-ক্রন্দন জানাতে থাকে। রাস্তাও তেমনি। যেন দাঁত বের করে মিউনিসিপ্যালিটিকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে !

টিকুতে টিকুতে গাড়ি এসে প্যাঁকালেদের বাড়ির দোরে লাগল। ভিতর থেকে কোনো শব্দ শোনা গেল না। ভিতরে কেউ আছে বলেও মনে হল না। একটা মৃৎ-প্রদীপের ক্ষীণ-শিখার আশ্বাসও নেই সেখানে।

মেজো-বৌয়ের বুক অজানা আশঙ্কায় হা হা করে উঠল ! তার অন্তরে যেন অনন্ত আকাশের শূন্যতায় রিক্ত আর্তনাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল। সে টলতে টলতে গাড়ি থেকে নেমে দোরের গোড়ায় আছড়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠল, 'খোকা !'

কে যেন তোর টুঁটি চেপে ধরেছে।

শূন্য ঘরের বুক থেকে কার যেন ক্ষীণ আর্তনাদ শোনা গেল। ও আর্তনাদ যেন এপারের নয়, সাঁতরে পার-হওয়া নদীর পারের শ্রান্ত যাত্রীর।

প্যাঁকালে ততক্ষণে বন্ধ ঘরের আগোড় খুলে ঢুকে পড়েছে। তার পায়ে কঙ্কালের মতো কি একটা ঠেকতেই সে চিৎকার করে উঠল, 'মা ! মা !'

হঠাৎ রান্নাঘরের দোর খুলে গেল ; এবং তার ভিতর থেকে বড়-বৌ বেরিয়ে এসে ভয়াতুর শীর্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে ?'

মেজো-বৌয়ের মূর্ছাতুর কণ্ঠে আর একবার শুধু একটু অস্পষ্ট অনুনয় ধ্বনিত হল, 'খোকা, আমার খোকা কই ?'

বড়-বৌ চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'রাক্ষুসী, এতদিনে এলি ! খোকা নেই ! কাল সকালে সে চলে গেছে !'

মেজো-বৌ 'খোকা' বলেই আহত বিহগীর মতো সেইখানেই লুটিয়ে পড়ল ! ... প্যাঁকালে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'বড়-বৌ, কী ভীষণ অন্ধকার ! আর সহ্য করতে পারছিনে, বাতি, বাতি কই ?'

বড়-বৌ তেমনি কান্না-দীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'বাতি নেই ! সব বাতি নিবে গেছে ! ঘরে এক ফোঁটা তেল নেই।'

প্যাঁকালে উন্মাদের মতো ভাঙা ঘরের চালা থেকে একরাশ পচা খড় টেনে জ্বালিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'তা হলে ঘরই পুড়ুক !'

সেই রক্ত-আলোকে দেখা গেল, প্যাঁকালের মা তার কঙ্কাল আর আবরণ চামড়াটুকু নিয়ে তখনো ধুঁকছে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় !

প্যাঁকালে 'মা' বলে তার বুকে পড়তেই বৃদ্ধার চক্ষু একটু জ্বলে উঠেই পরক্ষণে নিবে গেল চিরকালের জন্যে !

চালের খড় তখনো ধু ধু করে জ্বলছে, ওদেরি বুকের আগুনের মতো ! একটু পরে সে অগ্নিশিখাও যেন অতি শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

ছাব্বিশ

পাড়ার লোক মেজো-বৌকে দেখলে বলে, 'ও রাক্ষুসী ! ওর বুকে শুধু লোহা আর পাথর !'

খোকা চলে গেছে। মেয়ে পটলিকে নিয়েই মেজো-বৌ আবার আগের মতো পান খেয়ে, রেশমি চুড়ি পরে, বাঁকা সিঁথি কেটে, চওড়া কালো-পেড়ে শাড়ি পরে পাড়া বেড়ায়।

মাত্র মাস খানেক হল ছেলে মরেছে !

মূর্ছাভঙ্গের পরই মেজো-বৌ উন্মাদিনীর মতো তার ছেলের যা কিছু স্মৃতি-চিহ্ন যেখানে ছিল, মায় শতছিন্ন কাঁথাটি পর্যন্ত, — সব পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছে ! এই এক বছর ধরে গোপনে সে যেসব খেলনা সঞ্চয় করে রেখেছিল, তাও ঐ সঙ্গে পুড়িয়েছে।

তার হৃদয়ের সমস্ত শোক-জ্বালাকেও যেন ঐ দিনই চিরদিনের মতো ভস্মীভূত করে দিয়েছে। তারপরে নিজেই সে আগুন নিভিয়েছে কলসি কলসি চোখের জল ঢেলে ! আজ যেন তার আর কোনো শোক নেই, কোনো দুঃখ-গ্লানি নেই ! চোখের জলও যেন ঐ সঙ্গেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে !

এ যেন তার আর এক জন্ম ! সে যেন নবজন্মের নতুন লোকের নতুন মানুষ।

মেয়ে পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায়, তার যত্ন নেয় না। ও যেন ওর মেয়েই নয়। কেউ বলে, শোকে পাগল হয়েছে, কেউ বলে, রসের পাগল।

ঐ ঘরেই সে থাকে, মিশনারির সাহেব-মেমদের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সে সেখানে যায়নি, কিন্তু আবার তৌবা করে মুসলমানও হয়নি।

প্যাঁকালেকে স্থানীয় খান বাহাদুর সাহেব একটা কুড়ি টাকার চাকুরি জুটিয়ে দেওয়াতে সে আবার কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। কুর্শির বাবা মধু ঘরামি অনেকদিন আগেই মারা গেছে। কাজেই কুর্শিও খানিক কেঁদে-কেটে শেষে প্যাঁকালের ধর্মকেই গ্রহণ করেছে। সুতরাং ওদের দিন বেশ এক রকম চলে যাচ্ছে।

শুধু মেজো-বৌ যেন ঘরে থেকেও ঘরের কেউ নয়। এর-ওর বাড়ি যায় এবং যায় একটু বাড়াবাড়ি রকমেরই ধোপ-দোরস্ত হয়ে! কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকে তাকে একখানা চৌকি এগিয়ে দেয়। তাদের ধারণা, মেজো-বৌ এই এক বছরে না জানি বহু সাহেব-কাপ্তেন পাকড়ে টাকার কুমির হয়ে এসেছে! দুঃখ-ধান্ধা করে খায়, কাজেই আগে থেকে একটু মুখের ভাবটা থাকলেও হয়তো বা কালে-কাবুসে হাত পাতলে কোন না দুটো টাকা পাওয়া যাবে!

সত্যি-সত্যিই মেজো-বৌ কিছু টাকা জমিয়েছিল, কিন্তু সে দু-একশো মাত্র, ওর বেশি নয়। তাই সে বিবিয়ানি করে উড়াচ্ছে, এরপর কি হবে, বা কি করে চলবে, সে চিন্তাও যেন সে করে না।

তার টাকার লোভে বাড়ির লোকেও কেউ কিছু বলতে সাহস করে না।

পাড়ার মোড়ল হিসেবি লোক, অনেক চিন্তার পর সে স্থির করল যে, পাড়ার কোনো মুসলমান ছোকরাকে দিয়ে ওর রসস্থ মন ভুলাতে পারলে ওকে অনায়াসেই স্বধর্মে ফিরিয়ে এনে একজন নাসারাকে মুসলিম করার গৌরব ও পুণ্যের অধিকারী হতে পারবে। কাজেই সে মৌলবি সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে আর বেশি পীড়াপীড়ি করলে না এ নিয়ে। কি জানি, যদি বেশি টানে দড়ি ছিঁড়ে যায়।

কেউ কিছু বলল মোড়ল হেসে বলে, 'বাবা, এখন দিগ্‌দড়ি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। যাবে কোথা? একটু চরে খাক, তারপর ঘরের গাই ঘরে ফিরে আসবে!'

মোড়লের বুদ্ধির তারিফ করতে করতে তারা ফিরে যায়।

মেজো-বৌ লতিফার কাছেই যায় সবচেয়ে বেশি করে। লতিফা যে আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেবেলা থেকে মানুষ, তাতে করে সে চিরকাল হৃদয়টাকেই বড় করে দেখতে শিখেছে। মেজো-বৌয়ের ভিতরের যে আগুন সে দেখেছিল, তাকেই সে শ্রদ্ধা করে। কাজেই তাকে স্বধর্মে ফেরানো নিয়ে কোনদিনই পীড়াপীড়ি করেনি! নাজির সাহেব বেচারা একেবারে যাকে বলে মাটির মানুষ। এ নিয়ে ওঁর কোনো মাথা-ব্যথাই নেই। শুধু লতিফাকে রহস্যের ছলে এ নিয়ে একটু চিমটি কাটেন মাত্র। বলেন, 'দেখো গো, শেষে তুমিও যেন আড়কাঠির পাল্লায় পড়ে আমায় অকূলে না ভাসাও!'

লতিফা হেসে বলে, 'তুমি তো ভাসবার মতো হালকা নও, তোমার বরং ডুবারই বেশি ভয়। তা সে দিক দিয়ে ভয় আমারই বেশি! আমিই তো খাল কেটে বেনোজল আর কুমির দুই-ই ঘরে আনছি!'

নাজির সাহেব নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'নাঃ! ডুববার মতোই বপুটা স্থূল হচ্ছে বটে! এইবার থেকে রাত্তিরে উপোস দিয়ে এ বরবপু একটু হালকা করতে হবে—অন্তত ভেসে যাবার মতো!'

লতিফা নাজির সাহেবের গায়ে খুতকুড়ি দিয়ে কটাস করে রাম-চিমটি কেটে বলে, 'ষাট! বালাই! তোমায় কে মোটা বলে! তার চোখে ভ্যালার আঠা দিয়ে দেবো!'

নাজির সাহেব 'উহু উহু' করে ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে বলেন, 'বাপ রে বাপ ! আগে জানলে কে এ শূর্পনখাকে বিয়ে করত ...'

সেদিন সকালে উঠেই মেজো-বৌ হঠাৎ বলে উঠল, 'বড়-বু ! আমি আজ পাড়ার সমস্ত ছেলেদের খাওয়াব !'

বড়-বৌ বুঝতে না পেরে বলল, 'কেন ?'

মেজো-বৌ সহজ কণ্ঠেই বলল, 'আজ খোকার চালশে।'

বড়-বৌয়ের দুই চোখ জলে ভরে উঠল। সত্যিই তো আজ চল্লিশ দিন হল খোকা চলে গেছে ! মেজো-বৌ তাহলে ভোলেনি। ভুলবার ভান করে মাত্র। বড়-বৌ চোখের জল মুছে বলে উঠল, 'তা তোর ছেলের নামে খাওয়াবি, ওতে আমাদের কি বলবার আছে ভাই ! কিন্তু একবার পাড়ার মোড়ল আর মৌলবি সাহেবকে ত বলতে হয়।'

মেজো-বৌ তেমনি শান্তকণ্ঠে বলল, 'না ওদের কাউকে বলব না। শুধু ছোট ছোট খোকাদের ডেকে নিজে রেঁধে খাওয়াব।'

বড়-বৌ কেঁদে ফেলে বলল, 'ওরে পাগলি ! মোড়ল না বললে, কেউ যে তার ছেলেকে তোর হাতের রান্না খেতে দেবে না !'

মেজো-বৌ একটু থেমে বলে উঠল, 'ওঃ, আমি যে খ্রিস্টাননি। তা যে করেই হোক, আমি খাওয়াবই।' বলেই সে কিছু না বলে মোড়লের বাড়ি গিয়ে হাজির হল।

মোড়ল দেখল, এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সুযোগ। এই সুযোগ ছাড়লে তবে আর ঘরে ফেরানো যাবে না। সে খুব ভালো মানুষ সেজে বললে, 'তা কি করব বল মা, তুই তো আমার মেয়ের মতোই ! খ্রিস্টানের হাতে আমি বললেও কেউ খাবে না। মরে গেলেও না।'

মেজো-বৌয়ের দগ্ধ-চোখে সহসা যেন অশ্রুর পুঞ্জিভূত মেঘ ঘনিয়ে এল। তার মনে পড়ল কতদিন অনাহারে কাটিয়ে তার খোকা চলে গেছে ! তার সমস্ত মন যেন হাহাকার করে আর্তনাদ করে উঠল। সে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারল না। ডুকরে কেঁদে উঠে সামনের উঠানে লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগল, 'আমি আজই মুসলমান হব ! আমার খোকার আত্মা যেন চিরকালের ক্ষুধা নিয়ে না ফিরে যায় !

মোড়ল যেন হাতে চাঁদ পেল। সে তখনি উঠে মেজো-বৌকে তুলে বলল, 'এই তো মা, এতদিনে মানুষের মতো, মায়ের মতো কথা বললি। তোর খোকা মরবার সময় পর্যন্ত বিকারের ঘোরে বলেছে, 'মা, তুই খেরেস্তান, তোর হাতের পানি খাব না।' তুই মুসলমান হয়ে ওর ফাতেহা না দিলে ওর শাস্তি হবে।'

মেজো-বৌ দুই কানে আঙুল দিয়ে বলে উঠল, 'আর ওর নাম করো না আমার কাছে। ওর কোন কথা বলো না। আজ পাড়ার সব ছেলেই আমার খোকা।'

মোড়ল মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'তাই হোক! ওরাই তোর খোকা হোক। ওদের খাইয়ে, কোলে করে তুই তোর খোকার শোক ভোল।'

মেজো-বৌ চলে গেলে মোড়ল আপন মনেই বলে উঠল, 'রাক্ষুসী হলেও মা তো। নাড়ির টান যাবে কোথায়?'

সাতাশ

পাড়ার প্রায় শতাধিক ক্ষুধাতুর শিশুকে পরিপাটি করে মেজো-বৌ খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় করে যখন লতিফার বাড়ি এসে দাঁড়াল, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাইরে রুবির প্রকাণ্ড মোটরকার দাঁড়িয়ে।

কি যেন এক নিবিড় প্রশান্তিতে আজ মেজো-বৌয়ের বুক ভরে উঠেছে। ঐসব ক্ষুধাতুর শিশুদের খাওয়াতে খাওয়াতে, তাদের প্রত্যেককে আদর করতে কোলে করতে করতে তার মনে হচ্ছিল, তার খোকা হারায়নি! সে এই ক্ষুধাতুর শিশুদের মাঝেই শত শিশুর রূপ ধরে এসেছে! তাদের আদর করে চুমু খেয়ে বুকে চেপে তার সাধ যেন আর মিটতে চায় না। যে খোকাকে দেখে, তার মুখেই সে তার খোকার মুখ দেখতে পায়! আজ যেন সে জগজ্জননী!

সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে তার মনে হল ও তারা নয়, ওর খোকা! ঐ দূরলোকে থেকে তার মাকে ফিরে পেয়ে হাসছে। ঐ আকাশের মতো বিরাট উদার খোকার মায়ের কোল।

এক আকাশ-মাতার কোলে শত-সহস্র তারা—খোকা-খুকি!

সন্ধ্যাতারার পাশেই চতুর্থী তিথির চাঁদ। ও যেন খোকার বাঁকা হাসি। ও যেন খোকার ডিঙ্গি। খোকা বাণিজ্যে বেরিয়েছে—তার মাকে রাজরানি করবার দুঃসাহসে মণিমাণিক্য আনতে শূন্যে পাড়ি দিয়েছে। না, না—ও যেন খোকার হাতে ছেনি-দা! দুষ্ট ছেলে দা হাতে গহন বনে পালিয়েছে, তার দুঃখিনী মায়ের জন্যে কাঠ কেটে আনবে। না, না—ও ওর মায়ের জন্যে ঐ শূন্যে ঘর তুলছে মেঘের ছাউনি দিয়ে! আকাশে আকাশে সারাদিন খেলা করে ফিরবে, পালিয়ে বেড়াবে, তারপর সন্ধ্যাবেলায় ঐখানটিতে ঐ উঠোনে দাঁড়িয়ে বলবে, 'আমি এসেছি, আমি হারিয়ে যাইনি।'

মেজো-বৌয়ের চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠতেই তার মনে হল, ঐ তারার চোখও যেন ঝিকমিক করে উঠেছে! খোকার চোখে জল! না না, আর কাঁদবে না সে! ও যে সকল দেশের সকল লোকের সকল মায়ের খোকা সে! ও কি কারুর একলার? এক মার কাছে এসেছিল, আদর পায়নি, আর এক মার কাছে চলে গেছে! তবু তো সে আছে! ঐ

তারায়, ঐ চাঁদে, ঐ আকাশের কোথাও না কোথাও সে আছেই আছে! যেখানে খুঁজি, সেখানেই যে ওকে দেখতে পাই! দুষ্টু ছেলে, কখনো ভিখারিনীর কোলে খিদের ছল করে কাঁদে, কখনো পিতৃমাতৃহীনের ছল করে দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে বেড়ায়, কখনো মারহাট্টা মায়ের ওপর রাগ করে পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে, কখনো দুলালি মায়ের কোলে সোনাদানা পরে হাসে। ও কি খোকা, ও যে সর্বগ্রাসী, রাক্ষস! সমস্ত বিশ্বকে যে ও ওর রূপ দিয়ে ছেয়ে ফেলেছে। ...

মেজো-বৌয়ের এত রূপ বুঝি কেউ কখনো দেখেনি। লতিফা, রুবি একসঙ্গে চমকে উঠল! এত মানুষ নয়!.. মেজো-বৌয়ের চোখে তখন বিশ্বমাতার পরিপূর্ণ দীপ্তি!

মেজো-বৌ হাসতে হাসতে বসে পড়ে বলল, 'এই মাত্তর খোকাদের খাইয়ে এলুম। ওদের খাওয়াতে বড্ডো দেরি হয়ে গেল ভাই, তাই আজ আর আসতে পারিনি! যা সব দুষ্টু ছেলে!'

একি অপূর্ব কণ্ঠস্বর! এ কি প্রশান্ত গভীর স্নেহ! সকলের মন যেন জুড়িয়ে গেল!

মেজো-বৌ এমন করে কথাগুলি বলল, যেন তারই কোলের খোকাদের খাইয়ে-দাইয়ে শান্ত করে তবে আসতে পারল!

লতিফা কিছুতেই বুঝতে পারল না! শুধু রুবির চোখ ফেটে জল এল! সে মনে মনে মেজো-বৌকে নমস্কার করে বলল, 'তোমার আর ভয় নেই। তুমি ভয়ের সাগর উতরে গেছ!'

লতিফা বিমূঢ়ের মতো প্রশ্ন করে বসল, 'কার খোকা মেজো-বৌ?'

রুবি জোরে লতিফার হাত টিপে দিতেই তার হুঁশ হল। সে ভুলেই গেছিল যে, আজ মেজো-বৌ তার খোকার নামে পাড়ার খোকাদের খাওয়াল! তার এই অমার্জনীয় ভুলের জন্য সে নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগল মনে মনে। না জানি মেজো-বৌয়ের শোকার্ত মাতৃহৃদয়ে কত ব্যথাই সে দিয়েছে! তাড়াতাড়ি এদিক থেকে মন ফেরাবার জন্য সে বোকার মতো বলে উঠল, 'আজ দাদাভাইয়ের চিঠি পেলাম কি-না ভাই, তাই মনটা কেমন যেন হয়ে গেছে! তাই হুঁশ ছিল না।"

মেজো-বৌ শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁর খুব অসুখ বুঝি?'

লতিফা অবাক হয়ে বলে উঠল, 'হাঁ, তা তুমি কি করে জানলে?'

মেজো-বৌ হেসে বলল, 'ভয় নেই, তিনি আমায় চিঠি দিয়ে জানাননি, এমনি কেন যেন মনে হল।'

রুবির চোখ নিমিষের তরে যেন জ্বলে উঠল। সে লতিফার কাছে শুনেছিল, মেজো-বৌয়ের নাকি ওদিক দিয়ে একটা গোপন দুর্বলতা আছে। কিন্তু সে শিক্ষিতা মেয়ে! কাজেই তার জ্বলে-ওঠা চোখকে এক নিমিষে নিবিয়ে ফেলতে দেরি হল না। তার ওপর শোকার্ত মাতৃহৃদয়কে এদিক দিয়ে আঘাত করবার মতো নির্মমতাও তার ছিল না।

রুবি কিছু বলবার আগেই মেজো-বৌ বলে উঠল, 'আমি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সকাল-সন্ধ্যে একটু করে পড়াব মনে করেছি, তা তুমি তো ভাই ম্যাজিস্ট্রর-এর মেয়ে, তোমার বাবাকে এই পাড়াতেই একটা ছোট ঘর তুলে দিতে বল না। অবশ্য ঘর না পেলে আপাতত আমাকে আমাদের উঠোনের সামনে বাগানটাতেই পাঠশালা বসাতে হবে। কিন্তু বর্ষা এলে তখন কি করা যাবে?'

রুবির মনের ঝাঁঝটুকু কেটে গেল, এই হতভাগিনীর এই সান্ত্বনা খোঁজার ছল দেখে। তার বুঝতে বাকি রইল না যে, সে সকল ছেলেকে ভালোবেসে নিজের শোক ভুলতে চায়। সে খুশি হয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই বলব আব্বাকে। আর তিনি যদি কিছু না-ই করেন, আমি তোমার পাঠশালার ঘর তুলে দেবো। শুধু ঘর তোলা নয়, নিজে এসে সাহায্যও করে যাব হয়তো!'

মেজো-বৌ বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। কিন্তু তার চোখ জলে ভরে এল। সে একটু চুপ করে থেকে দুই হাত তুলে ললাটে ঠেকাল। সে নমস্কার তার রুবিকে, না কাকে উদ্দেশ করে তা বোঝা গেল না!

লতিফা বিস্ময়-বিমূঢ়ের মতো এতক্ষণ বসেই ছিল। ও যেন এর কিছু বুঝতে পারছিল না। ওর মন ছিল ওর ঘর-ছাড়া দাদুটির চিন্তায়—তার জন্য বেদনায় ভরপুর। মেজো-বৌ এসে পড়ার পর থেকে যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল রুবির সঙ্গে তা এমন হঠাৎ চাপা পড়ল দেখে সে একটু ছটফট করতে লাগল—অবশ্য মনে মনে। তার ওপর, ছেলে মরার শোক ও জানে না, কিন্তু না জেনেই ওর ভীতু মন ও শোকের কথা ভাবতেও যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে। ও শোকের যেন কল্পনাও করা যায় না। সে আর থাকতে না পেরে যেন এই শোকাবহ প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার জন্যই বলে উঠল, 'আচ্ছা, মেজো-বৌ! তুমি একটা বুদ্ধি বাতলে দিতে পার? অবশ্য তোমার কাছে পরামর্শ চাওয়ার সময় এ নয়। তবু মনে হয়, তুমি যেন এর একটা মীমাংসা করতে পারবে।'

মেজো-বৌ নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে লতিফার দিকে চাইল।

লতিফা বলে যেতে লাগল, 'আজ সকালে দাদাভাই-এর একখানা চিঠি পেয়েছি রেঙ্গুন জেল থেকে। সেই নিয়েই রুবির সঙ্গে আলোচনা চলছিল। যাক, চিঠিখানা তুমি দেখই না, তাহলে সব বুঝতে পারবে।'

মেজো-বৌ চিঠি নিয়ে পড়তে লাগল—

রেঙ্গুন সেনট্রাল জেল

চিরআয়ুষ্মতীসু!

স্নেহের বুঁচি। পাঁচ-ছ মাস পরে তোদের চিঠি দিচ্ছি। সব কথা লিখতে পারব না—লিখবার অধিকার নেই! লিখলেও উপরওয়ালারা তাকে এমন করে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন যে, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুও কোনো বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার উদ্ধারসাধন করতে পারবেন

না। তা ছাড়া আমার স্বভাব তো জানিস, আমি বলে যেতে পারি অনর্গল, কিন্তু লিখতে হয় অর্গলবদ্ধ হয়ে। তাতে করে মন আর হাত দু-ই ওঠে হাঁপিয়ে। অবশ্য হাঁপানি আমার এখনো আরম্ভ হয়নি—যদিও বুকে টিউবার-কিউলসিসের জার্‌ম কিছুদিন থেকে তার নীড় রচনা করেছে। সে খবর অনেক আগেই খবর-কাগজের মারফতে হয়তো প্রচার হয়ে গেছে এবং তোরও তা শুনতে বাকি নেই।

তুই তো শুধু আমার বোনই নস্, তুই বন্ধু। তাই আজ তোকে এমন অনেক কথা বলব, যা তোর কাছেও কোনোদিন বলিনি।

তুই তো জানিস, আমার বুকে পোকার খাবার মতো কোনো খাদ্য ছিল না। কিন্তু ওটা যে সংক্রামক, তাও আমার অজানা ছিল না। একদিন পোকা-খাওয়া বুকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল। শুনলাম, সে পোকা নাকি আমারি কাঁটার বেড়ার থেকে উঠে গিয়ে সেখানে বাসা বেঁধেছে।

বড় দুঃখ হল। কিন্তু আমার কোনো হাত ছিল না! থাকলেও সে হাত বন্ধক রেখেছিলাম পুলিশের হাত-কড়ার কাছে। কাজেই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতে হল।

কিন্তু প্রভুভক্ত পোকা আমায় ভুলতে পারল না। এত সি.আই.ডি. এত পুলিশ-প্রহরীর নজর এড়িয়ে—সমুদ্দুর ডিঙিয়ে আমার বেড়ার পোকা আমার বুকে ফিরে এল। অন্যের বুক কতটা খেয়ে এসেছে, তা তার হৃষ্টপুষ্ট চেহারা এবং সতেজ দংশন থেকেই বুঝতে পারলাম।

অবশ্য আমার আর কোনো পোকাকেই ভয় নেই। বিলিতি পোকা, দিশি পোকা, বুকের পোকা, দুঃখের পোকা—তা সে যে পোকাই হোক। কিন্তু ভয় আমার না থাকলেও কর্তাদের আছে। তাঁরা আমায় নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। সাপের ছুঁচো গেলা-গোছ—ছাড়তেও পারে না, গিলতেও পারে না।

আজ ঘুম থেকে উঠেই খোশ-খবর শোনা গেল। আমায় নাকি কাল ছেড়ে দেওয়া হবে। অবশ্য ছেড়ে দেওয়া মানে, দম নিতে দেওয়া। মরিস যদি বাবা তো ঘরে গিয়েই মর, আমাদের দায়ী করে যাসনে—এই মনোভাব আর কি!

এরা সত্যিই সিংহের জাত। পশু হয়েও পশুরাজ স্পেসিসের। আধ-মরা রোগ-জীর্ণ শিকার এরা খায় না।

আবার পুরুষ্টু হয়ে উঠলেই ক্যাঁক করে ধরবে!...

আমি ঠিক করেছি, ছাড়া পেলেই সোজা ওয়ালটেয়ারে ছুটে যাব। আমি চাই—এই বন্ধনের পরে নিঃসীম মুক্তি। মাথায় অনাবৃত আকাশ, চোখের সামনে কূলহারা তটহারা জলধি, মনের সামনে নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত একা—একা আমি!

মাঝে মাঝে মনে হয়—মনে হয় ঠিক না, লোভ হয়—যাবার আগে এই অদ্বিতীয় মনের দ্বিতীয় জনকে দেখে যাই—জেনে যাই। আমার মরুভূমির ঊর্ধ্বে সাদা মেঘের ছায়া নয়—কালো মেঘের ছায়া ঘন মায়া দেখে যাই।

তোরই চিঠিতে জেনেছি, সে মেঘ নাকি তোরই দেশে গিয়ে জমেছে। তোর হাতের কাছে যদি খুব খানিকটা উত্তুরে হাওয়া থাকে, দিতে পারিস তাকে দক্ষিণে পাঠিয়ে? তুই হয়তো বলবি, এবং শুনে মেঘও হয়তো বিদ্যুৎহাসি হেসে বলবে, হাতের কাছে যার থাকবে সমুদ্দুর, সে চায় দু-ফোঁটা মেঘের জল! সংস্কৃত কবিদের একটা চির-চলিত উপমার কথা মনে পড়ছিল, তা আর লিখলাম না! না লিখলেও বুঝবি বলে।

মানুষ যখন প্রগল্‌ভা হয়—অর্থাৎ সোজা কথায় বিকারগ্রস্ত হয়ে বকতে থাকে, তখন তার যে মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে—এ কথা ডাক্তারে না বললেও সকলে বোঝে। আমার বেলায়ই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

আমার যাবার বেলায় আমার শেষ কথা বলে গেলাম এইজন্যে যে, বলবার অবসর জীবনে হয়তো আর হবে না।

আমি জীবনে কোনো-কিছুতেই নিরাশ হইনি। জীবনের বেলাতেও হতাম না—যদি না বুঝতাম যে, বাঘে ধরেও যাকে উগলে দেয়—তার দুরবস্থা কতদূর গিয়ে পৌঁছেছে! রক্ত-মাংসের পরিমাণ তার কত কমে এসেছে!—কিন্তু এ কি ক্ষুধা আমার? এই কি মৃত্যু-ক্ষুধা?

আমি যদি না-ই ফিরি, দুঃখ করিসনে ভাই। আমরা তো ফেরার সম্বল নিয়ে বেরোইনি। তাই ফেরারি আসামি হয়েই কাটিয়ে দিলাম। আমাদেরই পথের পথিক যারা রয়ে গেল—তাদের মাঝেই আমায় দেখতে পাবি। এই কারায়, এই ফাঁসিমঞ্চে আমরা তো আজই এসে দাঁড়াইনি, আমাদের কণ্ঠে শত জন্মের শত লাঞ্ছনার রক্ত-লেখা হয়তো আজো মুছে যায়নি। নইলে এমন সুখের নীড়ে আমার মন বসল না কেন? পিঞ্জরের দ্বার ভেঙে মুক্ত লোকের ঊর্ধ্বে উড়ে গান গাওয়ার এ সাধ কেন জাগল? জীবনকে আমরা জীবিতের মতোই ব্যয় করে গেলাম, মৃতের মতো কার্পণ্য করে কাক-শকুনের খাদ্য করিনি! আমার যা সম্ভাবনা, তা যেন কোনো দিন তোর অগৌরবের না হয়ে ওঠে।

অন্যলোকে গিয়ে যদি এ-লোকের প্রিয়জনকে মনে রাখবার মতো অবসর থাকে, সেখানে গিয়ে যদি অনশন-কারাবন্দি না হই, তাহলে বিশ্বাস করিস—তুই আমার মনে থাকবি।

খোকাদের চুমু দিস! নাজির সাহেবকে ফাইন্যাল গুঁতো! তুই আদর-আশিস নে।

রুবি ও মেজো-বৌকে আমার নমস্কার জানাস। ইতি—

তোর — দাদু

•

চিঠি পড়ে মেজো-বৌ যে মুখ ঊর্ধ্বে তুলে ধরল, তা মানুষের মুখ নয়। ও যেন ঝরার একটু আগের শিশির-সিক্ত রক্ত-কমল!

লতিফা মুগ্ধনয়নে দেখতে লাগল। রুবির চোখ যেন পুড়ে গেল!

মেজো-বৌয়ের কিছু বলবার আগেই রুবি বলে উঠল, 'আমি ঠিক করেছি বুঁচি আমি ওয়ালটেয়ারে যাব। মা আমায় বলেন উল্কা। উল্কাই যদি হই, তাহলে শূন্যে আর ঘুরতে পারিনে! ধরায় যে মানুষ আমায় নিরন্তর টানছে, মুখ থুবড়ে তার দেশেই পড়ব গিয়ে। হয়তো আর আমি মুখ তুলে উঠতে পারব না, আমার সব আগুন যাবে নিভে। তবু ঐ আমার মহান মৃত্যু!—কি বল মেজো-বৌ? তুমি আমার সঙ্গে যাবে? লুকিয়ে পালাতে হবে কিন্তু। অভিসারিকা সেজে, বুঝেছ?

রুবির চোখ যেন সোনার আংটিতে বসানো রুবির মতোই জ্বলতে লাগল।

মেজো-বৌ একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলে উঠল, 'আমার যাবার ইচ্ছা থাকলে তোমার বহু আগেই সেখানে গিয়ে উঠতাম ভাই রুবি বিবি! দু-মাস আগে এ-খবর পেলে কি করতাম জানি না! কিন্তু আজ আর আমাকে নিয়ে আমার কোনো ভয়-ডর নেই। খোকাকে যদি না হারাতাম, এই খোকাদের যদি না পেতাম, তাহলে আমি সব-আগে তাঁকে সেবা করে ধন্য হতাম।'

রুবি মেজো-বৌয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল, 'অর্থাৎ তুমি রুবি হলে এতক্ষণ বেরিয়ে পড়তে।'

মেজো-বৌ হেসে ফেলে বলল, 'হুঁ। তাই।'

রুবি এক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'ভাই মেজো-বৌ, তুমি একটু আগে আমায় উদ্দেশ করেই বোধ হয় নমস্কার করেছিলে, আমার প্রতি-নমস্কার নাও। তুমিই আমায় পথ দেখালে।'

বলেই লতিফার দিকে চেয়ে বলল, 'ভাই বুঁচি, সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়তে হবে। আমার পথের সন্ধান পেয়েছি। ভাই মেজো-বৌ, আমি বুঁচির কাছে পাঠিয়ে দেবো তোমার খোকাদের পাঠশালা তৈরির খরচা, গ্রহণ করো।'

মেজো-বৌ, লতিফা কিছু বলবার আগেই রুবির ব্যস্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'শোফার! গাড়ি লে আও!'

আটাশ

ওয়ালটেয়ার

ভাই বুঁচি,

আমি যদি আজ আমার পরিচয় দিই—আমি তোদের সেই রুবি, তাহলে বিশ্বাস করবি? আমার বাপ মাও জানেন আর তোরাও হয়তো জানিস, আমি মরেছি! অথবা যদি না মরে থাকি, তাহলে আমার মরণই মঙ্গল বা একমাত্র গতি!

তোরা—অন্তত তুই শুনে সুখী হবি, না দুঃখিত হবি জানিনে, যদি আমি লিখি যে, আমি আজো মরিনি। আমি বেঁচে গেছি বুঁচি, বেঁচে গেছি—তোদের চেয়েও বড় করে বেঁচে গেছি।

আজ তোকে সব কথা খুলে বলব, তারপর সামনে রয়েছে কূলহারা সমুদ্র। কূলহারা জীবনকে আর কেউ নিতে নাপারে, সে তো রয়েছে !

তোর কাছে যখন জানলাম, তোর আনু ভাই রেঙ্গুন জেল থেকে মৃত্যুর নোটিশ হাতে ওয়ালটেয়ারে যাচ্ছে, তখনই আমার কর্তব্য ঠিক করে ফেললাম। তোর কাছে লেখা তার চিঠির প্রতিটি অক্ষর যেন আমার দিকে তাকিয়ে বলছিল, 'তোমায় চায়, সে তোমায় চায় !' রাজার লাঞ্ছনা-তিলক তার কপালে, শ্যাম সমান মরণের বাঁশি তার হাতে, ঐ যে আমার রাজপুত্র ! আমি অভিসারে বেরিয়ে পড়লাম।

আমি জানতাম, আমার বাপ-মার আদেশ-অনুরোধ ও স্নেহের বিপুল বাধাকে ডিঙিয়ে কিছুতেই বুঝি তার সান্নিধ্য লাভ করতে পারব না। কিন্তু সে যখন তার মৃত্যু-মলিন চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকাল, তখন তার কাছে আমার সম্মুখে এত বড় বাধা যেন বাধা বলেই মনে হল না।

মনে হল এত বড় যে বাধা, এর বড় যে অন্তরায়—সে তার চেয়েও বড়, তার চেয়েও বিপুল ! আকাশ আমায় ডাক দিল, আমার পাখা চঞ্চল হয়ে উঠল, আমি নীড়ের মায়া ভুললাম।

যে পর্বতে জন্মগ্রহণ করেছি আমি স্রোতস্বিনী, তার এত পাথর এত বন-জঙ্গল পথ আগলে আমায় ধরে রাখতে পারল না, আমি সমুদ্রের উদ্দেশে ছুটে এলাম। সমুদ্রের নাগাল পেয়েছি, আজ আমার মনে হচ্ছে, এই আমার শেষ, এই আমার পরিণতি, এই আমার সার্থকতা। কূল হারিয়েই আমার অকূলের বন্ধুকে পেলাম।

আমার বাপ-মার মনে—তোদের মনে কত ব্যথা দিয়েছি জানি। তোরা পাহাড়ের মতো সংস্কারের পর সংস্কারের পাথর চড়িয়ে উঁচু হয়ে আছিস, তোরা হয়তো তাকেই বলিস মহিমা। কিন্তু ঐ মহিমার অচলায়তনে নিঃশ্বাস রোধ করে বেঁচে থাকার মায়া অন্তত আমার ছিল না কোনোদিন। ও জীবন আমার নয়। নিজেকে হারিয়ে দেওয়া, ছড়িয়ে দেওয়াই আমার জীবনের গতি। পথে চলে, ভুল করে, পথ হারিয়েই আমার মুক্তি। জানি, ও জীবন আমার কাছে যেমন সত্য, তোদের কাছে তেমনি মিথ্যা।

আমার সত্যকে আমি চেয়েছি এবং পেয়েছিও—এই আমার সান্ত্বনা ! ...

একদিন অন্ধকার রাত্রে—যখন তোরা, আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই ঘুমুচ্ছিলি, আমি বেরিয়ে পড়লাম অন্ধকারের হাত ধরে। আলোর দেশে পৌঁছে দিয়ে আমার সাথী অন্ধকার চলে গেছে ! আমি আলো পেয়েছি, বন্ধুকে পেয়েছি—আমাকে পেয়েছি।

তোর চেয়ে তো বড় আত্মীয় আনসারের কেউ নেই, কই, তুই তো এমন করে আসতে পারলিনে !

আমি কে তার? দু-দিনের পরিচয়—কৈশোরের স্বপ্ন! কিন্তু সে স্বপ্নের নেশা আর আমার কাটল না। সেই স্বপ্নের পরিচয়কে সকলের মাঝে স্বীকার করার অবকাশ বিধাতা দিলেন না। আমাদের শুভদৃষ্টি হল সকলের অন্তরালে—মৃত্যু আর সমুদ্রকে সাক্ষী করে। আমাদের বাসর সাজাচ্ছে মৃত্যু তার অন্ধকারের নীলপুরীতে! বাইরে কেবল কোলাহল, কেবল লজ্জা, ভালো করে চোখ চেয়ে বন্ধুকে দেখবার অবকাশ নেই। এইবার দেখব তাকে সেই বাসর-ঘরে চোখ পুরে প্রাণ পুরে। রবি-শশী-গ্রহ-তারার দল আমাদের বাসর-ঘরে আজ থেকেই আড়ি পাতছে। ...

এখানে এসে একদিন কাগজে দেখলাম, আমার বাবা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। আমি কি বুঝি না, কেন তিনি অবসর গ্রহণ করলেন—শুধু চাকরিতে নয়, হয়তো বা জীবনেও! সব বুঝি, তবু এর আর কোন চারা ছিল না!

মনে করলাম, ভালোই হল এ। যে ক্ষমা এ জীবনে পাব না বাবার কাছে, সে ক্ষমা চেয়ে নেব এর পরের জীবনে। সেখানে সংস্কারের বন্ধন নেই, মহিমার উচ্চতা নেই, প্রেস্টিজের অভিমান নেই। মৃত্যুর বাসর-ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নেব, আমি জানি—সেদিন প্রাণ ভরে তিনি আশীর্বাদ করবেন!

আর মা? আজ যদি যাই তাঁর কোলে ফিরে, আজো তিনি ধুলা মুছে তেমনি করে বুকে তুলে নেবেন। কিন্তু মা তো বাবাকে ছাড়িয়ে নেই। যে ক্ষমা বাবা এ জীবনে করতে পারবেন না, বুক ফেটে গেলেও না, মা সে ক্ষমার বাণী উচ্চারণ করতে পারবেন না! তাঁরা রটিয়েছেন, মেয়ে মরে গেছে সেইটেই সত্য হোক!

আমার জন্য যে মিথ্যা কবর খোদাই হয়েছিল, সে শূন্য কবর শূন্য থাকবে না। আমি তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব—যত তাড়াতাড়ি পারি মরে তাঁদের সকল লজ্জার অন্ত করব।

অবশ্য আত্মহত্যা করে নয়! এ ভীরুতা আমার মনে কোনো দিনই নেই। থাকলে অনেক আগেই মরতে পারতাম—অন্তত সেইদিন, যেদিন আমার অমতে আমাকে বিয়ের ছুরিতে গলা রাখতে হয়েছিল।

এত গেল আমার দুঃখের কাহিনী। এইবার আমার সুখের কথা শুনবি?

আমি যখন ওয়ালটেয়ারে এসে নামলাম, দেখি আনসারের রাজ-বন্ধু পুলিশের গুপ্তচররা আমায় ছেয়ে ফেলেছে। আমার শাপে—বর হল! কত সন্ধান করে হয়তো তাকে বের করতে হত। তাদের কাছেই সন্ধান পেলাম, অবশ্য আমার জিনিসপত্র সন্ধান করতে দেওয়ার বিনিময়ে।

তখনো সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসেনি। তার শিয়রে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটি ছোট্ট ঘরে অবশভাবে হাত দুটি এলিয়ে দিয়ে সে সন্ধ্যাতারার দিকে চেয়ে আছে।

আমি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছিলাম জুতা খুলে। দেবতার ঘরে কি জুতা পরে ঢুকতে আছে?

দেখলাম, বেলাশেষের পূরবী রাগিণীর মতো তার চোখে-মুখে কান্না আর ক্লান্তি। বাতায়ন-পথে সন্ধ্যাতারার দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। সে নিঃশব্দে সন্ধ্যাতারাকে নমস্কার করল। আমি অমনি ঘরে ঢুকে বললাম, 'আমি এসেছি।'

সে কী আনন্দ তার চোখে-মুখে! সে 'রুবি' বলে ডেকেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল! ...

আচ্ছা ঝুঁচি, তুই ঘুমন্ত ক্ষুধাতুর অজগরের জাগরণ দেখেছিস? শিউঠে উঠিসনে। সব কথা ভালো করে শোন্।

দুদিন না যেতেই বুঝলাম, ক্ষুধিত অজগর জেগে উঠেছে। ওর সে বিপুল আকর্ষণ এড়িয়ে যাবার সাধ্য কি বন-হরিণীর?

সে আমায় তিলে তিলে গ্রাস করতে লাগল। আমি কাঁদতে লাগলাম, আমার জন্য নয়—ওর জন্য। এ-সর্বগ্রাসী ক্ষুধা যে শুধু আমার মৃত্যু নয়—এ যে ওরও মৃত্যু! ও যে মৃত্যু-জরজর, আমাকে গ্রাস করে বেঁচে থাকার ক্ষমতা কি আজ আর ওর আছে?

আমি জানতাম এ-রোগের বড় শত্রু ঐ প্রবৃত্তি! নইলে, যে আনসারের সংযম তপস্বীর চেয়েও কঠোর, তাকে এ-মৃত্যু-ক্ষুধায় পেয়ে বসল কেন?

সে যখন বলল, 'রুবি, চিরদিনই বিষ খেয়ে বড় হয়েছি, আজ মৃত্যুর ক্ষণে তুমি অমৃত পরিবেশন কর! আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হই।'

আমি আমার উপবাসী ভিখারি বন্ধুকে ফেরাতে পারলাম না।

তবু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওকে কি বাঁচাতে পারবেন বলে মনে হয়?'

ডাক্তার বলল, 'ওঁর একধারে ফুসফুস খেয়ে ফেলেছে। আর এক ধারও আক্রমণ করেছে। ও রোগ এখন আমাদের চিকিৎসার শক্তিকে অতিক্রম করে গেছে, এখন ওঁকে যদি বিধাতা বাঁচান!'

আমি ডাক্তারকে নমস্কার করে বললাম, 'তাহলে আপনার আর কষ্ট করে আসবার দরকার নেই ডাক্তার সাহেব। ও শান্তিতে মরুক!'

ডাক্তার চলে গেল। আমিও আমার কর্তব্য বেছে নিলাম।

আমি পরিপূর্ণরূপে তার ক্ষুধিত-মুখে আত্মসমর্পণ করলাম! যদি ও না-ই বাঁচে, তবে ওকে ক্ষুধা নিয়ে মরতে দেব না, দুদিন আগে মরবে এই তো! তাছাড়া এ মৃত্যু তো ওর একার নয়, ওর বুকের মৃত্যু-জীবাণু আমাকেও তো আক্রমণ করবে!

সে কি তৃপ্তি, সে কি আনন্দ ওর! মরুপথের পথিক মরবার আগে যেন মরূদ্যানে ছায়া পেল!

ওর আনন্দ, ওর হাসি, ওর সুখ দেখে মনে হল, ও বুঝি বেঁচে গেল! বিষই বুঝি ওর বিষের ওষুধ হল!

কিন্তু—কিন্তু—বুঁচি ! লতি ! সই ! আজ আমার ঘরের প্রদীপ নিভে আসছে ! তার শিখা কাঁপছে ! মরণের ঝড় আমার ঘরে ঢুকে মাতামাতি করছে। আমি আমার এইটুকু আঁচলের আড়াল দিয়ে ওকে বাঁচাই কি করে ভাই?

কে জানত, ওর ঐ হাসি, ঐ আনন্দ—নিভবার আগে শেষ জ্বলে ওঠা !

চিঠি লিখতে লিখতে ভোর হয়ে এল ! তারই শিয়রে বসে এই চিঠি লিখছি। আমাদের শিয়রের বাতি নিভে আসছে। সে একদৃষ্টে ভোরের তারার দিকে তাকিয়ে আছে। কথা বন্ধ হয়ে গেছে কাল থেকেই। কাউকে আমি ডাকিনি। সেও ডাকেনি।

দুইজনে সারারাত সমুদ্র আর আকাশের তারা দেখেছি।

একবার শুধু অতিকষ্টে বলেছিল, 'ঐ তারার দেশে যাবে?'

আমি বললুম, 'যাব।' সে গভীর তৃপ্তির শ্বাস ফেলে বলল, 'তাহলে এস, আমি তোমার আশায় দাঁড়িয়ে থাকব !'

তারপর আমায় চুমু খেল।

এক ঝলক রক্ত উঠে এল ! তার বুকের রক্তে আমার মুখ-ঠোঁট রাঙা হয়ে গেল।

আশীর্বাদ করিস, এই রক্ত-রেখা যেন আর না মোছে !...

তোর কাছে যখন এই লিপি গিয়ে পৌঁছবে—ততক্ষণে আমার দীপ নিভে যাবে ! আমার সুন্দর পৃথিবী—আমার চোখে মলিন হয়ে উঠেছে ! আমার চোখের নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে !

আমি জানি, আমারও দিন শেষ হয়ে এল ! আমিও বেলাশেষের পূরবীর কান্না শুনেছি। আমার বুকে তার বুকের মৃত্যু-জীবাণু নীড় রচনা করেছে ! আমার যেটুকু জীবন বাকি আছে তা খেতে তাদের আর বেশিদিন লাগবে না। তারপর চিরকালের চিরমলিন—নতুন জীবন—নতুন—তারায়—নতুন দেশে—নতুন প্রেম !

তোদের সকলের জন্যে সে কেঁদেছে। কত বড়, কত বিপুল জীবন নিয়ে সে জন্মেছিল—আর কি দুঃখ নিয়েই না গেল ! রাজার ঐশ্বর্য নিয়ে সে এসেছিল—সে গেল ভিখারির মতো,—নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্বন্ধু—একা !

সে বলে গেছে, মৃত্যুর পর তার দেহ মহাসমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে। সমুদ্রকে সে ভালোবেসেছিল—বুঝি বা আমার চেয়েও। সাগরের মতো প্রাণ যার—তাকে সাগরের জলেই ভাসিয়ে দেব।

আর আমার সময় নেই ! আমারও প্রদীপ নিভে এল বলে।

— রুবি

দুর্দিনের যাত্রী

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল

এস ভাই, পথের সাথী বন্ধুরা আমার, এস আমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দল ! আজ শনি এসেছে তোমাদের পোড়া-কপালে বাসি ছাই-এর পাণ্ডুর টিকা পরিয়ে দিতে। এস আমার লক্ষ্মীছাড়া গৃহহারা ভাইরা ! আজ ঝর-ঝর বারিধারার সুরে সুরে কান্না উঠেছে—'হায় গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতিহারা !' এই 'আকাশ-ভাঙা আকুল ধারার' মাঝে নাঙ্গা শিরে আদুল গায়ে বেরিয়ে এস—বেরিয়ে এস আমার পথের সাথীরা। তোমাদের জন্যে গৃহ নাই, তোমাদের জন্যে দয়া নাই, করুণা নাই, এই দুর্দিনে তোমাদের ঘরে ডেকে নেবার কেউ নেই, তোমাদের ডাক দিয়েছে ঐ ঝড়-বাদলের উতল হাওয়া আর মাটির মায়ের সিক্ত কোল। তোমাদের জন্য কোনো গৃহের বাতায়নে কালো চোখের করুণ কামনা ঝিলিক মারে না, তোমাদের অভাবে এ দুর্দিনে কারুর মন্দিরে শূন্যতার ধ্বনি বাজে না, তোমাদের কারুর হৃদয় পীড়িত হয়ে ওঠে না। এস আমার অনাদৃত লাঞ্ছিত ভাইরা, আমরাই নতুন করে আমাদের জ্বালার জগৎ সৃষ্টি করব ! শনি হবে আমাদের কপালে জয়টিকা, 'ধূমকেতু' হবে আমাদের রথ, মরুভূমি হবে আমাদের মাতৃক্রোড়, মৃত্যু হবে আমাদের বধূ। এস—এস আমার লক্ষ্মীছাড়ার দল ! ত্যক্ত শতমুখী আমাদের বিজয়কেতন, মড়ার মাথা আমাদের রক্ত দেউল-দ্বারে মঙ্গল-ঘট, গরল আমাদের তৃষ্ণার জল, দাবানল-শিখা আমাদের মলয়-বাতাস, নিদাঘ-আতপ আমাদের তৃপ্তি, জাহান্নাম আমাদের শান্তি-নিকেতন। এস আমার শনির শাপদগ্ধ ভাইরা ! আমরা জয়নাদ করব অমঙ্গল আর অভিশাপের। সদ্য পুত্রহীনা জননী আর স্বামীহারা সদ্য বিধবার সৃষ্টি-কাঁদানো ক্রন্দন আমাদের মাধবী-উৎসবের গান, মৃত্যু-কাতর মুখের যন্ত্রণা আমাদের হাসি, আর ঐ যে ঘরে-ঘরে মায়ের মমতা, বোনের স্নেহ, প্রেয়সীর ভালোবাসা—ঐ আমাদের চোখের জল। ঐ যে গৃহের শান্তি, তৃপ্তি, আনন্দ, ঐ আমাদের কান্না। ঐ তরুণ কালো চোখের দীপ্তি আমাদের শিকল, ঐ শূন্য হিয়ার ব্যথিত কামনা আমাদের কারাগার। ঐ শ্মশান-মশান-চারিণী চণ্ডী আমাদের বীণবাদিনী। মহামারি, মারিভয়, ধ্বংস আমাদের উল্লাস। রক্ত আমাদের তিলক, রৌদ্র আমাদের করুণা। এরই মাঝে আমাদের নবসৃষ্টির অভিনব তপস্যা শুরু হবে। এস আমার সূর্যতাপস তরুণের দল। সান্ধ্য-শ্মশান আর গোরস্থান আমাদের সান্ধ্য-সম্মিলনী, আলেয়া আমাদের সান্ধ্যপ্রদীপ, মড়া-কান্না আর পেচক-শিবাদি-রব আমাদের মঙ্গল হুলুধ্বনি। মরীচিকা আমাদের লক্ষ্য, আঘাত আমাদের আদর, মার আমাদের সোহাগ। সর্বনাশ আমাদের স্নেহ, বজ্র-মার আমাদের আলিঙ্গন। উল্কা আমাদের মালা-খসা ফুল, সাইক্লোন আমাদের প্রিয়ার এলোকেশ। সূর্যকুণ্ড আমাদের স্নানাগার, অনন্ত নরক-কুঞ্জ।

এই অমঙ্গল অভিশাপ আর শনির জ্বালানো রুদ্র-চুল্লির মধ্যে বসে তোমাদের নবসৃষ্টির সাধনা করতে হবে। তোমাদের এই রুদ্র তপস্যার প্রভাবে সকল নরকাগ্নি ফুল হয়ে ফুটে উঠবে, যেমন 'ইবরাহীমের' পরশে 'নমরুদের' জাহান্নাম ফুল হয়ে হেসে উঠেছিল। এস আমার অভিনব তরুণ তপস্বীর দল ! তোমাদের ধ্বংসের আহ্বান করছি। এস।

তুবড়ি বাঁশির ডাক

ঐ শোনো—

'পুব সাগরের পার হতে কোন্ এল পরবাসী।
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন
হাওয়ায় হাওয়ায় শন্‌শন্
সাপ খেলাবার বাঁশি।'

বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস বিবর থেকে অগ্নি-বরণ নাগ-নাগিনী তোমার নিযুত ফণা দুলিয়ে। ঐ শোন্ সাপুড়ের তুবড়ি বাঁশির ডাক 'ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় শন্‌শন্ শন্‌শন্' ! এস আমার বিষধর কাল-কেউটের দল ! তোমাদের বিবর ছেড়ে বেরিয়ে এস এই দিনের রৌদ্র সিন্ধু-কূলে। তটিনী-তীরের কেতকী কুসুমে কুসুমে জড়িয়ে আছে যারা, কেয়ামূলের গোপন তলে আত্মগোপন করে আছে যারা, সেই নাগ-নাগিনীদের মনসার পূজা-বেদী হতে আজ ডাক এসেছে। ঐ শোনো তাঁর দূত বাজায় 'ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় শন্‌শন্ শন্‌শন্।' তোমাদের আদিমাতা অগ্নিনাগিনী আজ গগনতলে বেরিয়ে এসেছে তার পুচ্ছে কোটি কোটি নাগ-শিশু খেলা করছে, ঐ শোনো তার ডাক ঘনঘন শন্‌শন্। ঐ শোনো সাপুড়ের গভীর গুরুগুরু ডম্বরু-রব। তারই রবে বিপুল উল্লাসে পুচ্ছ সাপটি' উঠেছে দিকে দিকে নাগপুরে নাগ-নাগিনী, অধীর আবেগে বাসুকীর ফণা দুলে দুলে উঠছে—বিসুবিয়াসের বিপুল রন্ধ্র দিয়ে তার নাসার বিষ-ফুৎকার শুরু হয়েছে। বেরিয়ে এস—বেরিয়ে এস ; বিবরের অন্ধকার হতে এই রৌদ্রদগ্ধ তপ্ত দিবালোকে হে আমার বিষধর কাল-ফণীর দল। তোমাদের বিষ-দাঁতের ছোবলে ছোবলে ধরণী জর্জরিত হয়ে উঠুক, তোমাদের অত্যুগ্র নিশ্বাসে নিশ্বাসে আকাশ তাম্রবর্ণ হয়ে উঠুক, বাতাসে বাতাসে জ্বালাদগ্ধ অগ্নি-দাহন হু-হু-হু-হু করে ছুটে যাক, তোমাদের কর্কশ পুচ্ছে জড়িয়ে বসুমতীর টুঁটি টিপে ধরো। তোমাদের বিষ-জরজর পুচ্ছকে চাবুক করে হানো—মারো এই মরা নিখিলবাসীর বুকে মুখে। বিষের রক্ত-জ্বালায় তারা মোচড় খেয়ে খেয়ে একবার শেষ আর্তনাদ করে উঠুক। খসে খসে পড়ুক তাদের রক্ত-মাংস-অস্থি তোমাদের বিষ-তিক্ত চাবুকের আঘাতে আঘাতে। গর্জন করো, গর্জন করো আমার হলাহলশিখ

ভুজগ শিশুর দল ! বিপুল রোষে তোমরা একবার ফণা তুলে তোমাদের পুচ্ছের উপর ভর করে দাঁড়াও, বিশ্ব ছড়ায়ে উঠুক শুধু তোমাদের নিযুত কাল-ফণা। আকাশে-বাতাসে দুলুক শুধু তোমাদের নাগ-হিন্দোল। পাতালপুরের নিদ্রিত অগ্নিসিন্ধুতে ফুঁ দাও, ফুঁ দাও—ফুঁ দিয়ে জ্বালাও তাকে। আসুক নিখিল অগ্নিগিরির বিশ্ব-ধ্বংসী অগ্নিস্রাব, ভস্মস্তূপে পরিণত হোক এ-অরাজক বিশ্ব। ভগবান তার ভুল শোধরাক। এ খেয়ালের সৃষ্টিকে, অত্যাচারকে ধ্বংস করতে তোমাদের কোটি ফণা আস্ফালন করে ভগবানের সিংহাসন ঘিরে ফেলুক। জ্বালা দিয়ে জ্বালাও জ্বালাময় বিধি ও নিয়মকে।

এস আমার অগ্নি-নাগ-নাগিনীর দল ! তোমাদের পলক-হারা রক্ত-চাওয়ার জাদুতে হিংস্র পশুর রক্ত হিম করে ফেলি, তোমাদের বিপুল নিশ্বাসের ভীম আকর্ষণে টেনে আনো ঐ পশুগুলোকে আমাদের অগ্নি-অজগরের বিপুল মুখগহ্বরে। আকাশে ছড়াও হলাহল-জ্বালা, নীল আকাশ পাংশু হয়ে উঠুক ! রবি-শশী-তারা গ্রহ-উপগ্রহ সব বিষ-দাহনে নিবিড় কাল হয়ে উঠুক, বাতাস খুন-খারাবির রঙে রেঙে উঠুক। বিদ্যুতে-বিদ্যুতে তোমাদের অগ্নি-জিহ্বা লকলক করে নেচে উঠুক। ঢালো তোমাদের সঞ্চিত বিষ ঐ মহাসিন্ধু, নদনদীর বারি-রাশির মাঝে—টগবগ করে ফুটে উঠুক এই বিপুল জলরাশি—আর তার বুকে তোমাদের বিষ-বিন্দু বুদ্বুদ হয়ে ভেসে বেড়াক।

আজ 'ভাসান'-উৎসবের দিন। মনসার পূজা-বেদীতে তোমাদের সঞ্চিত বিষ উদগীরণের আহ্বান এসেছে। এস—এই ধূমকেতু-পুচ্ছের অযুত অগ্নি-নাগ-নাগিনীর মাঝে কে কোথায় আছ কোন্ বিবরের অন্ধকারে লুকিয়ে হে আমার পরম প্রিয় বিষধর কালফণীর দল ! এই অগ্নিনাগ-বাসে তোমাদেরও বিষ-চক্র-লাঞ্ছিত ফণা এসে মিলিত হোক, তোমাদের বিষ-নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ধূমকেতু-ধুম আরো—আরো ধূমায়িত হয়ে উঠুক।

'ঐ শোনো—শোনো
ঘন ঘন শন্ শন্
সাপ খেলাবার বাঁশি।'

মোরা সবাই স্বাধীন
মোরা সবাই রাজা

একবার শির উঁচু করে বল দেখি বীর, 'মোরা সবাই স্বাধীন, সবাই রাজা !' দেখবে অমনি তোমার পূর্ব-পুরুষের রক্ত-মজ্জা-অস্থি দিয়ে-গড়া রক্ত-দেউল তাসের ঘরের মতো টুটে পড়েছে, তোমার চোখের সাত-পুরু-করে বাঁধা পর্দা খুলে গেছে, তিমির রাত্রি দিক-চক্রবালের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে। তোমার হাতে-পায়ে গর্দানে বাঁধা শিকলে

প্রচণ্ড মোচড় দিয়ে বলো দেখি বীর—'মোরা সবাই স্বাধীন, সবাই রাজা !' দেখবে অমনি তোমার সকল শিকল সকল বাঁধন টুটে খানখান হয়ে গেছে।

স্বরাজ মানে কি? স্বরাজ মানে, নিজেই রাজা বা সবাই রাজা ; আমি কারুর অধীন নই, আমরা কারুর সিংহাসন বা পতাকাতলে আসীন নই। এই বাণী যদি বুক ফুলিয়ে কোনো ভয়কে পরোয়া না করে মুক্ত কণ্ঠে বলতে পার, তবেই তোমরা স্বরাজ লাভ করবে, স্বাধীন হবে, নিজেকে নিজের রাজা করতে পারবে ; নইলে নয়।

কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, এই 'আমার রাজা আমি'—বাণী বলবার সাহস আছে কোন্ বিদ্রোহীর? তার সোজা উত্তর—যে বীর কারুর অধীন নয়, বাইরে-ভিতরে যে কারুর দাস নয়, সম্পূর্ণ উদার মুক্ত ! যার এমন কোনো গুরু বা বিধাতা নেই যাকে ভয় বা ভক্তি করে সে নিজের সত্যকে ফাঁকি দেয়, শুধু সে-ই সত্য স্বাধীন, মুক্ত স্বাধীন। এই অহম্-জ্ঞান আত্মজ্ঞান—অহঙ্কার নয়, এ হচ্ছে আপনার ওপর অটল বিরাট বিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাস না থাকলে মানুষ কাপুরুষ হয়ে যায়, ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়। পরকে ভক্তি ক'রে বিশ্বাস করে শিক্ষা হয় পরাবলম্বন, আর পরাবলম্বন মানেই দাসত্ব। এই মনের পরাবলম্বন বা গোলামিই আমাদেরে চির-গোলাম ক'রে রেখেছে। আমাদের তেত্রিশ কোটি লোকের তেত্রিশ কোটি দেবতা, অর্থাৎ আমাদের ভারতে তেত্রিশ কোটি মানুষের সকলেরই নির্ভরতা তাদের স্ব-স্ব দেবতার ওপর ! সবাই বলেন, দেবতা আছেন—আর তাঁরা নেই। অর্থাৎ কিনা এটা নাস্তিকের দেশ, স্ব-হীন দেশ। অতএব এ স্ব-হীন দেশ যদি বলে যে, স্বরাজ লাভ করব, তাহ'লে যে তাদেরে উপহাস করে আর ঐ নাস্তিকের বুকে লাথি মারে, সে অন্যায় করে ব'লে তো মনে হয় না—উল্টো উপকারই করে। যার অন্তরে আপন সত্য আপন ভগবান সহজে জাগে না, তাদের ভগবান এমনি করে বুকে লাথি খেয়ে তবে জাগে। যারা আমাদেরে পায়ের তলায় রেখে আমাদের বুকে পদাঘাত করছে, মুখে থুথু দিচ্ছে, তারা আমার নমস্য। সে অসুরের পায়ের ধুলো আমি মাথায় নিই, যে অসুর ভীরু দেবতাকে পদাঘাত ক'রে পৌরুষ শেখায়, তার লুপ্ত দেবত্বকে সিংহ-বিক্রমে জাগিয়ে তোলে। যে জাগ্রত ওস্‌মান সুপ্ত জগৎসিংহকে ভীম-পদাঘাতে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে আমি নমস্কার করি। যে ভৃগু নিদ্রিত ভগবানের বুকে লাথি মেরে জাগায়, সে ভৃগুকে আমি প্রণাম করি। যে নরমুণ্ড-মালিনী চণ্ডী নিদ্রিত শিবের বুকে তাণ্ডব নৃত্য করে প্রলয়-করতালি বাজিয়ে তাকে জাগিয়ে তোলে, সেই অশিব-নাশিনীর উদ্দেশে আমার কোটি কোটি নমস্কার। শিবকে জাগাও, কল্যাণকে জাগাও। আপনাকে চেনো। বিদ্রোহের মতো বিদ্রোহ যদি করতে পারো প্রলয় যদি আনতে পারো তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই, কল্যাণ আসবেই। লাথির মতো যদি লাথি মারতে পারো, তা হ'লে ভগবানও তা বুকে করে রাখে। ভৃগুর মতো বিদ্রোহী হও, ভগবানও তোমার পায়ের ধুলো নেবে। কাউকে মেনো না, কোনো ভয়ে ভীত হয়ো না বিদ্রোহী। ছুটাও অশ্ব, চালাও রথ, হানো অগ্নিবাণ, বাজাও দামামা-দুন্দুভি ! বলো, যে যায় যাক সে, আমি আছি। বলো আমিই নূতন করে জগৎ সৃষ্টি করব। স্রষ্টার আসন থরথর ক'রে কেঁপে

উঠুক ! বল, কারুর অধীনতা মানি না, স্বদেশীরও না, বিদেশিরও না। যে অপমান করে তার চেয়ে কাপুরুষ হীন সে-ই, যে অপমান সয়। তোমার আত্মশক্তি যদি উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে তবে বিশ্বে এত বড় দানব-শক্তি নেই যা তোমাকে পায়ের তলায় ফেলে রাখে। নির্যাতন যদি সয়ে থাকো, তবে সে দোষ তোমারি। নিজের দুর্বলতার জন্য অন্যের শক্তির নিন্দা করো না।

জাগো অচেতন, জাগো ! আত্মাকে চেনো ! যে মিথ্যুক তোমার পথে এসে দাঁড়ায়, পিষে দিয়ে যাও তাকে, দেখবে তোমারই পতাকা-তলে বিশ্ব-শির লোটাচ্ছে। তোমারি আদর্শে জগৎ অধীনতার বাঁধন কেটে উদার আকাশতলে এক পঙ্‌ক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্বাগত

'খোশ-আমদেদ্ !' স্বাগত হে দেশবন্ধু ! হে বীরেন্দ্র ! তোমাদের এই তিমির রাত্রির অবসানে আমরা আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। তোমরা ফিরে এস এই বাংলার শ্মশানে।

জ্বালিয়ে রেখেছি এই শ্মশান-চিতার হোম-শিখা ; এস ঋষি, হোতা হও। এস তবে, কপালে শ্মশান-ভস্মের পাংশু টিকা পরিয়ে দিই। দেখেছ, কি ভীষণ ধূমকুণ্ডলী উঠেছে বাংলার আকাশ-বাতাস ছেয়ে। বল ঋষি, 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান !' এস ঋত্বিক, উচ্চারণ করো শব-সাধনার মন্ত্র। এই শবের মাঝে শিব জাগাতে হবে। পারবে ? —তবে এস। এই নাও মড়া, এই ধরো নর-কঙ্কাল—স্তূপে স্তূপে সাজানো। আর কি চাও ঋষি ? ঐ দেখো শৃগাল, ঐ দেখো কুক্কুর—ঐ দেখো শকুন—মড়ার পচা মাংস নিয়ে টানাটানি খাওয়া-খাওয়ি করছিল। জ্যান্ত মানুষের সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেল। ঐ দেখো, শ্মশানে নাচছে ভূত-প্রেত-ডাকিনী-যোগিনী, —এই ভূতে-ভরা শ্মশানে এসে তোমাদেরও যেন ভূতে না পায়—সাবধান ঋষি ! তোমরা ছিলে অন্ধকারের শান্তিতে, স্নিগ্ধ কালো অন্ধকার তোমাদের মায়ের মতো কোলে করে রেখেছিল। এখন এলে শ্মশানের বিকট অট্টহাস, করুণ আর্তনাদ আর প্রলয়-নৃত্যের ভীম কোলাহলের মাঝে।

ভয় পাচ্ছ কি ঋষি ? সাবধান ! এ কাল-শ্মশানে এসে সবাই ভয় পায়, ভূত-যোনি-গ্রস্ত হয়। তাই আবার বলি, সাবধান ! এখানে ভয় বড়, বড় ক্রন্দন, বড় জ্বালা। সইতে পারবে ? এখানে মায়ের কোল নেই, পিতার মঙ্গলহস্ত নেই, ভগিনীর স্নেহ নেই, এখানে কল্যাণীর মঙ্গলদীপ জ্বলে না। কেউ পথ দেখাতে নেই। অভাব, বেদনা, আঘাত,

মার, বিদ্রূপের চাবুক-জ্বালা, অনাদর, অপমান, এই সপ্ত নরক হা করে আছে গ্রাস করবার জন্যে। এই জাহান্নামের মধ্যে ব'সে পুষ্পের হাসি হাসতে পারবে? —তবে এস ঋষি, এস! বন্ধনভয় রাজভয়-বিজেতা বীর তোমরা, এই শ্মশানে শবের মাঝে এসে বসো। শিব আর অন্নপূর্ণাকে এই মড়ার মুল্লুকে যদি কোনোদিন আনতে পারো, তবে সেইদিন তোমাদের নমস্কার করব। আজ তোমাদের জন্যে আমাদের নমস্কার নেই।

এই শ্মশানে আছে শুধু পিশাচের খলখল অট্টহাস, আর অসহায়ের করুণ নাড়ি-ছেঁড়া মর্মভেদী ক্রন্দন! তা নিতে চাও? —তবে নাও। কিন্তু তা সইবে না ঋষি। আবার বলি, আজ তোমাদের জন্যে গৃহের মঙ্গল-শঙ্খ নয়, —তোমাদের জন্যে স্রক্-চন্দন নয়, তোমাদের জন্যে শ্মশানের ধূম আর ভস্ম, অট্টহাস আর ক্রন্দন, রক্ত আর অশ্রু—মৃত্যু আর ভীতি! এরই মাঝে হে চিত্তরঞ্জন, হে বীরেন্দ্র! তোমাদের জন্যে ধুলায় আসন পাতা। তোমরা এস। স্বাগত![১]

'মেয় ভুখা হুঁ'

পাগলি মেয়ের কী খেয়াল উঠল, হঠাৎ দুপুর রাতে ডুকরে কেঁদে উঠল, 'মেয় ভুখা হুঁ'!

মঙ্গল-ঘট গেল ভেঙে, পুরনারীর হাতের শাঁখ আর বাজে না, শাঁখাও গেল টুটে। ভীত শিশু মাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, 'মা, ও কে কাঁদে?'

মা বললে, 'চুপ কর, ও পাগলি, ও ডুলুনি, ছেলে ধরতে এসেছে।'

পাশে ছিল দস্যি ছেলে ঘুমিয়ে। সে লাফিয়ে উঠে বললে, 'মা আমি দেখব পাগলিকে!'

মা ঠাস্ করে ছেলের গালে এক চড় কসিয়ে বললে, 'দস্যি ছেলে! কথার ছিরি দেখ, ঐ ডাইনি মাগিকে দেখবেন্! শুয়ে থাক্ গিয়ে চুপটি করে। ষাট! ষাট!'

কিন্তু ছেলে আর ঘুমায় না। তাঁর কাঁচা রক্তের পুলক-নাচা চঞ্চলতায় এক অভিনব সুর বাজতে লাগল।

'মেয় ভুখা হুঁ!'

সে সুর—সে ক্রন্দন কাছে—আরো—আরো কাছে এসে যেন তারই দোরের পাশ দিয়ে কেঁদে গেল অনেক দূরের পুবের পানে। সে ক্রন্দন যত দূরে যায়, দস্যি ছেলের রক্ত ততই ছায়ানটের নৃত্য হিন্দোলায় দুলতে থাকে, ভূমিকম্পের সময় সাগর-

---

১. দেশবন্ধু ও বীরেন্দ্র শাসমলের কারামুক্তি উপলক্ষে।

দোলানির মতো। ছেলে দোর খুলে সেই ভুখারিনীর কাঁদন লক্ষ্য করে ঝড়ের বেগে ছুটল। মা বার কতক ডেকে দোরে লুটিয়ে পড়ল। সে অসম্ভবকে দেখবে, সে ভয়কে জয় করবে।

এলোকেশে জীর্ণাশীর্ণা ক্ষুধাতুর মেয়ে কেঁদে চলেছে 'মেয়্ ভুখা হুঁ।' তার এক চোখে অশ্রু আর চোখে অগ্নি। দ্বারে দ্বারে ভুখারিনী কর হানে আর বলে, 'মেয়্ ভুখা হুঁ!'

বুড়োর দল নাক সিঁটকিয়ে ভাল করে তাকিয়াটা আঁকড়ে ধরে, তরুণ যারা তারা চমকে বাইরে বেরিয়ে আসে, আর মা'রা ভয়ে বুকের মানিককে বুকে চেপে ধরে।

স্ত্রী ঘুমের মাঝে স্বামীর ভুজ-বন্ধন ছাড়িয়ে হঠাৎ বাতায়ন খুলে ভেজা-গলায় শুধোয়, কে এমন করে কেঁদে যায়? এমন ঝড়-বাদলের নিশীথে স্বামী স্ত্রীকে আরো জোরে বুকে চেপে ধরে ভীত জড়িত কণ্ঠে বলে, 'আহা, যেতে দাও না—'

ভুখারিনীর পেছনে দস্যি ছেলের দলটা বেশ দল-পুরু হয়ে উঠল। তারা সেই ঝন্‌ঝারাতের উদাসিনীকে ঘিরে উদ্দাম চঞ্চল আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি চাও ভুখারিনী—অন্ন?'

উদাসিনী ছলছল চোখে আর এক দোরে কর হেনে কেঁদে ওঠে, 'মেয়্ ভুখা হুঁ।'

'অন্ন চাও না? তবে কি চাও,—বস্ত্র?' এবার কণ্ঠস্বরে আরো কান্না আরও তিক্ততা ফুটে ওঠে,—'মেয়্ ভূখা হুঁ!'

উদাসিনী রাজপুরীর প্রান্তে এসে পড়ল।

অধীর ক্ষিপ্র কণ্ঠে দস্যি ছেলের দল চিৎকার করে উঠল, 'বল্ বেটি কি চাস, নইলে তোর একদিন কি আমাদের একদিন, --কি চাস তুই? আশ্রয়?

ভুখারিনী কিন্তু কথাও কয় না, ফিরেও তাকায় না। একটা একটানা বেদনা ক্রন্দন-ধ্বনি তার আর্তকণ্ঠে বারেবারে গুমরে ওঠে—'মেয়্ ভুখা হুঁ!'

দস্যি ছেলেগুলো এবার সত্যি সত্যিই খেপে উঠল। তাদের কৃপাণ একবার কোষমুক্ত হয়ে আবার কোষবদ্ধ হলো। এ যে নারী—মা।

কিন্তু রক্ত তাদের তখন অগ্নি-গিরি-গর্ভের বহ্নি-সিন্ধুর মতো গর্জন করে উঠেছে, তাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। আর পারে না, সব বুঝি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবার। উদাসিনী এক গভীর অরণ্যের প্রান্তে এসে ছিন্ন-কণ্ঠ কপোতিনীর মতো আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো, 'মেয়্ ভূখা হুঁ!'

ঝন্‌ঝা যেন মুখে চাবুক খেয়ে হঠাৎ থেমে গেল। বনের দোলা, নদীর ঢেউ, বৃষ্টির মাতামাতি সমস্ত তার বেদনায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। দিগন্ত-কোল থেকে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ রক্ত-আঁখি মেলে বেরিয়ে এল। বনের শ্বাপদকুল উদাসিনীর পায়ের তলায় মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ল। নিস্তব্ধ-নিঝ্‌ঝুম।

সে কি অকরুণ নিস্তব্ধতা। কানের কাছে কোন্ না-শোনা সুরের অগ্নিঝঙ্কার যেন অবিরাম করাত চলার মতো শব্দ করতে লাগল—ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্-ম্।

সেই সুর উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে শেষে খাদের দিকে নামতে লাগল।

এইবার যেন, 'বাজে রে বাজে ডমরু বাজে—হৃদয় মাঝে, ডমরু বাজে।'

এই কি বিশ্ব ঘোরার প্রণব নিনাদ? এক সাথে তিনটা উল্কা আকাশ ফুঁড়ে ধরণীর বুকে এসে পড়ল। সে যেন খ্যাপা ভোলানাথের ছোঁড়া ত্রিশূল, অথবা তাঁরই ত্রি-নয়ন হতে ঝরে-পড়া তিন ফোঁটা অগ্নি-অশ্রু।

দুষ্ট মেয়ে গঙ্গা কলকল কলকল করে হেসে উঠে সব নিস্তব্ধতা ভেঙে দিলে। দিগ্‌চক্র-রেখায় রেখায় বনানীপুঞ্জ দুলে দুলে উঠল, সে যে উলসিত শিবের জটা চাঞ্চল্য।

পাগলি আবার কেঁদে উঠল, 'মেয়্ ভূখা হুঁ!'

দস্যি ছেলের দল এবার সত্যি সত্যিই অধৈর্য হয়ে উঠল। উদাসিনীর কেশাকর্ষণ করে উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠল, 'বল্ বেটি কি চাস?'

হরিৎ-বনের বুক চিরে বেরিয়ে এল রক্ত-কাপালিক। ভালে তার গাঢ় রক্তে আঁকা 'অলক্ষণের তিলক-রেখা।' বুকে তার পচা শবের গলিত দেহ। আকাশে খড়গ উৎক্ষিপ্ত করে কাপালিক হেঁকে উঠল, —'বেটি রক্ত চায়!'

কে যেন একটা থাবা মেরে সূর্যটাকে নিবিয়ে দিলে।

দস্যি ছেলেরা হঠাৎ তাকিয়ে দেখে কোথাও কিছু নেই। শুধু অনন্ত প্রসারিত শ্মশান, তার মাঝে পাগল বেটি ছিন্নমস্তা হয়ে আপনার রুধির আপনি পান করছে আর চ্যাঁচাচ্ছে, 'মেয়্ ভূখা হুঁ—মেয়্ ভূখা হুঁ!'

তরুণের দল ভীম হুঙ্কার করে উঠল, 'বেটি রক্ত চায়! বেটি রক্ত চায়!'

মহা উৎসব পড়ে গেল ছেলেদের মধ্যে—তারা যজ্ঞ করবে। এবার মায়ের পূজার বলি হলো মায়ের ছেলেরাই।

শ্মশান আজ নিস্তব্ধ, জগৎ-সৃষ্টির পূর্বমুহূর্তে বিশ্ব যেমন নিস্পন্দ হয়ে গেল, তেমনি স্তব্ধাহত।

* * *

রক্ত-যজ্ঞের পরের দিন কৈলাসে জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা দশহাতে করুণা, স্নেহ আর হাসি বিলাচ্ছে দেখলাম। বললুম, বেটি জগদ্ধাত্রীই বটে। কাল তার ছেলেরা বলি হয়ে বেটির ক্ষুধা মেটালে, আর আজ সে দিব্যি অন্নপূর্ণা সেজে আনন্দ বিলোচ্ছে।

একরাশ ফোটা শিউলি পুবের হাওয়ায় উড়ে এসে আমায় চুম্বন করে গেল। কেমন করুণ শান্তিতে মন যেন আবার কানায় কানায় ভরে উঠল।

ও হরি! দেখি কি, অন্নপূর্ণা বেটির ঘরের একপাশে তার ছিন্নমস্তা ভৈরবী মূর্তির মুখোশটা পড়ে রয়েছে। ভোলানাথ তো হেসেই অস্থির।

আরো দেখলুম কালকার রক্ত-যজ্ঞের আহুতি ঐ দস্যি ছেলের সব কটাই জলজ্যান্ত বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যে দশটা ছেলে নীলকণ্ঠ শিবের কাছে, তাদের সব কণ্ঠ নীল। সে নীল দাগ তাদের টুঁটি টিপে মারার—ফাঁসির দাগ। আর যে-দলটা অন্নপূর্ণার ভাঁড়ার ঘরের পাশে জটলা করছে, তাদের কণ্ঠে লাল দাগ ; ঘাতকের হানা খড়্গ-রক্ত প্রেয়সীর শরম-রঞ্জিত চুম্বনের মতো তাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে রয়েছে।

পথিক ! তুমি পথ হারাইয়াছ ?

'পথিক ! তুমি পথ হারাইয়াছ ?'

বনানী-কুন্তলা ষোড়শী বনের বুক চিরে বেরিয়ে এসে পথ-হারা পথিককে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'পথিক ! তুমি পথ হারাইয়াছ ?'

সেদিন দিশে-হারা পথিকের মুখে উত্তর যোগায়নি। সুন্দরের আঘাতে পথিকের মুখে কথা ফোটেনি।

পথিক সেদিন সত্যই পথ হারিয়েছিল।

হে আমার গহন-বনের তরুণ-পথিক দল ! আজ সেই বনানী-কুন্তলা ভৈরবী-সুতা আবার বনের বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে—চোখে তার অসঙ্কোচ দৃষ্টির খড়্গ-ধার, ভালে তার কাপালিকের আঁকা রক্ত-তিলক, হাতে তার অভয় তরবারি—সে আবার জিজ্ঞাসা করছে—'পথিক ! তুমি পথ হারাইয়াছ ?'

উত্তর দাও, হে আমার তরুণ পথ-যাত্রী-দল ! ওরে আমার রক্ত-যজ্ঞের পূজারী ভায়েরা ! বল্ তোরাও কি আজ সৌন্দর্যাহত রূপ-বিমূঢ় পথহারা পথিকের মতো মৌন নির্বাক চোখে ঐ ভৈরবী রূপসীর পানে চেয়ে থাকবি ? উত্তর দে মায়ের পূজার বলির নির্ভীক শিশু !

বল্ মাভৈ ! আমরা পথ হারাই না ! আমাদের পথ কখনো হারায় না। বল্ আমাদের এ-পথ চির-চেনা পথ। হাটের পথিকের পায়ে-চলার পথ আমাদের জন্য নয়। সিংহ-শার্দূল-শঙ্কিত কণ্টক-কুণ্ঠিত বিপথে আমাদের চলা। ওগো ভৈরবী মেয়ে ! এ রক্ত-পথিকের দল, নবকুমারের দল নয়। ভৈরবী রূপসী আবার জিজ্ঞাসা করে, 'পথিক ! তুমি পথ হারাইয়াছ ?'

এবার বল আমার বন্য তরুণ দল, 'ওগো, আমরা পথ হারাইয়াছি, বনের পথ হারায় নাই।'

অকুণ্ঠিতা অনবগুণ্ঠিতা বন-বালার চোখে কুণ্ঠার ছায়া-পাত হোক, পরাজয়ের লাজ-অবগুণ্ঠন পড়ুক !

নিবিড় অরণ্য। তারই বুকে দোলে, দোলে, মহিরুহ সব দোলে—বনস্পতি দল দোলে—লতা-পাতা সব দোলে ! দোলে তারা সবুজ খুনের তেজের বেগে। তারই মাঝে চলে—চলে আমার বন-হিংস্র বীরের দল। তাদরে পথ দেখায় কাপালিকের রক্ত-তিলক পরা ভৈরবী মেয়ে।

অদূরে কাপালিকের রক্ত-পূজার মন্দির। মন্দিরে রক্ত-ভুখারিনীর তৃষ্ণাবিহ্বল জিহ্বা দিয়ে টপটপ ক'রে পড়ছে কাঁচা খুনের ঝারা। দূরে হাজার কণ্ঠের ভৈরব-গান শোনা গেল—

'তিমির হৃদয়-বিদারণ, জলদগ্নি নিদারুণ।
জয় সঙ্কট সংহর। শঙ্কর। শঙ্কর।'

রক্ত-পাগলি বেটির পায়ের চাপে শিব আর্তনাদ করে উঠল। রক্ত-মশাল করে ভৈরবপন্থীর কণ্ঠ শোনা গেল আরো কাছে—

'বজ্র-ঘোষবাণী, রুদ্র শূলপাণি,
মৃত্যু-সিন্ধু-সন্তর। শঙ্কর ! শঙ্কর !'

আবার শিব মোচড় খেয়ে উঠল, কিন্তু শব তার বুকে চেপে।

মন্দির থরথর করে কাঁপতে লাগল। উলসিত বনানী ঝড়ের ফুঁ দিয়ে নাচতে লাগল।

কাপালিকের রক্ত-আঁখি দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আর দেরি নাই, ঐ আসে রক্ত-পূজার বলি। ছেড়ে দে বেটি, ছেড়ে দে শিবকে, কল্যাণকে উঠে দাঁড়াতে দে।

ইন্দ্রের বজ্রে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হতে লাগল।

মেঘ-ডম্বরুতে বোধনের বাজনা বাজতে লাগল।

বিজলি মেয়ের বজ্র-কড়া নাড়ার মতো বাইরে দস্যি মেয়ে কড়কড় করে কড়া নেড়ে হেঁকে উঠল, 'দোর খোলো, পূজা এসেছে।'

বাইরে ঝড়ের দোলার তালে তালে ভৈরবপন্থীর দল নাচতে লাগল—

'কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।'

ঝনঝন শব্দে মন্দির-দ্বার খুলে গেল। কাপালিক বেরিয়ে এল, নয়নে তার দারুণ হিংসা-বহ্নি, স্কন্ধে তার বিজয়-কৃপাণ। মন্দিরের অঙ্গনে নৃত্য চলতে লাগল—

'তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।' ভৈরবী হাঁকলে, 'আর দেরি কি ?'

* * *

বনানী তেমনি দোলে—দোলে—দোলে। একটা কাৎরানি, একটা ব্যথিতার ক্রন্দনের মতো কি যেন দোলে—দোলে বনানীর পাগলামিতে।

কখন পূজা শেষ হয়ে গেছে। কখন ঘণ্টা বাজল, কখন বলি দেওয়া হলো, তা কেউ জানলে না। শুধু মন্দিরের শুভ্র বেদী রক্তে ভেসে গেছে। শব-পাগলি বেটির চরণ শিবের বুক থেকে শিথিল হয়ে যেন নামতে চাইছে। বেটির পায়ে একরাশ কাঁচা হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করছে, যেন সদ্য-ছিন্ন রক্ত-জবার জীবন্ত কাৎরানি।

একরাশ ছিন্ন-মুণ্ড খেপি বেটির পানে ছলছল চোখে তখনো তাকাচ্ছে।

আকাশ থেকে অগ্নিরথ নেমে এল। বলিদানের তরুণরা আতে চড়ে যখন উর্ধ্বে—উর্ধ্বে—আরো উর্ধ্বে উঠে যেতে লাগল, তখন বন্য মেয়ে কাপালিক-কন্যারও দুই গণ্ড বেয়ে টস্‌টস্ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সে করুণ-কণ্ঠে আর একবার জিজ্ঞাসা করল,—'পথিক ! তুমি পথ হারাইয়াছ?' তারপর শঙ্করী বেটির রক্ত-মাখা পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কাপালিকের খড়গ আর একবার নৃত্য করে উঠল। ভৈরবী শুধু বললে, 'মা !'

এবার করালী বেটির অশ্রুহীন চোখেও অশ্রুপুঞ্জ দুলে উঠল।

ততক্ষণে অগ্নি-রথ যাত্রীদলের উত্তর ভেসে এল, 'পথ হারাই নাই দেবী ! ঐ খড়গ-চিহ্নিত রক্ত-পথই শিব জাগাবার পথ।'

আমি সৈনিক

এখন দেশে সেই সেবকের দরকার যে-সেবক সৈনিক হতে পারবে।

সেবার ভার নেবে নারী কিংবা সেই পুরুষ যে-পুরুষের মধ্যে নারীর করুণা প্রবল। নারীর ভালোবাসা আর পুরুষের ভালোবাসা বিভিন্ন রকমের। নারীর ভালোবাসায় মমতা আর চোখের জলের করুণাই বেশি। পুরুষের ভালোবাসায় আঘাত আর বিদ্রোহই প্রধান।

দেশকে যে নারীর করুণা নিয়ে সেবা করে, সে পুরুষ নয়, হয়তো মহাপুরুষ। কিন্তু দেশ এখন চায়, মহাপুরুষ নয়। দেশ চায়, সেই পুরুষ যার ভালোবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে। যে দেশকে ভালোবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না, সে দরকার হলে আঘাতও করবে, প্রতিঘাতও বুক পেতে নেবে, বিদ্রোহ করবে। বিদ্রোহ করা আঘাত করার পশুত্ব বা পৈশাচিকতাকে যে অনুভূতি নিষ্ঠুরতা বলে দোষ দেয় বা সহ্য করতে পারে না, সেই অনুভূতিই হচ্ছে নারীর অনুভূতি, মানুষের ঐটুকুই হচ্ছে দেবত্ব। যারা পুরুষ হবে, যারা দেশ-সৈনিক হবে, তাদের বাইরে ঐ পশুত্বের বা অসুরত্বের বদনামটুকু সহ্য করে নিতে হবে। যে-ছেলের মনে সেবা করবার, বুকে জড়িয়ে ধরে ভালোবাসার ইচ্ছাটা জন্মগত প্রবল, তার সৈনিক না হওয়াই উচিত। দেশের দুঃখ-আর্ত-পীড়িতদের সেবার ভার এই সব ছেলেরা খুব ভালো করেই করতে পারবে। যেমন উত্তর-বঙ্গের বন্যা-

পীড়িতদের সেবা সাহায্য। বাংলার ত্যাগী ঋষি প্রফুল্লচন্দ্র আজ মায়ের মমতা নিয়ে দু'হাতে অন্নবস্ত্র বিলোচ্ছেন, এরূপ জগদ্ধাত্রীর, এরূপ অন্নপূর্ণার, এরূপ এ মূর্তি তো রুদ্রের নয়, প্রলয়ের দেবতার চোখে এমন মায়ের করুণা ক্ষরে না। এই যে হাজার হাজার ছেলেরা এই আর্তদের সেবার জন্য দু'বাহু বাড়িয়ে ছুটেছে, এ-ছোটা যে মায়ের ছোটা, এ-করুণা, এ-সেবা-প্রবণতা নারীর, দেবতার। আমরা এঁদের পূজা করি, কিন্তু এতে তো দেশের বাইরের মুক্তি স্বাধীনতা আনবে না। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, প্রফুল্ল বাংলার দেবতা, তাঁদের পূজার জন্য বাংলার চোখের জল চির-নিবেদিত থাকবে। কিন্তু সেনাপতি কই? সৈনিক কোথায়? কোথায় আঘাতের দেবতা, প্রলয়ের মহারুদ্র? সে-পুরুষ এসেছিল বিবেকানন্দ, সে-সেনাপতির পৌরুষ হুঙ্কার গর্জে উঠেছিল বিবেকানন্দের কণ্ঠে।

ওরে আমার ভারতের সেরা, আগুন খেলার সোনার বাংলো! কোথায় কোন্ অগ্নিগিরির তলে তোর বুকের অগ্নি-সিন্ধু নিস্তব্ধ নিস্পন্দ হয়ে পড়ল? কোন্ অলস-করা করুণার দেবতার বাঁশির সুরে সুরে তোর উত্তাল অগ্নি-তরঙ্গ-মালা স্তব্ধ-নিথর হয়ে পড়ল? কোথায় ভীমের জন্মদাতা পবন? ফুঁ দাও, ফুঁ দাও এই নিবন্ত অগ্নি-সিন্ধুতে, আবার এর তরঙ্গে তরঙ্গে নিযুত নাগ-নাগিনীর নাগ-হিন্দোলা উলসিয়া উঠুক। ওগো করুণার দেবতা, প্রেমের বিধাতা, বাঁশির রাজা। তোমরা মুক্ত বিশ্বের, তোমরা এ ঘুমন্ত দাস—অলস ভারতের নও। এই অলস জাতিকে তোমাদের সুরের অশ্রুতে আরো অলস-উতল করে তুলো না। তোমাদের সুরের কান্নায় কান্নায় এদের অলস আর্ত আত্মা আরো কাতর, আরো ঘুম-আর্দ্র হয়ে উঠল যে, এ সুর তোমাদের থামাও। আঘাত আনো, হিংসা আনো, যুদ্ধ আনো, এদেরে এবার জাগাও, কান্না-কাতর আত্মাকে আর কাঁদিয়ো না। আমরা যে আশা করে আছি, কখন সে মহা-সেনাপতি আসবে যার ইঙ্গিতে আমাদের মতো শত কোটি সৈনিক বহ্নি-মুখ পতঙ্গের মতো তার ছত্রতলে গিয়ে 'হাজির হাজির' ব'লে হাজির হবে। হে আমার অজানা প্রলয়ঙ্কর মহা-সেনানী, তোমায় আমি দেখি নাই, কিন্তু তোমার আদেশ আমি শুনেছি, আমি শুনেছি। আমায় যুদ্ধ-ঘোষণার যে তূর্য-বাদনের ভার দিয়েছ, সে ভার আমি মাথা পেতে নিয়েছি। এ যে তোমার হুকুম। সাধ্য কি, আমি তার অমান্য করি? হে আমার অনাগত অব্যক্ত মহা-শক্তি! বাজাও, বাজাও, এমনি করে আমার কণ্ঠে তোমার প্রলয়-শিঙ্গা বাজাও! তোমার রণ-ভেরী আমারই ক্ষীণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠুক। ঘরের পরের সকল মার, সকল আঘাত যেন নির্বিকার চিত্তে, হাসিমুখে সহ্য করে আমি তোমারই দেওয়া তূর্যে যুদ্ধ-ঘোষণা করতে পারি। হে আমার অপ্রকাশ মহাবিদ্রোহী, তুমিই আমায় বল দিয়ো। যেদিন তুমি আসবে সেদিন যেন তোমারই পতাকা-তলে তোমার দেওয়া তরবারিকে, রক্ত-সৈনিক বেশে দাঁড়াতে পারি। সেদিন কলিজার শোণিত-মাখা তরবারি তোমার পদতলে অর্ঘ্য দিয়ে যেন তোমার রক্ত-আঁখির প্রসাদ-চাওয়ায় বঞ্চিত না হই। যখন দুশমনের বর্শা-ফলক আমার বুকে বিদ্ধ হয়ে আমায় সৈনিকের গৌরব-দীপ্ত মরণের অধিকারী করবে যখন আমার রক্ত-হীন দেহ ধুলায় লুটিয়ে পড়বে সেদিন তুমি বলো প্রভু, 'বৎস! তুমি আমার কর্তব্য করেছ।' মনে

করি, হয়তো এ তূর্য-বাদনের শক্তি আমার নাই, কিন্তু ছাড়তে তো পারি না, তোমার অব্যক্ত-শক্তি, আমায় ছাড়তেও দেয় না, পিছুতেও দেয় না। সে ক্রমেই অগ্রে, আরো অগ্রে, ঠেলে নিয়ে যায়। আমার অসম্পূর্ণতা আমার অপ্রকাশ যা তোমার চোখে ক্ষমার, তা যে অন্যের চক্ষে অপরাধের প্রভু। আমার বিদ্রোহের মাঝে যেটুকু অহঙ্কার, শুধু সেইটুকু আমার হোক, তুমি শুধু বলো—আমার কণ্ঠে এসে বলো—'এ বিদ্রোহ আমার।'

ঐ অহঙ্কারের দুর্নামটুকু আমি মাথা পেতে নিতে পারি, সেই শক্তি আমায় দাও। আমার মাঝে বিদ্রোহী বেশে যখন এলে, হে আমার অনাগত মহাবিদ্রোহী বিপুল শক্তি, তখন তো বুঝিনি যে আমায় শুধু বাইরের আঘাত, ঘরের মারটুকুর অধিকারী করে নিলে, তখন তো বুঝিনি যে, এই বিদ্রোহের প্রসাদ, এর কল্যাণ-ক্ষীরটুকু তোমার। আজ শুধু ডাকছি আর ডাকছি, আমায় এবার তোমার যুদ্ধ পতাকা-তলে ডেকে নাও, মরণের মাঝে ডেকে নাও। আমায়-দেওয়া তোমার তূর্য-কেতন অন্য সৈনিককে দাও।

সেবার মাঝে আমায় সাড়া দিবার অধিকারী করলে না। বললে,—

'আর্তের অশ্রুমোচন আমার নয়, আমার রণ-তূর্য। আমি প্রলয়ের, আমি প্রেমের নই। আমি রুদ্রের, আমি করুণার নই। আমি সেবার নই, আমি যুদ্ধের। আমি সেবক নই, আমি সৈনিক। আমি পূজার নই। আমি ঘৃণার। আমি অবহেলার, আমি অপমানের। আমি দেবতা নই, আমি হিংস্র, বন্য, পশু। আমি সুন্দর নই, আমি বীভৎস। আমি বুকে নিতে পারি না, আমি আঘাত করি। আমি মঙ্গলের নয়, আমি মৃত্যুর। আমি হাসির নয়, আমি অভিশাপের।' হে আমার মাঝের তিক্ত শক্তি, রুদ্র-জ্বালা, বিষ-দাহন। হে আমার যুগে-যুগে নির্মম নিষ্ঠুর সৈনিক-আত্মা, তোমায় আমি যেন প্রশংসার লোভে খাটো না করি। তোমাকে দেবতা বলে প্রকাশ করবার ভণ্ডামি যেন কোনোদিন আমার মাঝে না আসে। আমি নিজে যতটুকু, ঠিক ততটুকুই যেন প্রকাশ করি। যুগে-যুগে পশু-আমার সৈনিক-আমার জয় হউক ! !

রুদ্র-মঙ্গল

রুদ্র-মঙ্গল

নিশীথ রাত্রি। সম্মুখে গভীর তিমির। পথ নাই। আলো নাই। প্রলয়-সাইক্লোনের আর্তনাদ মরণ-বিভীষিকার রক্ত-সুর বাজাচ্ছে। তারই মাঝে মাকে আমার উলঙ্গ করে টেনে নিয়ে চলেছে আর চাবকাচ্ছে যে, সে দানবও নয়, দেবতাও নয়, রক্ত-মাংসের মানুষ। ধীরে ধীরে পিছনে চলেছে তেত্রিশ কোটি আঁধারের যাত্রী। তারা যতবার আলো জ্বালাতে চায়, ততবারই নিভে নিভে যায়। তাদের আর্তকণ্ঠে অসহায়ের ক্রন্দন, 'বোধন না হতে মঙ্গলঘট ভেঙেছে—'। শুধু ক্রন্দন, শুধু হা-হুতাশ—শক্তি নাই, সাহস নাই।

কোথায় আঘাতের দেবতা। আঘাত কর, আঘাত কর তাদেরে, যারা চোখের সামনে মায়ের অপমান দেখে শুধু ক্রন্দন করে, প্রতিকারের পন্থার অন্বেষণে উন্মত্ত উল্লাসে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে না! অবমানিত হয়ে যাদের চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত না হয়ে অশ্রুজল নির্গত হয়, তাদেরে আঘাত কর, আঘাত কর হে আঘাতের দেবতা! মারো তাদের বুকে মুখে পিঠে—মারো তাদেরে। জাগাও তাদের আত্মসম্মান। পৌরুষ তাদের হুঙ্কার দিয়ে পড়ুক অত্যাচারের বুকে।

এ কি বেদনা! এ কি ক্রন্দন! উৎপীড়িতের আর্তনাদে, 'মজলুমের ফরিয়াদে' আকাশের সারা গায়ে আজ জ্বালা, বাতাসের নিঃশ্বাসে ব্যথা, মাতা বসুমতীর বুক ফেটে নির্গত হচ্ছে অগ্নিস্রাব আর ভস্মধূম। অত্যাচারীর ভীম নিষ্পেষণে বাসুকীর অচল ফণা থরথর করে কাঁপছে, এই ভূমিকম্পের কম্পিতা ধরণীকে অভয়-তরবারি এনে সান্ত্বনা দেবে, কে আছ বীর? আন তোমার প্রলয়-সুন্দর করাল-কমনীয় হস্ত। আনো তোমার রক্ত-কৃপাণের বিদ্যুৎ-হাসি, আনো তোমার মারণ-মঙ্গল অভয়-অসি! হে আমার ধ্বংসের দেবতা, একবার এই মহাপ্রলয়ের বুকে তোমার ফুলের হাসি দেখাও! স্তূপীকৃত শবের মাঝে শিবের জটার কচি শশী হেসে উঠুক! এই কুৎসিত অসুন্দর সৃষ্টিকে নাশ কর, নাশ কর হে সুন্দর রুদ্র-দেবতা! এই গলিত আর্ত সৃষ্টির প্রলয়-ভস্মটিকা পরে নবীন বেশে এসে দেখা দাও!

জাগো জনশক্তি! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা! তোমার হাতের এ-লাঙল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের মতো ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক—উলটে ফেলুক! আন তোমার হাতুড়ি, ভাঙ ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ—ধুলায় লুটাও অর্থ-পিশাচ বল-দর্পীর শির। ছোড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্ত-মাখা লালে-লাল ঝাণ্ডা! যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের তোমরা পায়ের

তলায় আন। সকল অহঙ্কার তাদের চোখের জলে ডুবাও। নামিয়ে নিয়ে এস ঝুঁটি ধরে ঐ অর্থ-পিশাচ যক্ষগুলোকে। তোমাদের পিতৃ-পুরুষের রক্ত-মাংস-অস্থি দিয়ে ঐ যক্ষের দেউল গড়া, তোমাদের গৃহলক্ষ্মীর চোখের জল আর দুধের ছেলের হৃৎপিণ্ড নিঙড়ে তাদের ঐ লাবণ্য, ঐ কান্তি। তোমাদের অভিশাপ-তিক্ত মারি-বিষ-জ্বালা লাগিয়ে তাদের সে-কান্তি, সে-লাবণ্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দাও! বল নির্জিত ভাইরা আমার, বল উৎপীড়িত বোনেরা আমার, বল বেদনাতুর অভাব-ক্লিষ্ট নর-নারী—

'জয় ভৈরব জয় শঙ্কর
জয় জয় প্রলয়ঙ্কর
শঙ্কর! শঙ্কর!

মারো তোমার ত্রিশূল ছুঁড়ে, দুলাও তোমার সর্বনাশের ঝাণ্ডা, কে আছ ভৈরব-পন্থী নর-নারী, আর হাঁকো—হাঁকো,—

'জয় ভৈরব জয় শঙ্কর
জয় জয় প্রলয়ঙ্কর
শঙ্কর! শঙ্কর!'

আমার পথ

'আমার এই যাত্রা হল শুরু
ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।'

'মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে' 'জয় প্রলয়ঙ্কর' বলে 'ধূমকেতু'কে রথ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হল। আমার কর্ণধার আমি। আমায় পথ দেখাবে আমার সত্য। আমার যাত্রা-শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি—নমস্কার করছি আমার সত্যকে। যে-পথ আমার সত্যের বিরোধী, সে পথ ছাড়া আর কোনো পথই আমার বিপথ নয়! রাজভয়—লোকভয় কোনো ভয়ই আমায় বিপথে নিয়ে যাবে না। আমি যদি সত্যি করে আমার সত্যকে চিনে থাকি, আমার অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকে, তা হলে বাইরের কোন ভয়ই আমার কিছু করতে পারবে না। যার ভিতরে ভয়, সে-ই বাইরে ভয় পায়। আমার বিশ্বাস, যে নিজেকে চেনে, তার আর কাউকে চিনতে বাকি থাকে না। অতএব যে মিথ্যাকে চেনে, সে মিছামিছি তাকে ভয়ও করে না। যার মনে মিথ্যা, সে-ই মিথ্যাকে ভয় করে। নিজকে চিনলে মানুষের মনে আপনা-আপনি এত

বড় একটা জোর আসে যে, সে আপন সত্য ছাড়া আর কারুকখে কুর্নিশ করে না—অর্থাৎ কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না। এই যে নিজকে চেনা আপনার সত্যকে আপনার গুরু, পথ-প্রদর্শক কাণ্ডারি বলে জানা, এটা দম্ভ নয়, অহঙ্কার নয়। এটা আত্মকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি। আর যদিই এটাকে কেউ ভুল করে অহঙ্কার বলে মনে করেন, তবু এটা মন্দের ভালো—অর্থাৎ মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভালো। অনেক সময় খুব বেশি বিনয় দেখাতে গিয়ে নিজের সত্যকে অস্বীকার করে ফেলা হয়। ওতে মানুষকে ক্রমেই ছোট করে ফেলে, মাথা নীচু করে আনে। ও রকম মেয়েলি বিনয়ের চেয়ে অহঙ্কারের পৌরুষ অনেক—অনেক ভালো।

অতএব এই অভিশাপ-রথের সারথির স্পষ্ট কথা বলাটাকে কেউ যেন অহঙ্কার বা স্পর্ধা বলে ভুল না করেন।

স্পষ্ট কথা বলায় একটা অবিনয় নিশ্চয় থাকে ; কিন্তু তাতে কষ্ট পাওয়াটা দুর্বলতা। নিজকে চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির উপর অটুট বিশ্বাস আসে। এই স্বাবলম্বন, এই নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস করতেই শিখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধীজী। কিন্তু আমরা তাঁর কথা বুঝলাম না, 'আমি আছি' এই কথা না বলে সবাই বলতে লাগলাম, 'গান্ধীজী আছেন।' এই পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেললে। একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব। অন্তরে যাদের এত গোলামির ভাব, তারা বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পাবে কি করে? আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যিই আমাদের আসবে, সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব, তার আগে কিছুতেই নয়। নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে অন্য একজন মহাপুরুষকে প্রাণপণে ভক্তি করলেই যদি দেশ উদ্ধার হয়ে যেত, তা হলে এই তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ এতদিন পরাধীন থাকত না। আত্মকে চেনা নিজের সত্যকে নিজের ভগবান মনে করার দম্ভ—আর যাই হোক, ভণ্ডামি নয়। এ-দম্ভতে শির উঁচু করে, পুরুষ করে, মনে একটা 'ডোন্ট কেয়ার'-ভাব আনে। আর যাদের এই তথাকথিত দম্ভ আছে, শুধু তারাই অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

এ-'ধূমকেতু' ঝগড়া-বিবাদ আনবে না, তবে প্রলয় যদিই আনে, তা হলে সেটার জন্যে দায়ী ধূমকেতুর দেবতা,—সারথি নয়। এ-দেশের নাড়িতে-নাড়িতে অস্থি-মজ্জায় যে পচন ধরেছে, তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না। যার ভিত্তি পচে গেছে, তাকে একদম উপড়ে ফেলে নতুন করে ভিত্তি না গাঁথলে তার ওপর ইমারত যতবার খাড়া করা যাবে, ততবারই তা পড়ে যাবে। প্রলয় আনার যে দুর্দম অসম-সাহসিকতা, 'ধূমকেতু' যদি তা না আনতে পারে, তবে তাতে অমঙ্গলের চেয়ে মঙ্গলই আনবে বেশি।

দেশের যারা শত্রু, দেশের যা-কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি তা সব দূর করতে 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনা। 'ধূমকেতু'র এমন গুরু বা এমন বিধাতা কেউ নেই, যার খাতিরে সে সত্যকে অস্বীকার করে কারুর মিথ্যা বা ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেবে। 'ধূমকেতু' সে-দাসত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। 'ধূমকেতু' কোনো দিনই কারুর বাণীকে বেদবাক্য

বলে মেনে নেবে না, যদি তার সত্যতা প্রাণে তার সাড়া না দেয়। না বুঝে বোঝার ভণ্ডামি করে পাঁচ জনের শ্রদ্ধা আর প্রশংসা পাবার লোভ 'ধূমকেতু' কোন দিনই করবে না।

ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোন ভুল করছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেবো! কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গোঁ বজায় রাখবার জন্যে ভুলটাকে ধরে থাকব না। তা হলে 'ধূমকেতু'র আগুন সেই দিনই নিবে যাবে। একমাত্র মিথ্যার জলই 'ধূমকেতু'-শিখাকে নিবাতে পারবে। তা ছাড়া ধূমকেতুকে কেউ নিবাতে পারবে না।

'ধূমকেতু' কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোন্‌খানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কোনো হিংসার দুশ্‌মনির ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।

... দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর বা সত্য, শুধু তাই লক্ষ্য করে এই আগুনের ঝাণ্ডা দুলিয়ে পথে বাহির হলাম।

'জয় প্রলয়ঙ্কর'

মোহর্‌রম

ফিরে এসেছে আজ সেই মোহর্‌রম—সেই নিখিল-মুসলিমের ক্রন্দন-কাৎরানির দিন। কিন্তু সত্য করে আজ কে কেঁদেছে বলতে পার হে মুসলিম? আজ তোমার চোখে অশ্রু নাই। আজ ক্রন্দন-স্মৃতি তোমার উৎসবে পরিণত! তোমার অশ্রু আজ ভণ্ডামি, ক্রন্দন আজ কৃত্রিম কর্কশ চিৎকার। 'হায় হাসান, হায় হোসেন!' বলে মিথ্যা বীভৎস চিৎকার করে আর মা ফাতেমার পুত্র-শোকাতুর আত্মাকে পীড়িত করে তুলো না। এ ক্রন্দন-অভিনয় দেখিয়ে আল্লার মুখ আর কালো করে দিয়ো না। তোমাদের ঐ যে উদ্দাম বুক-চাপড়ানির বীভৎসতা, সে ব্যর্থ হয়নি ভীরুর দল। সে-আঘাত আল্লার হাবিব হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বুকে গিয়ে বেজেছে। যাঁরা ধর্মের জন্যে সত্যের জন্যে জান কোরবান করেছেন, আজ সেই শহীদ বীরদের জন্যে ক্রন্দন-অভিনয় করে আর তাঁদের আত্মার অপমান করো না, নৃশংস অভিনেতার দল। তোমার ধর্ম নাই, অস্তিত্ব নাই, তোমার হাতে শমশের নাই, শির নাঙ্গা, তোমার কোরআন পর-পদদলিত, তোমার গর্দানে গোলামির জিঞ্জির, যে শির আল্লার আরশ ছাড়া আর কোথাও নত হয় না, সেই শিরকে জোর করে সেজ্‌দা করাচ্ছে অত্যাচারী শক্তি—, আর তুমি করছ আজ সেই শহীদদের—ধর্মের জন্য স্বাধীনতার জন্য শহীদের—'মাতমের অভিনয়! আফ্‌সোস মুসলিম! আফ্‌সোস!!

কোথায় কারবালা-মাতম তা কি দেখেছ, অন্ধ? একবার চোখ খুলে দেখ, দেখবে কোথায় কারবালার দুপুরে মাতম হাহাকার-রবে ক্রন্দন করে ফিরছে। আজ কারবালা শুধু আরবের ঐ ধূ-ধূ সাহারার বুকে নয়, ঐ ফোরাত নদীর কূলে নয়—আজ কারবালার হাহাকার ঐ নিখিল নিপীড়িত মুসলিমের বুকের সাহারায়, তোমার অপমান-জর্জরিত অশ্রু-নদীর কূলে কূলে।

মা ফাতেমা আরশের পায়া ধরে কাঁদছেন, স্কন্ধে তাঁর হাসানের বিষ-মাখা নীল পিরান আর হোসেনের খুন-মাখা রক্ত-উত্তরীয়। পুত্র-হারার আকুল ক্রন্দনে খোদার আরশ কেঁপে উঠছে। হে যুগে-যুগে শোক-অভিনেতা মুসলিমের দল! থামাও—থামাও মা ফাতেমার ক্রন্দন—থামাও আল্লার আরশের ভীতি-কম্পন। তোমার স্বাধীনতাকে তোমার সত্যকে তোমার ধর্মকে যে-এজিদের বংশধরেরা লাঞ্ছিত নিপীড়িত করছে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের ভূ-অবলুণ্ঠিত শির উঁচু হয়ে উঠুক। তোমার ইসলামকে অক্ষতদেহ উন্নত-শির করে রাখ, তোমার স্বাধীনতা তোমার সত্যকে রক্ষা কর, দেখবে পুত্র-শোকাতুরা জননী মা ফাতেমার ক্রন্দন থেমে গিয়েছে, আল্লার আরশের কম্পন থেমেছে। ঐ শোন কাসেমের অতৃপ্ত আত্মা ফরিয়াদ করে ফিরছে—'তৃষ্ণা, তৃষ্ণা!' কে দেবে এ-তৃষ্ণাতুর তরুণকে তৃষ্ণার জল? এ-তৃষ্ণা আবে-জমজম আবে-কওসরেও মিটবার নয়। এ-কারবালার মরু-দগ্ধ পিয়াসী চায় নিখিল-মুসলিম তরুণের রক্ত, ধর্ম আর স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে প্রাণ-বলিদান। কে আছ অরুণ-খুনের তরুণ শহীদ মুসলিম, কাসেমের এ-তৃষ্ণা এ-ক্রন্দন-তিক্ততা মেটাবে?

ঐ শোনো সদ্য স্বামীহারা বালিকা সকিনার মর্মভেদী ক্রন্দন, সে চায় না তার স্বামী কাসেমের প্রাণ, সে চায় ইসলামের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্যে কাসেমের মত প্রাণ-বলিদান।

আজ নিখিল মুসলিম-অঙ্গন তোমার কারবালা-প্রান্তরে হে মুসলিম! তার মাঝে আকুল অবিশ্রাম ক্রন্দন গুমরে ফিরছে—'তৃষ্ণা—তৃষ্ণা!'

আল্লার পানে তাকাও, রসূলের দিকে চেয়ে দেখ, মা ফাতেমা, হজরত আলীর মাতম শোনো, কাসেমের, সকিনার—অতৃপ্তির আকুল কাঁদন-রণরণি শোনো, কচি শিশু আসগরের তীর-বেঁধা কাঁচা কলিজার খুন-খারাবির কথা স্মরণ কর, আর তোমার কর্তব্য নির্ধারণ কর, হে মুসলিম! মোহরমের খুন-খারাবি আজ তোমার লক্ষ্য স্থির করে দিল।

বিষ-বাণী

মাভৈঃ! মাভৈঃ!! ভয় নাই, ভয় নাই—ওগো আমার বিষ-মুখ অগ্নি-নাগ-নাগিনীপুঞ্জ! দোলা দাও, দোলা দাও তোমাদের কুটিল ফণায় ফণায়। তোমাদের যুগ যুগ-সঞ্চিত কাল-বিষ আপন আপন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে ফেল। তোমাদের বিভূতি-বরণ অঙ্গ কাঁচা বিষের গাঢ় সবুজ রাগে রেঙে উঠুক। বিষ সঞ্চয় কর, বিষ সঞ্চয় কর—হে আমার

তিক্ত-চিত ভুজগ তরুণ দল ! তোমাদের ধরবে কে? মারবে কে? যে ধরতে আসবে, তার হাড়-মাংস খসে খসে পড়বে উগ্র বিষের দাহনে। কোন্ দুঃসাহসী বন্দী করবে তোমাদেরে? কারার লৌহদণ্ড দারুণ বিষ-দাহনে খসে গলে পড়বে। অত্যুগ্র নিশ্বাস-বহ্নিতে কারার কন্দরে-কন্দরে ধুধু ধুধু করে আগুন—আগুন জ্বলে উঠবে। তোমার তড়িৎ-জিহ্বার মুহূর্ত-ইঙ্গিতে জল্লাদের হাতের খড়গ টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে, ফাঁসির রজ্জু ভস্ম হয়ে যাবে। বিষ সঞ্চয় কর, হে আমার হলাহল-পুরবাসী কূট নাগ-নাগিনী-কুল। এত বিষ এমন বিষ—যা শুধু জ্যান্ত অবস্থাতেই অত্যাচারকে দগ্ধে মারবে না, মরবার পরও যে বিষ শাশ্বত সম-তেজা সম-উগ্র হয়ে থাকবে। নিদাঘ মধ্যাহ্নের তাপ-দগ্ধ রুদ্র-বৈশাখী ঝড়ে ঝড়ে চিতায়-ভস্মীভূত তোমাদের বিষ স্ফুলিঙ্গ উড়ে বেড়াবে দিগন্তের কোলে কোলে—গৃহীর প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, বলদর্পীর মহলে-মহলে। মা ডুকরে কেঁদে উঠবে, আর জ্বালায় শিশু-পুত্র তার আর্তনাদ করে করে নীল হয়ে, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে মাতৃক্রোড়ে মরতে থাকবে, যেমন কারবালার কচি শিশু আসগর 'তৃষ্ণা তৃষ্ণা' করে জহরমাখা তীর খেয়ে মরেছিল !

তোমাদের গোরস্থানে তোমাদের শ্মশানে বিষ-বায়ু দিনে ঘূর্ণিরূপে শিশ দিয়ে ঘুরে বেড়াবে, আর রাতে অনির্বাণ আলেয়া-শিখা হয়ে নেচে নেচে বেড়াবে। ওই শ্মশানে, ওই গোরস্তানে যে যাবে, সে আর জ্যান্ত ফিরে আসবে না।

মরেও তোমাদের বিষ যাবে না, প্রতি অস্থিকণায়, প্রতি মৃত্তিকা-পরমাণুতে তোমাদের উদ্গারিত কূট-হলাহল মিশ্রিত থাকবে। সে-অস্থি যার গায়ে বিঁধবে, সে-দগ্ধ মৃত্তিকার যার গায়ে ছোঁওয়া লাগবে সে তখনি বিষ-জর্জরিত, ভস্ম হয়ে যাবে। চাই এত জ্বালাময় হলাহল, এমনি মারিভয়-হানা মারিবিষ। তোমাদের দেহ হবে সহস্র বৃশ্চিক-যুক্ত কোটি হুল-বহুল। যে তোমাদের বাঁধতে আসবে, ঐ সহস্র বৃশ্চিক-যুক্ত কোটি হুল এক সাথে তাকে উগ্র রোষে দংশন হানবে।

* * *

আমাদের কাছে প্রেম ভণ্ডামি, করুণা বিদ্রূপ, প্রণয় কশাঘাত, প্রীতি ভীরুতা।

আমাদের বিবাহের লাল চেলি দেশশত্রুর আঘাত-রক্ত-রাঙা উত্তরীয়, ফাঁসির রশি আমাদের প্রিয়ার ভুজবন্ধন।

শব দেখে আমাদের গৃহত্যাগ, রক্ত-ঝরা প্রাণ, ঝাঁজরা-করা বক্ষ নিয়ে রণাঙ্গনে আমাদের আরাম-শয়ন। বুকে প্রতিদ্বন্দ্বীর বেয়নেটের সঙ্গীন-ঘাত, সে যেন আমাদের মাতৃহারা পুত্রের অভিমান-মার। স্কন্ধে ঘাতকের ভীম খড়গাঘাত, সে যেন আমাদের প্রিয়ার কোল হতে দুষ্টু আদরিণী মেয়ের ঝাঁপিয়ে পড়া।

আমরা অবিনশ্বর। আমাদের একজন যায়, একশো জন আসে। আমাদের একবিন্দু রক্ত ভূতলে পড়লে একলক্ষ বিদ্রোহী নাগশিশু বসুমতী বিদীর্ণ করে উঠে আসে। আমরা

অদম্য। আমাদের একজন বাঁধা পড়লে একশো জন ছাড়া পায়, সহস্র ভুজগ ছুটে এসে তার স্থান পূর্ণ করে।

আমরা দেশ-শত্রু বিভীষণের মহাকালান্তক কাল। আমরা অকাট্য ব্রহ্মশাপ! পরীক্ষিতের মত, লখিন্দরের মত দুর্ভেদ্য ছিদ্রহীন দুর্গের মধ্যে থাকলেও দেশবিদ্রোহীকে আমরা তক্ষক হয়ে, সূত্ররূপী কালসাপ হয়ে দংশন করি।

আমাদের বিদ্রোহ যারা দেশ জয় করেছে তাদের উপর নয়, আমাদের বিদ্রোহ দেশদ্রোহীদের উপর। যখন আইরিশ তরুণ দেশদ্রোহী রবার্ট এমেটকে ফাঁসি দিয়ে তাকে তিন খণ্ড করে কেটে রাস্তার মোড়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল এবং তার সেই খণ্ডিত দেহে লেখা হয়েছিল, 'How a traitor should be treated'—দেখো, দেশদ্রোহীর দুর্দশার কথা স্মরণ করো, হে দেশদ্রোহী মাতৃহন্তা বিভীষণের দল।

তোমাদের নামে শেষ ঘণ্টা বেজেছে মায়ের রক্ত-মন্দির অঙ্গনে। তোমাদের বিরুদ্ধে অসুর-নাশিনী দনুজ-দলনী মা-র রক্ত-তৃষাতুর জিহ্বা লক-লক করে উঠেছে।

এসো আমার মণিহারা কালফণীর দল, তোমাদের প্রেমের কেতকী-কুঞ্জ ছেড়ে, অন্ধকার বিবর ত্যাগ করে, এসো মায়ের আমার শ্মশান-শায়িত আঘাত-জর্জরিত মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে। হয় মৃত্যু-সঞ্জীবনী আনো, নয় ভালো করে চিতাগ্নি জ্বলে উঠুক! বলো, মাভৈ! মাভৈ!! বলো—

হর হর শংকর
বলো, জয় ভৈরব জয় শংকর
জয় জয় প্রলয়ংকর
শংকর! শংকর!!

ক্ষুদিরামের মা

ক্ষুদিরামের ফাঁসির সময়ের একটা গানে আছে, ক্ষুদিরাম বলছে—

'আঠার মাসের পরে
জনম নেব মাসীর ঘরে, মা গো,
চিনতে যদি না পার মা
দেখবে গলায় ফাঁসি—'

সেই হারা-ক্রন্দনের আশ্বাস-গান শুনে আজো অতি বড় পাষাণী মেয়েরও চোখে জল আসে, গা শিউরে ওঠে। আমাদের মত কাপালিকেরও রক্ত-আঁখি আঁখির সলিলে টলটল করে ওঠে। কিন্তু বলতে পার কি দেশের জননীরা, আমাদের সেই হারা-ক্ষুদিরাম তোমাদের কার ঘরে এসেছে? তোমরা একবার তোমাদের আপন আপন ছেলের কণ্ঠের

পানে তাকাও, দেখবে—তাদের প্রত্যেকের গলায় ক্ষুদিরামের ফাঁসির নীল দাগ। ক্ষুদিরাম ছিল মাতৃহারা। সে কোন্ মাকে ডেকে আবার আসবে বলে আশ্বাস দিয়ে গেছে, কেঁদে গেছে, তা যদি বুঝতে বাংলার মা'রা, তা হলে তোমাদের প্রত্যেকটি ছেলে আজ ক্ষুদিরাম হত। ক্ষুদিরাম ছেলেবেলায় মা হারিয়ে—পেয়েছিল সারা দেশের মায়েদের। মায়ের স্নেহের ক্ষুধা তার মেটেনি, তোমাদের সকলকে মা বলে ডেকেও সে তৃপ্ত হয়নি, তাই আবার আসব বলে কেঁদে গেছে। এবার অভিমানী ছেলে মায়ের ঘরে আসবে না, মাসীর ঘরে আসবে। কিন্তু অভিমানী হলে কি হয়, ও ছিল বোকা ছেলে, তাই বুঝতে পারেনি যে, মাসীর ঘর বলে অভিমান করে যার ঘরে আসতে চেয়েছে, সেও যে মায়েরই ঘর।

মায়ের সাড়া পায় নাই, মারা তাকে কোলে নেয়নি, তাই অভিমানে সে আত্মবলিদান দিয়ে আত্ম-নির্যাতন করে মায়েদের অনাদরের প্রতিশোধ নিয়েছে। যাবার বেলায় দস্যি ছেলে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলে গেল না। হায় হতভাগা ছেলে! কার জন্যে সে কাঁদবে? যার জন্যে কাঁদবার কেউ নেই, তার চোখের জল যে লজ্জা, তার কাঁদাটাও যে অপমান। দস্যিছেলে সব চোখের জলকে কণ্ঠের নিচে ঠেলে রাখলে। ফাঁসি পরে নীলকণ্ঠ হবার আগেই ব্যথায় নীলকণ্ঠ হয়ে গেল। প্রাণের তিক্ত ক্রন্দনের জ্বালা তার কেউ দেখলে না, দেখলে শুধু কিশোর ঠোঁটের অপূর্ব হাসি। ফাঁসি হতে আর দুচার মিনিট বাকি, তখনও সে তার নিজের ফাঁসির রশির সমালোচনা নিয়ে ব্যস্ত যে, ফাঁসির রজ্জুতে মোম দেওয়া হয় কেন! তোমরা কি ভাবছ মা যে, কি সাংঘাতিক ছেলে বাপু! কিন্তু ছেলে যতই সাংঘাতিক হোক, সত্যি করে বল দেখি, ঐ মাতৃহারা তোমাদেরই মুক্তির জন্য ফাঁসিতে যাওয়ার কথা শোনার পরেও কি তোমরা নিজেদের দুলালদেরে বুকে করে শুয়ে থাকতে যন্ত্রণা পাও না? ঐ মাতৃহারা মরা লাশ কি তোমাদের মা ও ছেলের মধ্যে এসে শুয়ে একটা ব্যবধানের পীড়া দেয় না? নিজের ছেলেকে যখন আদর করে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় যাবতীয় সামগ্রী খাওয়াও, নিবিড় স্নেহে বুকে চেপে ধরে শুয়ে ঘুম পাড়াও, একটু অসুখ করলে তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে মাথা খোঁড়, তখন কি এই মাতৃহীন ক্ষুদিরামের কথা—তারই মত আরো সব লক্ষ্মীছাড়া মাতৃহারাদের কথা মনে হয়ে তোমাদের বুকে কাঁটার মত বেঁধে না? তোমাদের এত স্নেহ এত মায়া কি অনুশোচনায়, লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠে না? বল মা, উত্তর দাও! আজ ঐ ক্ষুদিরামের মত শত লক্ষ্মীছাড়া ছেলে এসে তোমাদেরে তোমাদের মাতৃহৃদয়ের নামে জিজ্ঞাসা করছে, উত্তর দাও! জানি, উত্তর দিতে পারবে না, মুখে কথা ফুটবে না। তুমি বলতে যাবে, কিন্তু অমনি তোমার মনের মা তোমার মুখ টিপে ধরবে।

মানুষের মন আর আত্মা এমনি বালাই যে, পরের দুঃখ দেখে তার নিজের ভোগ বিস্বাদ হয়ে ওঠে, বিশেষ করে মা-দের। মাতৃহারা এক পাশে দাঁড়িয়ে জল-ছলছল চোখে যদি চায়, তাহলে তোমার হাত উঠবে না তোমার ছেলের মুখে কিছু তুলে দিতে, আপনি শিথিল হয়ে যাবে। এটাও সওয়া যায়। কিন্তু যদি কোনো মাতৃহারা বিদ্রোহ করে কারুর কাছে কিছু না চায়, মাথা উঁচু করে কোনো মায়ের ঘরের পানে না তাকিয়ে তার

রুক্ষ কেশ লক্ষ্মীছাড়া মূর্তির রুদ্রকেতন উড়িয়ে চলে যায়, ডাকলেও ঘরের পানে তাকায় না, মায়ের ডাকে চোখ ছলছল না করে উল্টো আত্মনির্যাতন করে তোমাদের চোখের সামনে,—তাহলে মায়ের মন কেমন করে ওঠে বল দেখি? হে আমার দেশের জননীরা! তোমাদের কাছে এসেছে তেমনি বিদ্রোহী লক্ষ্মীছাড়া মাতৃহারার দল, তাদের হারানো ক্ষুদিরামকে খুঁজে নিতে। ভয় করো না, বিদ্রূপ করো না এদের মা, এরা ভিখারি ছেলে নয়। আমরা তোমাদের কাছে করুণা ভিক্ষা করতে আসিনি, আসবও না। আমরা এসেছি আমাদের দাবি নিয়ে, আমাদের হারানো ক্ষুদিরামকে ফিরে নিতে। সে যে আমাদের মাতৃহারার দলের, সে মায়ের দলের নয়।

ক্ষুদিরাম গেছে, কিন্তু সে ঘরে ঘরে জন্ম নিয়ে এসেছে কোটি কোটি ক্ষুদিরাম হয়ে। তোমরা চিনতে পারছ না, তোমরা মায়ায় আবদ্ধ। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাদের ক্ষুদিরামকে—তোমাদের ছেলেদের ছেড়ে দাও, ওরা আমাদের—আমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দলের। ওরা মায়েদের নয়, ওরা ঘরের নয়, ওরা বনের। ওরা হাসির নয়, ফাঁসির। ঐ যে কণ্ঠে হাত দিয়ে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরছ, ঐ কণ্ঠে ফাঁসির নীল দাগ লুকানো আছে। ওরা তোমার নয়, আমার নয়, ওরা দেশের, ওরা বলিদানের, ওরা পূজার!

কোথায় ভাই ক্ষুদিরাম? আঠার মাসের পরে আসবে বলে গেছ, এসেওছ হয়তো প্রতি ঘরে ঘরে। কিন্তু আঠার বছর যে কেটে গেল ভাই, সাড়া দাও সাড়া দাও আবার, যেমন যুগে যুগে সাড়া দিয়েছ ঐ ফাঁসি-মণ্ডপের রক্ত-মঞ্চে দাঁড়িয়ে। তোমার সাথে আমাদের বারবার দেখাশুনা ঐ ফাঁসি-পরা হাসিমুখে! আর একবার সাড়া দিয়েছিলে তুমি আয়ার্ল্যান্ডে রবার্ট এমেট নামে। সেদিনো এমনি তরুণ বয়সে তুমি ফাঁসির কৃষ্ণ-আলিঙ্গন, খড়্গের সুনীল চুম্বন পেয়েছিলে। হারা-প্রিয়া 'সারা'র আলিঙ্গনপরশ তোমার জন্য নয়, কমলার প্রসাদ তোমার জন্য নয়, তোমার প্রিয়ায় তুমি এমনি বারে বারে পাবে আবার বারে বারেই হারাবে, তোমার প্রিয়ার চেয়েও প্রিয়তম ঐ ফাঁসির রশি। কোথায় কোন্ মাতৃ-বক্ষে কোন্ 'সারা'র কোন্ কমলার কুঞ্জে আপন ভুলেছ, হে ক্ষুদিরামের জাগ্রত আত্মা! সাড়া দাও। সাড়া দাও! এস আব্যর ফাঁসিমঞ্চে, আর একবার নতুন করে আমাদের সেই চির-নূতন চির-পুরাতন গান ধরি—

'আঠার মাসের পরে,
জনম নেব মাসীর ঘরে, মাগো!
চিনতে যদি না পার মা,
দেখবে গলায় ফাঁসি!'

'ধূমকেতু'র পথ

অনেকেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছেন, 'ধূমকেতু'-র পথ কি? সে কী বলতে চায়? এর দিয়ে কোন মঙ্গল আসবে ইত্যাদি।

নীচে মোটামুটি 'ধূমকেতু'র পথ নির্দেশ করছি।

প্রথম সংখ্যায় ধূমকেতুতে 'সারথির পথের খবর' প্রবন্ধে একটু আভাস দিবার চেষ্টা করেছিলাম, যা বলতে চাই, তা বেশ ফুটে ওঠে নি মনের চপলতার জন্য। আজও হয়ত নিজেকে যেমনটি চাই তেমনটি প্রকাশ করতে পারব না, তবে এই প্রকাশের পীড়ার থেকেই আমার বলতে-না-পারা বাণী অনেকেই বুঝে নেবেন—আশা করি। পূর্ণ সৃষ্টিকে প্রকাশ করে দেখাবার শক্তি হয়ত ভগবানেরও নেই, কোনও স্রষ্টারও নেই। মানুষ অপ্রকাশকে আপন মনের পূর্ণতা দিয়ে পূর্ণ করে দেখে।

সর্বপ্রথম, 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।

স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লি করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ-দেশে মোড়লি করে দেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদেরে পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা-পুঁটলি বেধে সাগর-পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদেরো এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।

পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।

আর এই বিদ্রোহ করতে হলে—সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে,—

'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ!'

বলতে হবে,—

'যে যায় যাক সে, আমার হয়নি লয়!'

কথাটা শুনতে হয়তো একটু বড় রকমের হয়ে গেল। একটু সহজ করে বলবার চেষ্টা করি। আর এইটাই ধূমকেতুর সবচেয়ে বড় বলা।

আমি যতটুকু বুঝতে পারি, তার বেশি বুঝবার ভান করে যেন কারুর শ্রদ্ধা বা প্রশংসা পাবার লোভ না করি। তা সে মহাত্মা গান্ধীরই মতো হোক আর মহাকবি রবীন্দ্রনাথেরই মত হোক, কিংবা ঋষি অরবিন্দেরই মত হোক, আমি সত্যিকার প্রাণ থেকে যেটুকু সাড়া পাই রবীন্দ্র, অরবিন্দ বা গান্ধীর বাণীর আহ্বান ঠিক ততটুকু মানবো। তাঁদের বাণীর আহ্বান যদি আমার প্রাণে প্রতিধ্বনি না তোলে, তবে তাঁদের মানব না। এবং এই 'মানি না' কথাটা সকলের কাছে মাথা উঁচু করে স্বীকার করতে হবে। এতে হয়তো লোকের অনেক নিন্দা-বদনাম-অপবাদ শুনতে হবে, কিন্তু আমি আমার কাছে ঠিক থাকব। তাঁদেরে বা তাঁদের মত ঠিক না বুঝেও যদি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, আমি গান্ধী-ভক্ত, রবীন্দ্র-ভক্ত বা অরবিন্দ-ভক্ত, তাতে অনেকের শ্রদ্ধা প্রশংসা লাভ করবো, কিন্তু আসলে ত সেটা ফাঁকি দিয়ে নেওয়া। এতে অন্যকে প্রবঞ্চনা করে খুব বাহ্বা নিতে পারি, কিন্তু আমার অন্তরের দেবতা অর্থাৎ আমার আমি তাতে দিন দিন ক্লিষ্ট-পীড়িতই হয়ে উঠবে। অন্যায় করলে, পাপ করলে অন্তরে যে পীড়া উপস্থিত হয়, মানুষের সেইটুকুই সচেতন ভগবান, সেইটুকুই জাগ্রত সত্য।

সকলেরই অন্তরে এমন একটা কিছু আছে, যেটা মিথ্যা সইতে পারে না। তা নিজেরই হোক আর পরেরই হোক। সেটাকে সব সময় হয়তো জিদের বশে স্বীকার করি না, কিন্তু নিজেকে ত আর ফাঁকি দেওয়া চলে না।

যখন ফাঁকি দিয়ে লোকের কাছ থেকে বাহ্বা নিয়ে ঘরে ফিরি, তখন আমার ঐ বাহ্বা অর্জনের ফাঁকির কথা মনে হয়ে প্রাণে যেন কেমন এক অসোয়াস্তি কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে। ঐ অসোয়াস্তিই হচ্ছে অনুশোচনা বা অনুতাপ। যাকে সদাসর্বদা তার কৃতকর্মের বা হঠকারিতার জন্য এই রকম অনুশোচনা বা অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ হতে হয়, সে ক্রমেই ভীরু, কাপুরুষ হয়ে যেতে থাকে, সে তখন বাক্-সর্বস্ব হয়ে ওঠে। তা দিয়ে আর কোনো দিন কোনো বড় কিছুর আশা করা যায় না। আমাদের সকলের মধ্যে নিরন্তর এই ফাঁকির লীলা চলেছে। আর বাংলা হয়ে পড়েছে ফাঁকির বৃন্দাবন। কর্ম চাই সত্য, কিন্তু কর্মে নামবার বা নামাবার আগে এই শিক্ষাটুকু ছেলেদেরে, লোকদেরে রীতিমত দিতে হবে যে, তারা যেন নিজকে ফাঁকি দিতে না শেখে, আত্মপ্রবঞ্চনা করে করে নিজেকেই পীড়িত করে না তোলে।

আমি জীবনে অনেক আত্মপ্রবঞ্চনা করে করে অন্তরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছি, কত রাত্রি অনুশোচনায় ঘুম হয় নাই। এখন সে-সব ভুল বুঝতে পেরেছি। এখন সোজা এই বুঝেছি যে, আমি যা ভাল বুঝি, যা সত্য বুঝি, শুধু সেইটুকু প্রকাশ করবো, বলে বেড়াবো, তাতে লোকে নিন্দা যতই করুক, আমি আমার কাছে আর ছোট হয়ে থাকবো না, আত্ম-প্রবঞ্চনা করে আর আত্ম-নির্যাতন ভোগ করবো না।

যাঁকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে, তাঁকে বুঝবার ভান করলে তাঁকে অপমানই করা হয়। কারণ, পূজা মানে দেবতাকে সত্যি করে চিনে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া। যাঁকে

আমি সত্য করে বুঝতে পারিনি, তাঁকে পূজা করতে যাওয়া তাঁর অপমান করা। মিথ্যা মন্ত্রের উচ্চারণে দেবতা পীড়িতই হয়ে ওঠেন দিন দিন, প্রসাদ দেন না।

কিন্তু মানুষের এমনই দুর্বলতা যে, এই শ্রদ্ধা-প্রশংসা পাওয়ার লোভটুকুকে কিছুতেই সে জয় করতে পারছে না। সমাজ থেকে সমাজের শ্রদ্ধা লাভের জন্য তাকে জেনে-শুনে অনেক মিথ্যা আচরণ করতে হয়। 'ধূমকেতু' এখন এইটুকু প্রচার করতে চায় যে, দেশ-উদ্ধারের জন্য যারা সৈনিক হতে চায়, অন্তত তারা যেন সর্বাগ্রে এই দুর্বলতা, এই লোভটুকু জয় করবার ক্ষমতা অর্জন ক'রে তবে কোনো কাজে নামে। সত্যিকার প্রাণ না নিয়ে কাজে নামলে তাতে কাজ পণ্ডই হয় বেশি।

অনেকেই লোভের বা নামের জন্য মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে নেমেছিলেন। কিন্তু আত্ম-প্রবঞ্চনা নিয়ে নেমেছিলেন বলে অন্তর থেকে সত্যের জোর পেলেন না, আপনি সরে পড়লেন। রবীন্দ্র-অরবিন্দ-ভক্তদের মধ্যেও ঐ একই প্রবঞ্চনা-ফাঁকি এসে পড়েছে। এরা অন্ধভক্ত, চোখওয়ালা ভক্ত নয়, বীর-ভক্ত নয়। এরা বুঝেও বুঝে না যে, পূজার নামে এরা তাঁদেরে অপমান করছে, বড় করবার নামে তাঁদেরে লোকচক্ষুতে আরো খাটোই করে তুলছে। এদের এতটুকু দুঃসাহস নেই যে, যেটুকু বুঝতে পারছে না সেটুকু 'বুঝতে পারছি নি' বলে বুঝে নিতে, পাছে তাঁর গুরুর কাছে সে কম বুদ্ধিমান হয়ে পড়ে বা গুরুর রোষদৃষ্টিতে পড়ে। এসব অন্ধলোক দিয়ে কোনো কাজ হবে না। কেননা, অন্তরে মিথ্যা আর ফাঁকি নিয়ে কাজে নামলে কাজেও মস্ত ফাঁক পড়ে যায়। যাঁকে বুঝি না, যাঁর মত বুঝতে পারি না, তাঁর মুখের সামনে মাথা উঁচু করে বলতে হবে যে, আপনার মত বুঝতে পারছি নে বা আপনার এ-মত এই-এই কারণে ভুল। তাতে যিনি সত্যকার দেবতা, তিনি কখনই রুষ্ট হবেন না, বরং তোমার সরলতা ও সত্য-প্রিয়তার দুঃসাহসিকতার জন্য শ্রদ্ধাই করবেন। বিদ্রোহ মানে কাউকে না-মানা নয়, বিদ্রোহ মানে যেটা বুঝি না, সেটাকে মাথা উঁচু করে 'বুঝি না' বলা। যে-লোক তার নিজের কাজের জন্য নিজের কাছে লজ্জিত নয়, সে ক্রমেই উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে স্বর্গের পথে উঠে চলবেই চলবে। আর যাকে পদে পদে তার ফাঁকি আর মিথ্যার জন্য কুণ্ঠিত হয়ে চলতে হয়, সে ক্রমেই নিচের দিকে নামতে থাকে, এইটাই নরক-যন্ত্রণা। আমার বিশ্বাস, আত্মার তৃপ্তিই স্বর্গসুখ, আর আত্মপ্রবঞ্চনার পীড়াই নরক-যন্ত্রণা। 'ধূমকেতু'র মত হচ্ছে এই যে, তোমার মন যা চায়, তাই কর। ধর্ম, সমাজ, রাজা, দেবতা কাউকে মেনো না। নিজের মনের শাসন মেনে চল। গান্ধির মত যদি প্রাণ থেকে না মানতে পার, বাস, লোকের নিন্দা-বদনামের ভয়ে তা মেনো না, রবীন্দ্র-অরবিন্দের মত ঠিক মেনে নিতে পারছ না, বাস, মাথা উঁচু করে বল, 'বুঝতে পারছি না'। অন্ধ-ভক্তির অন্ধতায় যা বোঝ না তা 'বুঝি না' বল, দেখবে অপূর্ব তৃপ্তি-পুলকে আত্মা তোমার কানায় কানায় ভরে উঠছে। তখন নিন্দা-অপমান তোমার গায়ে লাগবে না।

ইংরেজের সহযোগিতা করে যদি দেশ উদ্ধার হবে তুমি প্রাণ হতে নিজকে ফাঁকি না দিয়ে বিশ্বাস কর, তবে তাই কর, কারুর নিন্দা ও অপবাদকে ভয় করো না। কিংবা যদি

তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করলে দেশের মুক্তি হবে না মনে কর, তাই বল বুক ফুলিয়ে। অত্যাচারীকে অত্যাচারী বল। তাতে আসে আসুক বাইরের নির্যাতন, ইংরাজের মার, তাতে তোমার অন্তরের আত্মপ্রসাদ আরো বেড়েই চলবে!

মিথ্যাকে মিথ্যা বললে, অত্যাচারীকে অত্যাচারী বললে যদি নির্যাতন ভোগ করতে হয়, তাতে তোমার আসল নির্যাতন ঐ অন্তরের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। প্রাণের আত্মপ্রসাদ যখন বিপুল হয়ে ওঠে, তখন নির্যাতকের আগুন ঐ আনন্দের এক ফুঁতে নিবে যায়। ইব্‌রাহিম যখন বিদ্রোহী হয়ে নমরুদের অত্যাচারকে অত্যাচার আর তার মিথ্যাকে মিথ্যা বলে প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন, তখন নমরুদ তাঁকে ধরে এক বিরাট অগ্নি-জাহান্নামের সৃষ্টি করে তাতে নিক্ষেপ করলে। কিন্তু ইব্‌রাহিমের কোথাও ফাঁকি ছিল না বলে সত্যের জোর ছিল বলে তাঁর আত্মপ্রসাদ ঐ বিপুল আনন্দের এক ফুঁতে সমস্ত জাহান্নাম ফুল হয়ে হেসে উঠল। ইব্‌রাহিমের মনে যদি এতটুকু ফাঁকি থাকত, তবে তখনই নমরুদের আগুন তাকে ভস্মীভূত করে দিত।

ভগবানের বুকে লাথি মারবার অসমসাহসিকতা নিয়ে বেরিয়েছিলেন মহাবিদ্রোহী ভৃগু। কেননা সে তাঁকে বোঝেনি, তাঁর ভুলকে ভুল বলে শোধরাবার চেষ্টা করেছিল, ভগবান যখন তা শুনলেন না, ঘুমিয়ে রইলেন তখন ভৃগু ভগবানের বুকে লাথি মেরে জাগালে। ভগবানও ভৃগুর পদ-চিহ্ন সগৌরবে বক্ষে ধারণ করলেন। ভাবতে চক্ষে জল আসে। কিন্তু ভগবানের যারা বিদ্রোহী নয়, গো-বেচারি ভক্ত, ভগবানকে প্রভু ভেবে জনম-জনম কাটিয়ে দিলে সাধনায়, তাদেরে হয়তো সিদ্ধি তিনি দিলেন, কিন্তু তাদের কারুর পদাঘাত বুকে ধারণ করে দেখালেন না। এর আসল মানে হচ্ছে, সত্যকে জানবার যার বিপুল সত্য ইচ্ছা থাকে, তার আঘাতও সত্য সহ্য করে, বুকে করে নিয়ে তার সত্য-নিষ্ঠা, সত্য জাগাবার আকাঙ্ক্ষাকে জগতের ভীরু কাপুরুষ ভণ্ড-ভক্তদের চোখের সামনে দেখায় যে, এই ফাঁকির পূজারীর ক্রন্দনে সত্য জাগে না। সত্যকে জাগাবার জন্য বিদ্রোহ চাই, নিজেকে শ্রদ্ধা-প্রশংসার লোভ থেকে রেহাই দেওয়া চাই।

মন্দির ও মসজিদ

'মারো শালা যবনদের!' 'মারো শালা কাফেরদের!'—আবার হিন্দু মুসলমানি কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তারপর মাথা-ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম—তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরাণীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি

পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে,—‘বাবা গো, মা গো !’—মাতৃ-পরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে !

দেখিলাম, হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল।

মন্দির-মসজিদের ললাটে লেখা এই রক্তকলঙ্ক-রেখা কে মুছিয়া ফেলিবে, বীর? ভবিষ্যৎ তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে !

সেই রুদ্র আসিতেছেন, যিনি ধর্ম-মাতালদের আড্ডা ঐ মন্দির-মসজিদ-গির্জা ভাঙিয়া সকল মানুষকে এক আকাশের গম্বুজ-তলে লইয়া আসিবেন।

জানি, স্রষ্টার আপনি-মোড়ল ‘প্রাইভেট সেক্রেটারি’রা হ্যাট খুলিয়া, টুপি তুলিয়া, টিকি নাচাইয়া আমায় তাড়না করিবে, তবু ইহাদের পতন হইবে। ইহারা ধর্ম-মাতাল। ইহারা সত্যের আলো পান করে নাই, শাস্ত্রের এল্‌কোহল পান করিয়াছে।

পুসিফুট জনসন মাতালদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বহু মার খাইয়াছেন।

মুহম্মদকে যাহারা মারিয়াছিল, ঈসা-মুসাকে যেসব ধর্ম-মাতাল প্রহার করিয়াছিল, তাহাদেরই বংশধর আবার মারিতেছে মানুষকে—ঈসা-মুসা-মুহম্মদদের মত মানুষকে।

যেসব অবতার-পয়গম্বর মানুষের মার হইতে মানুষকে বাঁচাইতে আসিয়া মানুষের মার খাইয়া গেলেন, তাঁহারা আজ কোথায়? মানুষের কল্যাণের জন্য আসিয়াছিলেন যাঁহারা, তাঁহাদেরই মাতাল পশু শিষ্যেরা আজ মানুষের সর্ব অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠিল।

যিনি সকল মানুষের দেবতা, তিনি আজ মন্দিরের কারাগারে, মসজিদের জিন্দান-খানায়, গির্জার gaol-এ বন্দী। মোল্লা-পুরুত, পাদরি-ভিক্ষু জেল-ওয়ার্ডের মতো তাহাকে পাহারা দিতেছে। আজ শয়তান বসিয়াছে স্রষ্টার সিংহাসনে।

একস্থানে দেখিলাম, ঊনপঞ্চাশ জন ভদ্র-অভদ্র হিন্দু মিলিয়া একজন শীর্ণকায় মুসলমান মজুরকে নির্মমভাবে প্রহার করিতেছে, আর একস্থানে দেখিলাম, প্রায় ঐ সংখ্যক মুসলমান মিলিয়া একজন দুর্বল হিন্দুকে পশুর মতো মারিতেছে। দুই পশুর হাতে মার খাইতেছে দুর্বল অসহায় মানুষ। ইহারা মানুষকে মারিতেছে যেমন করিয়া বুনো জংলি বর্বরেরা শূকরকে খোঁচাইয়া মারে। উহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, উহাদের প্রত্যেকের মুখ শয়তানের চেয়েও বীভৎস, শূকরের চেয়েও কুৎসিত ! হিংসায়, কদর্যতায় উহাদের গাত্রে অনন্ত নরকের দুর্গন্ধ !

উহাদের দুই দলেরই নেতা একজন, তাহার আসল নাম শয়তান। সে নাম ভাঁড়াইয়া কখনো টুপি পরিয়া পর-দাড়ি লাগাইয়া মুসলমানদের খেপাইয়া আসিতেছে, কখনো পর-টিকি বাঁধিয়া হিন্দুদের লেলাইয়া দিতেছে, সে-ই আবার গোরা সিপাই গুর্খা সিপাই হইয়া হিন্দু-মুসলমানদের গুলি মারিতেছে ! উহার ল্যাজ সমুদ্রপারে গিয়া ঠেকিয়াছে, উহার মুখ সমুদ্রপারের বুনো বাঁদরের মত লাল !

দেখিলাম, আল্লার মসজিদ আল্লা আসিয়া রক্ষা করিলেন না, মা-কালীর মন্দির কালী আসিয়া আগলাইলেন না ! মন্দিরের চূড়া ভাঙিল, মসজিদের গুম্বজ টুটিল !

আল্লার এবং কালীর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আকাশ হইতে বজ্রাঘাত হইল না মুসলমানদের শিরে, 'আবাবিলের' প্রস্তর-বৃষ্টি হইল না হিন্দুদের মাথার উপর।

এই গোলমালের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু ছেলে আসিয়া গোঁফ-দাড়ি-কামানো দাঙ্গায়-হত খায়রু মিয়াকে হিন্দু মনে করিয়া 'বল হরি হরিবোল' বলিয়া শ্মশানে পুড়াইতে লইয়া গেল, এবং কতকগুলি মুসলমান ছেলে গুলি খাইয়া হত দাড়িওয়ালা সদানন্দ বাবুকে মুসলমান ভাবিয়া 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়িতে পড়িতে কবর দিতে লইয়া গেল।

মন্দির এবং মসজিদ চিড় খাইয়া উঠিল, মনে হইল যেন উহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে !

মারামারি চলিতেছে। উহারি মধ্যে এক জীর্ণা-শীর্ণা ভিখারিনী তাহার সদ্যপ্রসূত শিশুটিকে বুকে চাপিয়া একটি পয়সা ভিক্ষা চাহিতেছে। শিশুটির তখনো নাড়ি কাটা হয় নাই। অসহায় ক্ষীণ কণ্ঠে সে যেন এই দুঃখের পৃথিবীতে আসার প্রতিবাদ করিতেছিল। ভিখারিনী বলিল, 'বাছাকে আমার একটু দুধ দিতে পারছি না বাবু ! এই মাত্র এসেছে বাছা আমার ! আমার বুকে এক ফোঁটা দুধ নেই !' তাহার কণ্ঠে যেন বিশ্ব-জননী কাঁদিয়া উঠিল। পাশের একটি বাবু বেশ একটু ইঙ্গিত করিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিল, 'বাবা ! এই ত চেহারা, এক ফোঁটা রক্ত নেই শরীরে, তবু ছেলে হওয়া চাই।'

ভিখারিনী নিষ্পলক চোখে তাকাইয়া রহিল লোকটার দিকে। সে কি দৃষ্টি ! চোখ দুটো তার যেন তারার মত জ্বলিতে লাগিল। ও যেন নিখিল হতভাগিনী নারীর জিজ্ঞাসা ! এমনি করিয়া নির্বাক চোখে তাহারা তাকাইয়া থাকিয়াছে তাহারই দিকে—যে তাহার সর্বনাশ করিয়াছে। আমি যেন তার দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিলাম। সে বলিতে চায়, 'পেটের ক্ষুধা এত প্রচণ্ড বলিয়াই তো দেহ বিক্রয় করিয়াও সে ক্ষুধা মিটাইতে হয় !'

যে-লোকটি বিদ্রূপ করিল সে-ই হয়ত ঐ শিশুর গোপন পিতা ! সে না হয়, তারই একজন আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু অথবা তাহারই মত মানুষ একজন ঐ শিশুর জন্মদাতা।

ঐ যে এক আকাশ তারা, উহারা ইহারই মত দুর্ভাগিনী ভুখারিনীদের চোখ, অনন্তকাল ধরিয়া ভোগ-তৃপ্ত বিশ্ববাসীকে কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে।

তিনদিন পরে আবার দেখিলাম, পথে দাঁড়াইয়া সেই ভিখারিনী। এবার তাহার বক্ষ শূন্য। চক্ষুও তাহার শূন্য। যেদিন শিশু ছিল তার বুকে, সেদিন চক্ষে তার দেখিয়াছিলাম বিশ্বমাতার মমতা। অনন্ত নারীর করুণা সেদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার চোখের তারায়, তাই সে সেদিন অমন সিক্ত কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছিল। আজ তাহার মনের মা বুঝি-বা মরিয়া গিয়াছে তাহার শিশুর সাথে। আজও সে ভিক্ষা

চাহিতেছে, কিন্তু আর সে কাতরতা নাই তাহার কণ্ঠে, আজ যেন সে চাহিবার জন্যই চাহিতেছে! ...

আমায় সে চিনিল। আমি সেদিন তাহাকে আমার ট্রাম ভাড়ার পয়সা ছয়টি দিয়াছিলাম।—ভিখারিনীর শুষ্কচক্ষে হঠাৎ অশ্রুপুঞ্জ দুলিয়া উঠিল! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোর ছেলে কোথায়?' সে উর্ধ্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। তাহার পর একটু থামিয়া আমায় বলিল, 'বাবু, আমার সাথে একটু আসবেন?' আমি সাথে সাথে চলিলাম।

পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। তারই পাশে ডাস্টবিন। শহরের যত আবর্জনা জমা হয় ঐ ডাস্টবিনে। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। ভিখারিণী ডাস্টবিনের অনেকগুলো আবর্জনা তুলিয়া ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো কি একটা যেন তুলিয়া লইয়া 'যাদু আমার সোনা আমার' বলিয়া উন্মাদিনীর মত চুমা খাইতে লাগিল।

এই তাহার খোকন।—এই তাহার যাদু, এই তাহার সোনা! ভিখারিনী ইহার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর শিশুটিকে আবার ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, 'বাবু, ঐ পয়সা কয়টি দিয়ে সেদিন একটা খারাব-হয়ে-যাওয়া বার্লির টিন কিনেছিলুম। এ-কয়দিন ছেলেটাকে দিয়েছি ঠাণ্ডা জলে গুলে শুধু ঐ পচা বার্লি, আমিও খেয়েছি একটু করে—যদি আমার বুকে দুধ আসে! দুধ এল না এই হাড়-চামড়ার শরীরে! এক ফোঁটা দুধ পেলে না বাছা আমার, এই তিন দিনের মধ্যে! শেষে আর বার্লিও দিতে পারলুম না, আজ সে চলে গেল! ভালোই হয়েছে, বাছা আমার এবার খুব বড় লোকের ঘরে জন্মায় যেন। একটু পেটে দুধ খেয়ে বাঁচবে!'

চলে গেল ভিখারিনী আবার ভিক্ষা মাগতে!

ডাস্টবিন হইতে ভিখারিনীর পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়া আমি চলিলাম গোরস্থানের দিকে। ...

কাল এমনি করিয়া প্রতি বৎসর বাংলার দশ লক্ষ সন্তানের মরা লাশ বুকে ধরিয়া চলিতেছে শ্মশানের পানে, গোরস্থানের পথে।

যাইতে যাইতে দেখিলাম, সেদিনো মন্দির আর মসজিদের ইট-পাথরের স্তূপ লইয়া হিন্দু-মুসলমান সমানে কাটাকাটি করিতেছে।

শিশুর লাশ-কোলে আমি বহুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শিশুর লাশ যেন একটা প্রতিকার প্রার্থনা, একটা কৈফিয়ত তলবের মত দেখাইতে লাগিল। ধর্ম-মদান্ধদের তখন শিশুর লাশের দিকে তাকাইয়া দেখিবার অবসর ছিল না। তাহারা তখন ইট-পাথর লইয়া বিভৎস মাতলামি শুরু করিয়া দিয়াছে।

এমনি করিয়া যুগে যুগে ইহারা মানুষকে অবহেলা করিয়া ইট-পাথর লইয়া মাতামাতি করিয়াছে। মানুষ মারিয়া ইট-পাথর বাঁচাইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বঙ্গ-জননী তাহার দশ লক্ষ অনাহার-জীর্ণ রোগশীর্ণ অকালমৃত সন্তানের লাশ লইয়া

ইহাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ইহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই! ইহারা মানুষের চেয়ে ইট-পাথরকে বেশি পবিত্র মনে করে! ইহারা ইট-পূজা করে! ইহারা পাথর-পূজারী!

ভূতে-পাওয়ার মতো ইহাদেরে মন্দিরে পাইয়াছে, ইহাদেরে মসজিদে পাইয়াছে। ইহাদের বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে!

যে-দশ লক্ষ মানুষ প্রতি বৎস মরিতেছে শুধু বাংলায়, —তাহারা শুধু হিন্দু নয়, তাহারা শুধু মুসলমান নয়, তাহারা মানুষ—স্রষ্টার প্রিয় সৃষ্টি!

মানুষের কল্যাণের জন্য ঐসব ভজনালয়ের সৃষ্টি, ভজনালয়ের মঙ্গলের জন্য মানুষ সৃষ্টি হয় নাই। আজ যদি আমাদের মাতলামির দরুন ঐ ভজনালয়ই মানুষের অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠে—যাহার হওয়া উচিত ছিল স্বর্গমর্ত্যের সেতু—তবে ভাঙ্গিয়া ফেল ঐ মন্দির-মসজিদ! সকল মানুষ আসিয়া দাঁড়াইয়া বাঁচুক এক আকাশের ছত্রতলে, এক চন্দ্র-সূর্য-তারা-জ্বালা মহামন্দিরের আঙ্গিনাতলে!

মানুষ তাহার পবিত্র পায়ে-দলা মাটি দিয়া তৈরি করিল ইট, রচনা করিল মন্দির-মসজিদ। সেই মন্দির-মসজিদের দুটো ইট খসিয়া পড়িল বলিয়া তাহার জন্য দুই শত মানুষের মাথা খসিয়া পড়িবে? যে এ কথা বলে, আগে তাহারই বিচার হউক।

দুইটা ইটের ঋণ যদি দুই শত মানুষের মাথা দিয়া পরিশোধ করিতে হয়, তবে বাঙালি জাতির যে এই বিপুল দেহ-মন্দির হইতে দশ লক্ষ করিয়া মানুষ খসিয়া পড়িতেছে প্রতি বৎসরে শোষণ-দৈত্যের পেষণে, এই মহা-ঋণের পরিশোধ হইবে কত লক্ষ মানুষের মাথা দিয়া?

মন্দির-মসজিদের চূড়া আবার গড়িয়া উঠিবে এই মানুষেরই পায়ে-দলা মাটি দিয়া, পবিত্র হইয়া উঠিবে এই মানুষেরই শ্রমের পবিত্রতা দিয়া; শুধু তাহারাই আর ফিরিয়া আসিবে না, যাহারা পাইল না একটু আলো, একটু বাতাস, এক ফোঁটা ওষুধ, দু'চামচ জল-বার্লি! যাহারা তিলে তিলে মরিয়া জাতির হৃদয়হীনতার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে! যাহাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়া সমগ্র জাতি মরিতেছে তিলে তিলে!

আমি ভাবি, যখন রোগ-শীর্ণ জরা-জীর্ণ অনাহার-ক্লিষ্ট বিবস্ত্র বুভুক্ষু সর্বহারা ভুখারিদের দশ লক্ষ করিয়া লাশ দিনের পর দিন ধরিয়া ঐ মন্দির-মসজিদের পাশ দিয়া চলিয়া যায়, তখন ধসিয়া পড়ে না কেন মানুষের ঐ নিরর্থক ভজনালয়গুলো? কেন সে ভূমিকম্প আসে না পৃথিবীতে? কেন আসে না সেই রুদ্র—যিনি মানুষ-সমাজের শিয়াল-কুকুরের আড্ডা ঐ ভজনালয়গুলো ফেলবেন গুঁড়িয়ে? দেবেন মানুষের ট্রেডমার্কার চিহ্ন ঐ টিকি-টুপিগুলো উড়িয়ে?

মন্দির-মসজিদের সামনে বাজনা বাজাইলে হয় তার প্রতিকার, আসে তার জন্যে মুদ্রা হাজার হাজার, আসে তার জন্য ছপ্পর ফুঁড়িয়া নেতার দল—গো-ভাগাড়ে শকুনি পড়ার মত!—শুধু দশ লক্ষ লাশের আর প্রতিকার হইল না!

মানুষের পশু-প্রবৃত্তির সুবিধা লইয়া ধর্ম-মদান্ধদের নাচাইয়া কত কাপুরুষই না আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল।

সকল কালে সকল দেশে সকল লাভ-লোভকে জয় করিয়াছে তরুণ। ওগো বাংলার তরুণের দল—ওগো আমার আগুন খেলার নির্ভীক ভাইরা, ঐ দশ লক্ষ অকালমৃতের লাশ তোমাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া! তারা প্রতিকার চায়!

তোমরা ঐ শকুনির দলের নও, তোমরা আগুনের শিখা, তোমাদের জাতি নাই। তোমরা আলোর, তোমরা গানের, তোমরা কল্যাণের। তোমরা বাহিরে এস, এই দুর্দিনে তাড়াও ঐ গো ভাগাড়ের পড়া শকুনির দলকে।

আমি শুনিতেছি মসজিদের আজান আর মন্দিরের শঙ্খধ্বনি। তাহা এক সাথে উত্থিত হইতেছে ঊর্ধ্বে—স্রষ্টার সিংহাসনের পানে। আমি দেখিতেছি, সারা আকাশ যেন খুশি হইয়া উঠিতেছে।

হিন্দু-মুসলমান

একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল আমার, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেন, দেখো, যে ন্যাজ বাইরের, তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে?

হিন্দু-মুসলমানের কথা মনে উঠলে আমার বারেবারে গুরুদেবের ঐ কথাটাই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও উদয় হয় মনে যে, এ-ন্যাজ গজালো কি করে? এর আদি উদ্ভব কোথায়? ঐ সঙ্গে এটাও মনে হয়, ন্যাজ যাদেরই গজায়—তা ভিতরেই হোক আর বাইরেই হোক—তারাই হয়ে ওঠে পশু। যেসব ন্যাজওয়ালা পশুর হিংস্রতা সরল হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে—শৃঙ্গরূপে, তাদের তত ভয়ের কারণ নেই, যত ভয় হয় সেই সব পশুদের দেখে—যাদের হিংস্রতা ভিতরে, যাদের শিং মাথা ফুটে বেরোয়নি! শিংওয়ালা গরু-মহিষের চেয়ে শৃঙ্গহীন ব্যাঘ্র-ভল্লুক জাতীয় পশুগুলো বেশি হিংস্র—বেশি ভীষণ। এ হিসেবে মানুষও পড়ে ঐ শৃঙ্গহীন বাঘ-ভালুকের দলে। কিন্তু, বাঘ-ভালুকের তবু ন্যাজটা বাইরে, তাই হয়তো রক্ষে। কেননা, ন্যাজ আর শিং দুই-ই ভেতরে থাকলে কী রকম হিংস্র হয়ে উঠতে হয়, তা হিন্দু-মুসলমানের ছোরা-মারা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না।

যে প্রশ্ন করছিলাম, এই যে ভেতরের ন্যাজ, এর উদ্ভব কোথায়? আমার মনে হয় টিকিতে ও দাড়িতে। টিকিপুর ও দাড়ি-স্তানই বুঝি এর আদি জন্মভূমি। পশু সাজবার মানুষের একি 'আদিম' দুরন্ত ইচ্ছা! —ন্যাজ গজাল না বলে তারা টিকি দাড়ি জন্মিয়ে যেন সান্ত্বনা পেল।

সে দিন মানব-মনের পশু-জগতে না জানি কী উৎসবের সাড়া পড়েছিল, যে দিন ন্যাজের বদলে তারা দাড়ি-টিকির মতো কোনো কিছু একটা আবিষ্কার করলে!

মানুষের চিরন্তন আত্মীয়তাকে এমনি করে বৈরিতায় পরিণত করা হলো দেওয়ালের পর দেওয়াল খাড়া করে। ধর্মের সত্যকে সওয়া যায়, কিন্তু শাস্ত্র যুগে যুগে অসহনীয় হয়ে উঠেছে বলেই তার বিরুদ্ধে যুগে যুগে মানুষও বিদ্রোহ করেছে। হিন্দুত্ব-মুসলমানত্ব দুই-ই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব। তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি! আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়। নারায়ণের গদা আর আল্লার তলোয়ারে কোনো দিনই ঠোকাঠুকি বাঁধবে না, কারণ তাঁরা দুইজনেই এক, তাঁর এক হাতের অস্ত্র তাঁরই আর এক হাতের ওপর পড়বে না। তিনি সর্বনাম, সকল নাম গিয়ে মিশেছে ওঁর মধ্যে। এত মারামারির মধ্যে এইটুকুই ভরসার কথা যে, আল্লা ওর্ফে নারায়ণ হিন্দুও নন মুসলমানও নন। তাঁর টিকিও নেই, দাড়িও নেই। একেবারে 'ক্লিন'। টিকি-দাড়ির ওপর আমার এত আক্রোশ এই জন্য যে, এরা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে যে, তুই আলাদা আমি আলাদা। মানুষকে তার চিরন্তন রক্তের সম্পর্ক ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চিহ্নগুলো।

অবতার-পয়গম্বর কেউ বলেননি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রিশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি—আলোর মত, সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তেরা বললে, কৃষ্ণ হিন্দুর, মুহম্মদের ভক্তেরা বললে, মুহম্মদ মুসলমানদের, খ্রিস্টের শিষ্যেরা বললে, খ্রিস্ট ক্রিশ্চানদের। কৃষ্ণ-মুহম্মদ-খ্রিস্ট হয়ে উঠলেন জাতীয় সম্পত্তি। আর এই সম্পত্তিত্ব নিয়েই যত বিপত্তি। আলো নিয়ে কখনো ঝগড়া করে না মানুষে, কিন্তু গরু-ছাগল নিয়ে করে। বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় আমরা সূর্য নিয়ে ঝগড়া করতাম। এ বলতো আমাদের পাড়ার সূর্য বড়; ও বলতো আমাদের পাড়ার সূর্য বড়! আমাদের গভীর বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক পাড়ায় আলাদা আলাদা সূর্য ওঠে! স্রষ্টা নিয়েও ঝগড়া চলেছে সেই রকম। এ বলছে আমাদের আল্লা; ও বলছে আমাদের হরি। স্রষ্টা যেন গরু-ছাগল! আর তার বিচারের ভার পড়েছে জাস্টিস সার আবদুর রহিম, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতির ওপর। আর বিচারের ফল মেডিক্যাল কলেজ গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে।

নদীর পাশ দিয়ে চলতে চলতে যখন দেখি, একটা লোক ডুবে মরছে, মনের চিরন্তন মানুষটি তখন এ-প্রশ্ন করবার অবসর দেয় না যে, লোকটা হিন্দু না মুসলমান। একজন মানুষ ডুবছে, এইটেই হয়ে ওঠে তার কাছে সবচেয়ে বড়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। হিন্দু যদি উদ্ধার করে দেখে লোকটা মুসলমান, বা মুসলমান যদি দেখে লোকটা হিন্দু—তার জন্য ত তার আত্মপ্রসাদ এতটুকু ক্ষুণ্ন হয় না। তার মন বলে, 'আমি একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি—আমারই মতো একজন মানুষকে।'

কিন্তু আজ দেখছি কি? ছোরা খেয়ে যখন খায়রু মিয়া পড়ল, আর তাকে যখন তুলতে গেল হালিম, তখন ভদ্র সম্প্রদায় হিন্দুরাই ছুটে আসলেন, 'মশাই করেন কি? মোচলমানকে তুলছেন! মরুক ব্যাটা!' তারা 'অজাতশ্মশ্রু' হালিমকে দেখে চিনতে পারেনি যে সে মুসলমান। খায়রু মিয়ার দাড়ি ছিল। ছোরা খেয়ে যখন ভুজালি সিং পড়ল পথের উপর তাকে তুলতে গিয়ে তুর্কিছাঁট-দাড়ি শশধর বাবুরও ঐ অবস্থা!

মানুষ আজ পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের চিরন্তন আত্মীয়তা ভুলেছে। পশুর ন্যাজ গজিয়েছে ওদের মাথার ওপর, ওদের সারা মুখে। ওরা মারছে লুঙ্গিকে, মারছে নেঙ্গোটিকে; মারছে টিকিকে, দাড়িকে! বাইরের চিহ্ন নিয়ে এই মূর্খদের মারামারির কি অবসান নেই!

মানুষ কি এমনি অন্ধ হবে যে, সুনীতি বাবু হয়ে উঠবেন হিন্দু-সভার সেক্রেটারি এবং মুজিবর রহমান সাহেব হবেন তঞ্জিম তব্‌লিগের প্রেসিডেন্ট? ...

রাস্তায় যেতে যেতে দেখলাম, একটা বলদ যাচ্ছে, তার ন্যাজটা গেছে খসে। ওরই সাথে দেখলাম, আমার অতি বড় উদার বিলেত-ফেরত বন্ধুর মাথায় এক য়্যাব্বড় টিকি গজিয়েছে!

মনে হল, পশুর ন্যাজ খসছে আর মানুষের গজাচ্ছে!

গ্রন্থ-পরিচয়

[নজরুল-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশ-কাল ও কতকগুলি রচনা-সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হইল।]

পুনশ্চ শিরোনামে পরিবেশিত তথ্য নতুন সংস্করণের সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক সংযোজিত।

ছায়ানট

'ছায়ানট' ১৩৩২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে যে 'উৎসর্গ'-পত্রটি ছিল, পরবর্তী সংস্করণগুলিতে তাহা বর্জিত হয়।

'বিজয়িনী' ১৩২৮ পৌষের 'মোসলেম ভারত'-এ এবং 'চৈতী হাওয়া' ১৩৩২ বৈশাখের 'কল্লোল'-এ বাহির হইয়াছিল।

'নিশীথ-প্রীতম্' ১৩২৮ মাঘে ৪র্থ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় এবং ৮ম বর্ষের ৩য় সংখ্যক 'নারায়ণ'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

'লক্ষ্মীছাড়া' ১৩২৮ ভাদ্রের 'উপাসনা'য় বাহির হইয়াছিল।

'শেষের গান' ১৩২৯ শ্রাবণের 'সহচর'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল : তাহাতে প্রথম পংক্তিটি ছিল এরূপ :

আমার মরণ-রথের চাকার ধ্বনি ঐ রে এবার কানে আসে।

তৃতীয় স্তবকের প্রথম পংক্তি ছিল এরূপ :

মোর কাফনের কর্পূর-বাস ভরপুর আজ দিগ্বলয়ে,

'নিরুদ্দেশের যাত্রী' ১৩২৭ চৈত্রের 'নারায়ণ'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। শিরোনামের নিচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : 'বাউল—কাশ্মিরী খেম্‌টা'।

'চিরন্তনী প্রিয়া' ১৩২৮ কার্তিকের এবং 'বেদনা-মণি' ১৩২৯ ভাদ্রের 'মানসী ও মর্মবাণী'তে ছাপা হইয়াছিল।

'অনাদৃতা' ১৩২৮ ভাদ্রের 'নারায়ণ'-এ এবং 'শায়ক-বেঁধা পাখি' ১৩২৯ আষাঢ়ের 'বঙ্গবাণী'তে বাহির হইয়াছিল।

'হারা-মণি' ১৩২৮ সালে 'নারায়ণ' পত্রিকায় ১২১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'স্নেহ-ভীতু' ১৩২৭ ফাল্গুনের 'মোসলেম ভারতে' বাহির হইয়াছিল। বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : 'বাউল সুর—তাল লোফা'। সে সংখ্যাতেই গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেন শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

'পলাতকা' ১৩২৮ বৈশাখের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : 'মা-মরা খোকার মৃত্যু-শয্যায় পিতা গাচ্ছেন', এবং 'সুর—বৈকালী মেঠো বাউল'। গানটি 'ভারতী' হইতে ১৩২৮ আশ্বিনের 'মোসলেম ভারতে' উদ্ধৃত হইয়াছিল।

'মানস-বধূ' ১৩২৯ শ্রাবণে ১ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যক মাসিক 'বসুমতী'তে বাহির হইয়াছিল।

'দহন-মালা' ১৩২৮ বৈশাখের এবং 'অকরুণ প্রিয়া' ১৩২৮ আশ্বিনের 'নারায়ণ'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

'দূরের-বন্ধু' ১৩২৭ কার্তিকের 'মোসলেম ভারত'-এ 'গান' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল ; বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : 'লাউনি-বারোঁয়া—তেওরা'।

'আশা' ১৩২৭ পৌষের 'মোসলেম ভারত'-এ 'গান' শিরোনামে বাহির হইয়াছিল। বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : 'খাম্বাজ—(ঢিমা) একতালা'। সে সংখ্যাতেই গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেন শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

'মরমী' প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩২৭ ফাল্গুনের 'মোসলেম ভারত'-এ। ১৩৩০ অগ্রহায়ণের 'কল্লোল'-এ ইহা পুনর্মুদ্রিত হয় এবং সে সংখ্যাতেই শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ইহার সুর ও স্বরলিপি প্রকাশ করেন।

'প্রতিবেশিনী' ১৩২৭ মাঘের 'সওগাতে' 'বেদন-হারা' শিরোনামে এবং ১৩২৭ চৈত্রের 'মোসলেম ভারত'-এ 'গান' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'দুপুর-অভিসার' ১৩২৮ শ্রাবণের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : 'গৌড়-সারঙ্—দাদরা'।

'ছল-কুমারী' ১৩২৮ অগ্রহায়ণের 'উপাসনা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'বাদল-দিন'-এ ১৩২৮ আশ্বিনের এবং 'কার বাঁশী বাজিল?' ১৩২৮ ভাদ্রের 'মোসলেম ভারত'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

'অকেজোর গান' ১৩২৮ অগ্রহায়ণের এবং 'স্তব্ধ বাদল' ১৩২৯ শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'চির-চেনা' ১৩২৯ শ্রাবণের 'বঙ্গবাণী'তে বাহির হইয়াছিল।

'অমর কানন' ১৩৩২ শ্রাবণে ৫ম বর্ষের ৩৩শ সংখ্যক 'বিজলী'তে বাহির হইয়াছিল।

'পূবের হাওয়া' [ঝড় : পূর্ব তরঙ্গ] ১৩৩১ শ্রাবণের, 'আল্‌তা-স্মৃতি' ১৩৩০ পৌষের এবং 'রৌদ্র-দগ্ধের গান' ১৩৩০ চৈত্রের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

পু ন শ্চ

ছায়ানট ১৩৩২ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে (সেপ্টেম্বর ১৯২৫) প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : ব্রজবিহারী বর্মণ রায়, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০, মূল্য পাঁচ সিকা।

পরে *ছায়ানটের* ২৬টি কবিতা *পূবের হাওয়া* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব কবিতায় যে-পাঠভেদ আছে, তার বিবরণ *পূবের হাওয়ার* গ্রন্থপরিচয়ে পাওয়া যাবে। নতুন সংস্করণে আমরা *ছায়ানটের* আদি সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করেছি।

চিত্তনামা

১৩৩২ সালের ২রা আষাঢ় দার্জিলিঙে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পরলোকগমন করেন। ১৩৩২ শ্রাবণে 'চিত্তনামা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি সম্পর্কে ১৩৩২ অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী' বলেন :

> "৪০ পাতা বইয়ের দাম এক টাকা। ... বইয়ের কবিতাগুলি পড়িয়া ভালো লাগিল। লেখকের দেশবন্ধুর প্রতি ভক্তি প্রতি ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। বইখানির বাঁধান, ছাপা, কাগজ—সবই খুব ভাল।"

'অর্ঘ্য' সম্পর্কে শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :

> "দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শুনে কবি কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে 'অর্ঘ্য' গানটি লেখেন ১৩৩২ সালের ৩রা আষাঢ়। দেশবন্ধুর শবাধারে রচনাটি মালার সঙ্গে অর্ঘ্য-স্বরূপ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।"
>
> — [কাজী নজরুল, ৩৭ পৃষ্ঠা]

'অকালসন্ধ্যা' ১৩৩২ শ্রাবণের 'বঙ্গবাণী'-তে প্রকাশিত হইয়াছিল। শিরোনামের নিচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : 'জয় জয়ন্তী কীর্ত্তন—একতালা'। পাদটীকায় লেখা ছিল : 'স্বর্গীয় দেশবন্ধুর শোকযাত্রার গান'।

'সান্ত্বনা' ১৩৩২ আষাঢ়ের ৫ম বর্ষের ৩১ সংখ্যক 'বিজলী'তে বাহির হয়।

'ইন্দ্রপতন' ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১২ই আষাঢ় তারিখের 'আত্মশক্তি'তে প্রকাশিত হয়। এ-সম্পর্কে চৌধুরী শামসুর রহমান লিখিয়াছেন :

> ইন্দ্রপতন' সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকায়ই ছাপা হয়েছিল। ... কবি তাঁর এ কবিতায় মহান নেতার গুণকীর্তন করতে গিয়ে তাঁকে নবিদের সাথে তুলনা ক'রে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বলে ফেলেছিলেন : 'হে মানব-আম্বিয়া।' তা ছাড়া, কবিতাটিতে এমন

আরো কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল, যা ইসলামি ভাবধারার অনুকূল নয়। এ সব ত্রুটির প্রতি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে খোলা চিঠির আকারে লেখা আমার প্রবন্ধ মফঃস্বলের কাগজ 'বগুড়ার কথা'য় দীর্ঘ দুপৃষ্ঠা স্থান নিয়ে প্রকাশিত হয়। আমার এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলমান সমাজে তৎকালে বেশ সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল। ... পরে যখন কবিতাটি তাঁর 'চিত্তনামা' বইয়ে প্রকাশিত হয়, কবি নজরুল তখন আপত্তিকর লাইনগুলি সংশোধন ক'রে এবং কোনো কোনো লাইন বাদ দিয়েই তা ছেপেছিলেন।"

— [পঁচিশ বছর, ৪২–৪৪ পৃ]

কবিতাটি গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার কালে "হে মানব-আম্বিয়া" পদটি পরিবর্তিত হয় "হে মানব নবি-হিয়া" রূপে এবং তাহার চারিটি পংক্তি পরিবর্জিত হয়। যত দূর মনে পড়ে, পরিত্যক্ত পংক্তিগুলি ছিল এরূপ :

জন্মিলে তুমি মোহাম্মদের আগে, হে পুরুষবর!
কোরানে ঘোষিত তোমার মহিমা, হতে পয়গাম্বর।
যে জ্যোতি পারেনি সহিতে স্বয়ং মুসা-ও কোহ্-ই-তুরে,
সেই জ্যোতি তুমি রেখেছিলে তব নয়ন-মণিতে পুরে।
'রাজভিখারী' ১৩৩২ শ্রাবণের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুনশ্চ

ছায়ানট ও *চিত্তনামা* কাব্যে প্রকাশকাল মুদ্রিত হয়নি। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় *ছায়ানটের* প্রকাশকাল ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ এবং *চিত্তনামার* প্রকাশকাল ৪ নভেম্বর ১৯২৫ বলে উল্লিখিত হয়েছে। এসব তারিখ গ্রন্থপ্রকাশের প্রকৃত তারিখ নাও হতে পারে। তবে আমরা এই কালানুক্রম অনুসরণ করে *নজরুল-রচনাবলীর* বর্তমান সংস্করণে *চিত্তনামার* আগে *ছায়ানটের* স্থান দিয়েছি।

সাম্যবাদী

'সাম্যবাদী' ১৯২৫ ডিসেম্বের পুস্তিকা-আকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক মৌলভী শামসুদ্দীন হুসেন, বেঙ্গল পাবলিশিং হোম, ৫ নূর মহম্মদ লেন, কলিকাতা। ১৫ নং নয়ান চাঁদ [দত্ত] স্ট্রিট, কলিকাতা, মেটকাফ প্রেসে শ্রীমণিভূষণ মুখার্জী কর্তৃক মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই আনা।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষ মুতাবিক ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ৩৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ে'র সাপ্তাহিক

মুখপত্র-রূপে 'লাঙল' প্রকাশিত হয়। প্রধান পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, সম্পাদক ছিলেন কাবর পল্টনের বন্ধু মণিভূষণ মুখার্জী এবং কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন মরহুম শামসুদ্দীন হুসেন। লাঙলের বিশেষ (প্রথম) সংখ্যায় 'সর্বপ্রধান সম্পদ'-রূপে 'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হয়।

'সাম্যবাদী' পরে 'সর্বহারা' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পু ন শ্চ

সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থে ১১টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয় : সাম্যবাদী, ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, চোর-ডাকাত, বারাঙ্গনা, মিথ্যাবাদী, নারী, রাজা-প্রজা, সাম্য ও কুলি-মজুর। পরে এর চারটি কবিতা *সর্বহারা* কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গৃহীত হয়। *নজরুল রচনাবলী*র নতুন সংস্করণে *সাম্যবাদী*র প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসৃত হয়েছে।

পূবের হাওয়া

'*পূবের হাওয়া*' ১৩৩২ আশ্বিনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : মজিবল হক, বি. কম্., ভোলা, বরিশাল। প্রিন্টার্স : ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ২৬/৯/১এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। প্রকাশক 'একটি কথা'য় বলেন :

> 'পূবের হাওয়া'য় পঞ্চাশটি কবিতা যাওয়ার কথা। এবার সাঁইত্রিশটি গেল ; পর বারে সব কটি দেওয়া যাবে।

'পূবের হাওয়া'র সাঁইত্রিশটি কবিতার মধ্যে এই ছাব্বিশটি কবিতা : ১. 'মরমী' ; ২. 'অবসর' ; ৩. 'বেদনা-মানিক' ('বেদনা-মণি' শিরোনামে) ; ৪. 'বেদন-হারা' ('প্রতিবেশিনী' শিরোনামে) ; ৫. 'নিরুদ্দেশের যাত্রী' ; ৬. 'পথিক-শিশু' ('চির-শিশু' শিরোনামে) ; ৭. 'স্নেহ-ঋণী' ('স্নেহ-ভীতু' শিরোনামে)' ; ৮. 'দুপুর-অভিসার' ; ৯. 'দহন-মালা' ; ১০. 'পথিক-বধূ' ('বিধুরা পথিক প্রিয়া' শিরোনামে) ; ১১. 'স্নেহ-পরশ' ('পরশ-পূজা' শিরোনামে) ; ১২. 'বাঁশি বাজিল' ('কার বাঁশি বাজিল?' শিরোনামে) ; ১৩. 'গৃহহারা' ('বেদনা-অভিমান' শিরোনামে) ; ১৪. 'অনাদৃতা' ('অ-বেলায়' শিরোনামে) ; ১৫. 'স্নেহাতুর' ('হারা-মণি' শিরোনামে) ; ১৬. 'নিশীথ-প্রীতম' ; ১৭. 'রেশমী ডোর' ('হার-মানা-হার' শিরোনামে) ; ১৮. 'দূরের পথিক' ('বিদায়-বেলায়' শিরোনামে) ; ১৯. 'পুলক' ('নীল পরী' শিরোনামে) ; ২০. 'প্রণয়-ছল' ('ছল-কুমারী

শিরোনামে) ; ২১. 'বরষায়' ('বাদল-দিনে' শিরোনামে) ; ২২. 'বিদায়-বাঁশী' ('অকরুণ পিয়া' শিরোনামে) ; ২৩. 'শেষের ডাক' ('শেষের গান' শিরোনামে) ; ২৪. 'অভিমানিনী' ('অনাদৃতা' শিরোনামে) ; ২৫. 'শেষের প্রীতম' ('মনের মানুষ' শিরোনামে) এবং ২৬. 'বিজয়িনী', তাঁহার পূর্ববর্তী 'ছায়ানট' কাব্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সেজন্য সেগুলি এখানে পুনর্মুদ্রিত হইল না।

'ছায়ানট' কাব্যের 'পরশ-পূজা' কবিতাটির ষষ্ঠ পংক্তি 'পূবের হাওয়া'য় হইয়াছে এরূপ :

আহা পরশ তোমার জাগ্‌ছে যে গো এই সে, দেহে মম,
কম সরস হরষ-সম॥

নবম পংক্তি হইয়াছে এরূপ :

তোমার বাহুর বুকের শরম-ছোঁওয়ার আকুল কাঁপন আছে—
মদির অধীর পুলক নাচে॥

এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পংক্তিদ্বয় হইয়াছে এরূপ :

আমি চুমোয় চুমোয় ডুবাবো এই সকল দেহ মম—
ওগো শ্রাবণ-প্লাবন সম॥

'দূরের পথিক' কবিতাটির প্রারম্ভ 'পূবের হাওয়া'য় এরূপ :

আজ অমন কর গো বারে-বারে জল-ছলছল চোখে চেয়ো চেয়ো না,
শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না।

'পুলক' কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক 'পূবের হাওয়া'য় এরূপ :

তার অবুঝ বনের সবুজ সুরে
মাঠের নাটে পুলক পুরে,
ঐ গহন বনের পথটি ঘুরে বাজিয়ে বাঁশী আসচে দূরে
কচি পাতা দূত ওরি॥

'ছায়ানট' কাব্যের 'শেষের গান' অনেক শব্দ পরিবর্তন করিয়া শেষের ডাক' শিরোনামে 'পূবে'র হাওয়া'য় মুদ্রিত হইয়াছে এভাবে :

মরণ-রথের চাকার ধ্বনি ঐরে আমার কানে আসে।
পূবের হাওয়া তাই নেমেছে পারুল বনে দীঘল শ্বাসে॥
ব্যথার কুসুম গুলঞ্চ ফুলে
মালঞ্চে আজ তাই শোকাকুল,
গোরস্থানের মাটির বাসে তাই আমার আজ প্রাণ উদাসে॥

অঙ্গ আসে অবশ হ'য়ে নেতিয়ে-পড়া অলস ঘুমে,
সাগর-পারের বিদেশিনীর হিম-ছোঁওয়া যায় নয়ন চুমে।
হৃদয়-কাঁদা নিদয় কথা
আকাশ-ভেজা বিদায়-ব্যথা
লুটায় গো মোর ভুবন ভরি' বাঁধন-ছেঁড়ার কাঁদন-ত্রাসে॥

মোর কাফনের কর্পূর-বাস ভরপুর আজ দিগ্বলয়ে,
বনের শাখা লুটিয়ে কাঁদে হরিণটি তার হারার ভয়ে।
ফিরে-পাওয়া লক্ষ্মী বৃথাই
নয়ন-জলে বক্ষ তিতায়,
ওগো এ কোন্ যাদুর মায়ায় আমার দু'চোখ শুধু জলে ভাসে॥

আজ আকাশ-সীমায় শব্দ শুনি অচিন্ কা'দের আসা-যাওয়ার,
তাই মনে হয় এই যেন শেষ আমার সকল দাবী-দাওয়ার।
আজ কেহ নাই পথের সাথী,
সামনে শুধু নিবিড় রাতি,
আমায় দূরের মানুষ ডাক দিয়েছে, রাখবে কে আর বাঁধন-পাশে॥

'স্মরণে' ১৩২৭ শ্রাবণে ৩য় বর্ষের ২য় সংখ্যক বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায় 'গান' শিরোনামে ছাপা হইয়াছিল। শিরোনামের নীচে লেখা ছিল : "সুর—হিন্দুস্থানী-কাজরী।" তাহাতে দ্বিতীয় স্তবকের পঞ্চম পংক্তি ছিল নিম্নরূপ :

তাই পরাণ আমার বেড়ায় মেগে'
সে কা'র যতনে।

'বাদল-প্রাতের শরাব' ১৩২৭ আষাঢ়ের 'মোসলেম ভারতে' বাহির হইয়াছিল। শিরোনামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : 'হাফিজ-এর ছন্দ ও ভাব অবলম্বনে'। 'পূবের হাওয়া'য় কবিতাটির শিরোনাম দেওয়া হয় : 'নিকটে'।

এই কবিতাটি সম্বন্ধে ১৩২৭ ভাদ্রের 'মোসলেম ভারতে' শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বলেন :

> 'বাদল-প্রাতের শরাব' শীর্ষক কবিতায় ইরানের পুষ্পসার ও দ্রাক্ষাসার ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। এ কবিতাটিতেও কবির 'মস্ত' হইবার ও 'মস্ত' করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালি মাত্রেই ইহার উচ্ছল রসাবেশ অন্তরে অনুভব করিবে। কবির লেখনী জয়যুক্ত হউক।

'মানিনী' ১৩২৭ বৈশাখের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় 'মানিনী বধূর প্রতি' শিরোনামে বাহির হইয়াছিল।

'আশা' ১৩২৭ পৌষের 'সওগাতে' 'কলঙ্কী প্রিয়' শিরোনামে ছাপা হইয়াছিল। বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল : 'গান—বাউলের সুর'।

'শরাবন্ তহুরা' ['নার্গিস বাগ্ মেঁ বাহার কি আগ্ মেঁ'] গানটি ১৯২০ সালে রচিত বলিয়া শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহমদ ১৯৬৬ সালের ২রা আগস্ট তারিখে লেখা তাঁহার এক পত্রে (১৩৮১ সালের নজরুল একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত] উল্লেখ করিয়াছেন।

'বিরহ-বিধুরা' ১৩২৭ মাঘের 'মোসলেম ভারতে' ছাপা হইয়াছিল। পাদটীকায় লেখা ছিল : 'কাবুলী-কবি 'খোশহাল'-এর হিন্দুস্থানে নির্বাসন-কালীন তাঁহার সহধর্মিনীর লিখিত একটি কবিতার ভাব অবলম্বনে।'

পুনশ্চ

প্রকাশকালে পূবের হাওয়ার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২+৫০, মূল্য পাঁচ সিকা। ছায়ানটের যে-২৬টি কবিতা পূবের হাওয়ায় গৃহীত হয়েছে, তার অনেকগুলিতে কিছু পাঠভেদ আছে।

ছায়ানটের মুক্তিবার' কবিতার নাম পূবের হাওয়ায় 'অবসর'। 'অবসর' কবিতার দ্বাদশ চরণের পরে আছে :

অভিমানিনীরে মোর।

'মুক্তিবারে' এ চরণটি নেই।

ছায়ানটের 'নিরুদ্দেশের যাত্রী' কবিতার একবিংশ ও দ্বাবিংশ চরণ দুটি এরূপ :

থামল বাদল-রাতের কাঁদা
হাসলো আবার টুটলো ধাঁধা।

পূবের হাওয়ার 'নিরুদ্দেশের যাত্রী' কবিতায় চরণ দুটি এরূপ :

থামল বাদল রাতের কাঁদা।
ভোরের তারা কনক-গাঁদা।

ছায়ানটের 'চিরশিশু' কবিতার শেষ তিন চরণ :

ওরে ও কে কণ্ঠ রুখে
উঠছে কেন মন ভারায়ে।
অস্ত হতে এলে পথিক উদয় পানে পা বাড়ায়ে॥

পূবের হাওয়ার 'পথিক শিশু' কবিতার শেষ দুটি চরণ এরূপ :

ওরে ও কে কণ্ঠ রুখে? পাঁচ ফাগুনের যুঁই-চারা এ
আজ মন-পাখি ধায় মধুরতম নাম আশীষের শেষ ছাড়ায়ে।

ছায়নটের 'দহনমালা' কবিতার দ্বিতীয় চরণের "বদল দিয়ে" এবং ষষ্ঠ চরণের "দু'হাতে পূরে" পূবের হাওয়ার 'দহনমালা' কবিতায় যথাক্রমে "বদল করে" ও "দু' হাত ভরে" হয়েছে।

ছায়ানটের 'বিধুরা পথিক-প্রিয়া' ও পূবের হাওয়ার 'পথিক-বধূ' কবিতার প্রথম একাদশ চরণের পাঠ অভিন্ন। তারপরে 'পথিক-বধূ' কবিতায় পাই:

পরদেশী কোন শ্যামল বঁধূর শুনতো বাঁশি সারাক্ষণ গো?
চুমচো কারে? ও নয় তোমার পথিক-বঁধূর
চপল হাসির হা-হা
তরুণ ঝাউএর কচি পাতায় করুণ অরুণ কিরণ
ও যে আ-হা
দূরের পথিক ফিরে নাক আর (আহা আ-হা)
ও সে সবুজ দেশের অবুঝ পাখি
কখন্ এসে যাচবে বাঁধন, চল পাখি ঘরকে চল!
ওকি? চোখে নাম্‌লো কেন মেঘের ছায়া ঢল ছল॥

ছায়ানটের 'ছলকুমারী'র প্রথম স্তবকের শেষ দুই চরণ এবং দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম চরণে পাঠভেদ পাওয়া যায় *পূবের হাওয়ার* 'প্রণয়-ছল' কবিতায়। সেখানে

আমায় দেখেই সলাজ ত্রাসে
অনামিকায় গড়িয়ে আঁচল গাল দুটিকে ঘামায়॥
সবাই যখন ঘুমে মগন দুরু দুরু বুকে তখন
আমায় চুপে চুপে

রূপান্তরিত হয়েছে

আমায় দেখেই সলাজ ত্রাসে
গাল দুটিকে ঘামায়॥
অনামিকায় জড়িয়ে আঁচল
দুরু দুরু বুকে
সবাই যখন ঘুমে মগন তখন আমায় চুপে চুপে।

এই কবিতায় আরও কিছু পরিবর্তন লক্ষযোগ্য। যেমন : 'ছলকুমারীর'র "সইরা হাসে দেখে তাহার" 'প্রণয়-ছলে' "সইরা হাসে দেখে ছুঁড়ির" এবং প্রথমোক্ত কবিতার

কি যে কথা সেই তা জানে
ছলকুমারী নানান ছলে আমারে সে জানায়

দ্বিতীয়োক্ত কবিতায়

চলতে চাদর পরশ হানে
আমারো কি নিতুই পথে তারি বুকের জামায়।

ছায়ানটের 'বাদল-দিনে' কবিতার চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবক এবং ষষ্ঠ স্তবকের প্রথম চরণদুটি পূবের হাওয়ার 'বরষা' কবিতায় নেই।

পূবের হাওয়ায় নতুন যে-১১টি কবিতা গৃহীত হয়, তার পাঠের ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণ অনুসরণ করা হয়েছে।

সর্বহারা

'সর্বহারা ১৩৩৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাহাতে অন্তর্ভুক্ত হয় এই ১১টি কবিতা : (১) সর্বহারা, (২) কৃষাণের গান, (৩) শ্রমিকের গান, (৪) ধীবরদের গান, (৫) ছাত্রদলের গান, (৬) কাণ্ডারী হুঁশিয়ার, (৭) সাম্যবাদী, (৮) ফরিয়াদ, (৯) আমার কৈফিয়ৎ, (১০) প্রার্থনা ও (১১) গোকুল নাগ।

উৎসর্গ-কবিতাটি 'সর্বহারা' শিরোনামে ১৩৩৩ আশ্বিনের সওগাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সর্বহারা' কবিতাটি ২৫শে চৈত্র ১৩৩২ তারিখের, 'কৃষাণের গান' ৮ই পৌষ ১৩৩২ তারিখের এবং 'শ্রমিকের গান' ৬ই ফাল্গুন ১৩৩২ তারিখের 'লাঙলে' বাহির হইয়াছিল। ২৩শে মাঘ ১৩৩২ মুতাবিক ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ তারিখে কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্বোধনী সঙ্গীত-রূপে কবি-কর্তৃক 'শ্রমিকের গান' গীত হইয়াছিল।

'ধীবরদের গান' ৪ঠা চৈত্র ১৩৩২ মুতাবিক ১৮ই মার্চ ১৯২৬ তারিখে 'লাঙলে' 'জেলেদের গান' শিরোনামে ছাপা হয় ; তাহার পাদটীকায় মুদ্রিত আছে ; "মাদারিপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎসজীবী সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনের উদ্বোধন-সঙ্গীত।" উক্ত সম্মিলনী সম্পর্কে সে-সংখ্যার লাঙলে বলা হয় : "গত ১১ই ও ১২ই মার্চ (২৭শে ও ২৮শে ফাল্গুন) তারিখে ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর শহরে মৎস্যজীবী সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন হয়। ১০ই মার্চ সন্ধ্যায় সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার মহাশয় ষ্টিমার-যোগে আসেন। তাঁর সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার ও শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার ছিলেন।"

'ছাত্রদলের গান' ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে কৃষ্ণনগরে ছাত্র ও যুব-সম্মেলনের উদ্বোধন-সঙ্গীত রূপে কবি-কর্তৃক গীত হইয়াছিল।

'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠের 'বঙ্গবাণী'তে বাহির হইয়াছিল। তাহার পাদটীকায় মুদ্রিত আছে : "কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মিলনীতে গীত।" ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন-সঙ্গীত রূপে কবি-কর্তৃক গীত হইয়াছিল। ১৩৩৩ আশ্বিনের 'কালি-কলমে' এই গানটি কবি-কৃত স্বরলিপি-সহ প্রকাশিত হয়।

'আমার কৈফিয়ৎ' ১৩৩২ আশ্বিনে ৫ম বর্ষের ৪১শ সংখ্যক 'বিজলী'তে বাহির হইয়াছিল।

'গোকুল নাগ' ১৩৩২ অগ্রহায়ণের 'কল্লোল'-এ ছাপা হইয়াছিল। গোকুলচন্দ্র নাগ ১৯২২ হইতে ১৯২৫ পর্যন্ত 'কল্লোল' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার গল্পগ্রন্থ 'সোনার ফুল' ও উপন্যাস 'পথিক' সুপরিচিত। তিনি ১৩৩২ সালের ৮ই আশ্বিন একত্রিশ বৎসর বয়সে দার্জিলিঙে পরলোকগমন করেন।

পু ন শ্চ

সর্বহারা ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : ব্রজবিহারী বর্মণ রায়, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২+৬৪, মূল্য এক টাকা ছয় আনা।

১৯৫৯ বঙ্গাব্দে কলকাতার নলেজ হোম থেকে *সর্বহারার* দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে *সাম্যবাদী* ও *সর্বহারার* কিছু কবিতা এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কিছু কবিতা সংগৃহীত হয়। এই সংস্করণের মুখবন্ধ রচনা করেন রবীউদ্দীন আহমদ। সূচি এইরূপ : কৃষাণের গান, শ্রমিকের গান, ধীবরদের গান (তিনটিই *সর্বহারা* থেকে), চোর-ডাকাত, মিথ্যাবাদী, রাজা-প্রজা, সাম্য (চারটিই *সাম্যবাদী* থেকে), প্রার্থনা (*সর্বহারা* থেকে), চাষার গান, ছাদপেটার গান, চীন ও ভারত, নারী, চাষীর গান, এই দেশ কার, বিদায় মাভৈ, জাকাত লইতে এসেছে ডাকাত চাঁদ ও শ্রীমান আবদুল মুহিত চৌধুরী স্নেহভাজনেষু (গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত এবং বেশির ভাগই সর্বহারা প্রকাশের অনেক পরে লিখিত)। এই সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত 'নারী ও *সাম্যবাদী*'র নারী স্বতন্ত্র কবিতা। *সর্বহারা* গ্রন্থের মূল উৎসর্গপত্র বদলে দিয়ে এই সংস্করণে 'উৎসর্গ—মুজফ্‌ফর আহমদ-কে' মুদ্রিত হয়।

নজরুল-রচনাবলী'র নতুন সংস্করণে সর্বহারার প্রথম সংস্করণের পাঠ ও ক্রম অনুসৃত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণভুক্ত অতিরিক্ত নটি কবিতা *নজরুল-রচনাবলী*'র তৃতীয় খণ্ডে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা অংশে মুদ্রিত হলো।

বুলবুল

'বুলবুল' প্রথম সংস্করণ ১৩৩৫ আশ্বিনে প্রকাশিত হয় ; তাহাতে ৪২টি গান অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ১৩৩৫ চৈত্রে দ্বিতীয় সংস্করণে 'নূতন গান' বিভাগে শেষের ৭টি গান সংযোজিত হয়। ১৩৩৫ পৌষের সওগাতে অমলেন্দু দাশগুপ্ত 'বুলবুলের কবি' শিরোনামে 'বুলবুল'- এর একটি আলোচনা লেখেন ; উহা দ্বিতীয় সংস্করণের গোড়ায় সন্নিবেশিত হয়।

'বাগিচায় বুলবুলি তুই' ১৩৩৩ মাঘের কল্লোলে প্রকাশিত হয়। রচনার স্থান ও তারিখ : কৃষ্ণনগর, ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৩।

'আমারে চোখ ইশারায়' ১৩৩৩ চৈত্রের কল্লোলে প্রকাশিত হয়। কল্লোল হইতে উহা ১৩৩৪ আষাঢ়ের সওগাতে উদ্ধৃত হয়।

'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে' ১৩৩৩ ফাল্গুনের এবং 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে' ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠের কল্লোলে প্রকাশিত হয়।

'কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায়' ১৩৩৪ শ্রাবণের নওরোজে এবং 'মৃদুল বায়ে বকুল-ছায়ে' ১৩৩৩ মাঘের কল্লোলে প্রকাশিত হয়।

'কে বিদেশী বন-উদাসী' ১৩৩৪ পৌষের এবং উহার কবি-কৃত স্বরলিপি ১৩৩৪ চৈত্রের সওগাতে প্রকাশিত হয়।

'করুণ কেন অরুণ আঁখি' এবং 'এত জল ও-কাজল চোখে' ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠের 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়। এ দুইটি গান কবি-কৃত স্বরলিপি-সহ যথাক্রমে ১৩৩৪ আষাঢ় ও আশ্বিনের নওরোজে বাহির হয়।

'আসে বসন্ত ফুল-বনে' ১৩৩৩ পৌষের সওগাতে প্রকাশিত হয়। রচনার স্থান ও তারিখ : কৃষ্ণনগর, ২৮ অগ্রহায়ণ ৩৩। পাদটীকায় মুদ্রিত আছে : 'বিখ্যাত উর্দু গজল 'কিসকে খেরামে নাজ্‌নে কবর্‌মে দিল্‌ হিলা দিয়া'—সুর।

'দুরন্ত বায়ু পুরবইয়া' ১৩৩৩ ফাল্গুনের সওগাতে প্রকাশিত হয়। রচনার স্থান ও তারিখ : কৃষ্ণনগর, ১ পৌষ ১৩৩৩। পাদটীকায় মুদ্রিত আছে : 'উর্দু গজল : 'নাজ্‌ভি হোতা রহে হোতি রহে বে-দাদ্‌ ভি'—সুর।'

'চেয়ো না সুনয়না' ১৩৩৪ অগ্রহায়ণের সওগাতে এবং 'নিশি ভোর হল জাগিয়া' ১৩৩৪ চৈত্রের 'প্রগতি'তে প্রকাশিত হয়। 'এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো' ১৩৩৫ বৈশাখের 'প্রগতি'তে কবি-কৃত স্বরলিপি-সহ প্রকাশিত হয়।

'কেন দিলে এ কাঁটা' ১৩৩৪ ভাদ্রের নওরোজে এবং 'সখি বলো বঁধুয়ারে নিরজনে' ১৩৩৪ চৈত্রের সওগাতে প্রকাশিত হয়।

'নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল' ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠের এবং 'পরদেশি বঁধুয়া এলে কি এতদিনে' ১৩৩৪ চৈত্রের কালিকলমে প্রকাশিত হয়।

'আসিলে এ ভাঙা ঘরে' ১৩৩৪ শ্রাবণের নওরোজে কবি-কৃত স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হয়।

'আজি দোল-পূর্ণিমাতে' ১৩৩৪ চৈত্রের এবং 'আজি এ কুসুম-হার' ১৩৩৫ আষাঢ়ের কল্লোলে প্রকাশিত হয়।

'গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু', 'হাজার তারার হার হয়ে গো', 'অধীর অম্বরে গুরু গরজনে', 'চরণ ফেলি গো মরণ-ছন্দে' এবং 'নমো হে নমো যন্ত্রপতি' ১৩৩৪ শ্রাবণের নওরোজে 'সারা ব্রিজ' (সেতুবন্ধ) নাটিকার গান-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'ঝরে ঝরঝর কোন্ গভীর গোপন ধারা', 'হৃদয় যত নিষেধ হানে', 'শুকাল মিলন-মালা' এবং 'স্মরণ-পারের ওগো প্রিয়' ১৩৩৪ আষাঢ়ের নওরোজে 'ঝিলিমিলি' নামক একাঙ্কিকার গান-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'গহীন রাতে ঘুম কে এলে ভাঙাতে' ১৩৩৫ ভাদ্রে 'ধূপছায়া'য় ও 'সওগাত'-এ প্রকাশিত হয়।

'কোন্ শরতে পূর্ণিমা-চাঁদ আসিলে এ ধরাতল' ৩১শে ভাদ্র ১৩৩৫ মুতাবিক ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৮ তারিখে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (জন্ম : ৩১শে ভাদ্র ১২৮৩ মুতাবিক ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬) জন্ম-জয়ন্তী উৎসবে শ্রীমতী সাহানা দেবী কর্তৃক গীত এবং ১৩৩৫ আশ্বিনের কল্লোলে প্রকাশিত হয়।

'কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে' ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠের সওগাতে প্রকাশিত হয়। পাদটীকায় মুদ্রিত আছে : 'উর্দু গজল 'নাজ্ ভি হোতা রহে হোতি রহে বেদাদ্ ভি'—সুর।'

'কেন আন ফুল-ডোর' রচনার স্থান ও তারিখ : 'নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ, ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৫'—উহা ১৩৩৫ মাঘের এবং 'কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া' ১৩৩৫ ফাল্গুনের সওগাতে প্রকাশিত হয়।

পু ন শ্চ

বুলবুল ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের কার্তিকে (নভেম্বর ১৯২৮) প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : গোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরি, ৬১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪+৭০ ; মূল্য এক টাকা ; রাজসংস্করণ পাঁচ সিকা। *বুলবুলের* দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের চৈত্রে ও তৃতীয় সংস্করণ হয় ১৩৩৭-এর ভাদ্রে। *নজরুল-রচনাবলীর* নতুন সংস্করণে তৃতীয় সংস্করণের পাঠ অনুসৃত হয়েছে। এই সংস্করণের প্রকাশক গোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরি, ৬১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট কলিকাতা ; পৃষ্ঠা ৮+১৬+৮০ ; মূল্য এক টাকা চার আনা, রাজসংস্করণ দেড় টাকা।

চোখের চাতক

'চোখের চাতক' প্রথম সংস্করণ ১৩৩৬ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক শ্রীগোপালদাস মজুমদার ; ডি. এম্. লাইব্রেরি, ৬১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রিন্টার : শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, সুধা প্রেস, ১৯৮।১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য

এক টাকা, রাজ-সংস্করণ ১।০। উহাতে ৫৩টি গান অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু 'সূচি'তে আছে ৫১টি গান। উহার 'উৎসর্গ-পত্র'—

কল্যাণীয়া বীণা-কণ্ঠী
শ্রীমতী প্রতিভা সোম
জয়যুক্তাসু।

'আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়ল তরী' ১৩৩৬ আশ্বিনের সওগাতে এবং 'কে তুমি দূরের সাথী' ১৩৩৬ শ্রাবণের কল্লোলে প্রকাশিত হয়।

'আমার সাম্পান যাত্রী না লয়' এবং 'তোমায় কূলে তুলে বন্ধু' ১৩৪৩ ফাল্গুনের বুলবুলে 'চট্টল-গীতিকা' শিরোনামে উদ্ধৃত হয়।

'ওরে মাঝি ভাই' ১৩৩৫ ফাল্গুনের, 'আঁধার রাতে কে গো একেলা' ১৩৩৬ আষাঢ়ের এবং 'জনম জনম গেল আশা-পথ চাহি' ১৩৩৬ অগ্রহায়ণের সওগাতে প্রকাশিত হয়। 'ওরে মাঝি ভাই' রচনার স্থান ও তারিখ : 'চট্টগ্রাম, জানুয়ারি ১৯২৯।'

'পেয়ে কেন নাহি পাই হৃদয়ে মম' ১৩৩৫ সালে ঢাকার 'জাগরণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং 'জাগরণ' হইতে ১৩৩৬ অগ্রহায়ণের 'সঞ্চয়'-এ উদ্ধৃত হয়।

'না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়' ১৩৩৬ কার্তিকের সওগাতে এবং 'পর-জনমে দেখা হবে প্রিয়' ১৩৩৭ অগ্রহায়ণের 'উত্তরা'-য় প্রকাশিত হয়।

'কে ডাকিলে আমারে আঁখি তুলে' ১৩৩৬ পৌষের ও 'কার বাঁশী বাজে মুলতান-সুরে' ১৩৩৬ মাঘের সওগাতে প্রকাশিত হয়।

পু ন শ্চ

চোখের চাতক ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা ৪+৭৮। নজরুল-রচনাবলীর নতুন সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসৃত হয়েছে।

রিক্তের বেদন

'রিক্তের বেদন' ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড ; ২৬/৯/১-এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। প্রকাশকদের পক্ষে জনাব কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক 'নিবেদন'-এ বলেন :

> রণকোলাহলের মত্ততার মাঝে জন্মেছিল তরুণ কবির ভাবরাজ্যের দ্যোতনা-করা এই উচ্ছ্বাস। মেসোপটেমিয়ার ধূলি ঝেড়ে আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকেই একে কোল

দিতে হয়েছিল। আমার অযোগ্যতাই এতদিন কবির হৃদয়োচ্ছ্বাসকে চেপে রেখে সহৃদয় পাঠকবর্গের সহিত তার পরিচয়ের ব্যাঘাত জন্মিয়েছে। এতে কবি এবং তার পাঠকবর্গের প্রতি অন্যায়-অত্যাচারের জন্য আমি দায়ী। অদ্য প্রায়শ্চিত্ত করলাম।

কলিকাতা,
বড়দিন, ১৯২৪।

'রিক্তের বেদন' গল্পটি ১৩২৭ বৈশাখের 'নূর'-এ, 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' ১৩২৬ জ্যৈষ্ঠের 'সওগাত'-এ, 'মেহের-নেগার' ১৩২৬ মাঘের 'নূর'-এ, 'সাঁঝের তারা' ১৩২৭ মাঘের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায়, 'রাক্ষুসী' ১৩২৭ মাঘের 'সওগাত'-এ, 'সালেক' ১৩২৭ আষাঢ়ের 'বকুল'-এ 'সালিক' শিরোনামে এবং 'স্বামীহারা' ১৩২৬ ভাদ্রের 'সওগাত'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'দুরন্ত পথিক' দৈনিক 'নবযুগ' হইতে ১৩২৭ আশ্বিনের 'মোসলেম ভারতে' সঙ্কলিত হইয়াছিল।

'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা।

পুনশ্চ

প্রকাশকালের রিক্তের বেদনের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪+১৬০, মূল্য দেড় টাকা।

মৃত্যুক্ষুধা

'মৃত্যুক্ষুধা' ১৩৩৭ বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উহা ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে ১৩৩৬ ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত সওগাতে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'মৃত্যুক্ষুধা' রচনার সময় কবি সপরিবারে কৃষ্ণনগরে বাস করিতেন। এ-সম্পর্কে জনাব মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখিয়াছেন :

> '১৯২৬ সালের ২রা জানুয়ারি তারিখে নজরুল ইসলাম হুগলি ছেড়েছিল এবং সেইদিনই অল্প কঘন্টার ভিতরে সে কৃষ্ণনগরে পৌঁছে গিয়েছিল। ... কৃষ্ণনগরে প্রথম যে-বাড়িতে নজরুলের ওঠার ব্যবস্থা শ্রী হেমন্তকুমার সরকার করেছিলেন, সেটা ছিল গোলা-পটি মহল্লার মদন সরকারের গলিতে। মদন সরকার হেমন্ত বাবুর বাবার নাম। এটা হেমন্তবাবুদের পুরানো বাড়ি ছিল। ... যে মাস পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে অনেকগুলি সম্মেলন হয়েছিল। ... বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য সে (নজরুল ইসলাম) লিখেছিল 'কাণ্ডারী হুশিয়ার'। ... সম্মেলন ইত্যাদির ঝামেলা মিটে যাওয়ার পরে নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে একটা ভালো বাড়ি পেয়ে সেই বাড়িতে উঠে গেল। বাড়িটি

ছিল স্টেশন রোডের ধারে। একতলা ছোট বাড়ি হলেও খুব চওড়া ছিল তার বারান্দা। পাশে আমের বাগান ছিল এবং এত বেশি খোলা ময়দান ছিল যে, তাকে বাগান-বাড়িও বলা যায়। বাড়ির মালিক ছিলেন একজন খ্রিস্টান মহিলা। ... এই জায়গাটা কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত 'চাঁদ সড়ক' ইলাকা। শ্রমজীবী খ্রিস্টান ও মুসলিমদের বাস এই ইলাকায়। নজরুলের উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধা' এই পরিবেশেই লেখা হয়েছিল।"

— [কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা, ৩৫৬–৩৭৭ পৃ.]

দুর্দিনের যাত্রী

১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৬শে শ্রাবণ মুতাবিক ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১১ই আগস্ট অর্ধসাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। নজরুল ইসলাম 'ধূমকেতু'তে যে-সকল সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ লেখেন, তাহারই কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া ৫৪ পৃষ্ঠার পুস্তিকা 'দুর্দিনের যাত্রী' প্রকাশিত হয়। প্রকাশক—নজরুল ইসলাম। প্রিন্টার—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'ভট্টাচার্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস', ৪নং বৃন্দাবন পাল বাই লেন, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা। পুস্তিকাখানিতে প্রকাশকালের উল্লেখ নাই। তাহা বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক বাজেয়াফ্‌ত হইয়া যায়।

'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৮ই ভাদ্র, 'তুবড়ী বাঁশীর ডাক' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১২ই ভাদ্র, 'মোরা সবাই স্বাধীন : মোরা সবাই রাজা' এবং 'স্বাগত' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের এই ভাদ্র, 'মেয় ভুখা হুঁ' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৯শে ভাদ্র, 'পথিক'। তুমি পথ হারাইয়াছ?' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৫ই আশ্বিন এবং 'আমি সৈনিক' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১৪ই কার্তিক তারিখের 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুনশ্চ

দুর্দিনের যাত্রী ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে প্রকাশিত হয় বলে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম নির্দেশ করেছেন।

রুদ্রমঙ্গল

'রুদ্র-মঙ্গল' ৭৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকা। গ্রন্থাকার কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশকালের উল্লেখ নাই। প্রিন্টার—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'ভট্টাচার্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২ নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য—আট আনা।

'রুদ্র-মঙ্গলও বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক বাজেয়াফত হইয়া যায়।

'রুদ্রমঙ্গল' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১লা ভাদ্র, 'আমার পথ' ("ধূমকেতু'র পথ" শিরোনামে) ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৬শে শ্রাবণ, 'মোহররম' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১৬ই ভাদ্র, 'বিষবাণী' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৬শে ভাদ্র, 'ক্ষুদিরামের মা' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২রা আশ্বিন এবং 'ধূমকেতুর পথ' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৬শে আশ্বিন তারিখের 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা এপ্রিল মুতাবিক ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১৯শে চৈত্র শুক্রবার কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। সেই উপলক্ষে নজরুল ইসলাম ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট মুতাবিক ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র তারিখের 'গণবাণী'তে 'মন্দির ও মসজিদ' এবং ২রা সেপ্টেম্বর মুতাবিক ১৬ই ভাদ্র তারিখের 'গণবাণী'তে 'হিন্দু-মুসলমান' লেখেন।

পুনশ্চ

'রুদ্রমঙ্গল' বর্মণ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, থেকে প্রকাশিত হয় বলে আলী আহমদ উল্লেখ করেছেন। এই প্রকাশনা সংস্থা হয়তো বইটির পরিবেশক ছিলেন। প্রকাশকাল সম্ভবত ১৯৭৭।

নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

১৮৯৯ ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ২৪শে মে ১৮৯৯ সালে পশ্চিম-বঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ। পিতা কাজী ফকির আহমদ। মাতামহ তোফায়েল আলী। মাতা জাহেদা খাতুন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আলী হোসেন। ভগ্নী উম্মে কুলসুম। নজরুলের ডাক-নাম ছিল দুখু মিয়া।

১৯০৮ পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু।

১৯০৯ গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাশ, মক্তবে শিক্ষকতা, মাজারের খাদেম, লেটো দলের সদস্য ও পালাগান ইত্যাদি রচনা।

১৯১১ মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১২ স্কুল ত্যাগ, বাসুদেবের কবিদলের সঙ্গে সম্পর্ক, রেলওয়ে গার্ড সাহেবের খানসামা, আসানসোলে এম বখ্শের চা রুটির দোকানে চাকুরি, আসানসোলে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ময়মনসিংহের কাজী রফিজউল্লাহ ও তাঁর পত্নী শামসুন্নেসা খানমের স্নেহ লাভ।

১৯১৪ কাজী রফিজউল্লাহ্‌র সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের কাজীর-সিমলা, দরিরামপুর গমন এবং দরিরামপুর স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১৫-১৭ রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন, শৈলজানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রিটেস্ট পরীক্ষার আগে সেনাবাহিনীর ৪৯নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগদান।

১৯১৭-১৯ সৈনিক জীবন, প্রধানত, করাচিতে গন্জা বা আবিসিনিয়া লাইনে অতিবাহিত, ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার পদে উন্নতি, সাহিত্যচর্চা। কলকাতার মাসিক সওগাতে 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্প এবং ত্রৈমাসিক বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় 'মুক্তি' কবিতা প্রকাশ।

১৯২০ মার্চ মাসে সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তন, বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটস্থ দফতরে মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে অবস্থান, কলকাতায় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন শুরু, 'মোসলেম ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিবিধ রচনা প্রকাশ।

সাংবাদিক জীবন, মে মাসে এ. কে. ফজলুল হকের সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদক পদে যোগদান, নজরুল ও মুজফ্ফর আহ্মদের ৮-এ টার্নার স্ট্রিটে অবস্থান, সেপ্টেম্বর মাসে 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত এবং নজরুল ও মুজফ্ফর আহ্মদের বরিশাল ভ্রমণ, 'নবযুগ'-এর চাকুরি পরিত্যাগ, বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দেওঘর গমন।

১৯২১ দেওঘর থেকে প্রত্যাবর্তন, 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদক আফজাল-উল-হকের সঙ্গে ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটে অবস্থান, পুনরায় 'নবযুগে' যোগদান।

এপ্রিল মাসে আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা গমন, কান্দির পাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও বিরজাসুন্দরী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ, আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুর গমন ও দুই মাস দৌলতপুর অবস্থান, আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে বিবাহ। কুমিল্লা থেকে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের সকলের বিবাহে যোগদান, বিবাহের রাত্রেই নজরুলের দৌলতপুর ত্যাগ ও পরদিন কুমিল্লা গমন এবং অবস্থান। কলকাতায় বিবাহ-সংক্রান্ত গোলযোগের বার্তা প্রেরণ।

জুলাই মাসে মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর হয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন, ৩/৪সি তালতলা লেনের বাড়িতে অবস্থান, অক্টোবর মাসে অধ্যাপক (ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নভেম্বর মাসে পুনরায় কুমিল্লা গমন, অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ডিসেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় তালতলা লেনের বাড়িতে বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা। 'বিদ্রোহী' সাপ্তাহিক 'বিজলী' ও মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ছাপা হলে প্রবল আলোড়ন।

১৯২২ চার মাস কুমিল্লা অবস্থান, আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলার সঙ্গে সম্পর্ক। মার্চ মাসে প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশ। ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু; রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোক সভায় যোগদান, সত্যেন দত্ত সম্পর্কে রচিত শোক-কবিতা পাঠ। দৈনিক 'সেবকে' যোগদান ও চাকরি পরিত্যাগ। ১২ই আগস্ট অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ, ধূমকেতুর জন্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশ, অক্টোবর মাসে 'অগ্নি-বীণা' কাব্য ও 'যুগবাণী' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ, 'যুগবাণী' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' বাজেয়াপ্ত, নভেম্বর মাসে নজরুলকে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আটক। 'ধূমকেতু' পত্রিকাতেই নজরুল প্রথম ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন ১৩ই অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায়।

১৯২৩ জানুয়ারি মাসে বিচারকালে নজরুলের বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' আদালতে উপস্থাপন, এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, আলিপুর জেলে স্থানান্তর, নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' গীতিনাটক উৎসর্গ, হুগলি জেলে স্থানান্তর, মে মাসে নজরুলের অনশন ধর্মঘট, শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, 'Give up hunger strike, our literature claims you', বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে অনশন ভঙ্গ, জুলাই মাসে বহরমপুর জেলে স্থানান্তর, ডিসেম্বরে মুক্তিলাভ।

১৯২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান। মিসেস এম রহমানের উদ্যোগে এপ্রিলে প্রমীলার সঙ্গে বিবাহ, হুগলিতে নজরুলের সংসার স্থাপন, অগাস্টে 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' প্রকাশ ও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, শনিবারের চিঠিতে নজরুল-বিরোধী প্রচারণা। হুগলিতে নজরুলের প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম ও অকালমৃত্যু।

১৯২৫ মে মাসে কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে যোগদান। এই অধিবেশনের গুরুত্ব, মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের যোগদান। জুলাই মাসে বাঁকুড়া সফর, 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক, ডিসেম্বর মাসে নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ ও শামসুদ্দিন হোসায়ন কর্তৃক ভারতীয় কংগ্রেসের অন্তর্গত, মজুর স্বরাজ পার্টি গঠন। ডিসেম্বরে শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের মুখপত্র 'লাঙল' প্রকাশ, প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। 'লাঙল'-এর জন্যেও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী। 'লাঙল' বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রেণীসচেতন পত্রিকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ১৬ই জুন। কবিতাসংকলন 'চিত্তনামা' প্রকাশ।

১৯২৬ জানুয়ারি থেকে কৃষ্ণনগরে বসবাস। মার্চ মাসে মাদারিপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মেলনে যোগদান। এপ্রিল মাসে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত। এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথকে 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংসপথের যাত্রীদল' এবং 'শিকল-পরা ছল' গান শোনান। মে মাসে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', কিষাণ সভায় 'কৃষাণের গান' ও 'শ্রমিকের গান' এবং ছাত্র ও যুব সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' পরিবেশন। জুলাই মাসে চট্টগ্রাম, অক্টোবর মাসে সিলেট এবং যশোর ও খুলনা সফর। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম। আর্থিক অনটন। 'দারিদ্র্য' কবিতা রচনা। নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চ পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয় বরণ। ডিসেম্বর থেকে গজল রচনার সূত্রপাত, 'বাগিচায়

বুলবুলি', 'আসে বসন্ত ফুলবনে', 'দুরন্ত বায়ু পুরবইয়াঁ', 'মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে' প্রভৃতি গান ও 'খালেদ' কবিতা রচনা। নজরুলের ক্রমাগত অসুস্থতা।

১৯২৭ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা সফর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান ও 'খোশ আমদেদ' গানটি পরিবেশন, 'খালেদ' কবিতা আবৃত্তি।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণবাণী' (সম্পাদক মুজফ্ফর আহ্‌মদ)–র জন্যে এপ্রিল মাসে 'ইন্টারন্যাশনাল', 'রেড ফ্লাগ' ও শেলির ভাব অবলম্বনে যথাক্রমে 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্ত–পতাকার গান' ও 'জাগর তূর্য' রচনা। জুলাই মাসে 'গণবাণী' অফিসে পুলিশের হানা। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত বাদ–প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক এবং 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্র–পত্রিকায় বিতর্ক। ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ এবং নজরুলের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ', প্রবন্ধ 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক। বিতর্কের অবসানে প্রমথ চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা' প্রবন্ধ।

'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্পণ' প্রভৃতি রক্ষণশীল মুসলমান পত্রিকায় নজরুল–সমালোচনা। ইবরাহিম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল হুসেনের নজরুল–সমর্থন।

১৯২৮ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান, এই সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতের জন্যে 'নতুনের গান' রচনা। ঢাকায় অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, মিস্ ফজিলতুন্নেসা, প্রতিভা সোম, উমা মৈত্র প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। মে মাসে নজরুলের মাতা জাহেদা খাতুনের এন্তেকাল।

সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শরৎ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনা।

অক্টোবর 'সঞ্চিতা' প্রকাশ। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় নজরুল বিরোধিতা। 'সওগাত' পত্রিকার নজরুল সমর্থন। ডিসেম্বর মাসে নজরুলের রংপুর ও রাজশাহি সফর।

কলকাতায় নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলনে যোগদান। নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় নিখিল ভারত সোশিয়ালিস্ট যুবক কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান, কবি গোলাম মোস্তফার নজরুল-বিরোধিতা।

ডিসেম্বরের শেষে কৃষ্ণনগর থেকে নজরুলের কলকাতা প্রত্যাবর্তন, 'সওগাতে' যোগদান। প্রথমে ১১নং ওয়েলেস্‌লি স্ট্রিটে 'সওগাত' অফিস সংলগ্ন ভাড়া বাড়িতে ও পরে ৮/১ পান বাগান লেনে ভাড়া বাড়িতে বসবাস। নজরুলের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির যোগাযোগ।

১৯২৯ ১৫ই ডিসেম্বর এলবার্ট হলে নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান, উদ্যোক্তা 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হবীবুল্লাহ্ বাহার প্রমুখ। সংবর্ধনা সভায় সভায় সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৩০ 'প্রলয়-শিখা' প্রকাশ ও কবির বিরুদ্ধে মামলা ও ছয় মাসের কারাদণ্ড। কিন্তু গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে কারাবাস থেকে মুক্তি। কবির প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু।

১৯৩১ সিনেমা ও মঞ্চ-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ।

'আলেয়া' গীতিনাট্য রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ। নজরুলের অভিনয়ে অংশগ্রহণ।

১৯৩২ নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে' সভাপতিত্ব।

ডিসেম্বরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের' পঞ্চম অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন।

১৯৩৩ গ্রীষ্মে 'বর্ষবাণী' সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে দার্জিলিং ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'ধ্রুব' চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়, সঙ্গীত পরিচালনা।

১৯৩৪ গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান 'কলগীতি' প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৬ ফরিদপুর 'মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কনফারেন্সে' সভাপতিত্ব।

১৯৩৮ এপ্রিলে, কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে' কাব্য শাখার সভাপতিত্ব।

ছায়াচিত্র 'বিদ্যাপতি'র কাহিনী রচনা।

১৯৩৯ ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে'র কাহিনী রচনা।

১৯৪০ কলকাতা বেতারে 'হারামণি', 'নবরাগ মালিকা' প্রভৃতি নিয়মিত সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রচার। লুপ্ত রাগ-রাগিণীর উদ্ধার ও নবসৃষ্ট রাগিণীর প্রচার অনুষ্ঠান দুটির বৈশিষ্ট্য।

অক্টোবর মাসে, নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'নবযুগে'র প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত। ডিসেম্বরে কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ।

প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত।

১৯৪১ মার্চে, বনগাঁ সাহিত্য-সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

৫ই ও ৬ই এপ্রিল নজরুলের সভাপতিত্বে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জুবিলি উৎসবে সভাপতিরূপে জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান, 'যদি আর বাঁশি না বাজে'।

১৯৪২ ১০ই জুলাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ১৯শে জুলাই, কবি জুলফিকার হায়দারের চেষ্টায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক সহায়তায় নজরুলের বায়ু পরিবর্তনের জন্য ডাঃ সরকারের সঙ্গে মধুপুর গমন। মধুপুরে অবস্থার অবনতি। ২১শে সেপ্টেম্বর মধুপুর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লুম্বিনি পার্কে' চিকিৎসার জন্য ভর্তি। অবস্থার উন্নতি না ঘটায় তিন মাস পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। কলকাতায় নজরুল সাহায্য কমিটি গঠন।

সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ—	ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম সম্পাদক—	সজনীকান্ত দাস
	জুলফিকার হায়দার
কার্যনির্বাহী কমিটির সভ্য—	এ. এফ. রহমান
	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ
	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
	তুষারকান্তি ঘোষ
	চপলাকান্ত ভট্টাচার্য
	সৈয়দ বদরুদ্দোজা
	গোপাল হালদার।

এই সাহায্য কমিটি কর্তৃক পাঁচ মাস কবিকে মাসিক দুইশত টাকা করে সাহায্য প্রদান।

১৯৪৪ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার 'নজরুল-সংখ্যা' (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১) প্রকাশ।

১৯৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজরুলকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান।

১৯৪৬ নজরুল পরিবারের অভিভাবিকা নজরুলের শাশুড়ি গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ। নজরুলের সৃষ্টিকর্ম মূল্যায়নে প্রথম গ্রন্থ কাজী আবদুল ওদুদ কৃত

'নজরুল-প্রতিভা' প্রকাশ। গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবি আবদুল কাদির প্রণীত নজরুল-জীবনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সংযোজিত।

১৯৫২ 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন। সম্পাদক কাজী আবদুল ওদুদ। জুলাই মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে রাঁচি মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ। চার মাস চিকিৎসা, সুফলের অভাবে কলকাতা আনয়ন।

১৯৫৩ মে মাসে কবি ও কবিপত্নীকে চিকিৎসার জন্যে লন্ডন প্রেরণ। মানসিক চিকিৎসক উইলিয়ম স্যারগন্ট, ই. এ. বেটন, ম্যাকসিক্ ও রাসেল ব্রেনের মধ্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে মতভেদ, ডিসেম্বর মাসে নজরুলকে ভিয়েনাতে প্রেরণ। ভিয়েনায় বিখ্যাত স্নায়ুচিকিৎসক ডা. হ্যান্স হফ্ কর্তৃক সেরিব্রাল এনজিওগ্রাম পরীক্ষার ফল, নজরুল 'পিকস ডিজিজ' নামে মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত এবং তা চিকিৎসার বাইরে। ডিসেম্বর মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

১৯৬০ ভারত সরকার কর্তৃক নজরুলকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান।

১৯৬২ ৩০শে জুন নজরুল-পত্নী প্রমীলা নজরুলের দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন। প্রমীলা নজরুলকে চুরুলিয়ায় দাফন। নজরুলের দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের মৃত্যু যথাক্রমে ১৯৭৪ ও ১৯৭৯ সালে।

১৯৬৬ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক 'নজরুল-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত।

১৯৬৯ সম্বিতহারা কবির অসুস্থতার সপ্তবিংশ বৎসর পূর্ণ এবং সর্বত্র কবি কাজী নজরুল ইসলামের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন। কলকাতার রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭১ ২৫শে মে নজরুল জন্মবার্ষিকীর দিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নব পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু।

১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নজরুল-জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে নজরুলকে সপরিবার ঢাকায় আনয়ন, ধানমণ্ডিতে কবিভবনে অবস্থান এবং সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড্ডীন। স্বাধীন বাংলাদেশে কবির প্রথম জন্মবার্ষিকী কবিকে নিয়ে উদ্‌যাপন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক কবিভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

১৯৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭৫ ২২শে জুলাই কবিকে পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তর, ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট মোট এক বছর এক মাস আট দিন পিজি হাসপাতালের ১৯৭নং কেবিনে নিঃসঙ্গ জীবন।

১৯৭৬ ২১শে ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' প্রচলন ও নজরুলকে পদক প্রদান।

ঐ বছরেই আগস্ট মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি। ২৭শে আগস্ট শুক্রবার বিকেল থেকে কবির শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি ব্রঙ্কো-নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ২৯শে আগস্ট রবিবার সকালে কবির দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ ডিগ্রি অতিক্রম করে যায়। কবিকে অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং সাকশান-এর সাহায্যে কবির ফুসফুস থেকে কফ ও কাশি বের করার চেষ্টা চলে। কিন্তু চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কবির অবস্থার উন্নতি হয় না—সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সাল মোতাবেক ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বেতার এবং টেলিভিশনে কবির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হলে পিজি হাসপাতালে শোকাহত মানুষের ঢল। কবির মরদেহ প্রথমে পিজি হাসপাতালের গাড়ি বারান্দার ওপরে, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি-র সামনে রাখা হয়। অবিরাম জনস্রোত কবির মরদেহে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

কবির নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বাদ আসর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শামিল হন। নামাজে জানাজা শেষে শোভাযাত্রা সহযোগে কবির জাতীয় পতাকা শোভিত মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। কবির মরদেহ বহন করেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ, বি. ডি. আর. প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়। পরবর্তী কালে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৮-২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে নজরুল-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন। এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

নজরুল-গ্রন্থপঞ্জি

ব্যথার দান	গল্প। ফাল্গুন ১৩২৮, ১লা মার্চ ১৯২২। উৎসর্গ—'মানসী আমার! মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করোনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম'।
অগ্নি-বীণা	কবিতা। কার্তিক ১৩২৯, ২৫শে অক্টোবর ১৯২২। উৎসর্গ—'ভাঙা-বাংলার রাঙা-যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
যুগ-বাণী	প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩২৯, ২৬শে অক্টোবর ১৯২২। বাজেয়াপ্ত ২৩শে নভেম্বর ১৯২২, দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬।
রাজবন্দীর জবানবন্দী	ভাষণ। ১৩২৯ সাল, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
দোলন-চাঁপা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩০, অক্টোবর ১৯২৩।
বিষের বাঁশী	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, ১০ই আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে'। বাজেয়াপ্ত ২২শে অক্টোবর ১৯২৪, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৫।
ভাঙার গান	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে'। বাজেয়াপ্ত ১১ই নভেম্বর ১৯২৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯।
রিক্তের বেদন	গল্প। পৌষ ১৩৩১, ১২ই জানুয়ারি ১৯২৫।
চিত্তনামা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩২, আগস্ট ১৯২৫, উৎসর্গ—'মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে'।
ছায়ানট	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩২, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫। উৎসর্গ—'আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ করকমলে'।
সাম্যবাদী	কবিতা। পৌষ ১৩৩২, ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৫।

পূবের হাওয়া	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৩২, ৩০শে জানুয়ারি ১৯২৬।
ঝিঙে ফুল	ছোটদের কবিতা। চৈত্র ১৩৩২, ১৪ই এপ্রিল ১৯২৬।
দুর্দিনের যাত্রী	প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৩৩, অক্টোবর ১৯২৬।
সর্বহারা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৩, ২৫শে অক্টোবর ১৯২৬। উৎসর্গ—'মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)-র শ্রীচরণারবিন্দে'।
রুদ্র-মঙ্গল	প্রবন্ধ। ১৯২৭।
ফণি-মনসা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩৪, ২৯শে জুলাই ১৯২৭।
বাঁধনহারা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭। উৎসর্গ—'সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু'।
সিন্ধু-হিন্দোল	কবিতা। উৎসর্গ—বাহার ও নাহারকে, ১৩৩৪/১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ২রা অক্টোবর ১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ১৪ই অক্টোবর ১৯২৮। উৎসর্গ— 'বিশ্বকবি সম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
বুলবুল	গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর, ১৯২৮। উৎসর্গ—'সুর-শিল্পী, বন্ধু দিলীপকুমার রায় করকমলেষু'।
জিঞ্জীর	কবিতা ও গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৮।
চক্রবাক	কবিতা। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ—'বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিন্দেষু'।
সন্ধ্যা	কবিতা ও গান। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ—'মাদারিপুর 'শান্তি-সেনা'-র কর-শতদলে ও বীর সেনানায়কের শ্রীচরণাম্বুজে'।
চোখের চাতক	গান। পৌষ ১৩৩৬, ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯। উৎসর্গ—'কল্যাণীয়া বীণা-কণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু'।
মৃত্যু-ক্ষুধা	উপন্যাস। মাঘ ১৩৩৬, জানুয়ারি ১৯৩০।
রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ	অনুবাদ কবিতা। আষাঢ় ১৩৩৭, ১৪ই জুলাই ১৯৩০। উৎসর্গ—'বাবা বুলবুল ! ...'
নজরুল-গীতিকা	গান। ভাদ্র ১৩৩৭, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩০। উৎসর্গ—'আমার গানের বুলবুলিরা ! ....'

ঝিলিমিলি	নাটিকা। অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩০।
প্রলয়-শিখা	কবিতা ও গান। ১৩৩৭, আগস্ট ১৯৩০। গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০। কবির বিরুদ্ধে ১১ই ডিসেম্বর মামলা এবং ছয় মাসের কারাদণ্ড, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০ কবির জামিন লাভ, আপিল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মার্চে অনুষ্ঠিত গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে সরকার পক্ষের অনুপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ ১৯৩১ কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে কবির মামলা থেকে অব্যাহতি কিন্তু 'প্রলয়-শিখা'র নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।
কুহেলিকা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।
নজরুল-স্বরলিপি	স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৩৮, ২৫শে আগস্ট ১৯৩১।
চন্দ্রবিন্দু	গান। ১৩৩৮, সেপ্টেম্বর ১৯৩১। উৎসর্গ—'পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু'। বাজেয়াপ্ত ১৪ই অক্টোবর ১৯৩১। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৩০শে নভেম্বর ১৯৪৫।
শিউলিমালা	গল্প। কার্তিক ১৩৩৮, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩১।
আলেয়া	গীতিনাট্য। ১৩৩৮, ১৯৩১। উৎসর্গ—'নটরাজের চির নৃত্যসাথী সকল নট-নটীর নামে 'আলেয়া' উৎসর্গ করিলাম'।
সুরসাকী	গান। আষাঢ় ১৩৩৯, ৭ই জুলাই ১৯৩২।
বন-গীতি	গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩২। উৎসর্গ—'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদ আমার গানের ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে'।
জুলফিকার	গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর।
পুতুলের বিয়ে	ছোটদের নাটিকা ও কবিতা। সম্ভবত চৈত্র ১৩৪০, এপ্রিল ১৯৩৩।
গুল-বাগিচা	গান। আষাঢ় ১৩৪০, ২৭শে জুন ১৯৩৩। উৎসর্গ—'স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী আমার অন্তরতম বন্ধু শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিন্নহৃদয়েষু—'
কাব্য-আমপারা	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩। উৎসর্গ—'বাংলার নায়েবে-নবী মৌলবি সাহেবানদের দস্ত মোবারকে'।
গীতি-শতদল	গান। বৈশাখ ১৩৪১, এপ্রিল ১৯৩৪।
সুরলিপি	স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৪১, ১৬ই আগস্ট ১৯৩৪।

সুরমুকুর	স্বরলিপি। আশ্বিন ১৩৪১, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪।
গানের মালা	গান। কার্তিক ১৩৪১, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৪। উৎসর্গ—'পরম স্নেহভাজন শ্রীমান অনিলকুমার দাস কল্যাণীয়েষু—'।
মক্তব সাহিত্য	পাঠ্যপুস্তক। শ্রাবণ ১৩৪২, ৩১শে জুলাই ১৯৩৫।
নির্ঝর	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৪৫, ২৩শে জানুয়ারি ১৯৩৯।
নতুন চাঁদ	কবিতা। চৈত্র ১৩৫১, মার্চ ১৯৪৫।
মরু-ভাস্কর	কাব্য। ১৩৫৭, ১৯৫১।
বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড)	গান। ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯।
সঞ্চয়ন	কবিতা ও গান। ১৩৬২, ১৯৫৫।
শেষ সওগাত	কবিতা ও গান। বৈশাখ, ১৩৬৫, ১৯৫৯।
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, ডিসেম্বর ১৯৫৯।
মধুমালা	গীতিনাট্য। মাঘ ১৩৬৫, জানুয়ারি ১৯৬০।
ঝড়	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
ধূমকেতু	প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে	ছোটদের কবিতা ও নাটিকা। ১৩৭০, ১৯৬৪।
রাঙাজবা	শ্যামাসঙ্গীত। বৈশাখ ১৩৭৩, এপ্রিল ১৯৬৬।
নজরুল-রচনা-সম্ভার	আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, মে ১৯৬৫।
নজরুল-রচনাবলী	প্রথম খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৬। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	দ্বিতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। পৌষ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৭। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	তৃতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ফাল্গুন ১৩৭৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৭০। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	চতুর্থ খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, মে ১৯৭৭। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, প্রথমার্ধ। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১, মে ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ। পৌষ ১৩৯১, ডিসেম্বর ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

নজরুল-গীতি অখণ্ড	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
অপ্রকাশিত নজরুল	আবদুল আজিজ আল্ আমান সম্পাদিত। অগ্রহায়ণ ১৩৯৬, নভেম্বর ১৯৮৯। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
লেখার রেখায় রইল আড়াল	কবিতা ও গান। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। ভাদ্র ১৪০৫, আগস্ট ১৯৯৮। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
জাগো সুন্দর চির কিশোর	সংগ্রহ ও সম্পাদনা : আসাদুল হক। ২৮শে আগস্ট ১৯৯১। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
নজরুলের ধূমকেতু	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত। ফাল্গুন ১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১।
নজরুলের লাঙল	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত। জৈষ্ঠ্য ১৪০৮, মে ২০০১।
কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র	প্রথম খণ্ড। কলকাতা বইমেলা ২০০১। দ্বিতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, জুন ২০০১। তৃতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, জুন ২০০২। চতুর্থ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, জুন ২০০৩। পঞ্চম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, জুন ২০০৪। ষষ্ঠ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, জুন ২০০৫। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
নজরুলের হারানো গানের খাতা	সম্পাদনা : মুহম্মদ নূরুল হুদা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। আষাঢ় ১৪০৪, জুন ১৯৯৭।
নজরুল-গীতি অখণ্ড	প্রথম সংস্করণ : সম্পাদক, আবদুল আজিজ আল-আমান। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : সম্পাদক, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

'নজরুল-রচনাবলী'-তে অন্তর্ভুক্ত গানের বাণীর সঙ্গে নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর পাঠান্তর

নজরুল-সঙ্গীতের কোনো কোনো বাণীর সঙ্গে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত নজরুল-সঙ্গীতের বাণীর কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'তেও এই ধরনের পার্থক্য পাওয়া যায়। নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত এবং নজরুল অনুমোদিত নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর সঙ্গে না মিলানোর দরুন এবং নজরুলের গানের বইয়ে ও পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত বাণীর উপর নির্ভর করার ফলে কোথাও কোথাও এই পার্থক্য ও বাণীর পাঠান্তর রয়ে গেছে। 'নজরুল-রচনাবলী'তে প্রকাশিত নজরুল-সঙ্গীতের বাণীর সঙ্গে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর যে পার্থক্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে রয়েছে তা নীচে 'নজরুল-রচনাবলী' থেকে এবং নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী থেকে যতদূর সম্ভব পাশাপাশি তুলে ধরে দেখানো হলো। এই তুলনামূলক বিষয়টি দেখানো হয়েছে নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত বিভিন্ন নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ এবং 'আদি গ্রামোফোন রেকর্ডভিত্তিক নজরুল-সঙ্গীতের নির্বাচিত সংকলন' (১৯৯৭) শীর্ষক গ্রন্থের ভিত্তিতে।

নজরুলের গানের বই 'বুলবুল'	'নজরুল-রচনাবলী'	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী	বাণীর পার্থক্য
গানের প্রথম পংক্তি	গানের প্রথম পংক্তি	গানের প্রথম পংক্তি	
১	২	৩	৪
১. ভুলি কেমনে আজো যে মনে	ভুলি কেমনে আজো যে মনে (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়)	ভুলি কেমনে আজো যে মনে (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) রেকর্ড নং H.M.V. P 9974 শিল্পী : মিস্ আঙ্গুরবালা	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'তরুরা রিক্ত-পাতা আসলো তাই ফুল-বারতা ফুলেরা গলে ঝরেছে বলে ভরেছে ফলে বিটপী শাখা' ['নজরুল-রচনাবলী'তে স্তবকটি আছে]
২. কে বিদেশী বন-উদাসী	কে বিদেশী বন-উদাসী (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	কে বিদেশী বন-উদাসী (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.N.3262 শিল্পী : হরিমতী	২. আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'সহসা জাগি আধেক রাতে শুনি সে বাঁশী বাজে হিয়াতে, বাহু-সিথানে কে কে জানে কাঁদে গো পিয়া বাঁশীর সনে।'

৩. করুণ কেন অরুণ আঁখি	করুণ কেন অরুণ আঁখি (গানের স্তবক সংখ্যা সাত)	করুণ কেন অরুণ আঁখি (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং : H.M.V. P 11687	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত তিনটি স্তবক নেই : ১. 'দুর্দিনের এই দারুণ দিনে শরণ নিলাম পান-শালায় হায় সাহারার প্রথম তাপে পরাণ কাঁপে দিল-কাবাব' ২. 'এই শরাবের নেশার রঙে নয়ন-জলের রঙ লুকাই দেখছি আঁধার জীবন ভরি ভর-পিয়ালার লাল খোয়াব' ৩. 'আমার বুকের শূন্যে কে গো ব্যথার তারে ছড় চালায় গাইছি খুশীর মহ্‌ফিলে গান বেদন-গুণীর বীণ রবাব।'
৪. এত জল ও কাজল চোখে	এত জল ও কাজল চোখে (গানের স্তবক সংখ্যা সাত)	এত জল ও কাজল চোখে (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) রেকর্ড নং P 9974 শিল্পী : মিস্ আঙ্গুরবালা	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ১. 'যেদিনে মোর দেওয়া মালা ছিঁড়িলে আনমনে সখি, জড়াল জুঁই কুসুমী-হার বেণীতে সেদিন ওলো কে॥' ২. 'যে-পথে নীর ভরণে যাও বসে রই সেই পথ-পাশে, দেখি নিত্ কার পানে চাহি কলসীর সলিল ছলকে।'
৫. আসে বসন্ত ফুল বনে	আসে বসন্ত ফুল বনে (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়) আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের নিম্নোক্ত স্তবকটি 'নজরুল-রচনাবলী'তে নেই : 'সোনার গোধূলি নামিয়া আয় আমার রূপালি ফুল-শোভায় আমার সজল আঁখি-পাতায় আয় রামধনু রঙ ধরি'।'	আসে বসন্ত ফুল বনে (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং NG 45 শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ১. 'ফুল-রেণু দখিনা বায় বাতাস করিছে বন-বালায় বন-করবী নিকুঞ্জ ছায় মুকুলিকা ওঠে মঞ্জরি॥' ২. 'কুহু আর্জি ডাকে মুহু মুহু, 'পিউ কাঁহা' কাঁদে উহু উহু পাখায় পাখায় দোঁহে দুহু বাঁধে চঞ্চর চঞ্চরী।' ৩. 'পদ্ম ডলিয়া পায়ে বালা করিয়াছে সারা বন আলা দ্বারে মঞ্জরী-দীপ জ্বালা ডালপালা রচে ফুলছড়ি।'
৬. চেয়োনা সুনয়না আর চেয়োনা ও নয়ন পানে	চেয়োনা সুনয়না আর চেয়োনা ও নয়ন পানে (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়)	চেয়োনা সুনয়না আর চেয়োনা ও নয়ন পানে) (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) রেকর্ড নং H.M.V.N. P-1161 শিল্পী : ইন্দুবালা	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ১. 'কাননে হরিণ কাঁদে সলিল কাঁদে ঘুরছে শফরী। বাঁকায়ে ভুরুর ধনু ফুল-অতনু কুসুম-শর হানে॥' ২. 'জ্বলিছে দিবস রাতি মোমের বাতি রূপের দেওয়ালি নিশিদিন তাই কি জ্বলি পড়ছ গলি আমার নয়ানে।'

৭. পরান প্রিয় ! কেন এলে অবেলায়	পরান প্রিয় ! কেন এলে অবেলায় (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	পরান প্রিয় ! কেন এলে অবেলায় (গানের স্তবক সংখ্যা দুই) রেকর্ড নং : H.M.V. P-11554 শিল্পী : মিস্ মানিকমালা	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'ক্লান্ত দিবস দূরে কাঁদিছে পিলুর সুরে, কেন শত পথ ঘুরে আসিলে হেথায়॥'
৮. নিশি ভোর হলো জাগিয়া	নিশি ভোর হলো জাগিয়া (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	নিশি ভোর হলো জাগিয়া (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং : TWIN FT 3335 শিল্পী : মিস্ আঙ্গুরবালা	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'কত আর সাজাব ডালা, বাসি হয় নিতি যে মালা কত দূরে যাব ভাসিয়া পরান-পিয়া॥'
৯. বসিয়া নদীকূলে এলোচুলে কে উদাসিনী	বসিয়া নদীকূলে এলোচুলে কে উদাসিনী (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়)	বসিয়া নদী কূলে এলোচুলে কে উদাসিনী (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং : NG 45 শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ	আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ১. 'নিশিদিন চাহি তোমারে ওপারে বাজিছে বাঁশি, এপারে বাজে বধূর মল-নূপুর মধুভাষিণী॥' ২. 'আকাশে মেলিয়া আঁখি লেখা কি পড়িছ পিয়ার, কে গো সে রূপ-কুমার তুমি গো যার অনুরাগিণী।'
১০. কেন দিলে এ কাঁটা	কেন দিলে এ কাঁটা (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়)	কেন দিলে এ কাঁটা (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং : H.M.V. N-11735 শিল্পী : কে. মল্লিক	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ১. 'শীতল মেঘ-নীরে ডাকিয়া চাতকীরে নীর ঢালিতে শিরে বাজ কেন হানিলে॥' ২. 'যদি ফুটালে মুকুল কেন শুকাইলে ফুল, কেন কলঙ্ক-টিপে চাঁদের ভুরু আঙিলে॥'
১১. সখি, বলো বধূয়ারে নিরজনে	সখি, বলো বধূয়ারে নিরজনে (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	বলো বধূয়ারে নিরজনে (সখি) (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং : H.M.V. N-7268 শিল্পী : ইন্দুবালা	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'কাঁটার আড়ালে গোলাবের বাগে ফুটিয়েছে কুসুম কপট সোহাগে, সে কুসুম ঘেরা মেহেদীর বেড়া প্রহরী ভোমোরা সে কাননে।'

১২. নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল	নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং : H.M.V. P-11670 শিল্পী : মিস্ আঙ্গুরবালা	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'মরুতে চরণ ফেলে কেন বন-মৃগ এলে, সলিল চাহিতে পেলে মরীচিকা ছল॥'
১৩. এ আঁখিজল মোছ প্রিয়া	এ আঁখিজল মোছ প্রিয়া (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়)	এ আঁখি জল মোছ প্রিয়া (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং : H.M.V. P-11724 শিল্পী : ইন্দুবালা	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ক. 'ঝুরিয়া গেল যে মেঘ রাতে তব আঙিনায়, বৃথা তারে খোঁজ প্রাতে দূর গগন-পারে॥' খ. 'আগুনে মিটালে তৃষা কবি কোন্ অভিমানে, উদিল নীরদ যবে দূর-বন কিনারে॥'
১৪. পরদেশী বধূয়া, এলে কি এতদিনে	পরদেশী বধূয়া, এলে কি এতদিনে (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	পরদেশী বধূয়া, এলে কি এতদিনে (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং : H.M.V. P-11638 শিল্পী : কে. মল্লিক	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'নিতি ফুল সনে ফুটিয়া কাননে ঝরিয়াছি সাঁঝে নিরাশ হুতাশে, নব নব গানে বেদনা নিবেদন করিয়াছি কবি, প্রিয়, তব পাশে ! এলে আজি উদাসী নিখিল-মন জিনে।'
১৫. আসিলে এ ভাঙা ঘরে কে মোর রাঙা অতিথি	আসিলে এ ভাঙা ঘরে কে মোর রাঙা অতিথি (গানের স্তবক সংখ্যা সাত)	আসিলে এ ভাঙা ঘরে কে মোর রাঙা অতিথি (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) রেকর্ড নং : H.M.V. P-11743 শিল্পী : মিস আঙ্গুরবালা	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ক. 'বনের কেশর গাথে কদম কেশর ঝুরি, শিশির-চুনীর হারে উজল উশীর সিঁথি।' খ. 'মিলন মালায় বাজে গোপন মৃণাল কাঁটা নয়ন-জলে কি কবি আঁকিস তাহারি স্মৃতি॥'

১৬. রুমুঝুমু রুমুঝুমু কে এলে নূপুর পায়	রুমুঝুমু রুমুঝুমু কে এলে নূপুর পায় (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	রুমুঝুমু রুমুঝুমু কে এলে নূপুর পায় (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং : H.M.V. P-1161 শিল্পী : ইন্দুবালা	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'দুলিছে মেখলা-হার শ্যামলী মেঘমালায় উড়িছে অলক কা'র অলকার ঝরোকায়।'
১৭ গহীন রাতে ঘুম কে এলে ভাঙাতে	গহীন রাতে ঘুম কে এলে ভাঙাতে (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	গহীন রাতে ঘুম কে এলে ভাঙাতে (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V. P-11724 শিল্পী : মিস্ ইন্দুবালা	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'কেন এ কুহেলি ঠেলে দখিনা বাতাস এলে, কবি তুই হৃদয় মেলে ছিলি কি এরি আশাতে।'
১৮. কার নিকুঞ্জে রাত কাটিয়ে আসলে প্রাতে পুষ্পচোর	কার নিকুঞ্জে রাত কাটিয়ে আসলে প্রাতে পুষ্পচোর (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়) 'নজরুল-রচনাবলী'র অন্তর্গত 'বুলবুল' গ্রন্থে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'গুনগুনিয়ে মোর আঙিনায় কোন্ সতীনের গাইছ গুণ্ কার মলঞ্চে ফুল ফোটায়ে হুল ফোটালে বক্ষে মোর'	কার নিকুঞ্জে রাত কাটিয়ে আসলে প্রাতে পুষ্পচোর (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং : H.M.V. N-7014 শিল্পী : মিস্ হরিমতি	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ক. 'বোরকা খুলি' বন-কেতকীর ফুলরেণুতে রাঙলো গা, পারুল বধূর-মাগলে মধু হাস্‌না হেনার ভাঙলে দোর' খ. 'গায় কাওয়ালি বাদলি রুমঝুম তফওয়ালি নাচে মউর ঝুরছে কদম মেঘতমালে বিজলি চোখে চায় কিশোর।' গ. 'শোনরে কবি পুষ্পলোভী আজ ধরেছি ফুল চুরি, হুল ফুটিয়ে, ফুলবালাদের কূল ভোলানো ভাঙবো তোর।'
১৯. কেন আন ফুলডোর আজি বিদায়-বেলা	কেন আন ফুলডোর আজি বিদায়-বেলা (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	কেন আন ফুল-ডোর আজি বিদায়-বেলা (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং : H.M.V. P-11682 শিল্পী : মিস্ ইন্দুবালা	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'আছে বাহুর বাঁধন তব শয়ন-সাথী, আমি এসেছি একা আমি চলি একেলা।'
২০. কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া	কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া (গানের স্তবক সংখ্যা সাত)	কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং : H.M.V. P-11670 শিল্পী : মিস্ আঙ্গুরবালা	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ক. 'গাথিতে ফুলমালা বিঁধে সে কাঁটা হয়ে, কাঁটার হার গাঁথি— সে আসে ফুল লয়ে।' খ. 'কবি রে জলধি এ তাহারে মন দিয়ে গেলিরে জল নিয়ে জীবন ব্যাপিয়া॥ গ. 'নিষেধ নাহি মানে আমার পোড়া আঁখি, জল লুকাল কত কাজল মাখি মাখি।'

২১. এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল	এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) 'নজরুল-রচনাবলী'তে কবির 'বুলবুল' গীতগ্রন্থ থেকে গৃহীত একটি স্তবক নিম্নরূপ : 'ফোটে যে কোন ক্ষত-মুখে কবিরে তোর গীতিসুর সে ক্ষত দেখিলনা কেউ, দেখিল তোরে কেবল' আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে উক্ত স্তবকটি নিম্নরূপ : 'কবি রে কোন্ ক্ষতমুখে ফোটে তোর গীতি-সুর সে ক্ষত দেখিলনা কেউ দেখিল তোরে কেবল সে গীতি দেখিলনা কেউ শুনিল গীতি কেবল'	এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং TWIN FT 863 শিল্পী : মিস্ বীণাপাণি	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : ক. 'আমার বুকের কাঁদন তুমি বল ফুল-বাস ফিরে যাও, ফেলোনা গো শ্বাস দখিনা বায়ু চপল॥'
২২. বসিয়া বিজনে কেন একা মনে	বসিয়া বিজনে কেন একা মনে (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়)	বসিয়া বিজনে কেন একা মনে (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V. N-11638 শিল্পী : কে. মল্লিক	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ক. 'চাঁদ হেরে মুখ চাঁদ মুকুরে ছায়াপথ-সিঁথি রচি চিকুরে, নাচে ছায়ানটী কানন-পুরে' খ. 'বেলা গেল বধূ ; ডাকে ননদী, চল জল নিতে যাবে লো যদি, কালো হয়ে আসে সুদূর নদী নাগরিকা-সাজে সাজে নগরী॥' গ. 'মাঝি বাঁধে তরী সিনানঘাটে, ফিরিছে পথিক বিজন মাঠে, কারে ভেবে বেলা কাঁদিয়া কাটে ভর আঁখিজলে ঘট গাগরী॥'

বিঃ দ্রঃ: গানের বইয়ে এবং গানের রেকর্ডে ও স্বরলিপি গ্রন্থে বাণীর স্তবক-বিন্যাসে পার্থক্য আছে। এখানে স্বল্পপরিসরে তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

নজরুলের গানের বই 'চোখের চাতক'	'নজরুল-রচনাবলী'	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী	বাণীর পার্থক্য
গানের প্রথম পংক্তি	গানের প্রথম পংক্তি	গানের প্রথম পংক্তী	
১	২	৩	৪
১. আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী	আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী (গানের স্তবকের সংখ্যা চার)	আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং : H.M.V. N-4187 শিল্পী : ধীরেন্দ্র নাথ দাস	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'আমার দুঃখেরে কাণ্ডারী করি আমি ভাসিয়েছিলাম ভাঙা তরী, তুমি ডাক দিলে কে স্বপন-পরী নয়ন ইশারায়॥'
২. আমি কি সুখে লো ঘরে রবো	আমি কি সুখে লো ঘরে রবো (গানের স্তবক সংখ্যা নয়)	আমি কি সুখে লো ঘরে রবো (গানের স্তবক সংখ্যা সাত) রেকর্ড নং : H.M.V. N-9916 শিল্পী : হরেন চট্টোপাধ্যায়	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ক. 'সখি তার অনাদর আগুনে জ্বালায়ে পোড়াব লাবণি মোর ওলো তারি হাতের আঘাতে আঘাতে হবে এ দেহ কঠোর।' খ. 'আমার এ তনু শুকাবে গভীর অভিমানের জ্বালা আমি তাই দিয়ে হবো গলায় রুদ্রাক্ষের মালা' গ. 'আমি শ্যামের গলার মালা হব আমি জীবনে পেয়েছি শুধু জ্বালা সখি মরে এবার মালা হব' ঘ. 'আমার চোখের জলে বই নদী আমি নদী হয়ে কেঁদে যাব চরণে তাঁর নিরবধি। আমি কি সুখে লো গৃহে রব আমার শ্যাম হল যদি যোগী ওলো সখি আমিও যোগিনী হব।'
৩. ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়	ছাড়িতে পরাণ নাহি চায় (গানের স্তবক সংখ্যা চার) 'নজরুল-রচনাবলী'তে চতুর্থ স্তবক নিম্নরূপ : 'তুমি রবে যবে পরবাসে আমি দূর নীলাকাশে জাগিব তোমার আশে নূতন তারায়।'	ছাড়িতে পরাণ নাহি চায় (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রকর্ড নং: P. 11673 শিল্পী : কুমারী প্রতিভা সোম	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে চতুর্থ স্তবক নিম্নরূপ : 'নীরবে রবে যবে পরবাসে আমি দূর নীলাকাশে জাগিব তোমারি আশে নূতন তারায়।'
৪. যাও যাও তুমি ফিরে	যাও যাও তুমি ফিরে (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) 'নজরুল-রচনাবলী'তে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের নিম্নোক্ত শেষ স্তবকটি তৃতীয় স্তবক হিসাবে স্থান পেয়েছে : 'এই অভিমান জ্বালা মোর একেবারি কালা ম্লান মিলনের মালা দাও ধূলাতে ঢাকি?'	যাও তুমি ফিরে (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) রেকর্ড নং : H.M.V. 11682 শিল্পী : মিস ইন্দুবালা	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ক. 'আজ যে ফুল প্রভাতে হায় ফুটিল শাখাতে, তায় দেখিলনা রাতে সে ঝরিল নাকি।' খ. 'হায়রে কবি প্রবাসী নাই হেথা সুখ-হাসি, ফুল ঝরে হলে বাসী রয় কাঁটার ফাঁকি।'

৫. কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া	কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া (গানের স্তবক সংখ্যা ষোল)	কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া (গানের স্তবক সংখ্যা আট) রেকর্ড নং : H.M.V.N. 3135 শিল্পী : আশ্চর্যময়ী দাসী	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ক. 'আমার শ্যামেরে কাজল পরাইতে মেঘ ঘুরে ঘুরে গগনে। আমার শ্যামের মুকুট হয়ে শিখা নেচে ফেরে বন-ভবনে।' খ. 'সখি গো— সখি নিখিল তারে ধেয়ায় গো এই রাধিকার পারা কোটি শশী তারা তার নীল বুকে লূটায় গো' গ. 'যদি একাকিনী চলি বন তলে সে যে ছায়া হয়ে পিছে পিছে চলে। যদি একা মোর ঘরে দীপ জ্বালি আসে আঁধারের রূপে বনমালি সখি গো—' ঘ. 'আমার কলঙ্কী চাঁদ তার কলঙ্ক চেয়ে জ্যোৎস্না বেশি কলঙ্ক তার দেখে কে। লোকে আমার চাঁদে কলঙ্কী কয় জ্যোৎস্না তাহারি মেখে। আমি তারির লাগি কুমুদিনী হয়ে জলে ডুবে রই তারির লাগি' আমি চকোরিনী হয়ে নিশীথ জাগি তারির লাগি। আমার প্রাণের সাগরে জোয়ার জাগে চাঁদের লাগি' আমার কলঙ্কী চাঁদ।' ঙ. 'সখি গো— সখি আঁখি মোর বিবাদী হলে কালো রূপে সেও ছলে। আমার চোখের জল বিবাদী হলে সেও কালার রূপে গলে। আমার বুকের কথা চোখে এল চোখের জল সই সেও কালো। সখি লো মোর মরণ ভালো সে যে আঁখি পাতা হয়ে থাকে ঘিরি আঁখি বনে বনে ডাকে তারি আঁখি কোয়েলা পাখি।' চ. 'কাঁদে ফাল্গুনে গুণ গুণ ফুল-ভোমরা, বন-হরিণীর চোখে তারি কাজল পরা। তারে কেমনে ভুলিব। বল সখি তারে কেমনে ভুলিব।' ছ. 'আমারে অঙ্গ জড়ায়ে দুলে সে রঙ্গে শাড়ি সে নীলাম্বরী গো। আমি কূল ছাড়িয়াছি আজ দেখি সখি দুকূল লইয়া মরি গো। আমার বসন-ভূষণ তারির সখা কেমনে তায় ভুলিব।'

৬. পরদেশী বঁধু ! ঘুম ভাঙায়ো 'চুমি' আঁখি	পরদেশী বঁধূ ! ঘুম ভাঙায়ো চুমি' আঁখি (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	পরদেশী বঁধূ ! ঘুম ভাঙায়ো চুমি' আঁখি (গানের স্তবক সংখ্যা দুই) রেকর্ড নং : TWIN FT 4028 শিল্পী : মিস কমলা (ঝরিয়া)	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'যদি গান থামে মোর মুখে, ফিরিয়া যেয়োনা, বীণা রবে তবু বুকে, নাহি গান, কুলায়েতে আছে তবু পাখি ঘুম ভাঙায়ো চুমি আঁখি।'
৭. এত কথা কিগো কহিতে জানে চঞ্চল ঐ আঁখি	এত কথা কিগো কহিতে জানে চঞ্চল ঐ আঁখি (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	এত কথা কিগো কহিতে জানে চঞ্চল ঐ আঁখি (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং: H.M.V.N. 7087 শিল্পী : ধীরেন্দ্রনাথ দাস	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ক. 'মানস-সায়রে মরালেরি প্রায় গহন সলিলে ভেসে ভেসে চায় আমার হিয়ার নিভৃত ব্যথায় সাধ যায় ধরে রাখি চঞ্চল ঐ আঁখি [বইয়ে এবং রেকর্ডে স্তবক বিন্যাসে পার্থক্য আছে।]
৮. আজি বাদল ঝরে মোর একেলা ঘরে	আজি বাদল ঝরে মোর একেলা ঘরে (গানের স্তবক সংখ্যা চার) 'নজরুল-রচনাবলী'তে দুটি পংক্তি নিম্নরূপ : ১. 'এমন দিনে কে নীড়হারা পাখি' গ্রামোফোন রেকর্ডে উপরোক্ত পংক্তিটি নিম্নরূপ : 'আজ এমন দিনে কোন্ নীড়হারা পাখি' 'নজরুল-রচনাবলী' তে আরেকটি পংক্তি নিম্নরূপ: 'আয় ঝড়ের পাখি আয় এ একা বুকে' আয় দিবরে আশ্রয় মোর গহন বুকে আয় রচিব কুলয়ে আজ নূতন করে' গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নরূপ : 'আয় ঝড়ের পাখি আয় আমার এ বুকে আয় দিবরে আশ্রয় মোর গহন বুকে আয় বাঁধিব বাসা আজ নূতন করে।।	আজ বাদল ঝরে মোর একেলা ঘরে (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং : TWIN FT 864 শিল্পী : ইন্দুবালা	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ক. 'এই ঝড়ের রাতি নাই সাথের সাথী মেঘ-মেদুর গগন বায় নিবেছে বাতি।। মোর এ ভীরু প্রণয় হায় কাঁপিয়া মরে।।' খ. 'এই বাদল-ঝড়ে হায় পথিক-কবি ঐ পথের 'পরে আর কতকাল র'বি, ফুল দলিবি কত হায় অভিমান-ভরে।।'

বিঃ দ্রঃ : গানের বইয়ে এবং গানের রেকর্ডে ও স্বরলিপি গ্রন্থে বাণীর স্তবক-বিন্যাসে পার্থক্য আছে। এখানে স্বল্পপরিসরে তা রক্ষা যায়নি।

বর্ণানুক্রমিক সূচি

ক

ল

শ

স